জ্বলিছে ধ্রুবতারা

১ম খণ্ড

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

লুক ইস্ট

Jwaliche Dhrubotara

by Rantideb Sengupta

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক • আশিস পণ্ডিত
লুক ইস্ট পাবলিকেশনস
সি ই-১৭, সল্টলেক, সেক্টর-১
কলকাতা-৭০০০৬৪
দূরভাষ : ০৩৩-২৩২১০৭৩৮

পরিবেশক • দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

অক্ষরবিন্যাস • বাংলা স্ক্রিপ্ট

প্রচ্ছদ-চিত্র • মার্টি কলিন

প্রচ্ছদ • অসীম দেবনাথ

মুদ্রক • ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রা. লি.
৩বি, মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট
কলকাতা-৭০০০৫৪

৫০০ টাকা

লেখকের কথা

বাংলায় ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ আছে। ইংরেজিতেও কিছু আছে। নিবেদিতার জীবন ও কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আমার এই লেখাটি আর-একটি জীবনীগ্রন্থ হিসাবে লিখতে আমি কখনোই চাইনি। নিবেদিতার জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে লেখার পাশাপাশি, ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় এবং নিবেদিতার চারপাশে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবর্তিত হয়েছেন, তাঁদেরই আমি চিত্রিত করতে চেয়েছি। এটি করার ক্ষেত্রে, যেখানে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই তথ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা আমার ছিল না। ফলে, যুক্তি এবং তর্ক দিয়ে প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে আমার এই কাজটিকে আমি গবেষণামূলক কাজ বলতেই পছন্দ করব। নিবেদিতার জীবন ও কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থটি দুটি পর্বে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার। আপাতত প্রথম পর্বটি প্রকাশ করা গেল। এই পর্বে নিবেদিতার শৈশব থেকে স্বামীজির প্রয়াণ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদ — এই সময়কালটিকে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে, স্বামীজির প্রয়াণের পর এদেশে নিবেদিতার কর্মকাণ্ড, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা থেকে তাঁর জীবনের অন্তিম দিনটি পর্যন্ত সময়কাল। দ্বিতীয় পর্বটি লেখার কাজ এখন করছি।

নিবেদিতাকে নিয়ে আমার এই কাজটি করার পিছনে ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল। তা এখনো রয়েছে। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু নিবেদিতা ভারতকে দান করেছিলেন। পরিবর্তে ভারত এই মহীয়সী নারীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু জানায়নি বলেই আমার ধারণা। আমার বারবার মনে হয়েছে, যে সম্মান নিবেদিতার প্রাপ্য ছিল — তা বোধকরি তিনি পাননি। বরং, ভারতীয়, বিশেষত বাঙালির কাছে তিনি যেন এক বিস্মৃত চরিত্রই হয়েছেন এখন। নিবেদিতাকে নিয়ে বাংলায় কিছু কাজ হয়েছে সত্য। তবে দু-একটি কাজ ছাড়া, ইতিহাসনিষ্ঠভাবে তাঁর জীবন এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ আমার অন্তত চোখে পড়েনি। আমার মনে হয়েছে, নিবেদিতাকে নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ কাজ এবং বিশ্লেষণের এখনো একান্তই দরকার রয়েছে। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেই চেষ্টাটুকুই আমি করেছি। আমার এ চেষ্টা সফল হয়েছে কিনা — তা পাঠকরা বলবেন।

নিবেদিতাকে নিয়ে এই কাজটি করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং উৎসাহ আমার সর্বক্ষণ জুটেছে। এই কাজটি করতে আমার লন্ডন-প্রবাসী বন্ধু শ্রীমতী সারদা সরকার প্রথমাবধি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এখনো করছেন। বিভিন্ন সময়ে নিবেদিতা-সংক্রান্ত নানারকম তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে তিনি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে, আমার এই কাজটি অনেকাংশেই আমার একার কাজ নয়; এটিকে সারদা এবং আমার যৌথ কাজ হিসাবেই দেখছি আমি।

এই কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী ত্যাগিবরানন্দ মহারাজ। নিবেদিতা-সংক্রান্ত নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য বই তিনি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেও সবসময় অকুণ্ঠ উৎসাহ পেয়েছি। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং আমার সুহৃদ শ্রী পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ও আমাকে নিবেদিতা-সংক্রান্ত বইপত্র জোগাড় করে সাহায্য করেছেন। এই কাজের জন্য নিবেদিতার রচনা সমগ্র আমাকে উপহার দিয়ে সহায়তা করেছেন আমার ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী শ্রীমতী গীতশ্রী দাস।

তবে এই কাজটি করতে গিয়ে আমার সবথেকে বড় প্রাপ্তি নিবেদিতার উত্তরাধিকারী সেলেন্ডা মার্গো জিয়ারডিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সেলেন্ডা বর্তমানে আমেরিকা-নিবাসী। নিবেদিতার ভ্রাতা রিচমন্ডের নাতনি তিনি। সেলেন্ডার সংগ্রহে নিবেদিতার বেশ কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রয়েছে। সত্তরোর্ধ্ব সেলেন্ডার মধুর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নিবেদিতার মা এবং ভাইয়ের ছবি এই বইয়ে ব্যবহার করার জন্য সেলেন্ডা আমাকে দিয়েছেন। তদুপরি, এই বইয়ের জন্য তিনি ছোট্ট একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। সেলেন্ডার সঙ্গে আমার

এই পরিচয়টিও ঘটিয়ে দিয়েছেন সারদা। সেলেস্তার মতোই নিবেদিতার আর-এক উত্তরাধিকারী ক্রিস অরপ্যানেরও সন্ধান পেয়েছি এই কাজটি করতে গিয়ে। ক্রিস অরপ্যান নিবেদিতার বোন মেরি উইলসনের নাতি। এই কাজে তিনিও সহায়তা করেছেন।

আর-একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি জিন ম্যাকগিনেস। জিন আয়ারল্যান্ড নিবাসী। সমাজকর্মী। নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে জিন আয়ারল্যান্ডে অনেক কাজ নিজ উদ্যোগে করে চলেছেন। সে দেশে নিবেদিতার বাড়ি সংরক্ষণের চেষ্টা থেকে শুরু করে নিবেদিতার কর্মকাণ্ড প্রচারে জিনের ভূমিকা নিরলস। প্রতিবছর নিবেদিতার জন্মদিনটিতে এই মহীয়সী নারীকে নিয়ে জিন একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেন, নিবেদিতার জন্মস্থান ডনগ্যাননে। এই কাজটির বিষয়ে জিনের কাছ থেকেও অকুণ্ঠ উৎসাহ পেয়েছি। এই কাজটি করতে তিনিও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বইটির জন্য একটি সুন্দর ভূমিকাও লিখেছেন জিন।

বইটির প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকেছেন মার্টি কালিন। মার্টিও আয়ারল্যান্ড-নিবাসী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মার্টি আয়ারল্যান্ডের এক বিশিষ্ট চিত্রকর। স্যামুয়েল বেকেট, নিবেদিতার মতো আয়ারল্যান্ডে জন্ম নেওয়া মহৎ ব্যক্তিত্বের তৈলচিত্র এঁকেছেন মার্টি। নিবেদিতাকে নিয়ে কাজ করছি শুনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মার্টি বইয়ের জন্য এই প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকে আমাকে উপহার দিয়েছেন। মার্টিকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।

২০১২ সালে লন্ডনে অবস্থানকালে উইম্বলডনে নিবেদিতার বাড়ি দেখতে যাই। বস্তুত, সেই সময় থেকেই নিবেদিতাকে নিয়ে এই কাজটি করার ইচ্ছা জন্ম নেয় আমার মনে। সেই সময় থেকেই এই কাজটি শুরু করি। সেই কাজটি এখনো করে চলেছি। প্রথম পর্বটি শেষ হয়েছে। আশা রাখছি, দ্বিতীয় পর্বটি এই বছরের শেষ দিকে সম্পূর্ণ করে উঠতে পারব। এই কাজটি করতে গিয়ে আগে পড়া বহু বই যেমন নতুন করে পড়েছি, তেমনই বহু না-পড়া বইও এই সুযোগে পড়া হয়েছে। সৌভাগ্য হয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য বই পড়ার। এছাড়াও, নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ, সুলিখিত প্রবন্ধও পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই লেখার যাবতীয় তথ্য যেসব বই থেকে আহরণ করা হয়েছে তার একটি তালিকাও এর সঙ্গে দিয়ে দিলাম। তবে, কাজটি করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে — নিবেদিতা-সংক্রান্ত অনেক তথ্যই এখনো বোধহয় আমাদের অজানাই রয়ে গিয়েছে।

নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি এবং নির্ভর করেছি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিপত্রের ওপর। এ দেশে আসার পর তাঁর দৈনন্দিন খুঁটিনাটি জোসেফিনকে লেখা চিঠি থেকে যতটা

বিস্তারিত জানা যায়, ততটা বোধহয় আর কোথাও জানা যায় না। এক কথায়, জোসেফিনকে লেখা এই চিঠিগুলি কিছুটা নিবেদিতার দিনলিপির মতো কাজ করেছে। নিবেদিতা ডায়েরি লিখতেন। তাঁর ডায়েরি রামকৃষ্ণ মিশনের হেফাজতে রয়েছে। তবে, অন্যান্য অনেক গবেষকের মতো আমারও সেই ডায়েরি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে নিবেদিতা-সক্রান্ত গবেষণার কাজ যাতে আরো সুষ্ঠুভাবে করা যায় তার জন্যই এই ডায়েরি প্রকাশ হওয়া খুবই জরুরি।

সবশেষে বলতেই হবে লুক ইস্ট পাবলিকেশন যেভাবে এই বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রী পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়ের প্রতি। বই প্রকাশের যাবতীয় ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে তুলে নিয়ে পার্থ আমাকে ভারমুক্ত করেছে।

ভগিনী নিবেদিতার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠকের ভালো লাগলেই আমি কৃতার্থ।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

জানুয়ারি, ২০১৪

A chairde — hello friends

Let us give thanks to Rantidev Sengupta for this wonderful book about the life and times of Sister Nivedita. It is indeed timely, as the dawn is approaching when hopefully Nivedita will be recognised and revered in her birthplace in Ireland as much as she is in India. More than one hundred years after her death the full extent and influence of her inspirational and radical thinking has yet to be explored.

In 2007, a Blue plaque was erected in Scotch Street, Dungannon in memory of Margaret Noble / Sister Nivedita. The Blue Plaque was erected by The Ulster History Circle at the behest of Maurice Hayes and read, *'Margaret Elizabeth Noble, Sister Nivedita 1867-1911 Writer and Indian Nationalist born here'*. I was intrigued to find out who was she and what had she done? Yet no-one seemed to have any information about her. Thus started my quest to find out more about this woman who was born in Dungannon, yet remained unknown in her place of birth. Why was she forgotten in her own home town? Was it because she was a woman? Was it because she favoured nationalism for India? So many questions. Through my research I came to realise that she was the woman of all women, a child of Dungannon who Tagore reverently referred to as, 'The Mother of the People'.

Dungannon is a town with an approximate population of 10,000, situated in the centre of Northern Ireland in the County of Tyrone. DunGeanann is Irish for Geannon's fort. Geanann was the son of Cathbhadh, a first century druid. It was also the Ancient Capital of Ulster and as such was the home of Gaelic chiefs : most notably, The Great Hugh O'neill in late 1500's. The Hill of O'Neill in Dungannon is now a major tourist destination but increasingly Dungannon is also becoming a place of pilgrimage for those wishing to visit Scotch Street in Dungannon, where Sister Nivedita was born.

I feel it is important to recognise Sister Nivedita's roots in Ireland because Swami Vivekananda himself recognised it when he said, "*Let me tell you frankly that I am now convinced that you have a great future in the work for India. What was wanted was not a man, but a woman —a real lioness — to work for Indians, women especially. India cannot yet produce great women, she must borrow them from other nations. Your education, sincerity, purity, immense love, determination and* ***above all, your Celtic blood,*** *make you just the woman wanted.*"

Yes, above all else, it was her Celtic blood, a mixture of Scottish and Irish blood, which flowed through her veins, that made Swami Vivekananda certain that she was indeed the woman India needed and, more importantly, that she would be willing to answer the call. This book recounts how Margaret Noble went to India, became known as Sister Nivedita and took on a pivotal role in the regeneration of India.

In order to create more awareness of her great life a 2 day event was organised in 2011, one hundred years after her death, in Dungannon. I was ably assisted in this event by Clonaneese & Killeeshil Historical Society. Dungannon & South Tyrone Borough Council provided funding for the event. The event included lectures, walks, a bus tour and a world premiere of the docudrama, 'Awakening a Nation' written and directed by me and performed by the cast of The Noble Thespians. The Sister Nivedita event in Dungannon has now become an annual event and it is hoped that it will go from strength to strength. The docudrama is performed on request on a non-profit making basis. To date it has been performed in The Craic

Theatre Coalisland, Handsworth Wood Birmingham, Conway Mill Belfast, Dungannon Arts & Visitors Centre, Dungannon and in The Samuel Beckett Theatre, Trinity College, Dublin; and it is the highlight at the annual Sister Nivedita event held in October in Dungannon, Co. Tyrone, Northern Ireland.

First and foremost we remember Sister Nivedita for her deep, unwavering spirituality and as Swami Vivekananda's greatest disciple. Swami ordained her as a Hindu Nun and gave her the name, Sister Nivedita, The Dedicated One. Her unwavering dedication to India was never in doubt.

Her literary achievements were numerous articles, newsletters, magazines and books, focusing on the life of women in India, Indian history, myths and legends, Swami Vivekananda and India's need for nationalism.

Helping to revoulutionise The Bengal Art movement, she actively encouraged artists to move away from European influences and remain true to their native Indian art.

The educational principles which she espoused are still relevant today. The vast numbers of varied educational institutions in India today which proudly bear the name of Sister Nivedita bear witness to the fundamental value of her Educational principles.

The political path she fearlessly and boldly traversed laid the path for Gandhi and the modern leaders of India. Sister Nivedita went to India and 'Awakened a Nation' at a time when she would not even have had a vote in her native country — because she was a woman! Sister Nivedita understood the need for both India and Ireland to break free from the shackles of British colonialism. When she designed the first national flag for India she aptly chose the symbol of the thunderbolt conveying selfless sacrifice.

Sister Nivedita was a woman who had spirituality in abundance, the fiercest of intellects, the gift of discernment, and the greatest of masters. Couple all this with her Celtic blood and we have the most famous person to have left the shores of Ireland to, 'give her all to India'.

Nivedita demonstrated the power of selfless sacrifice and how it is possible to change society through individual efforts. Known and appreciated by most of Europe's progressive thinkers, her influence in the West and on World thought has yet to be evaluated.

I thank India for remembering and honouring Sister Nivedita in so many, many ways and I ask for your suport in our endeavours to create awareness of her great life here in her place of birth and throughout Ireland. My hope is that Sister Nivedita can impact on her native land and help to move it forward in much the same way as she moved India forward.

I remain humbly yours in respect of Sister Nivedita

Is mise le meas

BOU Jean McGuinness

Beidh céad míle failte romhaibh i gcónaí — A hundred thousand welcomes await you always.

Nivedita

From the time I was a little girl, my mother told me the story of her aunt, Sister Nivedita. I was entranced with the idea that she had left her family in England, changed her religion, and traveled to India to found a school that would help young women. Even though my great aunt had died thirty years before I was born and when my mother was only a toddler, I always felt a special connection with her for I was named after her. My middle name is Margot, the name that Sister Nivedita's family called her at home.

As I grew older and began to read, I decoded the titles of the books on my parents' bookshelves. Among my father's history books and my mother's novels, a special collection stood out. "The Master As I Saw Him" and "The Web of Indian Life" were the most memorable titles, but it would be several years before I was old enough to take these books down for myself and peruse them. In the meantime, my mother sometimes would retell some of the Hindu tales she had read in these books. I remember especially the story of the mother bird who martyred herself in order to save the life of her young.

Many years later, in my thirties, I embarked upon a new career, that of teaching elementary school. When doing my practice teaching in kindergarten, my mother sent me an article she had that Sister

Nivedita had written. I was pleasantly surprised and excited at how modern her outlook was, even though the article had been written at least seventy years before. This impressed me more than anything else. She had a keen and timeless insight into the nature of children and education. And it is this, more than anything else about Nivedita that has stayed with me. In my further studies and experiences in teaching young children and in raising my own, my admiration grew for the pioneer accomplishments made by Sister Nivedita and her friend, Maria Montessori. Today, my two granddaughters attend Montessori nursery schools.

My home today reflects many influences left to me by my great aunt, Sister Nivedita. Some items are from her directly and some were given to my grandparents by her friends, (several items from Sir Jagadis Bose and Sara Bull) and acquaintances. The bookshelf is filled with her books as well as two biographies. Brass finger bowls and ornaments from India are scattered throughout the house. A special silver tea-set embossed with Hindu deities and animals is used on special occasions. A large dark wooden Welsh dresser spans one wall in the living room, a purchase my great aunt made as a gift to her mother before she left England. Another gift she made was to her brother, my grandfather Richmond Noble. It is a white chine copy of the Virgin Mary's head fashioned after Michelangelo's Pieta. My grandfather claimed to be an agnostic (despite, or more likely because of his intensely religious upbringing by his Irish grandparents) yet because The Pieta was a piece of wonderful art, he cherished it. He also cherished it because it was given to him by his favorite sister who helped bring him up. He adored her.

Because of his adoration and respect for his older sister, her life story has been passed down in our family, but it is because of Sister Nivedita herself that her spirit lives so strongly today. She was a pioneer in the fields of education and literature and the rights of women.

Selenda Margot Giardine

যে স্কুলে নিবেদিতা পড়তেন

উইম্বলডনে নিবেদিতার বাড়ির বর্তমান ছবি

নিবেদিতার মা মেরি ইসাবেল হ্যামিলটন নোব্‌লের কোলে
নিবেদিতার বোনের কন্যা

◘ নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড নোব্‌ল

◘ জোসেফিন ম্যাকলিয়ড

□ সারা বুল

সারদা দেবীর সঙ্গে নিবেদিতা

গোপালের মা

অসুস্থ গোপালের মা-কে শুশ্রূষা করছেন নিবেদিতা

◘ ওকাকুরা কাকুজো

পিটার ক্রপটকিন

সিস্টার ক্রিস্টিন

রবীন্দ্রনাথ

জগদীশচন্দ্র বসু

কাশ্মিরে স্বামীজি, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সারা বুল এবং নিবেদিতা

কলকাতায় নিবেদিতার বাড়ির বর্তমান ছবি

এক

সময়টা নভেম্বর মাস। সাল ১৮৯৫। লন্ডন শহরে তখন বেশ ঠান্ডা। এমন সময়েই লন্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে এই খবরটি রটে গেল যে, লেডি ইসাবেল মার্গেসনের বাড়িতে এক হিন্দু সন্ন্যাসী আতিথ্য গ্রহণ করবেন। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিশিষ্ট জনদের সামনে কিছু বলবেন তিনি। মিস মার্গেসন লন্ডনের ধনী এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রতিনিধি। লন্ডন শহরে সেন্ট জর্জেস ড্রাইভে তাঁর সুদৃশ্য বসতবাড়ি। সমাজের বিশিষ্ট জনেরা মাঝে মাঝেই এই বাড়িতে মিলিত হন। লেডি মার্গেসনও সমাজের একজন বিদুষী রমণী হিসাবেই পরিচিত। বিশিষ্ট জনদের সমাগমে মাঝেমধ্যেই তাঁর সেন্ট জর্জেস ড্রাইভের বাড়িতে নানাবিধ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা জমে ওঠে। এ-হেন লেডি মার্গেসনের বাড়িতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আতিথ্য গ্রহণ করছেন এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলতে আগ্রহী হয়েছেন—এমন খবরে লন্ডনের সম্ভ্রান্ত মহলে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হল। এই সন্ন্যাসীটি কে তা নিয়ে নানাবিধ আলোচনা শুরু হল। জানা গেল—এই সন্ন্যাসীটি সম্পর্কে বিশদ জানেন দুজন—অঁরিয়েতা মুলার এবং এডওয়ার্ড টি স্টার্ডি। শ্রীমতী মুলার এবং শ্রীযুক্ত স্টার্ডি—এঁরাও সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ সমাজের প্রতিনিধি। মূলত এঁদের সূত্রেই যেটুকু খবর পাওয়া গেল তা হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোয় বিশ্বধর্মসম্মেলনে এই ভারতীয় সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা মার্কিন সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছে। মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলি ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তব্যসমূহ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশও করেছে। এই ভারতীয় সন্ন্যাসী মার্কিন দেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্য এবং বিতর্ক সৃষ্টি করে এসেছেন।

চিকাগোর ওই ধর্ম সম্মেলনে শ্রীমতী মুলারও অন্যতম বক্তা ছিলেন। ধর্ম সম্মেলনের থিওজফিকাল বিভাগে বক্তব্যও রাখেন শ্রীমতী মুলার। ওই ধর্ম সম্মেলনে এই হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তব্য শুনে তাঁর প্রতি কৌতূহল বোধ করেন অঁরিয়েতা মুলার।

মুলারের মনে হয়, এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে ব্রিটেনে আমন্ত্রণ জানালে ব্রিটিশরাও বেদান্তের এক নতুন ব্যাখ্যায় আলোকিত হতে পারবেন। সেই মতোই অক্ষয়কুমার ঘোষ নামে এক বাঙালি যুবক, যাঁকে মিস মুলার পোষ্যপুত্র করেছিলেন, তাঁর মাধ্যমে সন্ন্যাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে ব্রিটেনে আসার আমন্ত্রণ জানান। অক্ষয়কুমার সন্ন্যাসীর পূর্ব পরিচিত হওয়ার ফলে শ্রীমতী মুলারের পক্ষে আমন্ত্রণ জানানোর কাজটিও সুবিধাজনক হয়ে গিয়েছিল।

এডওয়ার্ড স্টার্ডি অবশ্য এই সন্ন্যাসীকে আরো আগে থেকেই জানতেন। স্টার্ডি বেদান্ত বিষয়ে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে ভারতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি এই সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেও আসেন। মূলত স্টার্ডি ও মুলারের ঐকান্তিক ইচ্ছাতেই এই সন্ন্যাসীর ব্রিটেনে আগমন। নিউ ইয়র্ক থেকে পারি হয়ে ১৮৯৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সন্ন্যাসী এসে পৌঁছোন লন্ডন শহরে।

লন্ডন শহরে পা রাখার পর এই ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রথমে কোথায় এসে উঠেছিলেন, তা নিয়ে একটু ধন্দ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি প্রথমে উঠেছিলেন কেমব্রিজে, আঁরিয়েতা মুলারের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি চলে যান কাভারশাম, রেডিংয়ে, স্টার্ডির বাড়িতে। মারি লুই বার্ক অবশ্য জানিয়েছেন, লন্ডনে প্যাডিংটন স্টেশনে সন্ন্যাসী এসে পৌঁছোনোর পরই স্টার্ডি তাঁকে কাভারশামে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করার পর সন্ন্যাসী চলে আসেন লন্ডনে। ওঠেন ওকলে স্ট্রিটের একটি বাড়িতে।

এই লন্ডন শহরে প্রিন্সেস হলে সন্ন্যাসীর ভাষণ প্রথম শোনেন লেডি ইসাবেল মার্গেসন। জানা যায়, আঁরিয়েতা মুলারের মতোই লেডি মার্গেসনও সন্ন্যাসীর ভাষণ প্রথমবার শ্রবণেই কৌতূহলী হয়েছিলেন। মুলারের মতোই লেডি মার্গেসনেরও মনে হয়েছিল, বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ সমাজের সঙ্গে অতি অবশ্যই এই সন্ন্যাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিৎ। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৯৫ সালের ১০ নভেম্বর, রবিবার, অপরাহ্নে লেডি মার্গেসন তাঁর বাড়িতে জনা দশ-পনেরো বিশিষ্ট জনকে আমন্ত্রণ জানালেন। এই বিশিষ্টজনদের সামনে বেদান্ত সম্পর্কে এই ভারতীয় সন্ন্যাসী বক্তব্য রাখবেন— এমনই ঠিক হল।

লেডি মার্গেসনের বাড়ির এই ছোট্ট সমাবেশটিতে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন উইম্বলডনের বাসিন্দা, তরুণী শিক্ষাব্রতী মার্গারেট নোব্‌লও। লেডি ইসাবেল মার্গেসনের সঙ্গে তরুণী মার্গারেটের পরিচয় সিসেম ক্লাবে। সিসেম ক্লাব সেই সময়ে সম্ভ্রান্ত এবং বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজের একটি মিলন স্থল। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি নিয়ে সেখানে তুমুল বৌদ্ধিক চর্চা হয়। জর্জ বার্নার্ড শ, অলডাস

হাক্সলির মতো যশস্বী সাহিত্যিক, চিন্তাবিদরা নিয়মিত সেখানকার চা-চক্রে যোগ দেন। মার্গারেট ওই ক্লাবের সম্পাদক এবং অন্যতম বক্তা।

লেডি মার্গেসনের বাড়িতে ওই ভারতীয় সন্ন্যাসীর আগমনের খবর মার্গারেট প্রথম পেয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাভেনজার কুকের মাধ্যমে। কুকের মাধ্যমেই লেডি মার্গেসনের বাড়িতে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণও পান মার্গারেট। অ্যাভেনজার কুক সেই সময় লন্ডনের বেশ নামজাদা ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। বাচ্চাদের জন্য ছবি আঁকেন। একটি ব্যক্তিগত ঘটনায় মার্গারেট যে তখন নিঃসঙ্গ— তা-ও জানতেন কুক। কুক এ-ও জানতেন, ব্যক্তিগত জীবনে একটি আঘাত পেয়ে মার্গারেট তখন আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কুকের মনে হয়েছিল—যে আশ্রয়স্থল খুঁজছেন মার্গারেট— কে জানে, সে আশ্রয়ের সন্ধান এই সন্ন্যাসীর বক্তব্যের ভিতর দিয়ে খুঁজে পাবেন কিনা। মার্গেসনের বাড়িতে ওই সন্ন্যাসীর আগমনের সংবাদ এবং রবিবারের ঘরোয়া সভায় মার্গারেটকে আমন্ত্রণ জানানোর সময় কুক নিজেও হয়তো বুঝতে পারেননি—মার্গারেটের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা তিনি নিজের অজান্তেই করে দিলেন।

১৮৯৫ সালের ১০ নভেম্বর অপরাহ্নে সেন্ট জর্জেস ড্রাইভে লেডি মার্গেসনের বাড়িতে কী হয়েছিল? এর একটি চিত্র ফরাসি লেখিকা লিজেল রেমঁ এঁকেছেন তাঁর 'Nivedita— Fille del Inde' গ্রন্থে। সেই বর্ণনাটিই অনুসরণ করি। সেদিন লেডি মার্গেসনের বাড়ির ওই আসরে মার্গারেট এসে পৌঁছেছিলেন প্রায় সবার শেষে। লেডি মার্গেসনের ড্রয়িংরুমে যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে প্রায় দশ-পনেরো জন অতিথি উপস্থিত। সবাই চুপ করে বসে আছেন। জানলার সবকটি পরদা টানা। ঘরের ভিতর চড়া ধূপের গন্ধ। একটু দেরিতে আসার জন্য মার্গারেট প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাড়াতাড়ি সামনে যে খালি চেয়ারটা পেলেন সেখানেই বসে পড়লেন। একটু পরেই প্রবেশ করলেন সেই হিন্দু সন্ন্যাসী— স্বামী বিবেকানন্দ। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর লালরঙের কোমরবন্ধ। সুগঠিত শরীর, স্মিত মুখ অথচ গাম্ভীর্যের একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ সারা শরীরে। এবং কী আশ্চর্য, বসলেন এসে একেবারে মার্গারেটের মুখোমুখি। বিবেকানন্দ আসন গ্রহণ করার পর লেডি মার্গেসন ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে যথেষ্ট বিনয় সহকারে বললেন, 'স্বামীজি, আমার বন্ধুরা সকলেই এসে গেছেন।' মার্গেসনের কথায় বিবেকানন্দ অল্প একটু হাসলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। সারা ঘর নিঝুম। বিবেকানন্দ তাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যা শুরু করার আগে মন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করলেন—'শিব, শিব, নমঃ শিবায়।'

অনেকক্ষণ ধরে সমবেত বিশিষ্টজনদের সামনে বেদান্তের ব্যাখ্যা করলেন স্বামীজি। চমৎকার ইংরেজি। বলার ভঙ্গিটি শান্ত। কণ্ঠস্বর কখনো উঠছে, কখনো নামছে। মাঝে মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন।

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, বিবেকানন্দের সেই দিনের বক্তব্য মার্গারেটকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে মার্গারেট সেদিন শুনেছিলেন বিবেকানন্দের বেদান্ত ব্যাখ্যা। মার্গারেটের সমস্ত শাণিত যুক্তি-বুদ্ধিকে যেন পরাজিত করে দিয়েছিল ভারতীয় সন্ন্যাসীর কথাগুলি। মার্গারেটের বারংবার মনে হয়েছিল কোনো এক অভিনব শক্তি যেন অভিভূত করেছে তাঁকে। এক অসীম উদার দিগন্ত যেন ওঁর সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। মার্গারেটের মনে হয়েছিল— পূর্ণ আত্মজ্ঞানী যাঁরা, উনি কি তাঁদেরই একজন তবে?

মার্গারেট অনুভব করেন, এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তব্য শুধুমাত্র কথার পিঠে কথা সাজিয়ে বুদ্ধির চাতুরিতে জনচিত্ত জয়ের চেষ্টা নয়, বরং এঁর বক্তব্যের ভিতরে রয়েছে আত্মোপলব্ধির বাণী। যে ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁকে পীড়িত করছিল, যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সংশয়ের মাঝে দিন কাটছিল—মার্গারেটের মনে হয়, যেন এক গভীর শান্তি তাঁকে এবার আচ্ছন্ন করেছে। যে সত্যের খোঁজ তাঁর অন্তরে চলছিল নিরন্তর— এতদিনে যেন তাঁর সন্ধান পেলেন।

মার্গারেট নোব্‌ল, পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা কী লিখেছেন ওই প্রথম সাক্ষাৎ সম্পর্কে। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ছিল কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি। আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে উত্তরটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন গোধূলি ও অন্ধকারের মিলন-সম্ভূত সেই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই ভারতের কোন উদ্যানে, অথবা সূর্যাস্তকালে কূপের নিকটে, কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সাধু এবং তাহার চারিদিকে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ— এইরূপ এক দৃশ্যেরই কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডে আচার্য হিসাবে স্বামীজীকে আমি আর কখনও এমন সাদাসিধাভাবে দেখি নাই।... সে অপরাহ্নের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবং সেদিনকার কথাবার্তার একটু আধটু মাত্র এখন মনে পড়িতেছে। কিন্তু সেই বিস্ময়কর প্রাচ্য সুর সংযোগে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক তিনি আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিবার নহে; ঐ সুরের ঝঙ্কার আমাদের গীর্জায় প্রচলিত গ্রেগরী-প্রবর্তিত সুরের কথা এত মন করাইয়া দেয়,অথচ উহা হইতে কত ভিন্ন!'

অনেকেরই এমন একটি সহজ ধারণা আছে যে, প্রথম দর্শনেই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের প্রতি নিবেদিতা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সাধারণের বিশ্বাসটিও সেরকমই। একথা ঠিকই যে, বিবেকানন্দ নিবেদিতার জীবনের অভিমুখটাই বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের প্রবেশ না ঘটলে হয়তো চিরটাকাল

উদ্দেশ্যহীন এক ছুটে চলাই সার হত নিবেদিতার। সে কথা স্বয়ং নিবেদিতাও স্বীকার করেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের দীর্ঘদিন পরে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'মনে কর সে সময় তিনি যদি লণ্ডনে না আসতেন। এ জীবনটা তাহলে একটা স্কন্ধকাটা স্বপ্নের মতো হয়ে থাকত। কিন্তু আমি জানতাম কারও ডাক শুনতে পাব। তার জন্য একটা নিরন্তর প্রতীক্ষা আমার ছিল। ডাক এল সত্যি।'

পাশাপাশি, একথাও সত্য যে, প্রথম সাক্ষাতেই বিবেকানন্দের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেননি নিবেদিতা। বরং, এই ভারতীয় সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে বেশ কিছু প্রশ্ন এবং সংশয় দেখা দিয়েছিল। যদিও লিজেল রেমঁর লেখা নিবেদিতার জীবনীতে এ-সম্পর্কে বিশদ কিছু পাওয়া যায় না। বরং লিজেল রেমঁ লিখেছেন বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আগেই ছাত্রীজীবনে চার্চের অধীন স্কুলে পড়াশোনা করার ফলে অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে নিবেদিতা আগ্রহী হয়ে পড়েন। অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে নিবেদিতার এই আগ্রহের কথা অ্যাভেনজার কুক জানতেন। জানতেন বলেই লেডি মার্গেসনের বাড়িতে নিবেদিতাকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান তিনি। তবে, এরকম সরলীকৃত ধারণাটি করা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ, মার্গারেটের জীবন আলোচনা করতে গেলেই আমরা দেখব বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম আলাপ হয়, সেই সময় মার্গারেট বেশি উৎসাহী ছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি চর্চায়। বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেও যে নিবেদিতার মন থেকে সংশয় দূর হয়নি তার কিছুটা ইঙ্গিত রেমঁর লেখায় পাওয়া যায়। রেমঁ লিখেছেন, ওইদিন লেডি মার্গেসনের বাড়িতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরেই উপস্থিত কয়েকজন মহিলা শ্রোতা বিরূপ মন্তব্য করেন। তাঁরা বলেন, বিবেকানন্দের মতবাদে মৌলিকত্ব কিছুই নেই। মার্গারেটেরও সেরকমই মনে হয়েছিল। তবে, প্রকাশ্যে মার্গারেট বিবেকানন্দের বক্তব্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। তিনি ভেবেছিলেন, ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তব্য নিয়ে আরও একটু ভাবনা-চিন্তা করে দেখতে হবে।

আবার নিবেদিতা যে ব্রহ্মচর্যকেই জীবনের শুরু থেকে একমাত্র ব্রত করে নিয়েছিলেন—এমন ভাবনাটিও বোধকরি ঠিক নয়। লিজেল রেমঁর লেখা নিবেদিতার জীবনী অনুসরণ করলে জানা যায়, শুধু অধ্যাত্মবাদ নয়, এরই পাশাপাশি দেশের রাজনীতি সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন তিনি। রেক্সহ্যামের স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় সমাজসেবার কাজেও নিজেকে তিনি জড়িয়ে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ, নানা বিষয়েই নিবেদিতার একটি সহজাত উৎসাহ ছিল। আজীবন তিনি ব্রহ্মচর্য যাপন করার কথা চিন্তা করেছিলেন, বা সেরকম তাঁর কোনো ইচ্ছা ছিল—একথা কিন্তু নিবেদিতার

ব্যক্তিগত জীবনও সমর্থন করে না। যৌবনে অন্তত দুবার দুই ব্রিটিশ যুবকের প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন তখনকার মার্গারেট। বিয়ে করে সংসার পাততেও চেয়েছিলেন। তবে, দুবারই শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ প্রণয়ে পরিণত হয়েছিল। বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে নিবেদিতার জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যখন আমরা প্রবেশ করব তখন এই ঘটনাগুলিও বিস্তারিতভাবেই আসবে।

স্বয়ং নিবেদিতার লেখা থেকেও জানা যায়, নিছক ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি লেডি মার্গেসনের বাড়িতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে যাননি। লিজেল রেমঁর লেখা জীবনী এবং নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'-এর অংশবিশেষ পাঠ করলেই বোঝা যায়, নিবেদিতার ওইদিন বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে ছুটে যাওয়ার পিছনে কাজ করছিল অদম্য কৌতূহল। এই কৌতূহল যে শুধু নিবেদিতার একার ছিল তা নয়; ওইদিন লেডি মার্গেসনের বাড়িতে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের মনেই এই কৌতূহল ছিল। আর এই কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা, চিকাগো বক্তৃতার পর তখন পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দকে নিয়ে প্রবল আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। তাঁর পক্ষে যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু হয়েছে, তেমনই তাঁর বিপক্ষে সমালোচনাও যথেষ্ট। অর্থাৎ, এককথায় বিবেকানন্দ তখন পাশ্চাত্যে যথেষ্ট বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তখনো পর্যন্ত, হাতে গোনা গুটিকয় মানুষ বাদে, পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট সমাজে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি অতি সরলীকৃত ধারণাই তাঁরা তখনো পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন— হিন্দু ধর্ম অর্থে পৌত্তলিকতা, নানাবিধ যুক্তিহীন আচার এবং সংস্কার। এইরকম একটি সময়েই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে গিয়ে হিন্দু ধর্মের অন্যতর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, উদার ধর্মীয় মতবাদ এবং মানবতার কথা বলেছেন— যা স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট সমাজকে কৌতূহলী করে তুলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্রিটেনেও বিবেকানন্দের সম্পর্কে নানা সংবাদ আসতে শুরু করেছে। স্টার্ডি এবং অঁরিয়েতা মুলারের মতো কয়েকজন বিবেকানন্দের কথা প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য স্টার্ডি এবং মুলার—দুজনেই বিবেকানন্দের বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধা করেননি; তবে সে অনেক পরে। সে প্রসঙ্গও পরে আসবে। এই বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজেরই অংশ ছিলেন নিবেদিতা। তাঁর মনেও বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি কৌতূহল জন্ম নেবে—এটিই স্বাভাবিক।

'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'এই "হিন্দু যোগী"কে (লণ্ডনে যে নামে তিনি অভিহিত হইতেন) দেখিবার জন্য আমরা যে কয়জন আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহারও ধর্মে তেমন আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। স্বামীজীর বামপার্শ্বে বসিয়াছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বংশের এক বৃদ্ধা মহিলা ফ্রেডারিক ডেনিসন

মরিসের শিষ্যা ও বন্ধু। অগ্রণী হইয়া তিনিই মার্জিত্ শিষ্টাচারের সহিত প্রশ্নাদি করিতেছিলেন। বোধ হয়, ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কম উদারভাবাপন্না। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং এবং অপর দুই-একজন, মনস্তত্ত্বই যে ধর্মবশ্বাসের কেন্দ্র—এই প্রচলিত আধুনিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেদিন অপরাহ্নে আমাদের মধ্যে অনেককেই বাছিয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, যেহেতু আমরা সহজে কোন ধর্মমতে আস্থা স্থাপন করিবার বিরোধী ছিলাম এবং ধর্মপ্রচার ব্যাপারে যে কিছু সত্যি থাকিতে পারে, সে বিষয়ে প্রত্যয় জন্মানো ছিল কঠিন। আমার এখন মনে হয়, সেদিন সেই সাক্ষাৎকারের শেষে বক্তা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ দম্ভ ও উদাসীনতার সহিত নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার একমাত্র কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে এই বলিয়া যে, অবিবেচনা-প্রসূত অনুরাগ যাহাতে হৃদয় অধিকার না করে সেজন্য সর্বদা বিচার বুদ্ধিকে বাঁচাইয়া চলিবার অভ্যাস। বিদায় লইবার পূর্বে গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা এক এক করিয়া অভিযোগ করিলাম; "নূতনত্ব কিছুই নেই"—কেন না কেহ এইসব বিষয় পূর্বেই বলিয়াছেন।'

প্রথম দিনের সাক্ষাতে বিবেকানন্দের বক্তব্যে 'নূতনত্ব কিছুই' না খুঁজে পেলেও, দিন কয়েক পরেই কিন্তু নিবেদিতা বুঝেছিলেন, স্বামীজি যে বার্তা বহন করে এনেছেন তাকে বোধহয় এভাবে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। নিবেদিতা লিখেছেন, 'কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, সেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে আমার নিকট ইহা প্রতিভাত হইল যে, এক অপরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত, এক নূতন ধরণের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এই রূপে উড়াইয়া দেওয়া কেবল অনুদারতার পরিচয় নহে, পরন্তু অন্যায়। আমার মনে হইল, ইনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কথা পূর্বে আমি শুনিয়া অথবা ভাবিয়া থাকিতে পারি;কিন্তু এ পর্যন্ত যাহা কিছু আমার নিকট শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে, সে সমস্ত মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার জীবনে ঘটে নাই। সুতরাং লণ্ডনে স্বামীজীর অবস্থানকালে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার যে দুইটি মাত্র সুযোগ মিলিয়াছিল, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম।'

অর্থাৎ, সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই নিবেদিতা চিনে নিয়েছিলেন তাঁর 'রাজা' —স্বামী বিবেকানন্দকে।

দুই

নিবেদিতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য লিখে গিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। লিখেছিলেন, 'নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার। কিন্তু উপসংহার বলিয়া তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না।' এত স্বল্প কথায় নিবেদিতাকে আর কেউ বোধকরি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এক অর্থে নিবেদিতার ভিতর তাঁর গুরু বিবেকানন্দের তার্কিক মননের অনেকটাই ছায়া পাওয়া যায়। নিবেদিতা যেমন, তেমনই বিবেকানন্দও কিন্তু গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে প্রথম সাক্ষাতেই নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেননি। বরং, অনেক সংশয়, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিবেকানন্দের মনেও উপস্থিত হয়েছিল। গুরু রামকৃষ্ণকে 'যাচাই' করে নিতে চেয়েছিলেন শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। সেজন্য বারংবার নানাবিধ প্রশ্নে, তর্কে-বিতর্কে তিনি বিদ্ধ করেছিলেন পরমহংসকে। নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়েই তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তাঁর গুরুকে। শিষ্য নরেন্দ্রনাথের এই পরীক্ষায় স্বয়ং পরমহংসের সায়ও কিছু কম ছিল না। পরমহংসও 'সব কিছু, এমনকী গুরুকেও, যাচাই করে' নেওয়ার কথা বলতেন। নরেন্দ্রনাথের সামনে পরীক্ষায় বসতে তাই তাঁর আপত্তি ছিল না। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নরেন্দ্রনাথের সামনে প্রতিভাত হয়েছিলেন 'অবতার বরিষ্ঠ' রূপে। ঠিক তেমনই বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা। নিবেদিতাও বারংবার নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন তাঁর গুরু বিবেকানন্দকে। বুঝতে চেয়েছেন, এই সন্ন্যাসী আর-পাঁচজন সন্ন্যাসীর থেকে ভিন্ন কিসে? পরমহংসের মতো বিবেকানন্দও তাঁর প্রিয়তম এই শিষ্যের সামনে হাসিমুখে পরীক্ষায় বসেছেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হয়েছেন নিবেদিতার 'রাজা'।

বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, রামকৃষ্ণ মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী, শিষ্য-ভক্তদের থেকে নিবেদিতা ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। নিবেদিতা যে পৃথক —সেটি সবথেকে ভালো বুঝেছিলেন বিবেকানন্দ স্বয়ং। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, তাঁর এই শিষ্যার ক্ষেত্রে

তাঁকে বারংবারই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণও হতে হবে। বাস্তবে হয়েছেও তা-ই। নিবেদিতার জীবনী আলোচনার আরো গভীরে প্রবেশ করলেই জানা যাবে—যতদিন গুরুর সান্নিধ্যে ছিলেন নিবেদিতা, ততদিনই গুরুকে নানাবিধ প্রশ্নে তিনি বিদ্ধ করেছেন। যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছেন গুরুর বক্তব্য। অন্ধের মতো অনুসরণ নিবেদিতার কখনোই পছন্দ ছিল না। বিবেকানন্দও বোধকরি বুঝেছিলেন, তাঁর এই শিষ্যাটিকে রামকৃষ্ণ মঠের অনুশাসনে বেঁধে রাখা যাবে না; এঁকে বিকশিত হতে দিতে হবে নিজের মতো করে। তবেই পূর্ণতা পাবেন নিবেদিতা নামক পুষ্পটি— যাঁকে তিনি অর্পণ করেছেন ভারতমাতার পদপ্রান্তে। নিবেদিতার এই যুক্তিবাদী এবং স্বাধীন মনোভাব সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে কিঞ্চিৎ চিন্তিত ছিলেন না—এমনও নয়। বিবেকানন্দ জানতেন—তাঁর মতো উদারতা দিয়ে নিবেদিতাকে গ্রহণ করার মতো ব্যক্তি রামকৃষ্ণ মঠেও কম রয়েছেন। বস্তুত, বিবেকানন্দ-পরবর্তী রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের নেতৃস্থানীয় সন্ন্যাসীদের ভিতর বিবেকানন্দের মতো বৈপ্লবিক সাহস, প্রগতিশীল ভাবনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা অভাব তো ছিলই। স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী মনোভাবের কারণে ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে নিবেদিতার সংঘাত বাঁধতে পারে এ আঁচ করেই বিবেকানন্দ মঠের সন্ন্যাসী, তাঁর গুরুভ্রাতাদের বলেছিলেন, 'ও যদি মঠের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাও রাখে, তোমরা ওকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিও।' লিজেল রেমঁর লেখায় বিবেকানন্দের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এইসব ঘটনাই বিশদভাবে আলোচিত হবে।

লেডি মার্গেসনের বাড়িতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার পর লন্ডন শহরে আরো দুটিস্থানে মার্গারেট ছুটে গিয়েছিলেন স্বামীজির বক্তব্য শুনতে। কিন্তু তাতেও যে তাঁর সব সংশয় দূর হয়েছিল বা সব প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন এমন নয়। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, লেডি মার্গেসন যেসব ঘরোয়া আলোচনা সভা আয়োজন করতেন, মার্গারেটের বেশি আগ্রহ ছিল সেইগুলিতে। এইসব আলোচনাসভার সবকটিতেই তিনি যাতে উপস্থিত থাকতে পারেন সেইভাবে তাঁর যাবতীয় কর্মসূচিও সাজিয়ে নেন মার্গারেট। এদিকে বিবেকানন্দও লক্ষ করলেন, এইসব ঘরোয়া আলোচনায় যাঁরা তাঁর বক্তব্য শুনতে আসেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাছাই করা। প্রতিপক্ষের বুদ্ধি পরিমাপ করে নিয়েই বিবেকানন্দ বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন। বেদান্তের মূলে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তাকেই ব্যাখ্যা করেন বিবেকানন্দ। যুক্তি-তর্ক দিয়ে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝিয়ে দেন, অন্য সব সংকীর্ণতাকে ছাপিয়ে বেদান্ত কেন এত উদার, এত মহৎ এবং কেন তা গ্রহণীয়। এই আলোচনা সভাগুলিতেই বিবেকানন্দের নজর কাড়েন মার্গারেট। এফ.ডি. মরিসের লেখা পড়ে মার্গারেট যুক্তির খেলায় পরাস্ত করতে চান এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে। বিবেকানন্দ বোঝেন—এই যুক্তিবাদী

ইয়োরোপীয় মেয়েটি বস্তুত পক্ষে এক আগুনের পাখি। এই মেয়েটিই হয়ে উঠতে পারে তাঁর রামকৃষ্ণ আন্দোলনের হাতিয়ার। ফলে, সাগ্রহে এবং সস্নেহে তিনি উত্তর দেন মার্গারেটের সব প্রশ্নের। তাঁকে নিরন্তর যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ দেন মার্গারেটকে। বিবেকানন্দ বুঝতে পারেন, যে অবিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে তিনি একদা উপস্থিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে, আজ মার্গারেট তাঁর কাছে এসেছেন ঠিক সেরকমই। একটি নতুন যুক্তি পেলেই তাকে আঁকড়ে ধরেন মার্গারেট, নতুনভাবে যাচাই করে নিতে চান—যেমন এককালে তিনিও চাইতেন— সে সবই বোঝেন বিবেকানন্দ।

এই সময়টির কথা উল্লেখ করে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বস্তুতঃ স্বামীজির কথার মর্মার্থ মার্গারেট বহুদিন পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে তখন যে তত্ত্ববোধের অভাব ছিল, তার জন্য পরে তাঁহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। স্বামীজীর বক্তৃতা দুটি তিনি স্থানে স্থানে টুকিয়া লইয়াছিলেন ভালো লাগিয়াছিল বলিয়া, কিন্তু ওই সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই; মানিয়া নেওয়া তো দূরের কথা।... স্বামীজির লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর ক্লাসগুলিতে নিয়মিত রূপে যোগদান করিবার সময়ে মার্গারেট ছিলেন বিরুদ্ধ যুক্তি অবতারণায় অগ্রণী। তাঁহার মুখে 'কিন্তু' এবং 'কেন' শব্দ দুটি লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু তিনি যুক্তি-প্রদর্শন এবং সন্দেহ উত্থাপন দ্বারা স্বামীজীর মতগুলিকে খণ্ডন এবং বর্জন করিবার যতই চেষ্টা করিয়া থাকুন, স্বামীজির প্রভাব তিনি অতিক্রম করতে পারেন নাই।...যে অসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বলে স্বামীজি জগৎ জয় করিয়াছিলেন, তাহার দুর্নিবার প্রভাব অতিক্রম করার ক্ষমতা বিদুষী ও বিচারসম্পন্না মার্গারেটেরও ছিল না।... বস্তুত মার্গারেটের সংশয় প্রকাশ, যুক্তির তীব্রতা ও নির্বিচারে সব বক্তব্য মানিয়া লইবার অক্ষমতা স্বামীজিকে বিচলিত করে নাই। সত্যের যথার্থ পূজারী যে, সে সত্যকে যাচাইয়া লইবেই। স্বামীজি নিজেও কি তাহাই করেন নাই? দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি কি তাঁহার গুরুর অপ্রাকৃত জ্ঞানের উপলব্ধিকে অস্বীকার করেন নাই? তাঁহার নিরন্তর ভাবমুখে অবস্থিতিকে মাথার খেয়াল অথবা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান নাই? স্বামীজি জানিতেন, মার্গারেটের দ্বিধা, সতর্কতা, সংশয়—এসবের পিছনে রহিয়াছে জ্ঞানরাজ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করিবার তীব্র ব্যাকুলতা।'

বস্তুত তিনিও যে নিজের গুরুকে যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ পরে তা বলেওছিলেন নিবেদিতাকে, 'আমার ছ বছর লেগেছিল তাঁকে (রামকৃষ্ণ পরমহংস) গ্রহণ করতে।' তবে, স্বামীজির বক্তব্য যত শুনলেন এবং যত তাঁর সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিলেন ততই কিন্তু মার্গারেট বুঝতে পারলেন, এই হিন্দু সন্ন্যাসী আর-পাঁচজন ধর্ম প্রচারকের মতো নন। বিবেকানন্দের বক্তব্যের যুক্তির গভীরতা ক্রমশ স্পর্শ করল

নিবেদিতার মনকে। এবং ক্রমশই নিবেদিতা আচ্ছন্ন হতে থাকলেন বিবেকানন্দে। নিবেদিতার এই মানসিক পরিবর্তন ধরা পড়েছে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং লিজেল রের্ম—দুজনের লেখাতেই। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, ২৭ নভেম্বর স্বামীজি আমেরিকা যাত্রা করলেন। পরের বছর এপ্রিল মাসে আবার তিনি লণ্ডনে আসেন। ফলে মার্গারেট যথেষ্ট সময় পেলেন চিন্তা করার। স্বামীজির যে কথাগুলি তিনি টুকে রেখেছিলেন, দীর্ঘ চার মাস ধরে তা নিয়ে চিন্তা করার ফলে ভারতীয় ভাবধারার কয়েকটি দিক তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমত, স্বামীজীর উদার ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা, যা অন্য ধর্ম ব্যাখ্যাতাদের থেকে তাঁর মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরেছে, দ্বিতীয়ত তাঁর বক্তব্যে যুক্তির নতুনত্ব। তৃতীয়ত, মার্গারেট এ-ও হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, মানব প্রকৃতির ভিতর যা কিছু সুন্দর, ধর্মের নামে স্বামীজি তাকেই আহ্বান করেছেন। আর এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্যই কি মার্গারেট আকুলভাবে অপেক্ষা করছিলেন না?

লেজেল রের্ম লিখেছেন, আলোচনার আসরগুলি এমনভাবে জমে উঠেছিল যে, অনেকেই বিবেকানন্দকে অনুরোধ করলেন নিউইয়র্ক যাওয়ার আগে তিনি যেন একটি বড় সভায় কিছু বক্তব্য রাখেন। বিবেকানন্দ তাতে রাজি হলেন। লন্ডনের পিকাডিলির প্রিন্স হলে একটি সভার আয়োজন করা হল। লন্ডন শহরের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত হলেন সেই সভায়। সভার শুরুতেই তাঁর বিশিষ্ট শ্রোতাদের তীক্ষ্ণ একটি খোঁচা দিয়ে স্বামীজি বললেন, 'তোমাদের কলকব্জা, ছাপাখানায় যা না হয়েছে, তার চাইতে খৃস্ট বা বুদ্ধের কয়েকটা কথায় মানবসমাজ ঢের বেশি উপকৃত হয়নি কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্লজ্জ অবুদারতা, নিষ্ঠুর যুদ্ধনিশানা আর নিদারুণ অর্থলোভ। এ সভ্যতাকে স্বীকার করতে গেলে যে মূল্য দিতে হয়, শান্তিপ্রিয় হিন্দু কোনোদিন তা দেবে বলে কি তেমন আশা করো?' খোদ লন্ডন শহরে, বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে পরাধীন ভারতের এক প্রতিনিধি এই তেজোদৃপ্ত উচ্চারণ করেছেন—এটাই অকল্পনীয় ছিল তখন। বিবেকানন্দ কিন্তু সেই অকল্পনীয়,অভাবনীয় কাজটিই করেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই এক কৌতূহলী সাংবাদিককে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমি কোনো গুপ্তবিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের কুহক দেখাতে আসিনি, আর ওসবে কারও মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করি না। সত্য স্বপ্রকাশ, দিনের আলোয় প্যাঁচার মতো মুখ লুকোয় না। সবাই তাকে যাচাই করে নিতে পারে।'

এই বিবেকানন্দই মার্গারেটকে মুগ্ধ করেন। মার্গারেট বুঝতে পারেন, তিনি এতকাল যে খ্রিস্টান মিশনারি বা অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের দেখেছেন—এই হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যে ধর্মাচরণের কথা এতদিন মার্গারেট শুনে এসেছেন—এঁর ধর্মাচরণের ভাবনাচিন্তা তা থেকে আলাদা। ধর্মাচরণ সম্পর্কে প্রচলিত

ধারণাটিই ইনি যেন ভেঙে দিতে এসেছেন। ইনি এক উদার ধর্ম আন্দোলনের কথা বলেন। মানবতাকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেন। এবং সর্বোপরি দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ধ্বনিত হয় এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠে। নিছক সাধন-ভজন-ধর্মোপাসনা-আচার-বিচারে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে মানুষের সেবায় জীবনকে সমর্পণ করতে বলেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠার কথা বলেন। এইসব কথা শোনা মার্গারেটের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতাই! কেননা, অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মার্গারেট এতদিন যে ভাব বিনিময় করে এসেছেন— তার সঙ্গে এসব মিলছে না। এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীর বেশে একজন বিপ্লবী হিসাবেই ভ্রম হয় মার্গারেটের।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁর এই উদার ধর্ম আন্দোলন এবং মানবতাবোধের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে। ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে, তাঁকে মূলত লড়াই করতে হয়েছিল ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে— হিন্দু রক্ষণশীলতা, ব্রাহ্ম সমাজের ছুঁৎমার্গ এবং ইয়ং বেঙ্গলের রোমান্টিসিজম। এই লড়াই করতে গিয়ে পরমহংসদেবকে ব্রাহ্ম সমাজের তাচ্ছিল্য সহ্য করতে হয়েছে (ব্যতিক্রম কেশবচন্দ্র সেন। পরমহংসদেবের উদার ধর্ম আন্দোলনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিলেন), হিন্দু রক্ষণশীল পুরোহিত সমাজের কদর্য আক্রমণও কিছু কম হয়নি তাঁকে লক্ষ্য করে। তবু পরমহংসদেব অবিচল থেকেছেন নিজের সাধনপথে। এবং এ-ও শিক্ষণীয় যে, এত আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি কখনো কোনো পালটা আক্রমণে যাননি। ওই সময়ে, যখন ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ছোঁয়াছুঁয়ি, এবং নানাবিধ কুসংস্কারে আবদ্ধ হিন্দু রক্ষণশীলরা— তখন তাদের সমস্ত আক্রমণকে উপেক্ষা করে তিনি 'যত মত, তত পথ'-এই কথা বলেছেন। এমনকী, ইসলাম ধর্মে সাধনা করে তাঁর এই মতকে প্রতিষ্ঠা করার সাহসও তিনি দেখিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ একই সঙ্গে কালী এবং ইসলামের সাধনা করেছেন— এ কিন্তু কম সাহসের পরিচয় নয়। পরবর্তী যুগেও এই অভিনব সাধনার পরিচয় কিন্তু কেউই দিতে পারেননি। রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মভাবনায় উদারতা এবং মানবতার পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি ঘটনায়। বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতারা যখন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন অভিনেত্রী, যাঁরা মূলত পতিতাপল্লী থেকে আসতেন, তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেছেন, বলা ভালো দিতে চাননি—তখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিন্তু নটী বিনোদিনীসহ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সেই অভিনেত্রীদের অনায়াসেই সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। নাট্যশিল্প যে জনচেতনা জাগরণের একটি হাতিয়ার হতে পারে— উপলব্ধি করেছেন তা-ও। বলেছেন, 'নাটকে লোকশিক্ষে হয়।'

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই উদার ধর্ম আন্দোলন, এই মানবতাবাদ আরো বেশি করে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর অবর্তমানে পত্নী সারদা দেবীর ভিতর। সারদা দেবীর জীবনের দু-একটি টুকরো ঘটনা তুলে দিলেই বোধহয় তা পরিষ্কার হবে। সেইসময়ে বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী ছিল গণ্ডগ্রাম। নানাবিধ সংস্কার, ছোঁয়াছুঁয়ি, ছুঁৎমার্গে আবদ্ধ ছিল সেই গ্রামের হিন্দুসমাজ। সর্বোপরি ছিল সমাজপতিদের চোখ রাঙানি। শিক্ষার কোনো আলোই তখন বাংলার এই গণ্ডগ্রামগুলিতে পৌঁছয়নি। রামকৃষ্ণদেবের প্রয়াণের পর এই জয়রামবাটিতেই ভাইয়ের সংসারে থাকতেন সারদা দেবী। এই সময়েই একদিন রাতে রান্না করে যে রাঁধুনি সে আসেনি। প্রতিবেশী বারুই পরিবারের একটি মেয়ে সারদা দেবীকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, আমি রাঁধব? খাবেন?' সারদা দেবী সম্মতি দিলেন তাতে। বললেন, 'তোমরা আমার মেয়ে। খাবো না কেন?' সারদা দেবীর একথা শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন আশেপাশের মহিলারা। ব্রাহ্মণ বাড়িতে রান্না করবে বারুইদের মেয়ে? এত সাহস? অতএব মেয়েটিকে যারপরনাই তিরস্কার করল তারা। সারদা দেবী অবশ্য অবিচল। মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ওদের কথায় কান দিও না।' এবং ওই মেয়েটির হাতের রান্নাই তিনি খেলেন।

এই জয়রামবাটীর কাছেই ছিল মুসলমানপল্লী। শিরোমণিপুর। একসময় সেখানে ভালো রেশমের চাষ হত। পরে রেশমের চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানকার মুসলমান চাষিরা রুজি রোজগারের জন্য চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির পথ বেছে নেয়। কোনো পল্লীতে তারা কাজের খোঁজে এলে গৃহস্থরা পত্রপাঠ বিদায় করত তাদের। এরকমই এক মুসলমান চাষি একদিন কয়েকটি কলা নিয়ে হাজির হল মা সারদার কাছে। বলল, 'মা, ঠাকুরের সেবার জন্য এগুলি এনেছি। তুমি নেবে কি?' মা নিলেন। বললেন, 'ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেবো বই কি।' কাছেই ছিল এক স্ত্রীভক্ত। মায়ের কাণ্ড দেখে সে বলল, 'মা, ও তো মুসলমান।' মায়ের উত্তর, 'তাতে কী হয়েছে? ঠাকুরের সব সন্তানই সমান।' এই প্রসঙ্গে ডাকাত আমজাদের ঘটনাও উল্লেখ করতে হয়। আমজাদকে সারদা দেবী নিজহস্তে খাবার পরিবেশন করতেন। তার এঁটো বাসন পরিষ্কার করতেও দ্বিধা ছিল না সারদা দেবীর। কেউ এ-নিয়ে প্রশ্ন করলে বলতেন, 'শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন আমার এক ছেলে, তেমনই আমজাদও আমার এক ছেলে।'

নিবেদিতা এবং স্বামীজির অন্যান্য বিদেশিনী শিষ্যাদের যত সহজে সারদা দেবী গ্রহণ করেছিলেন, তা স্বয়ং বিবেকানন্দের কাছেও আশ্চর্য বোধ হয়েছিল। তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাদের নিয়ে যখন কলকাতায় আসেন বিবেকানন্দ, তখন তাঁর মনেও এই সংশয় কাজ করেছিল যে তাঁর গুরুপত্নী কীভাবে এঁদের গ্রহণ করবেন? এক্ষেত্রেও

অন্য অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও সারদা দেবী তাঁদের সহজে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আহার-বিহারে কোনো ছুঁৎমার্গ রাখেননি তিনি। তখনকার সামাজিক অবস্থাটি মনে রাখলেই বোঝা যাবে, ওই সময়ে এ কিন্তু নেহাত সহজ, সাধারণ কাজ ছিল না। এ ছিল এক সামাজিক বিপ্লব।

অথচ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সারদা দেবী—দুজনের কেউই কিন্তু সেই অর্থে তথাকথিত এলিট সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন না। দুজনের কারোরই কোনো প্রথাগত স্কুল-কলেজের শিক্ষা ছিল না। দুজনেই ছিলেন নিরক্ষর গ্রাম্য সমাজ থেকে উঠে আসা দুই ব্যক্তিত্ব। সেই সারদা দেবীই যখন জয়রামবাটীর মতো গণ্ডগ্রামে এই সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলছেন, তখন শহুরে, শিক্ষিত, এলিট শ্রেণির নেতৃস্থানীয়দের ভূমিকা কী? ওই সময়েরই একটি ঘটনা। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং রানাডে— শিক্ষিত হিন্দু সমাজের দুই প্রতিনিধি— মহরাষ্ট্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি সভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। দুজনেই সেখানে চা-পান করেন। এই নিয়ে হিন্দু সমাজে তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে যায়। বলা হতে থাকে তিলক এবং রানাডের জাত গিয়েছে। তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিলক এবং রানাডে রক্ষণশীল সমাজের এই হুমকির সামনে মাথা নুইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। অথচ হিন্দু ব্রাহ্মণের নিরক্ষর বিধবা সারদা দেবী কিন্তু অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। জয়রামবাটী গ্রামেও সমাজপতিরা ফতোয়া জারি করেছিল যে 'অপকর্মের' জন্য সারদা দেবীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সারদা দেবী সে ফতোয়া উপেক্ষা করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করেননি। বরং বলেছিলেন, 'আমি ছত্রিশ জাতেরই মা।' রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদার ধর্মবাদের এই হল চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসও চাননি, তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ, আর পাঁচজনের মতো নিছক ধর্মপ্রচারক হোন। তিনি বরং বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।' নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করলে তিনি তিরস্কারই করেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সমাজকে আরো কিছু দেওয়ার আছে তাঁর। নিভৃতে ঈশ্বর সাধনা করে সময় কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি তৈরি করেননি নরেন্দ্রনাথকে। নরেন্দ্রনাথের জীবন যে শুধু নরেন্দ্রনাথের নয়, আরো পাঁচজনের— সেইটেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারবার। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র মন্ত্রটি তিনিই নরেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন।

গুরু পরমহংসদেবের এই উদার ধর্ম আন্দোলন এবং মানবতাকে সম্বল করেই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে পা রেখেছিলেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বদলে মানবতা এবং উদারতার বাণীই তিনি শুনিয়েছিলেন পাশ্চাত্যকে। সেই সঙ্গেই তাঁর বক্তব্যে বারবার ফুটে উঠেছিল 'দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী'-র প্রতি

সহমর্মিতা। বিবেকানন্দের বক্তব্য যে শুধু ধর্মের আন্দোলন ছিল না, বরং অনেক বেশি ছিল মানবতার বাণী, জাতপাত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠার বৈপ্লবিক আহ্বান, তা তাঁর লেখাগুলি থেকেই পরিষ্কার। বিবেকানন্দের বিভিন্ন লেখার ভিতর থেকে একটির অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য: 'The peasant, the shoemaker, the sweeper, and such other lower classes of India have much greater capacity for work and self reliance than you, They have been silently working through long ages and producing the entire wealth of the land, without a word of complaint. Never mind if they have not read a few books like you, if they have not acquired your tailor-made civilisation. What do these matter? But they are the backbone of the nation in all countries. If those lower class stop work, from where will you get your food and clothing? If the sweepers of calcutta stop work for a day, it creates a panic, and if they strike for three days the whole town will be depopulated by the outbreak of epdemics. If the labourers stop work, your supply of food and clothes also stops. And you regard them as low-class people and vaunt your own culture!' [Rebuild India – Swami Vivekananda] এইটুকু পড়লে সহজেই অনুমান করা যায়, আর-পাঁচজন ধর্মযাজকের মতো নিভৃতে ঈশ্বরসাধনার বাণী প্রচার বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল না।

বিবেকানন্দের এই রূপটি, এই বাণীটি যেদিন অনুভব করতে পেরেছিলেন মার্গারেট, সেদিন থেকেই তিনি বিবেকানন্দ-অনুরাগিণী হয়ে উঠেছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বহুদিন পরে, ১৯০৪ সালে, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'যদি অভিজ্ঞতা বেশী থাকত, হয়তো সংশয় হত, জীবনে শুভ লগ্ন এলেও মেনে নেওয়া হয়তো শক্ত হত। আমার ভাগ্য ভালো, আমি কিছুই জানতাম না।। তাই দোটানার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে গিয়েছি।... ভিতরে আমার আগুন জ্বলত। কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না। এমন কতদিন হয়েছে, কলম হাতে নিয়ে বসেছি, অন্তরের দাহকে রূপ দেব বলে— কিন্তু কথা জোটেনি। আর আজ আমার কথা বলে যেন শেষ করতে পারি না। দুনিয়ায় আমি যেমন আমার জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, দুনিয়াও তেমনই আমার অপেক্ষায় তৈরী হয়ে বসেছিল যেন। এবার তীর এসে লেগেছে ধনুকের ছিলায়।...কিন্তু স্বামীজি যদি না আসতেন আমার জীবনে? যদি হিমালয় শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? অন্তত আমার কথা বলতে পারি... আমি তো এখানে আসতে পারতাম না।'

বুদ্ধের যেমন সুজাতা, যীশুর যেমন মেরি ম্যাগডালেন, তেমনই এভাবেই ধীরে ধীরে মার্গারেট নোব্‌ল হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দের নিবেদিতা। আসলে, এই

মানববাদী, উদার বিবেকানন্দকে আচার্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে মার্গারেট—তিনিও প্রথমে ছিলেন একজন সমাজ বিপ্লবী, পরে অধ্যাত্মবাদী। নিবেদিতাও অধ্যাত্মবাদ এবং নিভৃত ধর্মোপাসনাকেই মুক্তির পথ বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাননি। মার্গারেটও সাড়া দিতে চেয়েছিলেন আর্ত আতুরের ডাকে। মুক্তিকামী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতার এই চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে হলে একটু পিছনপানে তাকাতে হবে। শুরু করতে হবে তাঁর শৈশবকাল থেকে।

তিন

নিবেদিতার জীবনকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। জীবনের প্রথম ভাগটি হল শৈশব থেকে যৌবন—স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বের জীবন। দ্বিতীয় পর্বটি—স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় থেকে স্বামীজির প্রয়াণ দিনটি অবধি। নিবেদিতার জীবনে তৃতীয় এবং শেষ পর্ব—স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর থেকে দার্জিলিংয়ে জীবনের অন্তিম সময়টি পর্যন্ত। এই তিনটি পর্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেই নিবেদিতা চরিত্রটি পূর্ণাঙ্গ উন্মোচিত হবে। আমরা চেষ্টা করব এই তিনটি পর্বই যতটা সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করতে। নিবেদিতার জীবনে প্রথম পর্বটি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেই বোঝা যাবে—যে জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রতি নিবেদিতা আজীবন আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার উৎস মুখটি কোথায় ছিল। নিবেদিতার জীবনের এই প্রথম পর্বটি বিস্তারিতভাবে ধরা পড়েছে বারবারা ফক্স এবং লিজেল রেমঁর লেখা নিবেদিতার জীবনী গ্রন্থে। নিবেদিতার জীবনের প্রথম পর্বটি আলোচনা করতে আমরা তাই ওই দুটি গ্রন্থের সাহায্য নেব। ওই গ্রন্থ দুটিতে উল্লেখিত তথ্যগুলির মাধ্যমে নিবেদিতাকে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করব।

১৮২৫ সনের কাছাকাছি সময়। সমগ্র আয়ারল্যান্ড জুড়ে তখন চলছে রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধ। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টরা যখন নিজেদের ভিতর লড়াই করছে, তখনি পাশাপাশি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ জনগণও ফুঁসে উঠছে। ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় বিভিন্ন আইরিশ গেরিলা গোষ্ঠী রীতিমতো সশস্ত্র লড়াই করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডে এই গেরিলা লড়াইয়ের যে পূর্ণ পরিসমাপ্তি এখনো হয়েছে তা-ও বলা যাবে না। আইরিশ গেরিলা গোষ্ঠীগুলি সাম্প্রতিক অতীতেও ব্রিটিশ প্রশাসনের ওপর হামলা চালিয়েছে। খোদ লন্ডন শহরেই এই নাশকতামূলক কাজকর্ম সম্প্রতিও তারা করেছে।

সেদিক দিয়ে দেখলে আয়ারল্যান্ডের এই গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। আয়ারল্যান্ডবাসীদের একটি অংশের মন থেকে এখনও ব্রিটিশ বিদ্বেষ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। সে যা-ই হোক, আইরিশ গেরিলাদের মোকাবিলা করতে ১৮২৫ সন নাগাদ ব্রিটিশ সরকার একটি ফতোয়া জারি করল। সেই সরকারি আদেশনামায় বলা হল—যারা ব্রিটিশরাজের বিরোধিতা করবে, তাদের সমস্ত কার্যকলাপই বেআইনি বলে ঘোষণা করা হবে। তারা জমি-বাড়ি-সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে না। ব্যবসা করতে পারবে না। আদালতে জুরির কাজ বা শিক্ষকতার চাকরি করতে পারবে না। কোনোরকম হাতিয়ার নিয়ে চলাফেরা এবং ঘোড়ায় চড়া তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। এমনকী মারা যাওয়ার পর কোনো গোরস্থানে তাদের কবর দেওয়া যাবে না। যে কেউই বুঝতে পারছেন সরকারি হুকুমনামাটি কতখানি দমনমূলক এবং অপমানজনক ছিল। স্বাধীনতাকামী আয়ারল্যান্ডবাসীদের কাছেও এটি অপমানকরই মনে হয়েছিল। ব্রিটিশরাজ যে শুধু তাঁদের সার্বভৌমত্ব হরণ করেছে তা নয়, তাঁদের মৌলিক অধিকারের ওপরও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—এরকমই সেদিন মনে করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের প্রতিটি নাগরিক। ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁরা আরো ক্ষুব্ধ, আরো বীতশ্রদ্ধই হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় চার্চে উপাসনার পর আয়ারল্যান্ডবাসীরা এই কুখ্যাত হুকুমনামাটি আওড়াতেন এবং ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আরো জোরদার লড়াইয়ের শপথ নিতেন। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার অন্যতম কেন্দ্রই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই চার্চগুলি। বিপ্লবের বাণী প্রচারের কজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন চার্চের ধর্মযাজক। জন নোব্‌ল ছিলেন এরকমই একজন ধর্মযাজক। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে আয়ারল্যান্ডে তিনি তখন রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। জন নোব্‌লের পূর্বপুরুষরা চোদ্দ শতকের শেষাশেষি স্কটল্যান্ড থেকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহর রস্ট্রেভরে এসে ডেরা বাঁধেন। জন ছিলেন উত্তর আয়ারল্যান্ডের ওয়েসলিয়ান চার্চের ধর্মযাজক।

আয়ারল্যান্ডে বরাবরই ধর্ম এবং রাজনীতি গাঁটছড়া বেঁধে চলেছে। ফলে ধর্মযাজকরা অনায়াসেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তেন। চার্চও রাজনীতিকে অনেকখানিই নিয়ন্ত্রণ করত। জন প্রতি তিনবছরে একবার করে এলাকা বদলাতেন। ফলে ধর্মযাজক হিসাবে সারা দেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগই হয়েছিল তাঁর। এতে জনের সুবিধা হয়েছিল। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থাটি তাঁর অনেকের থেকেই অনেক ভালোভাবে জানা হয়েছিল। আর যতই দেশের অবস্থা জানছিলেন, ততই ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠছিলেন তিনি। জনের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ব্রিটিশরাজের সমর্থক চার্চ অব আয়ারল্যান্ডের অনুগামী। রোমান

ক্যাথলিকদের উপর চরম নির্যাতন করেছেন তাঁরা। জন কিন্তু দেশের সম্যক অবস্থা অনুধাবন করার পর এই চার্চ অব আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে নামলেন। নীরবে, নিঃশব্দে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকলেন তিনি। আইরিশ বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তো ছিলই, পাশাপাশি জন ও আরো কয়েকজন মিলে নীরব প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ব্রিটিশরাজের বিরোধিতা করার জন্য হয়তো কয়েকজনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হল, সঙ্গে সঙ্গে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য অন্যরা এসে আন্দোলনের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন— এমনই ছিল জন এবং তাঁর সহমর্মী, সহযোদ্ধাদের প্রতিবাদের ধরন। ঈশ্বরোপাসনার পাশাপাশি নিপীড়িত, নির্যাতিতের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করাও ছিল জন নোব্‌লের জীবনের ব্রত।

জন নোব্‌লের এই কর্মধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের কর্মধারারও কিন্তু একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একথা ঠিকই, জন নোব্‌ল ধর্মযাজকের জীবনযাপন করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বদেশের রাজনীতিতে, বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে কোনোদিনই রাজনীতিতে জড়াননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরোক্ষ উৎসাহ জুগিয়েছে। যে কারণে পরবর্তীকালের বিপ্লবীদের অনেকের কাছেই বিবেকানন্দের রচনাবলী অবশ্যপাঠ্য হয়ে গিয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিপ্লবীরা বিবেকানন্দকে 'আদর্শ পুরুষ' মনে করতেন।

জন নোব্‌ল অর্থাৎ নিজের ঠাকুরদাকে দেখেননি নিবেদিতা। নিবেদিতার জন্মের বহু পূর্বেই তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু জন নোব্‌লের কর্মকাণ্ডের বিবরণ বিস্তারিত তিনি শুনেছিলেন।

১৮২৮ সন। জন নোব্‌লের বয়স তখন চল্লিশ। এক বন্ধুর বাড়িতে মার্গারেট এলিজাবেথ নিলাস নামে এক অষ্টাদশী তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। এলিজাবেথ বৈবাহিক সূত্রে আবার জনের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ছিলেন। আলাপের পর ভালোবাসা। জন এবং মার্গারেট সে ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের বিয়ে করার সিদ্ধান্তে প্রবল বাধা এসেছিল মার্গারেটের বাড়ি থেকে। মার্গারেটের বাড়ির লোকজন জনকে ঘরছাড়া করার হুমকি দিয়েছিলেন। বিয়ে ভেঙেও দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছুই অগ্রাহ্য করে মার্গারেট দৃপ্ত পায়ে এসে দাঁড়ালেন জনের পাশে। বিয়ে করলেন জনকে। বিপ্লবী জীবনকে তাঁরা দুজনেই ভাগ করে নিলেন। সুখেই দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিলেন তাঁরা। মার্গারেটের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, তখন অকস্মাৎ মারা গেলেন জন। পরিবারের ওপর নেমে এল চরম দারিদ্র্য। ছ'ছটি ছেলেমেয়ের মা মার্গারেট। বড়ছেলের নামও জন। তার তখন ষোল বছর বয়স। ওইটুকু বয়সে সে

কী-ই বা সাহায্য করতে পারে মা-কে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুরু হল তাঁর জীবন-সংগ্রাম।

মার্গারেটের চতুর্থ সন্তানের নাম স্যামুয়েল। যখন রোজগারের বয়স হল, মার্গারেট স্যামুয়েলকে পাঠিয়ে দিলেন কাকার কাছে, কাজ শিখে দুপয়সা রোজগার করতে। স্যামুয়েলের কাকা ছিলেন নামকরা কাপড়ের ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্যামুয়েলের যে খুব একটা ঝোঁক ছিল এমন নয়; কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে মায়ের ওই সংগ্রাম স্যামুয়েলকে বিচলিত করত। কাজেই মায়ের মুখ চেয়ে কাজ করে যেতেন স্যামুয়েল। তদুপরি, স্যামুয়েলের ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; ফলে সাফল্য আসতে খুব একটা দেরি হয়নি।
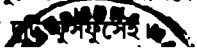
কাজকর্মের ফাঁকে ছুটি পেলে স্যামুয়েল যখন বাড়িতে আসতেন, তখন দেখতেন পড়শী একট মেয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছে, অথবা কোনো বই থেকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছে। স্যামুয়েল ঘরে ঢুকলেই লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে মেয়েটি বেরিয়ে যেত। স্যামুয়েলও পড়তেন অস্বস্তিতে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিজেদের অগোচরে তাঁরা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসে ফেললেন। স্যামুয়েলের মা-ও চাইছিলেন পড়শীদের ঐ মেয়েটি, মেরি হ্যামিলটন তাঁদের বাড়ির বউ হয়ে আসুক। ফলে দুজনের বিয়েতে আর কোনো বাধাই রইল না। মেরিও বলতেন, স্যামুয়েলের মা-কে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন তিনি। ওই পরিবারের বউ হয়ে যাবেন ভেবেই স্যামুয়েলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মেছিল।

বিয়ের পর উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরনে ছোট শহর ডনগ্যাননে সংসার পাতলেন স্যামুয়েল আর মেরি। সংসার গুছিয়ে ওঠার পর স্যামুয়েলের মাঝেমাঝেই মনে হত, তাঁর পিতা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, সেই স্বপ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে চলা তাঁরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভাবতেন পিতার মতোই তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়বেন স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে। স্বচ্ছন্দ আয়েসের জীবন তাঁর কাছে মাঝে মধ্যেই অসহ্য বোধ হত। কিন্তু তখন ব্রিটিশ রাজের অসহ্য দমনপীড়নে আয়ারল্যান্ডে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত। উপরন্তু নোব্‌ল পরিবারেও একটু সাম্প্রদায়িক-সংকীর্ণ মনোভাব মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি স্যামুয়েলকে পীড়িত করত। এই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থার ভিতরও স্ত্রী মেরি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। স্বামীর যে কোনো সিদ্ধান্তের শরিক হতে চান তিনি। মেরি অবশ্য তখন সন্তানসম্ভবা। কাজেই মেরির স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও মনে রাখতে হচ্ছিল স্যামুয়েলকে।

১৮৬৭ সন। ২৮ অক্টোবর। স্যামুয়েল এবং মেরির প্রথম সন্তান জন্ম নিল। কন্যা সন্তান। প্রথম সন্তান জন্ম নেওয়ার পর মেরি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'আমার প্রথম সন্তান তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম।' শিশু কন্যাটির বড় বড় নীল

চোখ, রোগা-পাতলা চেহারা। প্রথম সন্তান, তাই আদরও একটু বেশি। মেয়েকে দোলনায় দোল খাওয়াতে খাওয়াতে মেরি বলতেন, 'কী আছে তোর ভাগ্যে কে জানে। আমি কি সত্যিই তোকে ঈশ্বরের পায়ে সঁপে দিতে পেরেছি!' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, এই ঘটনা মেরি অনেক পরে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ মিস ম্যাকলিয়ডকে জানান। ঠাকুমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে শিশু কন্যাটির নাম রাখা হল মার্গারেট এলিজাবেথ। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

স্যামুয়েল-মেরির সংসারে প্রথম সন্তান এসেছে— এই আনন্দে পরিবারের সকলে একত্রিত হলেন। পরিবারের সকলের আলোচনাতেই ঘুরে-ফিরে আসছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে পূর্বপুরুষের বীরোচিত সংগ্রামের কাহিনি। নতুন কন্যাসন্তানের আগমনে বাড়িতে উৎসব, তাই এক পরিচারিকাকে রাখা হয়েছিল শিশুটিকে দেখাশোনার জন্য। পরিবারটি ছিল অত্যন্ত ধর্মভীরু। এবং গোঁড়া। অতিথিরা সবাই যখন গানে-গল্পে-খানাপিনায় ব্যস্ত, তখন শিশু মার্গারেটকে একটি তোয়ালেতে জড়িয়ে ওই পরিচারিকা নিয়ে গেল পাড়ারই একটি ক্যাথলিক চার্চে। সেখানে ব্যাপ্টাইজ করা হল শিশু মার্গারেটকে। পরে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। মার্গারেটের বয়স যখন এক বছর, তখন স্যামুয়েল আর মেরি স্থির করলেন, তাঁরা নতুনভাবে জীবন শুরু করবেন। সেই মতো মার্গারেটকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁর ঠাকুমার কাছে। বাড়ি-আসবাবপত্র-দোকান সব বেচে দিয়ে স্যামুয়েল আর মেরি যাত্রা করলেন ইংল্যান্ডে। সম্পন্ন ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন কঠোর সংগ্রামের পথ।

ইংল্যান্ডে এসে ম্যাঞ্চেস্টারে বাসা বাঁধলেন স্যামুয়েল আর মেরি। বেছে নিলেন যাজকের জীবন। সারাদিন ধর্মোপাসনার উপর থিসিস তৈরি করার কাজে নিয়োজিত রাখতেন নিজেকে। সন্ধ্যেবেলা আয়ারল্যান্ডের যেসব মানুষ ম্যাঞ্চেস্টারের বিভিন্ন কল-কারখানায় কাজ করতেন তাঁদের জড়ো করে দেশের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে অলোচনা করতেন। এভাবেই তাঁকে ঘিরে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠল। পিতার মতোই নিজেকে নানাবিধ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ক্রমশ জড়িয়ে ফেললেন তিনি। কিন্তু, তাঁর সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া আরও প্রাগাঢ়ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় অচল হয়ে পড়ল সংসার। ফলে কাজ খুঁজতে বের হতেই হল স্যামুয়েলকে। কাজও জুটে গেল সহজেই। যে সব যাজকরা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, বা, ছুটিছাটায় থাকতেন, তাঁদের বদলি হিসাবে ভাষণ দেওয়ার কাজটা জুটে গেল স্যামুয়েলের। কিন্তু কাজটা ছিল খাটুনির। সারাদিন পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেও পড়াশোনা করতে হত। এর পাশাপাশি তো ছিলই নিজের গোষ্ঠীর লোকজনদের সংঘবদ্ধ করার কাজ। অবশেষে স্যামুয়েল যখন ধর্মযাজকের পদ পেয়ে ওল্ডহ্যামে এলেন, তখন যক্ষ্মা বাসা বেঁধেছে তাঁর দুটি ফুসফুসেই।

এদিকে মার্গারেট বড় হয়ে উঠছে তার ঠাকুমার সন্নিধ্যে। ঠাকুরমার বাগানঘেরা বাড়িতে খেয়ালখুশি মতো খেলে বেড়ায় সে। ঠাকুমা ছাড়াও ছোট্ট মার্গারেটের সঙ্গী জর্জ কাকা। এলাকার মান্যগণ্য ডাক্তার। ঠাকুরমার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল মার্গারেটের। একবছর বয়স থেকেই ঠাকুমার সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছিল সে; ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, মা-বাবা অপেক্ষা ঠাকুমার প্রতিই গভীর অনুরাগ জন্মেছিল তার। মার্গারেটের অক্ষর পরিচয়ও হয়েছিল ওর ঠাকুমার কাছেই। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নিবেদিতার যে জীবনী রচনা করে গিয়েছেন, তাতে তিনিও উল্লেখ করেছেন, 'চারিদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবেষ্টনী, সঙ্গিগণের সহিত খেলাধূলা, পরম নিষ্ঠাবতী পিতামহীর সারাদিন অনলস কর্মের সহিত ভগবদুপাসনা— সব মিলিয়া মার্গারেটের শিশুচিত্তে এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল।'

মার্গারেটের বয়স যখন চার, তখন স্যামুয়েল এলেন তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঠাকুমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথায় মার্গারেট মুষড়ে পড়ল। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, জ্ঞান হওয়ার প্রায় পর থেকেই তার প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে ঠাকুমার সঙ্গে। নিজের পিতামাতা এখন তার কাছে অচেনা আগন্তুক। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'একটু বড় হইয়া ওল্ডহ্যামে পিতামাতার নিকট অসিবার পর মার্গারেটের মনে হইল, তিনি যেন এক অপরিচিত জায়গায় আসিয়াছেন। শিশুমনের সহজ সুরটি যে তন্ত্রীতে বাঁধা হইয়াছিল, এই জনাকীর্ণ নগরে তাহা তেমন করিয়া বাজে না।' মার্গারেটের সেই দিনগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে রেমঁ লিখেছেন, ওল্ডহামে গিয়ে মা আর তিন বছরের বোনকে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর এই প্রথম দেখল ও। মা ওর কাছে প্রায় অচেনা। বোনটি সারাদিন কাঁদে। নিজের ঘরে মার্গারেট যেন পরবাসী। রাগে আর ঈর্ষায় জ্বলে যেত ও। শেষে বাড়ির আইরিশ পরিচারিকাটির সঙ্গে ভাব জমাল মার্গারেট। মজার মজার ভূতের গল্প বলত সে। তাতে যেন একটু ঠাণ্ডা হত মার্গারেটের মন।

মার্গারেটের এই শৈশবাবস্থার খুব প্রাঞ্জল এবং বিস্তৃত ছবি এঁকেছেন লিজেল রেমঁ। লিজেল রেমঁর লেখা থেকেই জানা যায়, প্রাথমিক এই একাকিত্ব এবং বিষণ্ণতা কাটিয়ে মার্গারেটের সঙ্গে তার ছোট্ট বোনটির বেশ ভাব হয়ে গেল। কেমন কাটত দুই বোনের সেই ছোটবেলা? রেমঁর লেখার একটু অংশ তুলে দিই, 'দুটি শিশু বড় হয়ে উঠছিল একদমই ঘরোয়া পরিবেশে। যে ঘরে দুই বোন থাকত—সেটাই হয়ে উঠল ওদের খাসমহল। ঘরের জানলা দিয়ে প্রকাণ্ড পোড়ো জমি দেখা যায়। সামনেই প্রশস্ত রান্নাঘর। ওখানে সন্ধ্যেয় আগুনের সামনে দু বোন খেলা করে। আর স্কুলে গেলে খেলার জায়গা স্কুলের ভিতরে ফুলের বাগানটি। দু-বোন এক বিছানায় শোয়। ভোরবেলা তাঁতিরা চেঁচামেচি করতে করতে কাজে যায়। বৃষ্টির ছাটে ভিজে যায়

জানালার শার্সি। দু বোন ঠেসাঠেসি করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না। স্কুলে যাওয়ার পথে একচক্কর চারিদিকটা ঘুরে যায়। ছোট্ট শহর, রাস্তাগুলি অন্ধকার ঝুপসি, বাড়িগুলো একই ধাঁচের। সবচেয়ে অদ্ভুত ওদের স্কুলটা। তিন আইবুড়ো ভদ্রমহিলা সেখানে ওদের লেখাপড়া শেখান। আর ওরা যাতে দুষ্টুমি না করে তার জন্য খেলার সময়টায় ওদের ধরে ধরে সেন্ট জনের 'সুসমাচার' মুখস্থ করান। বিকেল নাগাদ বাড়ি ফেরে দু-বোন। সঙ্গে করে একদঙ্গল সমবয়সী ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসে, কানামাছি খেলবে বলে। রান্নাঘরটা ওদের খেলার জায়গা। সেখানে উনুনের ওপর কেটলি শোঁ শোঁ করছে। টেবিলে রুটি-মাখন সাজানো। মা আগুনের পাশে বসে সেলাই করছেন। দিনের ভিতর এটাই ছিল দু-বোনের সবথেকে ভালো লাগার সময়।'

মার্গারেটের ঠাকুমা যখন মারা গেলেন, তখন মার্গারেটের বয়স সাত। লিজেল রেমঁ সেই হিসাবই দিয়েছেন। তবে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেছেন, মার্গারেটের তখন আট বছর বয়স হয়েছে। এই সামান্য তথ্যগত ফারাকটুকু বাদ দিলে, ওই সময় মার্গারেটের ছেলেবেলাটি কীভাবে কেটেছিল সে ব্যাপারে দুজনের দেওয়া চিত্র প্রায় একই। মার্গারেট তার শৈশবে ঠাকুমার কাছে মানুষ হয়েছিল। ঠাকুমার সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছিল। ঠাকুমাকে ঘিরে তার একটি নিজস্ব জগতও গড়ে উঠেছিল। স্বভাবিকভাবেই, এটা আন্দাজ করতে কোনো কষ্ট হয় না যে, ঠাকুমার মৃত্যু ওই ছোট্ট বয়সে মার্গারেটকে যথেষ্টই কষ্ট দিয়েছিল।

ওল্ডহ্যামে নোব্‌ল পরিবারের দিনগুলি বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু ধর্মযাজকের কাজের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় স্যামুয়েলের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। চার বছর ওল্ডহ্যামে থাকার পর স্যামুয়েল এবার কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিলেন ডেভনের গ্রেট টরেন্টন গ্রাম। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'টরেন্টন আসিবার পর মার্গারেট আবার শৈশব জীবনের সুরটি ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার বয়স তখন আট বৎসর। তিনি ছিলেন পিতার প্রিয়পাত্রী। পিতাপুত্রীর মধ্যে একটি সহজ ভাব বিনিময় ঘটিয়াছিল। পিতার উপাসনাপদ্ধতি এবং অন্তরের ভগবদ্ভক্তি প্রসূত ভাবণগুলি মার্গারেটের কিশোর মনকে আকৃষ্ট করিত। বাইবেলের বিচিত্র কাহিনি তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনে কেবল খোরাক জোগাইত তাহাই নহে, বাস্তব জীবনের বাহিরে একটি রহস্যময় ঊর্ধ্বলোকের সন্ধান দিত। আকুল প্রার্থনাগুলি চিত্তে আবেগ সঞ্চার করিত। অনুমান করা যায়, ধর্মের প্রতি মার্গারেটের গভীর অনুরাগবোধ এই পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। দিনগুলি আনন্দেই কাটিতে লাগিল। স্যামুয়েলের বন্ধু, ভারত প্রত্যাগত এক ধর্মযাজক একদিন স্যামুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

মার্গারেটের বুদ্ধিদীপ্ত কোমল মুখ ও ধর্মের প্রতি একটি আন্তরিক অনুরাগ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। মুগ্ধ হইয়া তিনি বালিকাকে আশীর্বাদ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন, 'ভারতবর্ষ একদিন তোমাকে ডাক দিবে।' মার্গারেট বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন ভারতবর্ষ কোথায়!'

এই অংশটুকু পড়লে বোঝা যায়, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, শৈশবাবস্থা থেকেই মার্গারেট ধর্মচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এইরকম একটি ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। কিন্তু এই ধারণাটি অতি সরলীকৃত। লিজেল রেমঁর রচনা এ ধারণাকে সমর্থন করে না। রেমঁর লেখায় জানা যাচ্ছে ধর্মযাজক স্যামুয়েল প্রতিদিন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সামনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। ঈশ্বরের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন। একজন ধর্মযাজকের পরিবারে যেমনটি হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে পিতার এই বাইবেল পাঠ শুনতে শুনতে ছোট ছেলে- মেয়েগুলিরও ধারণা জন্মে গিয়েছিল ভালো কাজ করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন, মন্দ কাজ করলে হবেন রুষ্ট। ওই বয়সের যে কোনো শিশুর ভিতরই এরকম একটি ধারণা কাজ করে থাকে। এটিই শিশুর মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের অন্যতর ব্যাখ্যা হলে তা ঠিক হবে না। মার্গারেট অধ্যাত্মবাদের প্রতি আগ্রহী হয়েছিল স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময়। তার শিক্ষয়িত্রী মিস কলিন্সের সান্নিধ্যে এসে। লিজেল রেমঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, বাইবেলের চরিত্রগুলি মার্গারেট এবং তার ভাইবোনদের কাছে কল্পকথার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইবেলের বিভিন্ন গল্প শুনে সেই চরিত্রগুলি সেজে ওরা খেলা করত। ওদের মাতামহ হ্যামিলটন একসময় পর্তুগিজদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। তাঁর সংগ্রহ করা তালপাতার পাখা, পালকের টুপি, আর কড়ির জামা পরে ওরা বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্র সাজত।

টরেন্টনে আসার পরই স্যামুয়েলের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। এই পুত্রকন্যাদের ভিতর মার্গারেটই ক্রমে তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ এবং একান্ত অনুরক্ত হয়ে ওঠে। রেমঁ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—দুজনের লেখাতেই এরকম তথ্য পাওয়া যায়। একটি শিশু তার জীবনের প্রথম অনুকরণীয় পুরুষ হিসাবে নিজের পিতাকে দেখে, তার সবকিছুই অনুকরণ করতে চায়। সেক্ষেত্রে—মার্গারেটও তার ব্যতিক্রম ছিল না। স্যামুয়েল যখন কোথাও ভাষণ দিতে যেতেন, মার্গারেট যেত তাঁর সঙ্গে। স্যামুয়েল ভাষণ দিতেন, মার্গারেট চুপচাপ বসে লক্ষ করত তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গিমা। পরে, বাবাকে নকল করে বোন আর স্কুলের বন্ধু-বান্ধবের সামনে ধর্মযাজক সাজত। রেমঁ আরো জানিয়েছেন, মার্গারেট ছোটবেলা থেকে ছিল একরোখা। এই একরোখা দৃঢ়তাই বরাবর মার্গারেটকে অন্য আর সবার থেকে পৃথক করেছে। তবে, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার মতো লিজেল রেমঁও তাঁর রচনায় জানিয়েছেন, স্যামুয়েলের পরিচিত এক ধর্মযাজক মার্গারেটকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'ভারত একদিন তোমায় ডাকবে।' এ আশীর্বাণী কি

ভবিষ্যবাণী ছিল, না এ নিতান্তই কাকতলীয়—তার কোনো ব্যাখ্যা অবশ্য নেই। তবে নিবেদিতার দুটি বিশিষ্ট জীবনী গ্রন্থেই যখন এর উল্লেখ রয়েছে তখন ধরেই নেওয়া যায় এরকম ঘটেছিল। আর একথাও তো ঠিক, বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে ভারত ডেকেছিল। ভারতের প্রতি নিজের সবকিছু সমর্পণ করেছিলেন নিবেদিতা।

বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন সম্পর্কে নিবেদিতা সম্পূর্ণ নীরব। এমনকী, নিবেদিতা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরাও নিবেদিতার ওই পর্বের জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। ফলে, নিবেদিতার জীবনের ওই পর্বের ওপর আলোকপাতও কমই হয়েছে। একমাত্র লিজেল রেমঁর নিবেদিতার জীবনীতে ওই পর্বটি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু নিবেদিতাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, এবং নিবেদিতা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে এই পর্বটিও বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পর্বটি আলোচনা না করলে নিবেদিতার মানসিক এবং চারিত্রিক গঠনের প্রেক্ষাপটটি বোঝা সম্ভব হবে না। বরং এই পর্বের বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনাই বুঝিয়ে দেবে ভবিষ্যতের নিবেদিতা কেমন হবেন? আপাতদৃষ্টিতে ওই ঘটনাগুলি ছোট বলে মনে হলেও, এই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়েই নিবেদিতার মানসিক গঠনটিও আন্দাজ করে নেওয়া অসুবিধা হবে না।

টরেন্টনে নোব্‌ল পরিবারের সুখের সংসারও বেশিদিন স্থায়ী হল না। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে স্যামুয়েল পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

নিবেদিতার সব জীবনীকারেরাই জানিয়েছেন, মৃত্যুশয্যায় স্যামুয়েল বারবারই মার্গারেটের নাম করেছিলেন। স্ত্রী মেরিকে মার্গারেটের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'ভগবান যেদিন ওকে ডাক দেবেন, সেদিন বাধা দিও না যেন...ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি...ও এসেছে বড় কিছু একটা করার জন্য।' পরবর্তীকালে মেরি এ কথা জানিয়েছেন নিবেদিতার ঘনিষ্ঠজনদের।

পিতার মৃত্যুতে মার্গারেট প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন। কারণ, পিতা হয়ে উঠেছিলেন তার কাছে বন্ধুর মতো। পিতাই ছিলেন ওঁর জীবনের প্রথম অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। স্যামুয়েলের মৃত্যুতে নোব্‌ল পরিবার আবার চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের ভিতর পড়ল। তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে মা মেরির পক্ষে সংসার চালানো সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ল। অতএব, মেরি ফিরে এলেন তাঁর বাবার কাছে, আয়ারল্যান্ডে। মেরির বাবা হ্যামিলটন ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। আয়ারল্যান্ডে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এই হ্যামিলটনের সান্নিধ্যেই ধীরে ধীরে মার্গারেট রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। স্বদেশচেতনা এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল তার মধ্যে, যে চেতনার ফলে পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন নিবেদিতা। তদুপরি, ব্রিটিশ

শাসকদের বিরুদ্ধে মাতামহীর তীব্র ক্ষোভ মার্গারেটের ভিতরও সঞ্চারিত হয়েছিল। যে কারণে, পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধিতা এতই তীব্র ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কন্যাদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিবেদিতার কাছে প্রস্তাব দিলে প্রবল ক্রোধে নিবেদিতা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মেরি তাঁর সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হ্যামিলটন একদিন ঘরোয়া বৈঠকে বসলেন। ওই বৈঠকে ঠিক হল— কংগ্রেশনালিস্ট চার্চের অধীনে যে হ্যালিফ্যাক্স কলেজ, সেখানে মার্গারেট আর তার বোন মে-কে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শুরু হল মার্গারেটের আর এক জীবন।

চার

মার্গারেটের স্কুল জীবন সম্পর্কে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন বোর্ডিংয়ে মার্গারেটের যে নবজীবন আরম্ভ হইল, তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পারিবারিক জীবনে অবকাশমণ্ডিত অনাড়ম্বর সহজ গতি সেখানে নাই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত মুহূর্তগুলি ঘড়ির কাঁটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।... অবশ্য বিদ্যালয়ের জীবন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ছিল না। নিরন্তর কঠোর নিয়মের অধীনে মর্গারেটের স্বাধীন চিত্ত মাঝেমধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত।' এই লেখাটি পড়লেই বোঝা যায় কোনো কঠোর অনুশাসনে তাঁকে বেঁধে ফেলা যাবে না —তা নিবেদিতা তাঁর ওই স্কুলজীবন থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যতদিন বেঁচেছেন, এই স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়েই বেঁচেছেন নিবেদিতা। এমনকী গুরু বিবেকানন্দও তাঁকে মঠ-মিশনের কঠোর অনুশাসনে বাঁধতে পারেননি। মার্গারেটের স্কুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে লিজেল রেমঁর লেখায়। রেমঁ লিখেছেন, 'বন্দিশালার মতো স্কুলের অজস্র জানলা দেওয়া বিরাট বাড়ি, মেয়েদের নীল-সাদা ইউনিফর্ম— এসব ওরা মেনে নিল। ওরা আরও আবিষ্কার করল যে, স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রীই ধর্মযাজকের মেয়ে। কাজ কি খেলা, যা-ই হোক না কেন, স্কুলের ঘন্টার তালে সবকিছু ওখানে পা ফেলে চলে। স্কুলের ঘরগুলিতে প্রচুর আলো-হাওয়া। দেওয়ালে বড় বড় ছবি। খেলার মাঠ প্রকাণ্ড। কাছেই পাহাড়। সেই পাহাড়ের পাদদেশ অবধি স্কুলের সীমানা।

'মেয়েরা দশটায় শোবার ঘরে ঘুমোতে যায়। সারি সারি বিছানা। প্রত্যেকের বিছানার ধারে একটি করে নিজস্ব ওয়ার্ডরোব, তাতে কাপড়-চোপড়, স্কুলের পোশাক-আশাক যত, তার থেকে বেশি শখের জিনিস। একটুকরো নীল ফিতে, একটা শুকনো ফুল, একটা ফটো, কী একটা চকচকে নুড়ি—এ হেন টুকিটাকি ওদের কাছে খুব দামি। অবসরমতো এগুলি বের করে নাড়াচাড়া করা যায়।

মার্গারেট যখন স্কুলে ভরতি হয়, তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মিস ল্যারেট। অসম্ভব নিয়মানুবর্তী। দক্ষতার সঙ্গে স্কুলের সব কাজ পরিচালনা করেন। কোনো অনিয়ম সহ্য করতেন না। নিজেও কখনও কোনো অনিয়ম করতেন না। মিস ল্যারেট ছাত্রীদের আত্মত্যাগের শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষায় অনেক ছাত্রীই স্বেচ্ছায় সংকল্প করত—তারা ব্রহ্মচারিণী হবে, সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তবে, মার্গারেট বা তার বোন স্কুল জীবনে এরকম কোনো সংকল্প করেছিল বলে জানা যায়নি। এই মিস ল্যারেট কিন্তু মার্গারেটের জীবনে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিলেন। পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতার কাজ বেছে নেওয়ার পিছনে এই মিস ল্যারেটের প্রভাব যথেষ্ট কাজ করেছিল। মার্গারেট লেখাপড়ায় ভালো ছিল। রেমঁও জানিয়েছেন, কঠোর অনুশাসনে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে মোটেই চায়নি মার্গারেট। চার্চের অধীনে ওই স্কুল ছাত্রীদের বড় চুল রাখায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। মার্গারেট সে নির্দেশিকা অমান্য করেই ঘাড় অবধি একরাশ চুল সোনালি চুল রেখেছিল। এই চুল নিয়ে যথেষ্ট গর্বও ছিল মার্গারেটের। বড় চুল দেখে একদিন মিস ল্যারেট তা কেটে দেন। বলেন, 'এক বছরের ভিতর আর এরকম বড় চুল রাখতে পারবে না।'

মার্গারেটের জীবনীকারেরা লিখেছেন, এই হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পড়ার সময়ই তাঁর মনে পরাতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন এবং কৌতূহল দেখা দিতে থাকে। তার একটা বড় কারণ হয়তো, চার্চ নিয়ন্ত্রিত এই স্কুলটির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ছাত্রীদের অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলা, ছাত্রীদের ধর্মপ্রচারের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। মিস ল্যারেটের পর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়ে আসেন মিস কলিন্স। তখন মার্গারেট একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। ওই নতুন প্রধান শিক্ষায়িত্রী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর রুচি ছিল সাহিত্য এবং দর্শনে। কিন্তু পড়াতেন উদ্ভিদবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা। এই শিক্ষয়িত্রী বুঝলেন, মার্গারেট অন্য ছাত্রীদের তুলনায় একটু পৃথক। ফলে, মার্গারেটের সঙ্গে মিস কলিন্সের একটি মানসিক সংযোগ গড়ে উঠল। একান্তে মার্গারেটকে ডেকে নিয়ে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করতেন তিনি। সেই আলোচনার অধিকাংশটাই ছিল দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত। মিস কলিন্সের সংস্পর্শে এসে মার্গারেটের মনে অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাল। সে শিক্ষয়িত্রীকে প্রশ্ন করত, 'মৃত্যুর পরেই কি মানুষের জীবনের শেষ?' এই শিক্ষয়িত্রীকেই মার্গারেট একদিন বলে বসল-'ঈশ্বর আছেন আমি জানি। কিন্তু আমি তাঁকে জানতে চাই। বুঝতে চাই।' এখানে স্মর্তব্য, ঠিক এইরকম প্রশ্ন নিয়ে কৈশোরে নরেন্দ্রনাথও ছুটে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ' মশায়, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও কিশোর নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন এই কৌতূহল নিয়ে। নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে বিবেকানন্দের

ভাবনার এই সাদৃশ্য মেলাতে বসলে এটাই মনে হবে যে, এগুলিই হয়তো ভবিষ্যতে তাঁদের মানসিক মেলবন্ধনের প্রেক্ষিতটা তৈরি করে দিয়েছিল। এই একই অনুসন্ধিৎসা গুরু এবং শিষ্যের পরস্পরকে চিনে নিতে সহায়ক হয়েছিল। ভবিষ্যতেও নিবেদিতাকে চিনে নিয়ে ১৮৯৬ সালের ৭ জুন মার্গারেটকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দ তাই লিখেছিলেন, 'তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জগো। জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?' ভবিষ্যতে কীভাবে নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দ পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিলেন তা আমরা ক্রমে জানব। তার আগে বিবেকানন্দ-পূর্ববর্তী নিবেদিতার জীবনটি আরো বিশদভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

লিজেল রেমঁর রচনা অনুসরণ করলে জানা যায়, মিস কলিন্স তাঁর এই ছাত্রীটিকে অত্যন্ত আপন করে নেন। দুজনের ভিতর একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিস কলিন্স স্কুলে অন্য ছাত্রীদের থেকে মার্গারেটকে একটু আলাদা নজরই দিতে থাকেন। সাহিত্য এবং দর্শন সম্পর্কে মার্গারেটকে তিনি নিয়মিত শিক্ষা দান করতে থাকেন। লিজেল রেমঁর রচনা অনুসরণ করলে জানা যায়, স্কুলজীবনে দুই শিক্ষয়িত্রী মিস ল্যারেট এবং মিস কলিন্স—দুজনেই মার্গারেটকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মিস ল্যারেটকে দেখে মার্গারেট যেমন শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল, তেমনই মিস কলিন্স তার মননশীল চরিত্রটি আর পরিপুষ্ট করে তোলেন। তবে, শুধু অধ্যাত্মবাদ বা দর্শন সংক্রান্ত আলোচনাতেই যে মার্গারেট এ সময় সন্তুষ্ট ছিল তা-ও কিন্তু নয়। এই সময়েই দেশ এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কেও তার ক্রমশ আগ্রহ জন্মাতে থাকে। এবং তা নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনাও করতে থাকে সে। অর্থাৎ বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তার একটি মানসিক গঠন তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। পরে বিবেকানন্দ তাকে আরো সংগঠিত, সুনির্দিষ্ট করে তোলেন। জন্ম দেন নিবেদিতাকে।

এই সময় মার্গারেটের পারিবারিক অবস্থানটি কেমন ছিল তা-ও একটু জেনে নেওয়া যাক। বড়দিন আর জুলাইয়ের মাঝামাঝি—বছরে এই দুবার স্কুলে ছুটি পড়ত। ওই ছুটিতে মার্গারেট আর মে পাড়ি দিত আয়ারল্যান্ডে। ওরা তখনও নহাৎ ছোট। তবু, অন্য কারও সঙ্গে নয়, দু বোন নিজেরাই আয়ারল্যান্ডের পথ ধরত। একজন শিক্ষয়িত্রী ওদের রেলস্টেশনে থেকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতেন। ট্রেন থেকে নেমে জাহাজ। সারারাত জাহাজে কাটিয়ে পরদিন আয়ারল্যান্ড। এই পারিপার্শ্বিক চাপই কিন্তু ভবিষ্যতে মার্গারেটকে স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিল। কতখানি স্বাবলম্বী মার্গারেট হয়ে উঠেছিল, ওই ছোট বয়সেই কতখানি মানসিক দৃঢ়তা এসে

গিয়েছিল তার, তা লিজেল রেমঁর লেখার একটি অংশবিশেষ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। মার্গারেটের বয়স যখন বারো তখন তার মা লন্ডনে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ওইরকম একটি সময়ে, তখন মার্গারেট স্কুলের ছুটিতে বোনকে সঙ্গে নিয়ে আয়ারল্যান্ড যাচ্ছে, ফ্লিটউডে ওদের মা এলেন দু-বোনের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে তিন বছরের ছেলে। প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে তখন। ছোট্ট ছেলেটিকে একটি তোয়ালেতে মুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন মেরি।ওই তিনবছরের ছোট্ট ছেলেটিকে মার্গারেটের হাতে তুলে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন লন্ডনে। চোখের জলে মা-মেয়ের বিদায়পর্ব সমাধা হল। ওই শীতের রাতে ছোট বোন আর তিন বছরের ভাইকে নিয়ে মার্গারেট আয়ারল্যান্ডের জাহাজ ধরল। ছোট বয়স থেকে কষ্ট সহ্য করার অসীম ক্ষমতা থেকেই হয়তো ভবিষ্যতে, বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর নিবেদিতা ভারতে তাঁর বাকি জীবনটুকুতে অক্লেশে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন যাবতীয় কষ্টকে, অনায়াসে মোকাবিলা করেছিলেন যাবতীয় ঝঞ্ঝা। তবু, ভারতের মাটি ছেড়ে বিলেতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেননি কোনোদিনও।

প্রতিবার ছুটির সময় মার্গারেট যখন বাড়িতে ফিরত, বেলফাস্ট বন্দরে ওদের মাতামহ ওদের নিতে আসতেন। পুরো ছুটিটা মাতামহের আদরে স্নেহে কাটত দু-বোনের। ওদের মাতামহ একসময় ব্যবসা করতেন। পরে ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তবু তাঁর কোনো ফুরসৎ ছিল না। খুব ভোরে বেরিয়ে যেতেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন সারাদিন। 'তরুণ আয়ারল্যান্ড' সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। আয়ারল্যান্ডে হোমরুল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। চাষিদের ফিরে পাওয়া জমি বিলির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। গ্ল্যাডস্টোন যে সংস্কার আইন চালু করেছিলেন, তা কার্যকর করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরোধিতা করে বহুবার কারাদণ্ডের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। স্ত্রী খুব অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর কথা উঠলেই মার্গারেটের মাতামহ হ্যামিলটন বলতেন, 'সে ছিল বনেদী মারডক বংশের মেয়ে। ওদের ধারাই হচ্ছে চরৈবেতি।' হ্যামিলটন যখন বুট পরে, জ্বলন্ত পাইপ ঠোঁটে ঝুলিয়ে বাইরে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হতেন, তখন মার্গারেট মনে মনে ভাবত, 'যদি দাদুর সঙ্গে বেরুতে পারতাম।' মার্গারেট লক্ষ্য করত ওর মাতামহ ঝোলা ভরতি করে 'দ্য নেশন' নামে পত্রিকা নিয়ে বেরোতেন। 'দ্য নেশন' ছিল সরকার বিরোধী পত্রিকা। পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ছিল তখন। হ্যামিলটন ঘুরে ঘুরে এই নিষিদ্ধ পত্রিকাটিই বিলি করতেন। তবে, মাতামহও তাঁর এই নাতনিটিকে বেশিদিন ঘরে বসিয়ে রাখলেন না। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে শুরু করলেন। বাবার সঙ্গে মার্গারেটের যেমন একটা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, দেখতে দেখতে মাতামহের সঙ্গেও সেরকম সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাঁর সঙ্গে সব জায়গায় যাতায়াত

শুরু করল মার্গারেট। এমনকী রাজনৈতিক জায়গায়, সভা-সমাবেশেও। ফলে রাজনীতির দুয়ারটাও ধীরে ধীরে খুলে যেতে থাকল মার্গারেটের সামনে। রাজনৈতিক বোধেরও উন্মেষ ঘটতে শুরু করল তার ভিতর। হ্যামিলটন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নাতনির পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলতেন, 'ও টাইরনের নোব্‌ল বংশের মেয়ে। আমার আর জন নোব্‌লের নাতনি।' এই পরিচয় পেয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সবাই তাকাত মার্গারেটের দিকে। মার্গারেট ধীরে ধীরে অনুভব করতে আরম্ভ করল, বিপ্লববাদের এক গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করছে ও।

একটু বড় হওয়ার পর, মার্গারেটরা যখন ছুটির শেষে স্কুলে ফিরত, তখন ওর মাতামহ বাছাই করা বই সাজিয়ে দিতেন ওর বাক্সে। মিলটন, শেক্সপিয়ার, আয়ারল্যান্ডের প্রবাদপ্রতিম স্বাধীনতা সংগ্রামী রবার্ট এলসমারের জীবনী, বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবীদের কাহিনি আর জীবনকথা, বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ—ইত্যাদি। রবিবার ছুটির দিন মার্গারেট গোগ্রাসে এইসব বই পড়ত। প্রথম প্রথম একটু ভয়ও করত। যদি মিস কলিন্স এই ধরনের বই পড়তে দেখলে বকেন। কিন্তু এই সব বই পড়ার জন্য মিস কলিন্স কখনো মার্গারেটকে বকেননি। বরং মিস কলিন্স চেয়েছিলেন, মার্গারেটের ভিতর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটুক। মাতামহের দেওয়া ওই বইগুলিই মার্গারেটের ভিতরে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা জাগিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'স্বদেশ যে কী বস্তু তা আমি আমার দাদুর কাছেই শিখেছি।'

এই সময় মার্গারেট বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা শুরু করে। দু-ধরনের প্রবন্ধ লিখত মার্গারেট। এক ধরনের প্রবন্ধ লিখত প্যালেস্তাইন আর মিশর নিয়ে। তাতে অধ্যাত্মবাদ এবং খৃস্টের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করত। এই প্রবন্ধগুলি পড়তে দিত মিস কলিন্সকে। মিস কলিন্স এই প্রবন্ধগুলি পড়তেন এবং মতামত দিতেন। আর এক ধরনের প্রবন্ধ লিখত, যাতে থাকত জাতীয়তাবাদ, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে অধীর প্রতীক্ষার কথা। সেগুলি পড়তে পাঠাত মাতামহকে। সেই সঙ্গে থাকত উচ্ছ্বাসভরা চিঠি। মার্গারেটের জীবনের এই পর্বটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, ওই কিশোর বয়সে তিনজন ওর জীবনকে তিনরকমভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। মিস ল্যারেটের সংস্পর্শ ওকে শিক্ষকতা পেশা সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। যে জন্য শিক্ষা জীবনের শেষে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে বেছেও নিয়েছিল ও। মিস কলিন্স অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে আগ্রহী এবং অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিলেন ওকে— যা চরম পূর্ণতা পেয়েছিল বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে। আর মাতামহ তার ভিতর সঞ্চারিত করেছিলেন রাজনৈতিক বোধ এবং স্বদেশচেতনা, যা তাকে ভারতে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল।

যতই এই লেখালেখি এবং গুরুগম্ভীর পড়াশোনার ভিতর জড়িয়ে পড়ছিল মার্গারেট, ততই স্কুলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওর একটা দূরত্বও তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। অন্য মেয়েরা ওকে একটু এড়িয়ে চলত। মেজাজি এবং অহংকারী মনে করত। এদিকে, মার্গারেটের মা মেরি তখন বেলফাস্টে বিদেশিদের থাকার জন্য একটি বোর্ডিং খুলেছেন। মায়ের সঙ্গেও অবশ্য ততদিনে মার্গারেটের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। স্কুলের ছুটিতে মায়ের সঙ্গে এখন আর ততটা আনন্দে সময় কাটে না। বরং, নিজের পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে মার্গারেট। মেয়েকে এমন চুপচাপ, শান্ত দেখে মেরিও একটু দমে যান। অবিরত দারিদ্র্য এবং কষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মেরিও এখন একটু খিটখিটে এবং বদমেজাজি হয়ে পড়েছেন। মেরির এইরকম রূপান্তর দেখে মার্গারেটও কষ্ট পায়। নিজের যাবতীয় দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য মেরি কট্টর ধর্মাচরণের দিকে মন দেন। মেরি চান মার্গারেটও এই কট্টর ধর্মাচরণে মন দিক। মার্গারেটের তা পছন্দ নয়। তার যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল মন কোনো সংকীর্ণতা বা কট্টর মনোভাবকেই মেনে নিতে পারে না।

স্কুল জীবনের শেষ ছটা মাস মার্গারেটের কাটে চরম উত্তেজনায়। স্কুলের এই কঠোর অনুশাসনের পর বৃহত্তর কর্মজীবন কেমন হবে সেই চিন্তায় উদ্বেল হয়ে থাকে ওর মন। ওর একটাই সংকল্প — শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেবে। দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিন এসে গেল। যথেষ্ট ভালো ফল করে সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়ে গেল মার্গারেট। এবার মিস কলিন্সকে ছেড়ে যেতে হবে। এই বিচ্ছেদ বেদনায় বিষাদে ছেয়ে গেল ওর মন। মিস কলিন্সের মনও প্রিয় ছাত্রীর বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত। তবু বিদায় নিতেই হবে। বিদায় বেলায় মিস কলিন্স তাঁর এই প্রিয় ছাত্রীটিকে আশীর্বাদ করলেন— সমাজে যেন নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলে মার্গারেট। নিজের প্রিয় শিক্ষয়িত্রীর এই ইচ্ছাকে কিন্তু ভবিষ্যতের নিবেদিতা পূর্ণ করেছিলেন। [illegible] প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'এবার কর্মজীবনের আরম্ভ। শিক্ষার প্রতি সহজাত অনুরাগবশতঃ মার্গারেট পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন তিনি শিক্ষয়িত্রী হইবেন। শীঘ্রই কর্ম জুটিয়া গেল। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া কেসউইক যাত্রা করিলেন।' ওই বছরই নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ, পিতৃহারা হচ্ছেন। অসীম কষ্টের মাঝে মা এবং ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে তাঁকেও।

স্কুল পাশ করে বেরিয়ে মার্গারেটের চাকরি জীবনে যোগ দেওয়ার মুহূর্তের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে লিজেল রেমঁর লেখায়। 'চার্চ নিউজ পত্রিকায় একরাশ দরখাস্ত ছেড়ে দিয়ে উত্তর আসার আগেই ও জিনিসপত্র গোছাতে লেগে গেল। একটা শিক্ষয়িত্রীর পদ যে ও পাবেই তাতে সন্দেহ নেই। একে একে ওর পোশাকগুলি তোলে

একটা আখরোট রঙের চিরকাঠের বাক্সে। রোজকার পরার জন্য উঁচু কলারওয়ালা একটি পোশাক। একটা মিহি সুতোর কালো সার্জের পোশাক, বুটি তোলা, ঘন কুচি দেওয়া তাতে। মনোরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষা যে নিতান্ত প্রচ্ছন্ন নয়, তার প্রমাণস্বরূপ দামি স্কচ সিল্কের বডিস, তার লতানো কলার আর ফোলা হাতে দিব্যি লেসের ঝালর।

'১৮৮৮ সনের গ্রীষ্মকাল। কেসউইক থেকে একটা চিঠি এল। এইটেই তখনকার প্রধান ঘটনা— পাশার দান পড়েছে তো। মার্গারেট একটা নামজাদা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। তা নিয়ে আত্মীয়দের গর্বের অন্ত নাই। ওকে অভিনন্দন জানিয়ে কেউ দিলেন কাজ করা পিন কুশন, কেউ একটা রূপার কলমদানি, কেউ বা ব্লটার। সবই ওর কাজের জিনিস। ওর মন দুলে ওঠে। কাজে নামবার আর তর সইছে না যেন।

'ও তখন মোটে আঠার বছরের মেয়ে।'

পাঁচ

কেসউইকে মার্গারেটের শিক্ষয়িত্রী জীবন কীভাবে কেটেছিল সে সম্পর্কে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার গ্রন্থে অবশ্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'শিক্ষাকার্যে মার্গারেটের জন্মগত অধিকার। কেবলমাত্র জীবিকা-নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ না করিয়া যাহারা শিক্ষাদানের মধ্য দিয়া নিজের সত্তাকে প্রকাশ করিতে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে, তাহাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি স্বভাবতঃই চিরাচরিত পথ হইতে ভিন্ন। মার্গারেটের বয়স অল্প এবং শিক্ষাকার্যে তিনি নূতন ব্রতী হইলেও, তাঁহার আন্তরিকতা ও উৎসাহ নব নব অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান প্রণালীকে সহজ ও প্রাণবান করিয়া তুলিল।

'কেসউইকে আসার ফলে, সেখানকার হাইচার্চের সংস্পর্শে ধর্ম সম্বন্ধে মার্গারেটের মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। অধ্যাত্ম বিষয় সম্বন্ধে একটি সত্যকারের পিপাসা আর গভীর ঔৎসুক্য এখন হইতে তাঁহার মনে একটি বড় স্থান অধিকার করিল। এক বৎসর কেসউইকে কাটিয়া গেল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্গারেট রেক্সহ্যাম শহরে কর্ম লইলেন।' কিন্তু কেসউইকে মার্গারেটের কর্মজীবনের পর্বটি এত সংক্ষেপে সেরে ফেললে হবে না। সামগ্রিক জীবনের সবকটি পর্ব পেরোতে পেরোতেই মার্গারেট একসময় হয়ে উঠেছেন নিবেদিতা। তাঁর নিবেদিতা হয়ে ওঠার পিছনে জীবনের প্রতিটি পর্বেরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে।

কেসউইকে তাঁর প্রথম কর্মজীবনের প্রসঙ্গটি বিস্তারিত রয়েছে লিজেল রেমঁর লেখায়। কেসউইকের যে বোর্ডিং স্কুলটিতে মার্গারেট শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেয়েছিলেন, সেটি ছিল প্রাচীন এক সম্ভ্রান্ত স্কুল। বিশিষ্ট ব্রিটিশ কবি কোলরিজ এই স্কুলে একসময় পড়াশোনা করেছিলেন। পাহাড় আর হ্রদের পটভূমিতে শান্ত-সুন্দর পরিবেশে স্কুলটির অবস্থান ছিল। খুব উৎসাহ নিয়ে মার্গারেট এখানে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়েই বুঝলেন,ওঁদের ওই হালিফ্যাক্স কলেজের মতো ব্রহ্মচারিণী সেজে

থাকলে এখানে চলবে না। এখানে ওঁকে চোদ্দ থেকে ষোল বছরের ছাত্রীদের সাহিত্য এবং ইতিহাস পড়তে হবে। তাদের কাছে নিজেকে হাজির করতে হবে প্রাণোচ্ছল হাসিখুশি এক শিক্ষিকা হিসাবে। হ্যালিফ্যাক্স কলেজে যে শিক্ষিকাদের দেখেছেন মার্গারেট, শিক্ষিকা বলতে যে ধারণাটি তৈরি হয়েছিল তাঁর মনে— তার সঙ্গে এই ভাবনা ধাক্কা খেল প্রথমেই। তদুপরি, ছাত্রীজীবনে মার্গারেট ছিলেন অসম্ভব গম্ভীর, নিজের মতো করে একা থাকতেই ভালোবাসতেন। উচ্ছলতা প্রকাশ তাঁর স্বভাবেই ছিল না। কাজেই, শিক্ষয়িত্রীর কাজ শুরু করে প্রাথমিকভাবে ওঁর একটু অসুবিধা হল বৈকি। কিন্তু পেশাদারি শিক্ষয়িত্রীর মতোই মার্গারেট সহজেই তা সামলে নিয়ে ছাত্রীদের মাঝে মিশে গেলেন। নিজের উৎসাহ আর মুক্ত মনের ভাবনা-চিন্তা ছাত্রীদের ভিতর সঞ্চারিত করলেন। এই কেসউইকে শিক্ষকতা করার সময় শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন এবং সংস্কার আনার চেষ্টা করেন মার্গারেট। হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের কঠোর প্রাচীনপন্থী শিক্ষা তাঁকে পরবর্তীকালে শিক্ষাসংস্কারের কাজে উৎসাহী করেছিল এমন ভাবনা খুব একটা অসঙ্গত হবে না। নির্ধারিত পাঠ্যসূচি ছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বদলে, ছাত্রীদের মানসিক গঠন, তাদের মনোভাব, তাদের আচরণ লক্ষ করে, পাঠ্যবিষয়টি তাদের কাছে উপস্থাপন করতে চাইলেন তিনি। এভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং সংস্কারের কারণও ছিল— মার্গারেট চেয়েছিলেন পাঠ্যবিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রীদের ভিতর উৎসাহ জন্মাক। এবং তারা পাঠে আগ্রহী হোক। মার্গারেট বুঝেছিলেন, পাঠ্যবিষয় যদি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পাঠ ছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য না-ও হতে পারে। মনে রাখতে হবে, ওই সময় ইংল্যান্ডেও কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় খুব একটা সংস্কার আসেনি। বরং, রক্ষণশীল ব্রিটিশ সমাজ তখন প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি মেনেই চলছিল। মার্গারেটের এই আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষারীতি কেসউইক স্কুলের কর্তৃপক্ষের ভালো লাগল। সর্বতোভাবে মার্গারেটকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তাঁরা। ওই সময়ে কেসউইক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন কলারসিক, স্বাধীনচেতা এক মহিলা। তিনি অনুভব করলেন, এই নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির ফলে ছাত্রীদের পঠনপাঠনে আরও উন্নতিই ঘটবে। ওই গ্রামের যিনি ধর্মযাজক, তিনি ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তরঙ্গ। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং গ্রামের ধর্মযাজক — দুজনেই উৎসাহ নিয়ে মার্গারেটের শিক্ষাদান পদ্ধতিটি নিরীক্ষণ করতেন। এই সময় থেকেই শিক্ষাব্রতী হিসাবে মার্গারেটের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিকীকরণে তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকা কিন্তু বরাবরই ছিল। এমনকী, বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশে এসে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নিবেদিতা করেছিলেন তা হল মেয়েদের স্কুল স্থাপন। স্বামীজির প্রয়াণের পরও এই স্কুলটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই চালিয়ে গিয়েছেন।

স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব বিবেকানন্দও বুঝতেন। তাঁর পরিব্রাজকের জীবনেই বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন অন্ধ সংস্কার এবং হীনম্মন্যতা থেকে হিন্দু সমাজকে যদি উত্তরণের পথ দেখাতে হয়, তাহলে অন্যান্য সব কাজের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার কাজটিও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। যে কারণে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্বের কথা বারংবার বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, 'The uplift of the women, the awakening of the masses must come first, and then only can any real good come about for the country, for India.' ১৮৯৬ সালের ৭ জুন মার্গারেটকে যে চিঠিটি লিখেছেন বিবেকানন্দ, তাতেও তিনি লিখেছেন— 'এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তা-ই চলতে থাকবে! যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে।' এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যাবে, প্রথমাবধিই অজ্ঞতা দূর করার কথা নিবেদিতাকে বারংবার জোরের সঙ্গে বলেছেন স্বামীজি। যে কারণে তিনি নিবেদিতাকে বাগবাজারে মেয়েদের স্কুল গড়ে তোলার প্রেক্ষিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। নিবেদিতাকে মেয়েদের স্কুল গড়ার বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁর মেয়েদের স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহের চিন্তায় যখন নিবেদিতা সবিশেষ চিন্তিত তখন, ১৯০০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিবেদিতাকে চিঠিতে আশ্বাস দিয়েছেন স্বামীজি, '...ভয় করো না — তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যেদিক দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান।' এসব প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিতভাবে পরে আসব।

শুধু শিক্ষা সংস্কার নয়, কেসউইকে এসে মার্গারেটের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণারও অনেক পরিবর্তন হতে শুরু করে। মার্গারেট যে ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে এ সময় চলতেন — সেই মনোভাব ওঁর মা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ একটা পছন্দ ছিল না। মার্গারেটের পরিবারের এই সদস্যরা একটু কট্টর ধর্মাচরণে তখনও বিশ্বাস করতেন। মার্গারেটের মা মেরি চাইতেন, পারিবারিক এই ধর্মবিশ্বাসকে মার্গারেটও আঁকড়ে থাকুন। বস্তুত ধর্মভাবনায় পরিবারের সঙ্গে মার্গারেটের এই বিরোধ কিন্তু হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই। কেসউইকে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পর বিরোধিতাটা আরও বাড়ে। মেরি সবসময়ই ভাবতেন, শিশু বয়সে মার্গারেটকে যে ক্যাথলিক চার্চে দীক্ষিত করা হয়েছিল, এ হয়তো তারই ফল। অথচ মার্গারেট কিন্তু কেসউইকে শিক্ষকতার সময়েই ধর্মভাবনা এবং ধর্মচেতনা সম্পর্কে যথেষ্ট

উৎসাহী হয়ে ওঠেন। নিয়মিত চার্চে যেতেন, প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনার সময় প্রার্থনা সংগীত ওঁকে উদ্বেলিত করত। কিন্তু মার্গারেট যে ধর্মকে তখন প্রত্যক্ষ করতে চাইতেন, তা অনেকটা উদার ধর্মেরই প্রতিরূপ। চিরাচরিত কট্টর ধর্মাচরণের ভিতর মার্গারেটের মন ধর্মভাবনা সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেত না। মার্গারেটের এই উদার ধর্মভাবটিই বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন; যে কারণে মার্গারেটকে লেখা ১৮৯৬ সালের ৭ জুনের চিঠিতেই বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।

'এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে— তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী নিজে গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি— ওঠ, জাগো।' এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যাবে, আচার-বিচার, সংস্কারের বাইরে এক বৃহত্তর মানবধর্মের সন্ধান বিবেকানন্দ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর নিবেদিতাকে।

পরিবারের ধর্মভাবনার সঙ্গে মার্গারেটের মিল হয় না; তবু তিনি এ নিয়ে কোনো বিবাদ বা বিতর্কে যেতেন না। শুধু কেসউইক থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে এত আচার-বিচার এবং সংস্কারের ভিতর নিজেকে বন্দি মনে হত। মনে হত, কেসউইকে থাকাটাই ভালো। আরও মনে হত, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিজেকে যেন আর খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। রেমঁ লিখছেন, 'কেসউইক ওকে শিখিয়েছে, অন্তর যতই বিকশিত হবে, মাধুরীতে যতই ভরে উঠবে, ততই তার অনন্তের পিপাসা হবে অনির্বাণ।'

নিবেদিতার দুই জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং লিজেল রেমঁর লেখা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই সময় মার্গারেট এক ধরনের দিশাহীনতা এবং অস্থিরতায় ভুগছিলেন। হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পড়াকালীন অধ্যাত্মবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, পরে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, জাতীয়তাবাদী মনোভাব— সবকিছুর সংমিশ্রণে মার্গারেট তখন একটি অস্থির মানুষ। কোন পথে তিনি যাবেন, কোন পথটাকে তিনি বেছে নেবেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্যটাই বা কী এ সব সম্পর্কে তিনি স্থির নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। বলা ভালো, তিনি অন্ধকারে পথ

হাতড়ে চলার মতো চারদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। লেডি মার্গেসনের বাড়িতে যখন বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখনও কিন্তু মার্গারেট এইরকম পথ হাতড়ে চলা এক অস্থির পথিকই ছিলেন। তখনও কিন্তু মার্গারেট স্থির নিশ্চিত ছিলেন না কোন পথটি শেষ পর্যন্ত তাঁর বেছে নেওয়া উচিত। এই মার্গারেটকেই বিবেকানন্দ সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ গড়ে দিয়েছিলেন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, ১৮৮৬ সনে মার্গারেট কেসউইক ছেড়ে রেক্সহ্যামে চাকরি নিয়ে চলে আসেন। রেমঁ অবশ্য জানাচ্ছেন, ১৮৮৭ সালে রেক্সহ্যামে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন মার্গারেট। তবে, রেমঁ আর একটি চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছেন। কেসউইকে চাকরি করার সময়ই মার্গারেট তারুণ্যের আবেগবশত মাঝে মাঝে ভাবতেন কোনো ক্যাথলিক চার্চে যোগদান করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কারণ, তাঁর মনের মধ্যে নানারকম অনিশ্চয়তা এবং সিদ্ধান্তহীনতা খেলা করছিল। এইরকম ভাবতে ভাবতেই মার্গারেট হঠাৎ করেই কেসউইকে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেক্সহ্যামের সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি গ্রহণ করে চলে এলেন। রেক্সহ্যামে চাকরি নিয়ে আসার পর মার্গারেটের বৃহত্তর মানব সেবার মাঝেই ঈশ্বরের সেবা করার মনোবাসনা জেগেছিল। সেখানে চার্চের কর্মী হিসাবে মানবকল্যাণের কাজে এগিয়েও গিয়েছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে জানা গেছে, চার্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ কাজ মার্গারেট বেশিদিন করতে পারেননি। কারণ, চার্চের অনুশাসন মানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডিতে মানবসেবাকে আটকে রাখতে চাননি তিনি। চার্চের সঙ্গে বিরোধটা তাঁর সেখানেই বেঁধেছিল। মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'রেক্সহ্যাম জায়গাটা খনি অঞ্চলের মধ্যে। শহরের ঠিক মাঝখানে সেন্ট মার্কস চার্চ। পিতার প্রভাব মার্গারেটের উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। সুতরাং, ধর্মযাজক পিতার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিবার আগ্রহ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। শিক্ষাকার্যের অবসরে চার্চের কর্মী হিসাবে সমাজকল্যাণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মার্গারেট উপলব্ধি করিলেন, সমাজ সেবায় চার্চের কাজ নির্দিষ্ট গণ্ডি ধরিয়া চলে। সাহায্য দান চার্চের মতামত নিরপেক্ষ নহে। অপরদিকে তাঁহার কোমল চিত্ত নির্বিচারে সকলের বেদনায় সাহায্যদানে উন্মুখ। কেহ চার্চের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে কিনা, সাহায্যদানের ব্যাপারে, ইহা তাঁহার নিকট গুরুতর প্রশ্ন নহে। অতএব চার্চের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগল। মার্গারেট চার্চের সংস্রব ছাড়িলেন।'

কেসউইক ছেড়ে রেক্সহ্যামে আসার মধ্যবর্তী সময়টিও কিন্তু মার্গারেটের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বটি সম্বন্ধে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু লিজেল রেমঁ এই পর্বটি উল্লেখ করেছেন। রেমঁ লিখেছেন, এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করার আকাঙ্খা নিয়েই মার্গারেট কেসউইক ছেড়েছিলেন। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য আর কষ্টকে বরণ করে নিয়েছিলেন। বুঝতে চেয়েছিলেন, সমাজ কল্যাণের কাজে কতটা আত্মত্যাগ তিনি করতে পারেন। কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারেন তিনি। আর সেজন্যই রাগবির অনাথ আশ্রমে কাজ নিয়েছিলেন তিনি। ওই অনাথ আশ্রমে জনা কুড়ি অনাথ মেয়ে থাকত। তাদের কাজকর্ম শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা হত। সাধারণ মানুষের দানে ওই অনাথ আশ্রমটি চলত। মার্গারেট ওখানে মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখাতেন। তারা যাতে অনাথ আশ্রম থেকে বেরিয়ে স্বাধীন-স্বাবলম্বী হতে পারে— সে চেষ্টাই করতেন। একবছর এই অনাথ আশ্রমে মেয়েদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন মার্গারেট। ওই একবছর যথেষ্ট দারিদ্র্য এবং কষ্টের ভিতরই অতিবাহিত করতে হয়েছিল তাঁকে। কেউ বলতে পারেন, এ ছিল নিছকই তারুণ্যের উন্মাদনা এবং আবেগ। হয়তো তা-ই। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, একবছর ওই পরীক্ষাটি না দিলে তাঁর স্বেচ্ছাব্রতীর মানসিকতা গড়ে উঠত না! নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং সুখ-দুঃখকে ত্যাগ করে এক নিমেষে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাহসই হয়তো ভবিষ্যতে সঞ্চয় করতে পারতেন না মার্গারেট। বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মার্গারেট ১৮৯৭ সালে যখন ভারতে আসতে দৃঢ় সংকল্প করেন, তখন বিবেকানন্দ ২৯ জুলাই তারিখের একটি চিঠিতে তাঁকে ভারতে বসবাসের নানাবিধ অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এবং যথেষ্ট ভেবেচিন্তে এদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। মার্গারেট কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল ছিলেন। সব কষ্টই যে তিনি বরণ করে নিতে প্রস্তুত, তা জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে। এবং, স্বামীজির প্রয়াণের পরে, অশেষ কষ্ট এবং দারিদ্র্য সহ্য করে তিনি ভারতে থেকেও গিয়েছিলেন। ভারতের মাটি মার্গারেট ত্যাগ করেননি। এই ঘটনাগুলি মনে করলে এটাও মনে হবে যে, রাগবির ওই অনাথ আশ্রমে কাজ করতে যাওয়া যদি তারুণ্যের উন্মাদনা হয়ও, তবুও তা-ই হয়তো তাঁর স্বার্থত্যাগ করে কষ্টবরণ করে নেওয়ার চরিত্রটি গড়ে দিয়েছিল। তদুপরি, ছোটবেলায় যে কষ্ট এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মার্গারেট বড় হয়েছিলেন, রাগবির অনাথ আশ্রমে কাজ নেওয়ার অনেক আগেই, কষ্ট সহ্য করে লড়ে যাওয়ার মানসিকতাটাও তখনই গড়ে উঠেছিল। ফলে, এই তারুণ্যের আবেগটিও ভবিষ্যতের নিবেদিতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল। আর নিবেদিতার সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখব, আজীবন এক আবেগ নিবেদিতাকে তাড়িত করেছে— যে কারণে নিবেদিতা যে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আবেগের তাড়নায়, অনেক ক্ষেত্রেই সে কাজের প্রতিক্রিয়া চিন্তা না করে। ফলে, নিবেদিতার চরিত্র একইসঙ্গে একজন বিপ্লবীর, একজন ব্রহ্মচারিণীর এবং আবেগপ্রবণ নারীর। যে নারী এক নিমেষে সব ত্যাগ করে বাইরের ডাকে ঘর ছাড়তে পারেন। যে নারী অল্পেই কষ্ট পান, উত্তেজিত হন, আবার বড় অল্পেই তিনি সন্তুষ্ট, আনন্দিত।

নিবেদিতা যে কতখানি আবেগপ্রবণ ছিলেন, তা বিপিনচন্দ্র পালের নিবেদিতার স্মৃতিচারণায় বোঝা যায়। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, '১৯১০ সালে মিস নোবলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই একটি ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত, অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুণ উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ করি কোনও বৈরিভাব লেশমাত্র জাগে নাই।... সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিয়াই নিবেদিতার গোটা ছবিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে।

'আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, নিবেদিতা ইহা জানিতেন, আর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁহার একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার সুস্থচিত্তে কখনও কোনো মনোভাব ঢাকা থাকিত না। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তাঁহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে সোজাসুজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন— ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা, বিশেষত, মেয়েরা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িতেছেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছেন তো?

নিবেদিতা : হ্যাঁ।

আমি : মিসেস পি. কে. রায়কে চেনেন?

নিবেদিতা : চিনি। অমন মেয়ে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

আমি : মিসেস জে. সি. বোসকে চেনেন?

নিবেদিতা : মিসেস বোস রমণীর শিরোমণি।

আমি : এঁদের ছোট বোনকে জানেন?

নিদেবিতা : সি ইজ্ লাভলি।

আমি : শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়েকে দেখেছেন?— [মিসেস সরকার]

নিবেদিতা : হ্যাঁ দেখেছি। সি ইজ ভেরি গুড।

আমি : আপনি বোধহয় জানেন, এঁরা সকলেই ব্রাহ্ম মেয়ে।

'এইখানেই প্রথম পালা শেষ হইল। পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের উভয়ের সংগ্রামের তৃতীয় পালার অভিনয় হয়...

'সেদিন মিসেস বুল বোষ্টনের স্কুল সমূহের শিক্ষয়িত্রীদিগকে তাঁহার বাটীতে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই তিনশত শিক্ষয়িত্রী এই উপলক্ষে মিসেস বুলের বাড়িতে সমবেত হন।... নিবেদিতা অনেকগুলি শিক্ষয়িত্রীর নিকট ভারতবর্ষের কথা কহিতেছিলেন। আমি নীরবে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। ক্রমে জাতিভেদের কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার উপর তাঁহার চোখ পড়িল। আমাকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ঐ

মিঃ পাল বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানেন না এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি অপরিমিত নয়। মিঃ পালও জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্মের উপর তাঁহার আস্থা নাই।'

'তখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল। এ অবস্থায় আমার নীরব থাকা অসম্ভব হইয়া গেল।

'আমি কহিলাম— 'জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা ভুল ধারণা আছে। সেটা এই যে, এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না। এবং যতদিন এই জাতিভেদ উঠিয়া না যাইবে, ততদিন ভারতবর্ষের লোক এক জাতিতে পরিণত হইয়া আত্মশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। এই কথাটা নিতান্তই ভুল। জাতিভেদ থাকা বা না থাকার উপর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিছুতেই নির্ভর করে না। আমাদের দেশে জাতিভেদ আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রেণীভেদ সাঙ্ঘাতিক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রেণীভেদ থাকা সত্ত্বেও যেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোনো সাঙ্ঘাতিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই, সেইরূপ ভারতে জাতিভেদ আছে বলিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের কোনো অন্তরায় নাই। কিন্তু অন্যদিকে একথা মানিতেই হইবে যে, এই জাতিভেদ হিন্দু ভারতের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা অবাধে আমাদের মানুষ বলিয়া যে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না।

'নিবেদিতা অমনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'একথা ঠিক নহে। আপনি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করিতেছেন।'

'আমি কহিলাম— হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।...ইংরেজি শিক্ষা এই প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ পড়িতে পারিতেছি, বেদান্ত ধর্মের আলোচনা করিতে পারিতেছি এবং ধর্মপ্রচার করিতে পারিতেছি। প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম প্রচার করিবার অপরাধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমার কণ্ঠে চারি আঙুল পরিমাণ গরম গলানো সীসা ঢালিয়া দিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চার প্রায়শ্চিত্ত করাইত।

'নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন— 'মিথ্যা কথা। স্বামীজিকে হিন্দুরা ধর্মগুরুর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে।'

'আমি কহিলাম— মিস নোবেল, আপনি স্ত্রীলোক না হইলে এই অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদিগের ধর্মগুরু নহেন।

হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মতন একজন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক মাত্র।

'নিবেদিতার কোমলপ্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আমার কথায় তাঁহার গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।'

বিপিনচন্দ্র পালের এই লেখাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নিবেদিতা কতখানি আবেগপ্রবণ ছিলেন— তার প্রমাণ বিপিনচন্দ্রের এই স্মৃতিচারণটি। তিনি এতটাই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, দশজনের সামনে প্রকাশ্য আলোচনায় কেঁদে ফেলতে পারেন; নিজের আবেগ এবং অনুভূতিকে সংযত করতে পারেন না। ব্রহ্মচারিণীর থেকেও আবেগপ্রবণ কিশোরী রূপেই যেন ধরা দেন বেশি। বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিচারণে একটি বাক্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'নিবেদিতার সুস্থচিত্তে কখনও কোনো মনোভাব চাপা থাকিত না।' অর্থাৎ, বোঝাই যায় নিবেদিতা তাঁর আবেগটি প্রকাশ করে ফেলতেন। এতটাই আবেগপ্রবণ ছিলেন তিনি।

যাই হোক, রেক্সহ্যামে মার্গারেটের শিক্ষকতা জীবনের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাওয়া যাক। রেক্সহ্যাম সেকেন্ডারি স্কুলে মার্গারেট যখন শিক্ষকতার চাকরি পেলেন, তখন তাঁর বয়স একুশ। রেক্সহ্যাম জায়গাটি খনি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। শহরটার কোনো ছিরিছাঁদ নেই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাড়ি। শ্রমিক মহল্লা। ঘিঞ্জি, নোংরা। রাস্তাঘাট ধুলোমলিন, আবর্জনায় ভরা। দিনরাত খনির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নিম্নবিত্ত শ্রমিক পরিবারের লোকজনই বেশি। মার্গারেট কিন্তু এমন একটি শহরেই কাজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, শিক্ষকতার পাশাপাশি, নিম্নবিত্ত মানুষের ভেতরে থেকে তাদের মধ্যে সেবার কাজও চালাবেন। সেদিক দিয়ে রেক্সহ্যাম জায়গাটি বেশ পছন্দই হয়েছিল মার্গারেটের। এই বাসনা থেকেই ওখানকার সেন্ট মার্কস চার্চে চার্চকর্মী হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। শ্রমিক বস্তিতে ঘুরে ঘুরে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা, কারখানায় কর্মরত আসন্নপ্রসবা মেয়েদের খুঁজে বের করা, অনাথ শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা— এইসব কাজে মার্গারেট নিজেকে বেশ জড়িয়েও ফেলেছিলেন। কিন্তু লিজেল রেমঁও লিখেছেন, বেশিদিন চার্চের সঙ্গে তিনি থাকতে পারলেন না। মার্গারেট চাইতেন, সাহায্য দেওয়ার সময় বাছবিচার করলে চলবে না। গরিব এবং অসহায় মাত্রেই তাকে সাহায্যের জন্য চার্চকে এগিয়ে আসতে হবে। চার্চের মনোভাব কিন্তু তা ছিল না। চার্চ বাছবিচার করেই সাহায্য দিত। এ নিয়েই চার্চের সঙ্গে বিরোধ বাধল মার্গারেটের। তিনি চার্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। শুধু সরিয়েই নিলেন না, চার্চের সব কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিয়ে 'নর্থওয়েলস গার্ডিয়ান'-এ একটি চিঠি লিখিলেন। এক প্রতিবাদী মার্গারেট আত্মপ্রকাশ করলেন এবার।

এই চিঠি লেখার ভিতর দিয়েই কিন্তু মার্গারেটের ভিতরের আর একটি সত্তা প্রকাশ পেল। রেমঁ লিখছেন, মার্গারেট অল্পদিনেই বুঝতে পারলেন, কলমের জোরে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। মার্গারেটের এ উপলব্ধিও হল, শুধু সমাজ সেবা করে উনি দরিদ্রদের জন্য যতটা না সেবাকাজ করতে পারবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারবেন কলমের জোরে। ফলে, নানা ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন মার্গারেট। ক্রমে রেক্সহ্যামের দরিদ্র মানুষের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন তিনি। যাবতীয় অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদে তাঁর কলম মুখর হয়ে উঠল। এই যে প্রতিবাদী চরিত্র জন্ম নিয়েছিল রেক্সহ্যামে, আমৃত্যু সেই প্রতিবাদী চরিত্র থেকে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হননি নিবেদিতা।

এইসব লেখালেখির জন্য কিছু টাকাকড়িও আসতে শুরু করল। সেই টাকা দিয়ে অনাথদের জন্য একটি লঙ্গরখানা, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ভ্রাম্যমান পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলেন মার্গারেট। রেক্সহ্যামে সংস্কৃতি উন্নয়ন কেন্দ্র এবং স্টেডিয়াম তৈরির জন্য সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে লেখালেখি শুরু করলেন। মার্গারেট যেসব প্রবন্ধ লিখতেন, সেগুলির বেশির ভাগই ছিল সামাজিক নিবন্ধ। তবে, কখনও কখনও রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও প্রবন্ধ লিখতেন। বিভিন্ন পুরুষের ছদ্মনামে এই নিবন্ধগুলি লিখতেন উনি।

রেক্সহ্যামে এইরকম সমাজসেবার কাজে যখন নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছেন মার্গারেট, তখনই তাঁর জীবনে প্রথম প্রণয় এল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'কেসউইকে অবস্থানকালে তিনি অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে আগ্রহবোধ করিতেছিলেন, এমনকি মধ্যে মধ্যে কোনো কনভেন্টে যোগদান করিবার চিন্তাও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত; তথাপি সে আগ্রহ এত গভীর ছিল না যে দাম্পত্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা একেবারে নির্বাসিত হইয়াছিল।' তাঁর প্রথম প্রণয়ের ঘটনাটিই প্রমাণ করে মার্গারেটের মনেও অন্য আর-পাঁচটি যুবতীর মতো সুন্দর, সুখী একটি সংসারের স্বপ্ন ছিল। প্রথম প্রণয়টি ব্যর্থ হওয়ার পর যে কারণে, দ্বিতীয়বারও তিনি অপর একজনের সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মার্গারেটের জীবনের এই পর্বটি সম্পর্কে লিখেছেন, 'রেক্সহ্যামে শিক্ষকতার সহিত জনসেবার বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া মার্গারেট ক্রমশই নিজের শক্তির পরিচয় পাইতেছিলেন। নানারূপ সংগঠনমূলক কর্ম ও বিভিন্ন প্রবন্ধরচনার দ্বারা আত্মতৃপ্তির সহিত তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, বিস্তৃত কর্মের মাধ্যমেই তাঁহার সত্তার প্রকাশ ঘটিবে। এমন সময় ওয়েলসবাসী এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তখন পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনাদর্শ ছিল ধর্মজীবন-যাপনের সহিত জনসেবা। ইহার জন্য তিনি কোন অসাধারণ জীবনযাত্রার কল্পনা করেন নাই। সুতরাং সাধারণ নরনারীর ন্যায় সংসারজীবনের স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নহে। তাঁহার পিতামহ, পিতা এবং মাতামহ সকলেই

সংসারের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন না। ধর্ম এবং সেবারূপ কর্মের সমন্বয় তাঁহাদিগকে সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছিল। মার্গারেটের প্রাথমিক জীবনের মূলেও এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকাই ছিল স্বাভাবিক। এইরূপে আদর্শ বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বেড়াইলেও তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মনেপ্রাণে আদর্শবাদী। তাঁহার আদর্শপ্রবণ মন যতদিন পর্যন্ত পরমার্থকে খুঁজিয়া না পাইয়াছিল, ততদিনই সাধারণ নানা বিষয়ের মধ্যে পরিতৃপ্তির অনুসন্ধান করিয়াছিল। আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে তখন তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও উহা যে গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে, তাঁহার অবচেতন মনে তাহার আভাস ছিল। তাই পরবর্তীকালে যে মূহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি এক মহৎ আর্দশের স্বরূপ দেখিলেন, সেই মুহূর্তেই অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে আবার মার্গারেট ছিলেন অতিমাত্রায় আবেগময়ী। কোন ব্যক্তি অথবা বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিলে তিনি নিজের চিত্তকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। পরবর্তীকালেও তাঁহার চরিত্রে এই আবেগপ্রবণতা সর্বদাই দেখা গিয়াছে। তরুণ ওয়েলসবাসীর মধ্যে সম্ভবতঃ মার্গারেট এমন কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল, জীবনের লক্ষ্য পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইবার ইনি একজন উপযুক্ত সঙ্গী। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল না। পরস্পর বাগ্‌দত্ত হইবার পূর্বেই অতর্কিত রোগের আক্রমণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্গারেটের বন্ধু ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই মার্গারেট যখন ভাবী সুখময় জীবনের রঙিন কল্পনায় বিভোর, তখন সহসা এই কঠোর আঘাত তাঁহাকে নিদারুণ মর্মবেদনার সহিত জানাইয়া দিল যে, বাস্তবজীবন ও কল্পলোকের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান।' এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যদিও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'সাধারণ নরনারীর ন্যায় সংসারজীবনের স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নহে...' তবু, তিনি কিন্তু ওয়েলসবাসী এই ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মার্গারেটের প্রণয়পর্বটিকে অযথা অধ্যাত্মবাদের একটি আবরণই দিতে চেয়েছেন।

লিজেল রেমঁর লেখায় বরং মার্গারেটের এই প্রথম প্রণয় পর্বের একটি প্রাণবন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য যে, রেমঁ বা মুক্তিপ্রাণা কেউই মার্গারেটের এই প্রথম প্রেমিকটির নাম জানাতে পারেননি। ফলে, এঁর নাম অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে। রেমঁ জানিয়েছেন, রেক্সহ্যামে গরিবদের জন্য যখন সেখানকার অফিসপাড়ায় নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন মার্গারেট, তখন এক তরুণ ওয়েলসবাসীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, একটি কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। আলাপ ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় হয়। একটি ভালোবাসার সম্পর্কও গড়ে ওঠে দুজনের ভিতর। একদিন গির্জায় ওই ভদ্রলোক তাঁর

মায়ের সঙ্গে মার্গারেটের আলাপও করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা হাসিমুখে মার্গারেটকে তাঁদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন।

তারপর থেকে মার্গারেটকে প্রায়ই দেখা যেত ওই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটে। টুকটুক করে কড়া নেড়ে মার্গারেট ঢুকতেন ফ্ল্যাটে। তরুণ ইঞ্জিনিয়ারটি হয়তো তখন আরামকেদারায় বসে, পাইপ টানতে টানতে মার্গারেটেরই প্রতীক্ষা করছেন। ফিটফাট, ছিমছাম ঘরটি। দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করার পক্ষে উপযুক্ত। তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মা দুজনের জন্য চা নিয়ে আসেন। মার্গারেট ফায়ারপ্লেসে আগুনের সামনে বসে আখরোট পুড়িয়ে খান। ঘরোয়া পরিবেশটি বেশ উপভোগ করতেন মার্গারেট। মার্গারেট এটাও উপলব্ধি করতেন, ওঁদের দুজনেরই রুচি, চিন্তা-ভাবনা সব একই রকমের।

তরুণ ইঞ্জিনিয়ারটি মার্গারেটের আনা খবরের কাগজ উলটেপালটে দেখতেন। মার্গারেটের কোনো নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিতেন। কোনো নিবন্ধ প্রকাশ হলে তা নিয়ে দুজনে আলোচনাও করতেন। কোনো দিন ওঁরা শহর ছাড়িয়ে চলে যেতেন দূরে, গ্রামের দিকে। সারাদিন প্রকৃতির মাঝে কাটিয়ে আসতেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে দুজনের ভিতর সাময়িকভাবে ছাড়াছাড়ি হত; কিন্তু সে ছাড়াছাড়ি যেন দুজনকেই পরস্পরের প্রতি আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলত। বেশিদিন একে অপরকে ছেড়ে থাকতেও চাইতেন না। দুজনেই ঠিক করলেন, বিয়ে করে সুখে সংসার করবেন। দুজনের বাগ্‌দান পর্বের যখন সবকিছুই ঠিকঠাক তখন ওই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মারাত্মক ক্ষয়রোগ ধরা পড়ল। সেই রোগ সপ্তাহখানেকের ভিতরই মার্গারেটের থেকে চিরতরে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

অন্য আর-পাঁচটি মেয়ের মতোই এই শোককে সেই সময় সহ্য করা মার্গারেটের পক্ষে অসম্ভবই ছিল। তাঁর শুধুই মনে হচ্ছিল, রেক্সহ্যাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই। রেক্সহ্যামের সর্বত্র যেন ছড়িয়ে রয়েছে এই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের স্মৃতি। তা থেকে প্রাণপণে পালাতে চাইছিলেন মার্গারেট। বেশ কয়েকবার বদলির আবেদন করলেন। অবশেষে, রেক্সহ্যাম ছেড়ে চলে এলেন চেস্টারে।

ছয়

চেস্টার থেকেই মার্গারেটের জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। এই অধ্যায়টিও মার্গারেটের জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেসউইক বা রেক্সহ্যামে শিক্ষকতা করার সময় মার্গারেট শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে নিজের মতো করে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তবে, তা ছিল খুবই ক্ষুদ্র আকারে। স্থানীয়ভাবে তখন মার্গারেটের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে কিছু আলোচনা হলেও, ব্রিটিশ সমাজের চিন্তাশীল এবং বিদগ্ধ অংশে মার্গারেট তখনো ছিলেন অপরিচিত। তাঁর শিক্ষাভাবনার সঙ্গে তখনো পরিচিত হয়নি ব্রিটিশ সমাজ। চেস্টারে আসার পরই মার্গারেট শিক্ষা সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন, এবং তার বাস্তব প্রয়োগের কথাটা ভাবেন। শিক্ষা সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এই সময়েই তাঁকে পরিচিত করে তুলতে থাকে বিদগ্ধ চিন্তাশীল ব্রিটিশ সমাজে। ক্রমে ব্রিটিশ সমাজের বিশিষ্ট মহলে শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর পরিচিতি গড়ে ওঠে এবং বিশিষ্ট মহলে তাঁর একটি স্থানও হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, লেডি মার্গেসনের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা শুনতে যাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল— তাঁরা ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই বিশিষ্টদের ভিতর মার্গারেট না পড়লে তাঁকে লেডি মার্গেসনের বাড়ির ওই সম্ভ্রান্ত আলোচনাচক্রে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হত না। শিক্ষাব্রতী হিসাবে সমাজে এই সম্মানজনক স্থানটি অধিকার করার পরই মার্গারেট আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন সিসেম ক্লাব। ওই ক্লাবটি ছিল সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ সমাজের একটি প্রতীক। লর্ড জর্জ রিপনের স্ত্রী লেডি রিপন, লেডি ইসাবেল মার্গেসন এবং শ্রীমতী অ্যাশটন জনসনের সঙ্গে মিলিত হয়ে মার্গারেট ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ক্লাব। ১৮৯৬ সালের ১২ মে স্বামীজি এই ক্লাবে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। অর্থাৎ, চেস্টার থেকে মার্গারেটের জীবনের যে পর্ব শুরু হয়েছিল, সেই পর্বেই তিনি সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

চেস্টারে আসার পর প্রথমদিকে মার্গারেটের কিন্তু খুব নিঃসঙ্গ কেটেছে। এই নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য মার্গারেট আবার নতুন করে পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে একাকিত্ব দূর করতে মা-ভাই-বোনদের আবার কাছে পাওয়ার একটা তীব্র বাসনা দেখা দিল মার্গারেটের মনে। মার্গারেট ঠিক করলেন, মা-কে আর চাকরি করতে দেবেন না। তাঁকে কাছে এনে রাখবেন। মার্গারেটের বোন মেরিও তখন একবছরের বেশি চাকরি করছেন। বোনের সাহায্য পাওয়া যাবে বলেও আশা করলেন মার্গারেট। অবশেষে অনেক চিঠি লেখালেখি করে মা-কে রাজি করিয়ে নিয়ে এলেন। মাস তিনেকের ভিতরই আয়ারল্যান্ড থেকে মার্গারেটের মা মেরি লিভারপুলে চলে এলেন ছোট মেয়ের কাছে। বোন মেরি তখন লিভারপুলেই চাকরি করতেন। আর মার্গারেটের ভাই রিচমন্ড পড়তেন লিভারপুল কলেজে। চেস্টার থেকে লিভারপুলের দূরত্ব এমন কিছু নয়। মাত্র বারো মাইল। ইচ্ছে হলেই পরিবারের সবাই একত্রিত হতে পারতেন। এতদিন পর কাছাকাছি এসে সবাই বেশ খুশিই হলেন।

মার্গারেটের জীবনীকাররা লিখেছেন, শিক্ষকতা জীবনের চারটি বছর কাটিয়ে দেওয়ার পর আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি এই সময়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। এই সময়েই মার্গারেট পেস্তালোৎসি এবং ফ্রোবেলের কথা জানতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইৎজারল্যাণ্ডে পেস্তালোৎসি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে ফ্রোবেল শিশু-মনস্তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। বলতে গেলে, বিশ্বে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এঁরাই ছিলেন পথিকৃৎ। এঁদের বিভিন্ন রচনা পড়ে এবং এঁদের ব্যাখ্যা অনুধাবন করার পর মার্গারেটের কাছে শিক্ষাচিন্তার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেল। মার্গারেট অনুধাবন করলেন যে, এর আগে একটু বড় বয়সের ছাত্রীদের ভিতর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের যে প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছিলেন, তা একমাত্র সফল হতে পারে তখনই, যদি ছোট অবস্থাতেই ছাত্রছাত্রীদের ভিতর তা চালু করা যায়। এই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেন এমন আরও সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খোঁজে এবার উঠে পড়ে লাগলেন মার্গারেট। যাঁরা নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করছেন, তাঁদের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি শুরু করলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের চিন্তা-ভাবনাকে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। মার্গারেটের সমীক্ষার বিষয় ছিল শিশুর বাল্যজীবন। একটি শিশুর মনের দ্বন্দ্ব কী, বাড়িতে বা স্কুলে তার ঝোঁক কোনদিকে, কোন বিষয়ে সে সাবলীল— এইগুলি লক্ষ করে মার্গারেট শিশু মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতেন। এইসময়েই আধুনিক শিক্ষাপ্রসারে আগ্রহী কয়েকজনকে মার্গারেট খুঁজে পেলেন। প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীলদের ভয়ে তাঁরা তখন লিভারপুলে খুব সঙ্গোপনে এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

প্রয়োগ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মার্গারেটের দুই জীবনীকার, লিজেল রেমঁ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা জানাচ্ছেন, এইসময়ে মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ হয় লজম্যানদের। এই লজম্যান কারা, কী তাঁদের পরিচয় তা অবশ্য রেমঁ বা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বিশদে কিছুই জানাননি। তবে আন্দাজ করা যায় লজম্যানরা ছিলেন কোনো বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্য। এই লজম্যানদের মাধ্যমেই মার্গারেটের আলাপ হয়েছিল মিসেস ডি-লিউয়ের সঙ্গে। ডি-লিউ ছিলেন জাতিতে ডাচ। ছিলেন ফ্রোবেলের শিষ্যা।

এই লজম্যান পরিবারও নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। নিজেদের ছোট্ট ফ্ল্যাটেই তাঁরা একটি স্কুল খুলে বসেছিলেন। সেখানে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তাঁরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। মার্গারেট মাঝে-মাঝে যেতেন সেখানে; ফ্রোবেল পদ্ধতি কতখানি কার্যকর তা শিশুদের ভিতর পরখ করে দেখতেন। এই লজম্যান পরিবারের সঙ্গে মার্গারেট যে শুধু শিক্ষাপদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করতেন তা নয়, ঘনিষ্ঠতা এতটাই গড়ে উঠেছিল যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখও এঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন মার্গারেট। এই লজম্যানদের মাধ্যমেই মার্গারেট যুক্ত হলেন 'গুড সানডে ক্লাব'-এর সঙ্গে। এই ক্লাবটি ছিল একটি বৌদ্ধিক চর্চার কেন্দ্র। এখানে লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হতেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় হত। কারো কোনো অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে কখনও কখনও আলোচনাও হত। মার্গারেট এবং মে দুজনেই এই ক্লাবের আসরে যোগ দিতেন। মার্গারেটের বাড়ি থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে গুড সানডে ক্লাবে যেতে হত। দুই বোন হাত ধরাধরি করে, সারাটা পথ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ক্লাবে পৌঁছে যেতেন। এতে ওঁদের বাস ভাড়াটা বাঁচত। সেই টাকা বাঁচিয়ে পরে ওঁরা একটা জমজমাট সাহিত্য বাসর বসাতেন। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে সাহিত্য আলোচনা হত।

মার্গারেটের জীবনের এই পর্বটি দেখলে কিন্তু মনে হয় এই সময়টায় তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে এবং সাহিত্যচর্চাতেই বেশি আগ্রহী এবং ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় অধ্যাত্মচিন্তায় মার্গারেটের কৌতূহলের তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে যখন তিনি ভারতে এসেছিলেন, তখনও অধ্যাত্মবাদ প্রচার করার পরিবর্তে শিক্ষাবিস্তার এবং রাজনীতির কাজেই তাঁর বেশি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। অধ্যাত্মবাদ কোনোদিনই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠেনি।

এই সময়ের একটি বিস্তৃত বিবরণ লিজেল রেমঁর লেখায় পাওয়া যায়। এই সময় গুড সানডে ক্লাবের তরুণ সদস্যদের উৎসাহে মার্গারেট আবার নতুন করে লেখালেখি শুরু করলেন। তাঁদের পরিবারের স্মরণীয় ঘটনাগুলিই এই সময় লিখে রাখতে শুরু করলেন মার্গারেট। তাঁর পিতা-পিতামহের স্বদেশ প্রেম, আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের

দাবিতে আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা এগুলিই লিখতেন। নোবল, নিলাস, হ্যামিলটন আর মারডক পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের কথা মনে করতে গিয়ে উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। এই সময়ে মার্গারেটকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল স্বদেশচেতনা। তাঁর লেখাগুলিতে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। এই লেখাগুলির মাধ্যমেই পরিবারের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন তিনি। এই লেখাগুলি মার্গারেট লিখতেন এলিজাবেথ নিলাস নাম দিয়ে। গুড সানডে ক্লাবের সদস্যদের সামনে এই লেখাগুলি তিনি পাঠ করতেন।

এভাবেই দুটো বছর কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে কোনো অধ্যাত্ম ভাবনায় মার্গারেটের মন তোলপাড় হয়েছিল এমন প্রমাণ কিন্তু তাঁর জীবনীতে অন্তত মেলে না। এই সময়েই একদিন মিসেস ডি-লিউয়ের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব পেলেন মার্গারেট। উইম্বলডনে মিসেস ডি-লিউ একটি স্কুল খুলতে চলেছেন। সেই স্কুলে মার্গারেটকেও যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। মার্গারেটও একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন। দেখলেন মিসেস লিউয়ের স্কুলে যোগ দিলে যে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালাতে চান তা আরও সহজ হবে তাঁর কাছে। আরও বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন। এই প্রস্তাবে মার্গারেট রাজি হয়ে গেলেন। মিসেস ডি-লিউ আগে চলে গেলেন উইম্বলডনে। মার্গারেট চেস্টারে তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ করে কিছুদিন পরে এসে যোগ দিলেন মিসেস ডি-লিউয়ের সঙ্গে উইম্বলডনে। পরিবারের অন্য সদস্যরাও মার্গারেটের সঙ্গে উইম্বলডনে চলে এলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা জানাচ্ছেন, ১৮৯০ সনে মার্গারেট উইম্বলডনের এই স্কুলটিতে যোগ দিয়েছিলেন।

উইম্বলডনে শিক্ষকতার সময়েই কিন্তু মার্গারেটের একটি রাজনৈতিক পরিচয়ও গড়ে ওঠে। বিভিন্ন লেখায় এবং আলোচনা সভায় তিনি যেসব বক্তব্য রাখতেন, তাতে ওঁকে পরিচিত মহলে সবাই আইরিশ জাতীয়তাবাদী হিসাবেই মনে করতেন। মার্গারেটের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মার্গারেটও এই পরিচয়ে পরিচিত হতে অখুশি বোধ করতেন না। বরং, তিনি যে আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক বড় সমর্থক সেটিই তিনি প্রকাশ করতেন তাঁর বক্তব্য এবং লেখায়। জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ পরেও দেখা গিয়েছে, যখন তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে জড়িত করেছেন।

মিসেস ডি-লিউয়ের এই স্কুলে এসে মার্গারেট শিশুদের ভিতর আধুনিক শিক্ষা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। কার কোন দিকে ঝোঁক— সেই শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝেই মার্গারেট ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি করতে থাকেন। আর এই পরীক্ষার বেশ সুফলও পেতে থাকেন তিনি। এরই পাশাপাশি লন্ডনের আধুনিক শিক্ষা

সমিতির সঙ্গে একটি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন মার্গারেট। সমিতির সম্মেলনগুলিতে নিয়মিত বক্তাও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শিশুশিক্ষা বিষয়ে মার্গারেট সে সময়ে যা বক্তব্য রাখতেন, আজ এতদিন পরেও সেইসব বক্তব্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। মার্গারেটের বক্তব্য ছিল, শিশুদের ক্ষতি হয় মূলত দুটি কারণে: প্রথমত— বাবা-মা নিজের ইচ্ছাকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে সেভাবে মানুষ করতে চান। দ্বিতীয়ত— স্কুলের শিক্ষক শিশুর ঝোঁক কোনদিকে না বুঝে তাঁর ওপর পাঠ্যসূচি জোর করে চাপিয়ে দেন। মনে রাখতে হবে, সেই সময় ইংল্যান্ডেও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার এতটা প্রচলন ছিল না। অথচ সেই সময়েই মার্গারেট কিন্তু শিক্ষার আধুনিকীকরণ নিয়ে এত সুদূরপ্রসারী চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

এই সময়ে মার্গারেটের পারিবারিক জীবনের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন লিজেল রেমঁ। উইম্বলডনে এসে মার্গারেট এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা উঠেছিলেন ২১ এ উইম্বলডন হাই স্ট্রিট—এই ঠিকানার বাড়িতে। স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী সময়ে, ১৮৯৯ সনে, যখন লন্ডনে এসেছিলেন, তখন এই বাড়িতে আসতেন নোব্‌ল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে। এই ফ্ল্যাটেরই একটি ঘর মার্গারেট নিজের থাকার জন্য মনের মতো করে সাজিয়েওছিলেন। জানলার ধারে ছিল তাঁর লেখার ডেস্ক। তার পাশেই ছিল নানা বিষয়ের ওপর তাঁর সংগ্রহ করা বইপত্র। এই ঘরেই বসেই মার্গারেট পড়াশোনা এবং লেখালেখির কাজ করতেন। অবসর সময়ে ভাই রিচমন্ডকে সঙ্গী করে লন্ডন শহরে চক্কর কাটতে বেরোতেন মার্গারেট। রিচমন্ড তাঁর দিদিকে 'ভাবপ্রবণ' বলে খোঁচা দিতেন। মাঝে মাঝে দিদির সঙ্গে লন্ডনের বিখ্যাত সব থিয়েটার হলে নাটক দেখতেও যেতেন। বলতে গেলে, মার্গারেটের কল্যাণে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই শেক্সপিয়রের বহু নাটকের অংশবিশেষ রিচমন্ডের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মার্গারেটকে 'আবেগপ্রবণ' বলে রিচমন্ড যে খোঁচা দিতেন, বাস্তবিক মার্গারেট আবেগপ্রবণই ছিলেন। এমনকী পরবর্তী জীবনে মার্গারেট থেকে নিবেদিতাতে উত্তরণ ঘটার পরও সেই আবেগ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। বরং কখনো কখনো তাঁর কথায় এবং কাজে বেশ করুণরসাশ্রিত আবেগ ফুটে উঠত।

এই সময়ে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল মার্গারেটের। তাঁদের আসরের মধ্যমণিও তিনি হয়ে উঠেছিলেন। সিসেম ক্লাবের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। লেডি রিপন, ইসাবেলা মার্গেসন, অ্যাশটন জনসন এবং মার্গারেট এই চারজন ছিলেন এই ক্লাবের মূল স্থপতি। ইংল্যান্ডের প্রথম মিক্সড ক্লাব ছিল এটি। বার্নার্ড শ-এর মতো বাগ্মী এখানে চা-চক্রে যোগ দিতে আসতেন। এই সময়েই বিটি পরিবারের দুই তরুণের সঙ্গে মার্গারেটের দারুণ বন্ধুত্ব হয়। স্কুলের অবসর পেলেই মার্গারেট মাঝে মাঝেই এই দুই তরুণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন।

এই দুই তরুণের ভিতর যিনি বড়, মার্গারেট তাঁকে 'কবি' বলে ডাকতেন। ওই সময় টমাস হার্ডি 'জুড অব দ্য অবস্কিওর' লিখে ফেলেছেন। তা নিয়ে তুমুল সমালোচনা এবং বিতর্ক শুরু হয়েছে চারিদিকে। তবু টমাস হার্ডি খ্যাতির তুঙ্গে। তাঁকে ঘিরে অনুরাগীদের ভিড়ও কিছু কম নয়। হার্ডিকে কেন্দ্র করে জনাকয়েক তরুণ ঔপন্যাসিকের একটি দলও গড়ে উঠেছে। মার্গারেটের বন্ধু 'কবি' সেই তরুণ ঔপন্যাসিকদের দলে মার্গারেটকে মধ্যমণি করে তুললেন। পরবর্তী কালে মার্গারেটের ভাই রিচমন্ড নোব্‌লও লিখেছেন,'অল্পবয়সে মার্গারেটের বিদগ্ধ সমাজের প্রতি একটি অনুরাগ এবং আকর্ষণ ছিল। যেখানে যেতেন, সেখানেই একটা-না-একটা সাহিত্য আসর জমে উঠত ওঁকে ঘিরে।' বিটিভাইদের ভিতর যিনি ছোট, সেই অক্টাভিয়াস ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। উইম্বলডন নিউজের সম্পাদক। পত্রিকাটি কার্যত ছিল ইংল্যান্ডে বসবাসকারী আইরিশ সমাজের মুখপত্র। ওই পত্রিকায় অক্টাভিয়াস বুয়র-যুদ্ধ সংক্রান্ত মার্গারেটের বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া 'ডেলি নিউজ' এবং 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকাতেও মার্গারেট রাজনীতি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখতেন। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'রিসার্চ'-এও মার্গারেটের প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এই সময়েই আরও সক্রিয়ভাবে মার্গারেট রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। 'ফ্রি আয়ারল্যান্ড' নামে একটি সংগঠনেও যোগ দেন তিনি। এই সংগঠনটি তখন আয়ারল্যান্ডে হোমরুলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই সংগঠনের হয়ে আয়ারল্যান্ডে হোমরুলের দাবিতে মার্গারেট প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেন্দ্র গড়ে তুলতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় মার্গারেটের জীবনের এই ঘটনাগুলি অনুপস্থিত। এই ঘটনাগুলি বিস্তারিত পাওয়া যায় রেমঁর লেখায়। অথচ, এই ঘটনাগুলি সবিশেষ অবগত হওয়া দরকার এই কারণেই যে, বিপ্লববাদের প্রতি মার্গারেটের যে একটি সহজাত আকর্ষণ ছিলই এবং ভারতে আসার আগেই তিনি যে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন এইসব ঘটনা তারই প্রমাণ। সেই সঙ্গে এটুকু অনুমান করতেও অসুবিধা হয় না যে, ভারতে আসার আগেই মার্গারেটের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়েছিল। এইরকম অনুমান করার এটাই কারণ যে, ওই সময়ে যাঁরাই আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের ওপরই ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল। তদুপরি, মার্গারেট প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বক্তব্য রাখতেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন, ফ্রি আয়ারল্যান্ড নামক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ফলে, তাঁর ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নজর থাকাটাই স্বাভাবিক। মার্গারেটের জীবনের এই সময়ের ঘটনাবলী থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে,

১৮৯৫ সালে বিবেকানন্দ লন্ডনে আসার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত অধ্যাত্মবাদের বদলে রাজনৈতিক মতবাদই মার্গারেটকে বেশি আকৃষ্ট করে রেখেছিল। তাঁর স্কুল জীবনে অধ্যাত্মবাদের প্রতি মার্গারেটের কিছুটা আগ্রহ থাকলেও, জীবনের এই পর্বে হয়তো অধ্যাত্মবাদের প্রতি তিনি সেভাবে আগ্রহ বোধ করেননি।

ফ্রি আয়ারল্যান্ড নামক সংগঠনের হয়ে মার্গারেট যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন সেই সময়েই একদিন প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন এলেন এই সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে। পিটার ক্রপটকিন ছিলেন রাশিয়ার নামকরা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা। স্বল্পভাষী, নম্র স্বভাব, নির্লিপ্ত গোছের মানুষ। দীর্ঘদিন কারান্তরালে কাটিয়েছেন। ভূগোল এবং জীববিদ্যায় তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন। তখন সর্বত্র ক্রপটকিনের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বিপ্লবীদের ওপর অসম্ভব প্রভাব তাঁর। বিপ্লবীরা নির্বিবাদে তাঁকে মেনে চলতেন। তিনি যে সমস্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করতেন তা মানতে হত বিপ্লবীদের। মার্গারেটের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে দেখা করার। পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর মার্গারেট তাঁর ভিতর যেন নিজের বাবাকেই খুঁজে পেলেন। ক্রপটকিনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আরো বেশি করে বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন মার্গারেট। আরো বেশি করে যেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লেন। ক্রপটকিন থাকতেন ইলিংয়ে। ইলিং তখন লন্ডন শহরতলির একটি শিল্পাঞ্চল। ওখানে একটি ঝোপঝাড়পূর্ণ বাগানের ভিতর পুরোনো একটা বাড়িতে ক্রপটকিন সস্ত্রীক থাকতেন। খাবার ঘরে অয়েলক্লথ মোড়া একটি টেবিলই ছিল ক্রপটকিনের কাজের ডেস্ক। ওই টেবিলে বসেই যাবতীয় কাজকর্ম সারতেন ক্রপটকিন। আলাপ হওয়ার পর মার্গারেট মাঝেমধ্যেই যাতায়াত শুরু করলেন ক্রপটকিনের বাড়িতে। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও করতেন তাঁর সঙ্গে।

বিবেকানন্দ যে বছর স্টার্ডি এবং মিস মুলারের আমন্ত্রণে লন্ডনে আসছেন, সেই ১৮৯৫-এর শীতে ইংল্যান্ড পড়ল কঠিন অর্থনৈতিক সংকটে। শ'য়ে শ'য়ে কারখানা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার। জীবন-জীবিকার দাবি নিয়ে শ্রমিকরা তখন রাস্তায় নেমেছেন। আন্দোলনরত শ্রমিকরা তখন ক্রপটকিনকে নেতৃত্ব দিতে বলছেন। অন্যদিকে মালিক-পুঁজিপতিরাও ক্রপটকিনের শরণাপন্ন। তারা ক্রপটকিনকেই মধ্যস্থতা করতে বলছেন। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ক্রপটকিন তখন লড়ে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, তখনও রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন নামটি তখনও বিশ্ববাসী জানেন না। কিন্তু ওই সময়ই ক্রপটকিন মার্গারেটসহ তাঁর অনুগামীদের বলছেন, 'রাশিয়া তোমাদের কাছে ভবিষ্যতে গবেষণার বস্তু হবে।' ক্রপটকিনের এই কথাগুলি নিয়ে মার্গারেট তাঁর আইরিশ বন্ধুদের সঙ্গে

আলোচনা করেছেন। ক্রপটকিন হয়ে উঠেছেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। পুরোদস্তুর রাজনৈতিক জীবন তখন মার্গারেটের। মনে রাখতে হবে সালটা ১৮৯৫। আর কিছুদিনের মধ্যেই বিবেকানন্দ পা রাখবেন ইংল্যান্ডের মাটিতে।

১৮৯৫ সালের ১৭ আগস্ট স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবারের জন্য ইংল্যান্ডে পা রাখেন। এই বছরই ১০ নভেম্বর ইসাবেল মার্গেসনের বাড়িতে বক্তব্য রাখেন স্বামীজি। এখানেই স্বামীজিকে প্রথম দেখেন মার্গারেট। এই বছরই ইংল্যান্ডে আর্থিক সংকট। দেশ উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনে। মার্গারেটও তখন এইসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন। রেমঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, এই বছরের শেষাশেষি মিসেস ডি-লিউয়ের স্কুলটি ছেড়ে নিজেই একটি স্কুল খুললেন মার্গারেট। স্কুলটির নাম রাস্কিন স্কুল। এটি শুধু শিশুদের স্কুল হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যাঁরা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে চান— তাঁদের গবেষণার ব্যবস্থাও রাখা হল এই স্কুলে। ইতিমধ্যে অবশ্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে মার্গারেটের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাঁর স্কুলটিও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে নাম করে গেল। এই স্কুল চালানোর ব্যাপারে নামকরা বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সহায়তাও পেয়েছিলেন মার্গারেট। এঁদের ভিতর অন্যতম অ্যাভেনজার কুক। কুক ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। যথেষ্ট নামডাক ছিল তাঁর। এই কুকের সঙ্গে মার্গারেটের একটি দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল, যে সম্পর্ক মার্গারেট ভারতে চলে আসার পরেও স্থায়ী ছিল। কুকের কাছ থেকেই চিত্রকলা সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছিলেন মার্গারেট। পরবর্তীকালে যে কারণে ভারতীয় চিত্রকলার মর্ম বোঝা এবং তা নিয়ে আলোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মার্গারেটের জীবনের এই যে পর্বখানি, উইম্বলডনে চলে আসার পর যখন সাহিত্য এবং রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছেন, বিদগ্ধ মহলে তাঁর একটি পরিচিতি গড়ে উঠছে, বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন, প্রবন্ধ লিখছেন, সিসেম ক্লাবের মতো একটি সম্ভ্রান্ত ক্লাব প্রতিষ্ঠা করছেন— ঠিক তখনই তাঁর জীবনে দ্বিতীয় প্রণয়ের ঘটনাটি ঘটে। এ-সম্পর্কে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় একটি কথাও নেই। তবে রেমঁর লেখায় মার্গারেটের এই দ্বিতীয় প্রণয়টি সম্পর্কে কিছু জানা যায়।

মার্গারেটের এই দ্বিতীয় প্রণয়ের সূত্রপাত সিসেম ক্লাবেই। অ্যাভেনজার কুকের মাধ্যমে মার্গারেটের আলাপ হয়েছিল লেডি রিপনের সঙ্গে। লেডি রিপনের সালোঁতে মার্গারেট যাতায়াত শুরু করেছিলেন। সেখানে নিয়মিত শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। প্রথম প্রথম আসরটি ছিল ছোট। ওই আসরেই উপস্থিত থাকতেন 'সেন্ট জেমস গেজেট'-এ সম্পাদক আর ম্যাকলিন। ম্যাকলিন এবং মার্গারেটের চেষ্টাতেই এই আসরটি পরে সিসেম ক্লাবে পরিণত হয়। এই সিসেম ক্লাবে নানাবিধ বিতর্ক সভা

বসত। এই বিতর্ক সভাগুলিতে মার্গারেটকে সাহায্য করতেন ম্যাকলিন। তবে ম্যাকলিন ছিলেন ইউনিয়নিস্ট। রাজনীতির দিক দিয়ে মার্গারেটের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। আর, আগেই বলা হয়েছে, মার্গারেট সে সময়ে ছিলেন আইরিশ জাতীয়তাবাদের উগ্র সমর্থক। আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ফলে, মাঝেমধ্যে ম্যাকলিন এবং মার্গারেটের ভিতর তুমুল তর্ক বেধে যেত। উত্তেজিত হয়ে দুজনেই তর্কাতর্কি করতেন। কিন্তু সে তর্ক ছিল সম্পূর্ণই আদর্শগত কারণে, তার ভিতর কোথাও কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। পরে, দুজনেই এই নিয়ে নিজেদের ভিতর তুমুল হাসাহাসি করতেন।

এই ম্যাকনিলকেই মার্গারেট ভালোবেসেছিলেন কিনা তার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত রেমঁর লেখায় নেই; তবে, এই সময়েই যে মার্গারেট আর-একটি প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন—তা স্পষ্ট বলেছেন রেমঁ। রেমঁর ইঙ্গিতটি অবশ্য ম্যাকনিলের প্রতিই। রেমঁ লিখেছেন, মার্গারেটের এই দ্বিতীয় প্রণয়টি দেড় বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রথম প্রথম খুব সন্তর্পণেই এগিয়েছিলেন মার্গারেট। কারণ, প্রথম প্রণয়ের স্মৃতিটি তাঁর কাছে ছিল বড়ই দুঃখজনক। পরে অবশ্য তুমুল ভালোবাসায় ভেসেছিলেন। এই মনের মানুষটির সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্নও দেখেছিলেন। নিজের একটি সাজানো, ছোটখাটো সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখতেন মার্গারেট এই সময়ে। রেমঁর লেখায় মার্গারেটের জীবনের এই অংশটুকুর বর্ণনা পড়লে আর-পাঁচজন সুন্দরী, আবেগপ্রবণ যুবতীর থেকে তাঁকে পৃথক করা যায় না। এ-ও মনে হয়, যে যুবতী তখন সুখে সংসার পাতবার কথা ভাবছেন, তাঁকে, আর যা-ই হোক, সে সময় নিশ্চয়ই ঈশ্বর বা অধ্যাত্মচিন্তা তাড়িত করছিল না। বরং, জাগতিক চিন্তাতেই তিনি তখন আচ্ছন্ন।

মার্গারেটের এই প্রণয়পর্বের কথা তাঁর পরিবারের সদস্যরাও জেনেছিলেন। মেয়ে বিয়ে করে সংসার পাততে চলেছে এই সংবাদে মার্গারেটের মা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময়ই দ্বিতীয়বারের জন্য আকস্মিক আঘাত নেমে এসেছিল মার্গারেটের জীবনে। মার্গারেটের মনের মানুষটিকে বিয়ে করার দাবি নিয়ে আর এক নারী এগিয়ে এলেন। এই ঘটনায় মার্গারেট ভিতরে ভিতরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ততদিনে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সমাজে যথেষ্ট নামডাক তাঁর। কাজেই, মনে মনে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লেও তা প্রকাশ হতে দিলেন না। নীরবে, নিজের ভালোবাসার মানুষটির জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। সরিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু অন্তর শান্ত হল না। দু-দুবার সুখের সংসার গড়তে চেয়েও বিফল হলেন— এই শোক ক্রমশ তাঁকে বিষণ্ণ, একাকী করে তুলল। অন্তরের যন্ত্রণা কাউকে খুলেও বলতে পারলেন না। নিজের ভিতর এই দুঃখের বোঝা নীরবে বয়ে চলা তাঁর অসহনীয় মনে হতে থাকল। ভাবলেন, কারোর

সঙ্গে যদি নিজের এই দুঃখকে ভাগ করে কিছুটা হালকা হওয়া যেত। এই সময়ই তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে সেই প্রিয় শিক্ষয়িত্রী মিস কলিন্সের কথা। মিস কলিন্সের কঠোর ব্রহ্মচারিণীর পোশাকের আড়ালে লুকোনো রয়েছে যে এক কোমল হৃদয় নারী, তা মার্গারেট অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তাঁর মনে হল, এই দুঃখের দিনে মিস কলিন্সই হতে পারেন তাঁর একমাত্র আশ্রয়। মিস কলিন্সের কাছেই তিনি উজাড় করে দিতে পারেন তাঁর যাবতীয় দুঃখ। মার্গারেট চলে গেলেন হ্যালিফ্যাক্সে। প্রিয় এই ছাত্রীটির গভীর মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে পারলেন মিস কলিন্স। মিস কলিন্সের বুকে মাথা রেখে কাঁদলেন মার্গারেট। নিজের দুঃখ, নিজের ক্ষোভ সবটুকুই মিস কলিন্সের কাছে উজাড় করে দিলেন। পুরো এক সপ্তাহ মিস কলিন্স তাঁর কাছে রাখলেন মার্গারেটকে। ধীরে ধীরে শান্ত করে তুললেন ওঁকে। শোক একটু সামলে মার্গারেট ফিরে এলেন লন্ডনে। আর এরপরই শুরু হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি। এই পর্বেই তাঁর জীবনের অভিমুখটি পুরোপুরি বদলে গেল।

মার্গারেটের জীবনের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশের আগে আমরা দেখে নিই, ব্রিটিশ সেনসাস দপ্তর মার্গারেট নোব্‌ল সম্পর্কে কতটুকু তথ্য দিয়েছে। ব্রিটিশ সেনসাস দপ্তরের ১৮৭১ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ওই সময় মার্গারেটের পিতামাতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল এবং মেরি ইসাবেলা ল্যাঙ্কাশায়ার স্ট্রিটফোর্ডে ৬ গ্রেনহ্যাম গ্রোভ ঠিকানায় থাকতেন [RG 10/3972–117–49]। এই রিপোর্টে কিন্তু মার্গারেটের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, যখন এই জনগণনার কাজ হয়েছিল, তখন মার্গারেট তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে ইংল্যান্ডে ছিলেন না। তিনি আয়ারল্যান্ডেই ছিলেন।

১৮৮১ সালের সেনসাস রিপোর্টে অবশ্য মার্গারেটের উল্লেখ আছে। ওই সময়ে মার্গারেটের বাবা স্যামুয়েল প্রয়াত হয়েছেন। ১৮৮১-র সেনসাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্গারেট তখন ১৩ বছরের এক পিতৃহীন কিশোরী। ইয়র্কশায়ারের ক্রসলে হোম এবং অনাথদের স্কুলে পড়াশোনা করে। এই স্কুলটির ঠিকানা সাভিলে পার্ক, স্কারকোট, ইয়র্কশায়ার। সেনসাস রিপোর্টের নম্বর—RG11/4408–103–3. এই স্কুলটিকেই মার্গারেটের জীবনীকারেরা হ্যালিফ্যাক্স স্কুল বলে উল্লেখ করেছেন।

মার্গারেট সম্পর্কে ব্রিটিশ সেনসাস রিপোর্টে শেষবারের মতো উল্লেখ দেখা যায় ১৯০১ সালে। ওই সেনসাস রিপোর্টে তাঁকে ২১ উইম্বলডন হাই স্ট্রিটের বাসিন্দা হিসাবে দেখানো হয়েছে [RG 12/605–56–71]। যদিও মার্গারেট ততদিনে নিবেদিতা হয়েছেন। ভারতে চলে এসেছেন। তবে, ভারতে এলেও মাঝে মধ্যে ইংল্যান্ডে যাতায়াত ছিল তাঁর। ১৯০১ সালে জনগণনা চলার সময় মার্গারেট এই বাড়িতে

ছিলেন। উইম্বলডনে যখন মিসেস ডি-লিউয়ের স্কুলে যোগ দিতে আসেন মার্গারেট, তখন নোব্‌ল পরিবার এই বাড়িতেই এসে উঠেছিল। দীর্ঘদিন এই বাড়িটিই ছিল নোব্‌ল পরিবারের ঠিকানা।

এছাড়া, লন্ডনের প্রিন্সিপাল প্রোবেট রেজিস্ট্রিতে মার্গারেটের পিতা-মাতার নাম দুবার উল্লেখিত হয়েছে। প্রিন্সিপাল প্রোবেট রেজিস্ট্রির তথ্য অনুযায়ী ১৮৭৭-এর ১৬ আগস্ট টরেন্টনের বাসিন্দা রেভারেন্ড স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সম্পত্তির (৬০০ পাউন্ড অর্থমূল্য) অধিকারিণী হয়েছেন তাঁর বিধবা পত্নী মেরি ইসাবেলা নোব্‌ল। প্রোবেট রেজিস্ট্রির আর-একটি তথ্যে জানা গেছে, ১৯০৯ সালের ২৬ জানুয়ারি মেরি ইসাবেলা নোব্‌ল প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সম্পত্তির (২৭০ পাউন্ড অর্থমূল্য) অধিকারী হয়েছেন আইরিশ এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের আধিকারিক স্যামুয়েল রিচমন্ড হোয়ে নোব্‌ল। এই রিচমন্ড মেরির পুত্র।

এবার আমরা প্রবেশ করি মার্গারেটের জীবনের দ্বিতীয় পর্বে।

সাত

১৮৯৩ সালের ৩০ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় এসে পৌঁছোন। উদ্দেশ্য বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেওয়া। কিন্তু চিকাগোয় এসে পৌঁছোনোর পর বুঝলেন, বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পথটি মসৃণ নয়। প্রথমত, বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শুরু হতে তখনও আরও দু সপ্তাহ দেরি আছে। দ্বিতীয়ত, আমন্ত্রিত বক্তা ব্যতীত এখানে কাউকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হবে না। কাজেই, বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বক্তব্য রাখার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। অথচ, স্বামীজি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাউকেই চেনেন না। তদুপরি, চিকাগো শহরে থাকার মতো যথেষ্ট পয়সাও তাঁর সঙ্গে নেই। চিকাগো শহরে হোটেল ভাড়া অস্বাভাবিক বেশি। ওই সময়ই দু-একজন তাঁকে পরামর্শ দিলেন বোস্টন শহরে চলে যেতে। চিকাগোর তুলনায় বোস্টনে থাকা খাওয়ার খরচ কম। ভ্যাংকুভার থেকে চিকাগো আসার পথে স্বামীজির সঙ্গে বোস্টন নিবাসী এক মহিলার আলাপ হয়েছিল। তাঁর নাম ক্যাথরিন অ্যাবট সানবর্ন। তরুণ বিবেকানন্দের চেহারায়, ব্যক্তিত্বে এবং কথাবার্তায় ওই মহিলা মুগ্ধ হয়েছিলেন। বোস্টনে তাঁর বাড়িতে এসে থাকার জন্য স্বামীজিকে আমন্ত্রণও জানিয়ে রেখেছিলেন তিনি। ক্যাথরিনের বাবা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন ক্যাথরিনের আলাপ হয় তখন তিনি মধ্য পঞ্চাশের এক মহিলা। ওই সময়ে মার্কিন মুলুকের খুব নামকরা লেখক। পরে এই ক্যাথরিন বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। চিকাগোয় থাকার অসুবিধা হওয়ায় ক্যাথরিনের কথা প্রথমেই মনে এল স্বামীজির। চিকাগো থেকে স্বামীজি চলে এলেন বোস্টনে। এ প্রসঙ্গে ক্যাথরিন সানবর্ন তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, '...Just risen from a sickbed, I received a telegram announcing that my reverend friend on the train was at the Quincy House, Boston and awaiting my orders. Then I remenbered vividly. I had urged him to accept my hospitality if he felt lonely and needed help. I had promised introductions to

Harvard professors, Concord philosophers, New York Capitalist, women of fame, position and means, with brilliant gifts in writing and conversation. It was mid-August. Not a soul was in town, and how should I entertain my gaily apparelled pundit? I was aghast, but telegraphed bravely : Yours received. Come today. 4:20 train, Boston Albany.'

কথা রেখেছিলেন সানবর্ন। বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের। রাইট ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক। গ্রিক সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি। পরে এই রাইট পরিবারও বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বহুবারই রাইট দম্পতির বাড়িতে উঠেছেন। ক্যাথরিন সানবর্নের মতো রাইট দম্পতিও প্রথম দর্শনেই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে যান। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমতী রাইটের একটি পত্রে। স্বামীজি সানবর্নের মাধ্যমে রাইট দম্পতির বাড়িতে এসে ওঠেন। কয়েকদিন রাইট দম্পতির সঙ্গে অতিবাহিতও করেন তিনি। এই সময়ই শ্রীমতী রাইট তাঁর মা-কে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছেন, '...Kate Sanborn had a Hindooo monk in tow as I believe I mentioned in my last letter. John went down to meet him in Boston and missing him, invited him up here. He came Friday! In a long saffron robe that caused universal amazement. He was a most gorgeous vision. He had a superb carraige of head, was very handsome in an orient way, about thirty years old in time, ages in civilization. He stayed until Monday and was one of the most interesting people I have yet come across. We talked all day and all night and began with interest the next morning. The town was in a fume to see him; the boarders of Miss Lane's in wild excitement. They went in and out of the lodge constantly and little Mrs. Merill's eyes were blazing and her cheeks red with excitement. Chiefly we talked religion. It was a kind of revival. I have not felt so wrought up for a long time myself.'

চিঠির এই অংশটুকুই পড়লেই বোঝা যায় উচ্ছ্বাস কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং বিবেকানন্দ কতটা মুগ্ধ করেছিলেন রাইট দম্পতিকে। শুধু রাইট দম্পতি নন, এ-ও বোঝা যায়, চিকাগো আসার আগেই বোস্টনের মার্কিনিদের একাংশকেও স্বামীজি মুগ্ধ করে এসেছিলেন। অধ্যাপক রাইট ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষ। তাঁর যোগাযোগও ছিল প্রভূত। বিশ্বধর্ম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ভিতর কয়েকজন তাঁর পরিচিতও ছিলেন। স্বামীজিকে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে প্রতিনিধি করা এবং ভাষণ দেওয়ার সুযোগ

করে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁদের কয়েকজনকে পত্রও লিখে দিলেন। অধ্যাপক রাইটের সেই পত্র সম্বল করে স্বামীজি এসে পৌঁছোলেন চিকাগোয়।

অধ্যাপক রাইট এবং শ্রীমতী রাইটের এই সহৃদয়তার কথা স্বামীজি কিন্তু কখনও বিস্মৃত হননি। স্বামীজির চিঠিপত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩-এর ৪ সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজি লিখেছেন, 'আপনি, আপনার মহিয়সী পত্নী এবং শিশুসন্তানগুলি আমার মনে এমন ছাপ রেখেছেন, যা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি, তখন সত্যি মনে হয়—স্বর্গের কাছাকাছি আছি। যিনি সবকিছুর দাতা, তিনি আপনার উপর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।' এই চিঠিটির সঙ্গে অধ্যাপক রাইটকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি কবিতাও লিখে পাঠান স্বামীজি।

কিন্তু জন রাইটের লিখে দেওয়া চিঠিগুলি সঙ্গে নিয়ে চিকাগোয় এলেও দুর্ভাগ্য স্বামীজির পিছু ছাড়ল না। চিকাগো আসার পথে তিনি চিঠিগুলি হারিয়ে ফেললেন। এদিকে ধর্ম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কোনো ঠিকানাও স্বামীজির জানা নেই। বাধ্য হয়ে, রাতটি তিনি চিকাগো রেল স্টেশনে একটি বাক্সের ভিতর শুয়ে কাটালেন। পরদিন বেরোলেন বিশ্বধর্মসম্মেলনের জায়গাটি খুঁজে বের করতে। কিন্তু যেখানেই গেলেন, সর্বত্রই খুব রূঢ় ব্যবহার পেলেন তিনি। অদ্ভুত পোশাক পরা এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল সবাই। হতাশ-ক্লান্ত হয়ে স্বামীজি যখন রাস্তার ধারে বসে ভাবছেন কী করবেন, তখনই সামনের একটি বাড়ির দরজা খুলে প্রায় দেবদূতের মতো হাজির হলেন এক মহিলা। স্বামীজির পোশাক-আশাক দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন?' স্বামীজি তাঁকে বিশদে সব কথা খুলে বললেন। স্বামীজির কথা শুনে ওই মহিলা স্বামীজিকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন।

মহিলার নাম এলেন হেল। স্বামীজির সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয় তখন তাঁর বয়স ৫৬। এক সম্ভ্রান্ত মার্কিন পরিবারের বধূ ছিলেন এলেন হেল। পরবর্তীকালে এই হেল পরিবারও বিবেকানন্দ অনুরাগী হয়ে ওঠে। এলেন হেলের স্বামী জর্জ ডব্লিউ হেলকে স্বামীজি 'ফাদার পোপ' বলে সম্বোধন করতেন। শ্রীমতী হেলকে বলতেন 'মাদার চার্চ।' হেল দম্পতির কন্যাদের 'বোন' বলে ডাকতেন স্বামীজি। ১৮৯৮ সালের ২ মার্চ শ্রীমতী হেলের কন্যা মেরিকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'তোমরা সকলে—সমস্ত পরিবারটিই — আমার প্রতি এত সদয় যে, মনে হয় পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয় তোমাদেরই একজন ছিলাম, আমরা হিন্দুরা তো এইরকমই বলে থাকি।' হেল পরিবারের বাড়িটিই একসময় স্বামীজির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের প্রধান দপ্তর হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী হেলই স্বামীজিকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। তারপর এক নতুন ইতিহাস। স্বামীজির ওই ভাষণের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্য আবিষ্কার করল এক নতুন ধর্মভাবনাকে, যার সঙ্গে এতদিনের প্রচলিত ধ্যানধারণা মিলল না। এমনকী, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চ্যতের প্রচলিত ধারণাও আঘাত পেল। তদুপরি, স্বামীজির ভিতর পাশ্চাত্য আবিষ্কার করল এমন এক ধর্মপ্রচারককে, যাঁর সঙ্গে আর-পাঁচজন খ্রিস্টান মিশনারি বা হিন্দু ধর্মগুরুকে মেলানো যাচ্ছে না। ফলে, পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দকে নিয়ে সৃষ্টি হল প্রচণ্ড কৌতূহল। মার্কিন সমাজের একটি অংশ বিবেকানন্দকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। বিভিন্ন মার্কিন সংবাদপত্রেও সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল। 'চিকাগো টাইমস' লিখল, 'The face and dress which attracted the most notice, especially from the ladies, was that of Swami Vivekananda, a young man exceptionally handsome and features that would command attention anywhere.'

'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড', 'He is undoubtedly the greatest figure in the parliament of Religion. After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation.'

'নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক', 'But elequent as were many of the brief speeches, no one expressed as well the spirit of the Parliament and its limitations as the Hindu Monk. I copy his address in full, but I can only suggest its effect upon the audience, for he is an oratory by divine right, and his strong intellegent face in its picturesque setting of yellow and orange was hardly less intesesting than these earnest words and the rich rhythmical utterance he gave them...he speaks without notes, presenting his facts and his conclusions with the greatest art and the most convincing sincerity, and rising often to reach inspiring eloquence.'

'বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট', 'He is a great favourite at the parliament from the grandeur of his sentiments and his appearence as well. If he merely crosses the platform he is a applauded, and his marked approaval of thousands he accepts in a childlike spirit of gratification without a trace of conceit.'

সমসাময়িক একটি মার্কিন পত্রিকা লিখল, 'From the day the wonderful professor [the Swami] deliverd his speech, which was followed by other addresses, he was followed by a crowd whereever he went. In going in and coming out of the building, he was daily beset by hundreds of women who almost fought with each other for a chance to get near him, and shake his hand;'

মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলির এই উচ্ছ্বাস সম্পর্কে ১৮৯৩ সালের ২ নভেম্বর তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি পত্রে স্বয়ং স্বামীজি লিখেছেন, 'একটি সংবাদপত্র হইতে কিয়দংশ আমি উদ্ধৃত করিতেছি— "মহিলা—মহিলা—কেবল মহিলা— সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্যন্ত ফাঁকা নাই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্বে অন্য যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল, ইত্যাদি।" যদি সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য হইবে। কিন্তু তুমি তো জানই, নাম-যশকে আমি ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী করতালি পড়িয়া যাইত। সকল কলেজই আমাকে প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্য দেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সাম্রাজ্যের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।'

শ্রীমতী রাইটের পত্র, চিকাগো বক্তৃতার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং স্বয়ং স্বামীজির লেখা— এগুলি পড়লে একটি বিষয় আন্দাজ করতে খুব একটা কষ্ট হয় না, তা হল, বোস্টন থেকে চিকাগো — সর্বত্রই, শুধু স্বামীজির ভাষণে নয়, স্বামীজির চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বেও মুগ্ধ হয়েছিল মার্কিন সমাজ। বিশেষ করে স্বামীজির অপূর্ব দর্শন চেহারা এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন মহিলারা। ইংল্যান্ডে মার্গারেট নোব্‌লও যে শুধুমাত্র বিবেকানন্দের বেদান্ত ব্যাখ্যায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা হয়তো নয়। বিবেকানন্দের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মানুষের হৃদয় জয় করার মতো অপূর্ব বাচনভঙ্গি এবং অপরূপ সুন্দর চেহারা— এ-ও যে মার্গারেটকে বিবেকানন্দের প্রতি অন্যান্য বিদেশি অনুরাগীদের মতোই আকর্ষণ করেছিল— তা না বলে দিলেও বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

তবে, চিকাগো বক্তৃতার পরে বিবেকানন্দের মার্কিন দুনিয়া বিজয় যে খুব মসৃণ হয়েছিল— তা কিন্তু নয়। বরং এর পরই খ্রিস্টান মিশনারি, ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব এবং কট্টর রক্ষণশীল হিন্দুদের একত্র আক্রমণ নেমে এল তাঁর ওপর। সেই আক্রমণ একেবারে ব্যক্তিগত কুৎসার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল। বিবেকানন্দের ওপর এই তিন শক্তির আক্রমণ নেমে আসার কারণ ছিল ত্রিবিধ। প্রথমত, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে পা রাখার আগে খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দু ধর্ম এবং ভারত সম্পর্কে নানাবিধ মনগড়া কুৎসিত গল্প রটাত। তারা এমনটাই প্রচার করত যে, বর্বর হিন্দু ধর্ম ভারতের মতো দেশে অসহায় মানুষকে শোষণ করছে, তাদের

অশিক্ষিত করে রাখছে। প্রাচ্যের এই 'অসভ্য' মানুষদের খ্রিস্টের বাণী শুনিয়ে তাদের 'সভ্য' করে তোলার বার্তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা বেরিয়ে পড়ত প্রাচ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ কাজের জন্য তাদের প্রভূত অর্থের দরকার পড়ত। আর 'অসভ্য হিন্দু ধর্ম' এবং প্রাচ্যের 'অসহায়' মানুষের দোহাই পেড়ে তারা এই অর্থ সংগ্রহ করত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। বিবেকানন্দের পূর্বে পাশ্চাত্যে এসে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মের নামে এই জঘন্য কার্যকলাপের বিরোধিতা কেউ করেননি। বিবেকানন্দ প্রথম মার্কিন মুলুকে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ জানালেন। মিশনারিদের হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যার উত্তর দিলেন তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। পাশাপাশি বললেন, 'ভারতে এখন ধর্ম প্রধান চাহিদা নয়। ভারতে যথেষ্ট ধর্ম আছে, যা নেই তা হল অন্ন। যদি টাকা খরচ করতে চাও খাদ্যের জন্য কর, ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য কর, ধর্মপ্রচারে অর্থ ব্যয় কর না।' খ্রিস্টান মিশনারিদের এই কথা পছন্দ হল না। তবে, মার্কিন মুলুকের শিক্ষিত সমাজের একাংশ বিবেকানন্দের এই বার্তাকে স্বাগত জানাল। তার ফল হল এই যে, খ্রিস্টান মিশনারিরা যে টাকা তুলত তাতে ঘাটতি পড়ল।

খ্রিস্টান মিশনারিদের পাশাপাশি খেপে গেল ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের একাংশ খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিবেকানন্দ-কুৎসায় নেমে পড়ল। ব্রাহ্ম সমাজের খেপে যাওয়ার কারণটি ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত। চিকাগো ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আশা করেছিলেন, প্রাচ্যের প্রতিনিধি হিসাবে মার্কিন সমাজ তাঁকেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আলোয় ম্লান হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্বামীজির চরিত্রহনন করতে বাজারে নেমে পড়লেন। বিবেকানন্দ যে উদার হিন্দুধর্ম প্রচার করছিলেন তা একেবারেই না-পসন্দ্ ছিল হিন্দু রক্ষণশীলদেরও। তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম দেখেই হিন্দুরক্ষণশীলরা কুপিত হয়েছিল বিবেকানন্দের উপর। মেরি লুই বার্ক তাঁর লেখায় বলেছেন, 'খ্রিস্টান মিশনারিরা এতদিন যে জমির উপর দাঁড়িয়েছিল, সেই জমিটাই স্বামীজি ধসিয়ে দিয়েছিলেন।... একটি ধর্ম (খ্রিস্টধর্ম) সারবত্তার দিক থেকে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়— শুধু এটুকু শিক্ষাদানের মধ্যেই বিবেকানন্দের বক্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল না; সেই সঙ্গে নিজেদের দেশে ও বহির্জগতে খ্রিস্টান ধর্মচর্চার ভণ্ডামির দিকটাও তিনি নির্দেশ করেছিলেন।' মেরি লুই বার্ক আরও লিখেছেন, 'যেসব গালগল্পের ভিতর দিয়ে মিশনারিরা উন্মাদনা সৃষ্টি করত, তার প্রত্যেকটিরই স্বামীজি বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন কিংবা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন।'

মেরি লুই বার্ক তাঁর 'পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'মেঘ জমতে শুরু করেছিল ধর্মমহাসম্মেলনেই। যদিও সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব রক্ষা করার সবরকম চেষ্টাই হয়েছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাহ্যিক

প্রকাশও ছিল নিষিদ্ধ, তবু অখ্রিস্টিয় ধর্মগুলির প্রতি কট্টর মৌলবাদীদের শত্রুতার মনোভাবে ক্রোধ অসংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। হিদেনদের (হিন্দু) সঙ্গে কূটনৈতিক করমর্দন ও ভ্রাতৃসুলভ মৃদুহাস্য যাজকের সহনশীলতাকে পীড়িত করেছে। সুতরাং পার্লামেন্ট সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৌজন্য বিদায় নেবে— এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।' বার্কের এই বক্তব্য একেবারেই সঠিক। কেননা, ধর্মমহাসম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকাগোর 'ইন্টিরিয়র' পত্রিকা লিখল, 'ধর্মমহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের অতিথি। এখন পার্লামেন্ট শেষ হয়েছে। এখন আমাদের উচিত তাঁকে এবং তাঁর ভ্রান্ত দর্শনকে আক্রমণ করা।' বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে খ্রিস্টান মিশনারিরা একটি সম্মেলন আহ্বান করল। সেই সম্মেলন থেকে বিবেকানন্দকে 'শয়তানের অনুচর' আখ্যা দেওয়া হল। এই সম্মেলনে উৎফুল্ল হয়ে 'খ্রিস্টান অ্যাডভোকেট' পত্রিকা লিখল, 'What a splendid antidote the convention was for Vivekananda and his lectures! Came just in the nick of time. The glamour produced by his suave sophistries vanished like mist before the stalwart faith and living experience of men who have met and coped with heathenism on its ground. Vale kananda.'

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের নামে কুৎসা প্রচারে অগ্রণী ছিলেন ডা. জন মার্ডক। জন মার্ডক বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগিণীদের ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, 'এই মহিলার পাল হিন্দুধর্মের কিছুই বোঝে না। তাদের মুখ্য আকর্ষণ পোশাকে— যা তাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাজের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি ভারতীয় গল্পও আছে। একবার একটা শিয়াল নীল-ভেজানো গামলায় পড়ে যায়। তারপর যখন সে বেরিয়ে আসে তখন তার অপূর্ব নীল রঙা শরীর। সে নিজেকে বনের রাজা বলে দাবী করল। সিংহ ও অন্যান্য পশুরা তা মেনেও নিয়েছিল, যতক্ষণ না তার আসল জাত ধরা পড়েছিল।' ব্যক্তিগত কুৎসা কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে এটি ছিল তার প্রমাণ। মেরি লুই বার্ক পরে লিখেছেন, ১৮৯৪ সালের জুন মাসটি ছিল বিবেকানন্দের জীবনের 'অন্ধকার যুগ'।

বিবেকানন্দ বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, স্বামীজিকে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন যে জন হেনরি বরোজ, তিনি এদেশে এসে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কুৎসা শুরু করলেন। বরোজ বললেন, 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের অভাবের দরুণ তিনি হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুশাস্ত্র জানতেন না। তাঁরই শিষ্য বিবেকানন্দ। গুরু অজ্ঞ হলে শিষ্য পণ্ডিত হবেন কী করে?' নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বরোজ ম্যাক্সমুলারের নাম জড়ানোর চেষ্টাও করেছিলেন। পরে, রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে ম্যাক্সমুলারের লেখা বই প্রকাশ

হলে জানা গেল— বরোজ ম্যাক্সমুলারের নাম জড়িয়ে যা যা বলেছিলেন তা একেবারেই মিথ্যা।

এই খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে হাত মেলালেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতাপচন্দ্র স্বামীজির মার্কিন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি গিয়ে প্রচার করতে শুরু করলেন বিবেকানন্দ আসলে একজন ঠগ জোচ্চর ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ১৮৯৪ সালের ১৯ মার্চ গুরু ভ্রাতা রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি। পরে যখন চিকাগোশুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো, তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বলল। ...দাদা, আমি দেখেশুনে অবাক। বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর তো খাতির যথেষ্ট এ দেশে। তবে আমার মতো তোমাদের হল না, তা আমার কি দোষ?... আর মজুমদার পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, 'ও কেউ নয়, ঠক জোচ্চোর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে— আমি ফকির' ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে প্যাম্পফ্লেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা; কিন্তু গুরু সহায় বাবা! মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমায় ভালোবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে— মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাদ্রীর কি কর্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপূজা করি না'— এসব আর চলে না— পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে ভায়া, এরা চায় ফিলসফি, learning (বিদ্যা), ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।...ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসাটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হামবড়া, আর কেউ বড় হবে না।'

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দুরকম কুৎসা রটিয়েছিলেন বিবেকানন্দ সম্পর্কে। আমেরিকায় প্রতাপচন্দ্র বলে বেড়িয়েছিলেন, 'বিবেকানন্দ একজন পরিচয়হীন ঠগ্, জোচ্চর।' আর এদেশে এসে বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দ আমেরিকায় সবরকম পাপ কাজ করে বেড়াচ্ছেন। মার্কিন নারীদের সঙ্গে পশুর মতো জীবনযাপন করছেন।' ওই সময়ে সবচেয়ে আলোকপ্রাপ্ত বলে যারা দাবি করত সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিই কিন্তু বিবেকানন্দ সম্পর্কে জঘন্যতম কুৎসা রটাতে দ্বিধা করেননি। এবং মনে রাখতে হবে, তখনো কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত। তাঁর দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ আসেনি বা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধির এহেন কুৎসা রটনায় তিনি বাধাও দেননি।

এদেশেও বিবেকানন্দ বিরোধিতা করা এবং বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর লোকের অভাব ছিল না। চিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের হৃদয় জয় করেছেন, এ সংবাদ এদেশে এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্ররা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দের নামে কুৎসা প্রচার করতে। 'সাহিত্য' পত্রিকায় সেই সময়ে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'তাঁহার (বিবেকানন্দ) বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলা, যেন যাত্রাদলের অধিকারী।...তারপর খাদ্যাখাদ্য বিচার-স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার— সনাতন ধর্মের আচারানুষ্ঠানের একটা মস্ত বিষয়— বিবেকানন্দ এটার প্রতি এত চটা যে তিনি 'হাঁড়িধর্ম্ম' 'ছুৎমার্গ' বলিয়া ইহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শৈশবাবধিই তিনি স্বাধীন মতের পরিপোষক—ছেলেবেলায়ই মোসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইতেন, মোসলমানের হুঁকায় মুখ দিতেন— তাহার পিতাও যেন খাদ্যাখাদ্য বিচার কম করিতেন।... বিশেষত আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া আশ মিটাইয়া নির্বিবাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; অতএব ইহার নিকট হইতে আমরা খাদ্যাখাদ্য-স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের আর কী সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি।' 'ইন্ডিয়ন মিরর' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-ও প্রবল বিবেকানন্দ-বিরোধিতায় নেমেছিল। 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ এস বি সি নামে এক পত্রলেখক লিখেছিলেন, 'ভেলকিবাজির ভেলকি ফাঁক। বিবেকানন্দ আর সেই বৈদান্তিক নন, যিনি ত্রিলোক চষে হিন্দুধর্মকে পুরাতনী প্রজ্ঞা ফিরিয়ে দিতে চান। তিনি এখন সেইসব বদ জিনিস ছড়াচ্ছেন, যার জন্য আধুনিক হিন্দুধর্ম বুদ্ধিমান লোকের কাছে পূতিগন্ধময় বলে মনে হয়।... তিনি এখন দক্ষতার সঙ্গে ডিগবাজি মেরেছেন, মত বদলে সাধারণ চেনা মানুষের চেহারায় হাজির রয়েছেন, প্রাচীনপন্থীদের সুনজরে যে তাঁকে পড়তেই হবে।'

'অনুসন্ধান' পত্রিকায় লেখা হল, 'আজিকালি স্বামী হওয়ার যেরূপ হুজুগ পড়িয়াছে তাহাতে বোধহয় কালে স্ত্রী খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে।' ওই পত্রিকায় বিবেকানন্দকে ব্যঙ্গ করে আরো লেখা হল, 'স্বামীর নাম শুনিলে আজিকালি কতকগুলি লোক সহজেই বিচলিত হইয়া পড়েন। গেরুয়া বসন দেখিলেই তাঁহারা গড়াগড়ি যান। তদুপরি, পাগড়ি-বাঁধা, হ্যাট পরা মস্তকে দাঁড়াইয়া ইংরাজি বক্তৃতার ব্যাখ্যায় যদি কেহ তাঁহাদিগকে বেদান্তের বুলি শুনাইতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই, তৎক্ষেত্রেই তাঁহারা মূর্চ্ছা যাইয়া সমাধি লাভ করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে বসেন।... স্বামীর বাজারে বড় বেজায় সস্তা দর। এই সস্তা দরের শকটে চড়িয়া আজকালির মধ্যে এদেশে এত লোক স্বামী হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুদিন পরে 'সেন্সসের' তালিকা পাওয়া বিষম দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ স্বামীদলের মধ্যে বিবেকানন্দ একজন প্রধান স্বামী।' 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় জনৈক দীননাথ গাঙ্গুলি লিখলেন, 'বিবেকানন্দ ঋষি তো ননই, সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাঁকে বলা চলে না।' এমনকী,

শিশিরকুমার ঘোষ-মতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-ও বিবেকানন্দের ঘোর বিরোধিতা করল।

খ্রিস্টান মিশনারি, রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু এবং ব্রাহ্মসমাজের পাশাপাশি থিওজফিস্টরাও বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগত আক্রমণে নেমে পড়ল। থিওজফিস্টদের বিবেকানন্দ-বিরোধিতার কারণ ছিল। তারা মনে করত স্বামীজি অ্যানি বেশান্তকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেন না। অথচ, ১৮৯৬ সালের ৯ জুলাই, অ্যানি বেশান্তেরই আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ লন্ডনে শ্রীমতী বেশান্তের বাড়ি ব্লাভাৎস্কি লজে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন। থিওজফিস্টরা আমেরিকায় কী ধরনের কদর্য আক্রমণ করেছিল বিবেকানন্দকে, তা একটি বক্তৃতায় স্বামীজি নিজেই উল্লেখ করে গিয়েছেন। আমেরিকার প্রবল ঠাণ্ডায় বিবেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে চিকিৎসা করানোর মতো যথেষ্ট অর্থও তাঁর কাছে ছিল না। মাদ্রাজে টেলিগ্রাম করে স্বামীজি তাঁর শিষ্য এবং বন্ধুদের কাছে অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ওই অসুস্থতার খবর পেয়ে জনৈক থিওজফিস্ট নেতা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এখন তাহলে শয়তানটা মরবে।' থিওজফিস্টরা এ-কথাও বলেছিল, 'বিবেকানন্দকে যেন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি যেন আমেরিকায় অনাহারে শুকিয়ে মরেন।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, আমেরিকার ডেট্রয়েটে এক নৈশভোজে স্বামীজিকে কফি খেতে দেওয়া হয়েছে। স্বামীজি যখন কফির কাপে চুমুক দিতে যাবেন, তখন হঠাৎ যেন দেখলেন তাঁর পাশে রামকৃষ্ণ পরমহংস এসে দাঁড়িয়েছেন। কানে কানে বলছেন, 'ওটা খাসনি, ওটা বিষ।' স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বর্ণনা করা এই ঘটনাটিকে যদি মনের ভ্রম বলে উড়িয়ে দিই, তাহলেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিরোধীদের আক্রমণ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, স্বামীজির অবচেতন মনেও নানারকম আশঙ্কা বাসা বেঁধেছিল। এই বিরোধিতা যে শুধু বিবেকানন্দের মার্কিন বাসের সময়ই হয়েছিল, তা মনে করারও কোনো কারণ নেই। মার্কিন দেশ থেকে স্বদেশে ফেরার পরও তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আরো নগ্ন এবং কুৎসিত আক্রমণ নেমে এসেছে তাঁর ওপর। বিবেকানন্দ চিকাগো থেকে দেশে ফেরার পর কীরকম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করা যাক। বিবেকানন্দকে কলকাতায় সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য তাঁর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একটি সভা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওই সভায় সভাপতিত্ব করার অনুরোধ নিয়ে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে সভাপতিত্ব করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন তা-ই নয়, তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দু রাজার শাসন থাকলে তাঁকে (বিবেকানন্দ) ফাঁসি দেওয়া হত।'

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়। কী পাশ্চাত্যে, কী এদেশে, বিবেকানন্দকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর বিরোধীরা কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি খাড়া করতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত কুৎসা রটিয়ে বিবেকানন্দকে হেয় করতে চেয়েছেন তাঁরা। এ থেকে এটুকু অন্তত বোঝাই যায়, চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে এবং আমেরিকার অন্যত্র বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিবেকানন্দ যে উদার ধর্মমতের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তার বিরোধিতা করার মতো যথেষ্ট যুক্তি বিবেকানন্দ-বিরোধীদের হাতে ছিল না।

ক্রমাগত এই ব্যক্তিগত কুৎসা এবং আক্রমণের জবাবে বিবেকানন্দ কী করেছিলেন। বলতে গেলে এই ব্যক্তিগত কুৎসা ও আক্রমণ বিবেকানন্দের কাছে নতুন কিছুও ছিল না। যখন তিনি বিবেকানন্দ হননি, শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত — তখনই তাঁকে এই কুৎসার মুখে পড়তে হয়েছিল। স্বয়ং বিবেকানন্দই লিখেছেন, '...ফলে স্বল্পদিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে পর্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি। সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রয় হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখকষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য কেহ যদি মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভোগী হইতে পারি একথা যেদিন নিঃসংশয় বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

'কথা কানে হাঁটে। আমার ঐ সকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাঁহার কলকাতাস্থ ভক্তগণের পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।... পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হ্যাঁ, না কিছুই বলেন নাই। পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে ঐকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর।'— তখন, বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখন ঐ রূপ করিতে পারে না, আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।'

বিবেকানন্দর এই ভাবাই বলে দেয়, কী নিম্নশ্রেণির কুৎসা এবং আক্রমণের ভিতর দিয়ে তাঁকে বহু আগে থেকেই পথ চলতে হয়েছিল। তবে, এই অভিজ্ঞতাই হয়তো তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিল, এই আক্রমণের সামনে কীভাবে নিজেকে সংযত রাখতে হয়, নিজের লক্ষ্যের প্রতি স্থির এবং অবিচল থাকতে হয়। তবু এই আক্রমণ যে

বিবেকানন্দকে একদম পীড়া দেয়নি তা নয়। নিজের ঘনিষ্ঠদের কাছে তাঁর বেদনা কখনও সখনও প্রকাশও করে ফেলেছেন স্বামীজি। বিলেত থেকে এক চিঠিতে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন, 'আমার বুড়ি-মা এখনও বেঁচে আছেন। সারাজীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন। সেসব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে ভালবাসা যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে— কলকাতায় মজুমদার (প্রতাপচন্দ্র মজুমদার) যেমন রটাচ্ছে, জঘন্য নোংরা জীবনযাপন করছে এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবে।' লক্ষণীয় যে, ব্যক্তিগত কিছু পত্রে এইরকম ক্ষোভ এবং বেদনা প্রকাশ করে ফেললেও, তাঁর বিরোধীদের সম্পর্কে স্বামীজি কিন্তু কখনোই কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কুৎসা রটনার পথে যাননি। তাদের কোনো বক্তব্যের বিরোধিতা করার প্রয়োজন মনে করলে স্বামীজি সেটা তত্ত্বের মাধ্যমেই করেছেন।

আসলে, বিরোধীদের ওইসব কথাবার্তাকে উপেক্ষা করার পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি। তিনি বুঝেছিলেন, তিনিও যদি পাঁচটা কুৎসা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণে জড়িয়ে পড়েন— তাহলে মূল লক্ষ্য থেকে তিনি সরে যাবেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল রামকৃষ্ণ আন্দোলনের ভাবধারা আরো প্রসারিত করা এবং বেলুড়ে মঠ স্থাপন করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি অন্য সব বিষয়ে নিজেকে নিস্পৃহ এবং সংযমী রেখেছিলেন। তদুপরি, এই কুৎসারটনাকারীদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতেও স্বামীজি পড়তে চাননি কখনও। আর-পাঁচজন ধর্মপ্রচারকের থেকেও নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন। যে কারণে শত প্ররোচনাতেও বিবেকানন্দ কুৎসার প্রতিযোগিতায় নিজেকে নামিয়ে আনেননি। স্থিতধী, নিজের লক্ষ্যে অবিচলই থেকেছেন। আর একারণেই বিবেকানন্দ অনন্য। পরবর্তীকালে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই স্থিতধী, সংযমী, লক্ষ্যে অবিচল সন্ন্যাসী হিসাবেই ধরা দিয়েছেন বিবেকানন্দ।

চিকাগো বক্তৃতা এবং তারপর তাঁকে ঘিরে এত কাণ্ড এটুকুই বুঝিয়ে দেয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে তখন যথেষ্ট বিতর্কিত চরিত্র। একদিকে তাঁকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাসে যেমন মেতে উঠছে মার্কিন সমাজের একাংশ, বেশ কিছু মার্কিন পত্র-পত্রিকায় যেমন গুরুত্ব সহকারে প্রচার পাচ্ছে তাঁর সংবাদ, তেমনই তাঁর বিরোধিতা করার লোকেরও অভাব হচ্ছে না। তাঁকে আক্রমণ করেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হচ্ছে। এককথায়, বিবেকানন্দ তখন পাশ্চাত্য দুনিয়ায় প্রচারের আলোয়। এই বিতর্কিত বিবেকানন্দ সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ তখন ব্রিটেনেও এসে পৌঁছচ্ছে। ব্রিটেনের শিক্ষিত সমাজও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এই বিতর্কিত হিন্দু সন্ন্যাসী সম্পর্কে। ১৮৯৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বিবেকানন্দ প্রথমবারের জন্য ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছোন। ১০ নভেম্বর লেডি ইসাবেল মার্গেসনের বাড়িতে বক্তৃতা দেওয়ার আগেই লন্ডনে আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দর এই

বক্তৃতাগুলির কথা বিভিন্ন ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। ২৩ অক্টোবর ব্রিটেনের 'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা লেখে, 'রাজা রামমোহনের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া ভারতবাসীর ভিতর এত ভালো বক্তা আর দেখা যায়নি।' এমনিতেই বিতর্কিত বিবেকানন্দকে ঘিরে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজে একটি কৌতূহল ছিল, তার ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সব সংবাদে সেই কৌতূহল আরও বেড়েই গিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার লণ্ডনে এসেছেন, তখন মার্গারেট নোবেল কিন্তু সেখানকার সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সমাজেরই এক প্রতিনিধি। তাঁর দ্বিতীয় প্রেমটি তখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে, সেই মানসিক ধাক্কা কিছুটা সামলে উঠে মার্গারেট তখন উইম্বলডনে তাঁর স্কুলের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দকে নিয়ে ব্রিটিশ সমাজে যে কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে— সে কৌতূহল মার্গারেটের ভিতরও জন্ম নেয়নি একথা ভাবা ভুল হবে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ মার্গারেটের নজরে পড়েনি— এমনটি ভাবাও বোধ হয় ঠিক হবে না। কাজেই, লেডি মার্গেসনের বাড়িতে তিনি যখন প্রথমবার বিবেকানন্দের বক্তব্য শুনতে যাচ্ছেন, তখন বাকিদের মতো তাঁরও কৌতূহলটাই যে বেশি কাজ করেছিল— এ সহজেই অনুমান করা যায়। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে এমনই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং নিবেদিতা। লিখেছেন, 'এই 'হিন্দু যোগীকে' দেখিবার জন্য আমরা যে কয়জন আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহারও ধর্মে তেমন আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না।' কৌতূহলটাই যে একমাত্র কারণ ছিল— তা নিবেদিতার লেখাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

আট

১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন লন্ডন এসে পৌঁছোন সেই সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থাটি কীরকম ছিল? ১৮৭৯, ১৮৮০ এবং ১৮৮১—এই তিনটি বছর আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল এবং মাইকেল ডেভিডের নেতৃত্বে তখন আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন গ্ল্যাডস্টোন। আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন কোনোটাই দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না গ্ল্যাডস্টোন। বরং, তিনি আইরিশ আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে পার্নেল তখন আয়ারল্যান্ডে হোমরুলের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করে তুলেছেন। পার্নেলের এই হোমরুল আন্দোলনেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন মার্গারেট নোব্‌লের পিতামহ, পিতা এবং মাতামহ। আয়ারল্যান্ডের এই আন্দোলনের প্রতি মার্গারেটের একটি আগ্রহ ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। শিক্ষকতার চাকরিতে মার্গারেট যখন রেক্সহ্যাম থেকে চেস্টারে চলে আসেন, সেই সময়ে দেশের এই রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তিনি কিছু লেখালেখিও করেন।

১৮৯১ সালে পার্নেলের মৃত্যু হল। গ্ল্যাডস্টোনের পর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হলেন লর্ড স্যালিসবেরি। ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নেতা পিটার ক্রপটকিন এসে বসবাস শুরু করেছেন লন্ডনে। তরুণ আইরিশ বিপ্লবীদের ওপর প্রভাবও বিস্তার করে ফেলেছেন তিনি। আয়ারল্যান্ডে আর্থার গ্রিফিথ প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যে লন্ডনে আইরিশ বিপ্লবীদের দু-একটি ঘাঁটিও তৈরি হচ্ছে। মার্গারেট শিক্ষকতা করতে লন্ডন এসে পৌঁছলেন এরকম একটি সময়ে। ক্রপটকিনের কথা আগেই শুনেছিলেন মার্গারেট। এবং ক্রপটকিনের বিপ্লববাদ তাঁকে আকৃষ্টও করেছিল। মার্গারেটের জীবনী আরো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব বিপ্লববাদের রোম্যান্টিসিজম তাঁকে বরাবরই আকৃষ্ট করেছে। যে কারণে, ভারতে এসে

অরবিন্দ ঘোষ-প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর অতি সহজেই যোগাযোগ গড়ে ওঠে। লন্ডনে শিক্ষকতা করার সময়েই ক্রপটকিনের সঙ্গে মার্গারেটের আলাপ হয় এবং তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। লন্ডনের বিভিন্ন এলাকায় বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজেও সক্রিয় ভূমিকা নেন তিনি। ১৮৯৫ সালে লন্ডনে এই মার্গারেটের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল বিবেকানন্দের। ওই সময়ে মার্গারেট কিন্তু বেশি ব্যস্ত ছিলেন সক্রিয় রাজনীতি এবং শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে নানাবিধ গবেষণায়। লিজল রেমঁ লিখছেন, হ্যালিফ্যাক্সে মিস কলিন্সের কাছে নিজের মনের সবটুকু দুঃখ উজাড় করে দিয়ে মার্গারেট আবার ফিরে এলেন লন্ডনে। ততদিনে তিনি অনেকটা সামলে নিয়েছেন। আবার তাঁর নিত্যদিনের কাজকর্ম শুরু করেছেন। কাজকর্ম বলতে মূলত উইম্বলডনে নিজের স্কুলে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। রেঁম অবশ্য বলেছেন, এই সময়ে মার্গারেট নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। তাঁর রিক্ত হৃদয় হাহাকার করত। এবং এই সময়েই অধ্যাত্মবাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ আবারও বৃদ্ধি পায়। সত্যকে জানার একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা এই সময়ই মার্গারেটের ভিতর নিরন্তর তাড়না সৃষ্টি করতে থাকে। রেমঁ লিখছেন, ধর্ম ছাড়া মার্গারেট বাঁচতে পারেন না। এ যে তাঁর চাই-ই। এই আকাঙ্ক্ষা তার সহজাত, জীবনের অঙ্গ। সেই যে হ্যালিফ্যাক্সে মার্গারেটের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল, তার সহজ উত্তর তখনও পর্যন্ত পাননি। চার্চ এবং সমাজের অগুনতি জোড়াতালিতে যে ধর্মাচরণের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে ওঁর ধর্মবোধ ধাক্কা খায়। ফলে অবিরত একটা তোলপাড় অনুসন্ধান মার্গারেটের ভিতর চলতেই থাকে। হয়তো কোনো একটি অধ্যাত্মভাবনাকে তিনি আঁকড়ে ধরলেন—কদিন পরেই তার নেতিবাচক কিছু দিক নজরে এল। তখন শুরু হয় আবার নতুন কিছুর অন্বেষণ।

রেমঁ লিখছেন, 'এমনি বন্ধুর পথে একা চলতে-চলতে মার্গারেট আশাভঙ্গের বেদনা পেয়েছেন বারবার, সন্দেহ নেই। তার ফলে আস্তে আস্তে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে এক ধরনের সংশয়বাদ জেগে উঠল, যদিও তাঁর মধ্যে নাস্তিক্যের লেশমাত্র ছিল না। কারণ, আভাসে তিনি বুঝতে পারছিলেন, যা তিনি অবলম্বন করতে চাইছেন, তার ওপরেও কিছু একটা আছে। সে-জিনিস এখনও তাঁর নাগালের বাইরে। অন্তরের সহজ বিশ্বাস এমনি করে পথের বাধা কাটিয়ে ওঁকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলে।

'অ্যাংলিকান চার্চের 'ফ্রি থিংকার' সম্প্রদায়ের নেতার সঙ্গে আলাপ করে মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হয়েছিল, এতদিনে লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান মিলল বুঝি। কিন্তু সেখানেও পরমত অসহিষ্ণুতার দেওয়ালে মার্গারেটকে ধাক্কা খেতে হয় শেষ পর্যন্ত। গোঁড়ামিতেই মানুষের সত্যাদৃষ্টি আবিল হয়ে ওঠে। এ জগতে সত্য কোথায়?'

বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মার্গারেটের এই অধ্যাত্মচেতনার ওপরই সবিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন রেমঁ। কিন্তু রেমঁর এই এই ধারণা মনে হয় কিছুটা আরোপিত। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে লন্ডনবাসী মার্গারেট নোব্‌লের প্রাথমিক যোগসূত্রটা দেখাতে

অধ্যাত্মবাদের অতি সরল ব্যাখ্যাটিই মনে হয় রেমঁ মেনে নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং নিবেদিতা কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা স্বয়ং লিখেছেন, 'এই হিন্দু যোগীকে দেখিবার জন্য আমরা যে কয়জন আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহারও ধর্মে তেমন আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না।' এটাই স্বাভাবিক। কেননা হ্যালিফ্যাক্স স্কুল ছেড়ে শিক্ষকতা জীবনে যোগদানের পর মার্গারেটের জীবনে কিন্তু কখনও অধ্যাত্মবাদকে প্রধান হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। বরং, সমাজসেবার আদর্শ নিয়ে চার্চের সংস্পর্শে এসে মার্গারেট আশাহতই হয়েছিলেন। চার্চের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পছন্দ হয়নি। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বয়স বৃদ্ধির সহিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের অপর দিকগুলি ক্রমেই মার্গারেটের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ধর্মজীবনে এত অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা কেন? হৃদয় এখানে অহরহ নিপীড়িত, ক্লিষ্ট, ধর্মানুভূতির সহগামী উদার আনন্দের এখানে অভাব। ধর্মজীবনে চলবার একটা পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর চার্চ যেন উদ্যত শাসনদণ্ড হস্তে ভ্রুকুটি করিয়া চাহিয়া আছে। এতটুকু এদিক ওদিক হইলেই সর্বনাশ। যাহারা ইহার অনুগামী তাহাদের মধ্যে দাক্ষিণ্যের অভাব। সর্বদাই তাহারা অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু। নীতির আবেগহীনতা চরিত্রের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়াছে। মার্গারেটের মনে নিরন্তর প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—এই যাজকীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে কোন উদার এবং মানবীয় ধর্ম কি নাই?... ক্রমে মার্গারেট গীর্জায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। প্রাণহীন, শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি সময়ে সময়ে মানসিক যন্ত্রণার তীব্রতা ও বৈরাগ্য যখন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিত, তখন অভ্যাসবশতঃ তিনি আবার গীর্জায় ছুটিয়া যাইতেন—ভাবিতেন ইহার অনুষ্ঠানগুলিতে মগ্ন হইয়া হৃদয়ভার লাঘব করিবেন।'

মার্গারেট পড়তেন চার্চ পরিচালিত স্কুলে। এই স্কুলে শিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ব্রহ্মচারিণী এবং চার্চ অনুগত সন্ন্যাসিনীরা। এই স্কুলে ছাত্রীদের অধ্যাত্মচর্চার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই শিক্ষা মার্গারেটও লাভ করেছিলেন। সেই স্কুল জীবনে অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল—এ-ও সত্যি । কিন্তু তাকে তিনি স্কুল জীবনের পরেও আর আঁকড়ে বসে থাকেননি। অধ্যাত্মচর্চাই যদি মার্গারেটের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হত তাহলে চার্চ পরিচালিত যে কোনো স্কুলেই তিনি শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে অধ্যাত্মচর্চাতেই নিজেকে নিমগ্ন রাখতে পারতেন। এইদিক দিয়ে বিচার করলে রেমঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য কখনো মনে হবে না।

তবে, একথা ঠিক যে, বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে মার্গারেট এক গভীর সংশয় এবং অস্থিরতার ভিতর দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় তো ছিলই; তদুপরি নিজের চলার পথটি তিনি তখনও সম্পূর্ণ চিনে নিতে

পারছিলেন না। রাজনীতি এবং শিক্ষার আধুনিকীকরণে মনোযোগ দিলেও, তা তাঁকে যে পুরোপুরি তৃপ্তি দিতে পেরেছিল—তা বোধহয় নয়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'মার্গারেটের বিচারশক্তি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া হাক্সলী (অলডাস হাক্সলি) প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। যে যত যুক্তিবাদী, তাহার সংশয়ও তত প্রবল। মাত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়সেই মার্গারেটের চিন্তাশক্তি আশ্চর্য পরিণতি লাভ করিয়াছিল। যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গিয়া খ্রীষ্টান মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ জাগিল, উহার বহু বিশ্বাস ও আচার মনে হইল মিথ্যা, অসঙ্গত। ফলে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল।'

এই রকমই একটি সংশয়দীর্ণ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাতের সূত্রেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হয়ে উঠেছিলেন মার্গারেট নোব্‌ল। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'মাত্র জনাকয়েক বন্ধু জানতেন মার্গারেটের কাছে অধ্যাত্মজীবনের কতখানি দাম। এঁদের মধ্যে এভেনজার কুক একজন। একদিন চিত্রবিদ্যার পাঠ দিতে এসে তিনি ওকে বললেন, 'লেডি ইসাবেল মার্গসন তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুকে যেতে বলেছেন, এক হিন্দু সন্ন্যাসী কিছু বলবেন ওখানে— তুমি যাবে?

'নিছক কৌতূহলবশে এই আচমকা আমন্ত্রণ স্বীকার করে মার্গারেট। সন্ন্যাসীটির সম্বন্ধে নানা কথাই বলাবলি হচ্ছে। কে উনি? 'সিসেম ক্লাব'-এর জনকয়েক সভ্য, বিশেষ করে মিঃ স্টার্ডি ও হেনরিয়েটা মুলার আমেরিকা যুক্তরাজ্যে তাঁর অসামান্য সাফল্য, সাধু হিসেবে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ইত্যাদি নিয়ে এত বিশদ বিবরণ দিলেন যে সেসব শুনে একটা মতামত খাড়া করা শক্ত। মিঃ স্টার্ডি ভারতবর্ষে অনেক ঘুরেছেন, উনি ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে দিতে পারেন হয়তো। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি চুপচাপ রইলেন। কেবল এটুকু জানা গেল, সাধুটি তাঁর বাড়িতেই থাকবেন।'

চিকাগো ভাষণের পর স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তখন পাশ্চাত্যের শিক্ষিত বিশিষ্ট সমাজে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাভেনজার কুক এবং মার্গারেট নোব্‌ল এখন লন্ডনের বিশিষ্ট শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি। এই ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্পর্কে তাঁদের দুজনের মনেই কৌতূহল জেগেছিল। রেমঁ নিজেই লিখেছেন 'নিছক কৌতূহলবশেই' আমন্ত্রণ স্বীকার করেন মার্গারেট। শুধু বিবরণ শুনে যে এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে কোনো মতামত খাড়া করা যাবে না—এমন ভাবনাও যে মার্গারেটের মনে এসেছিল তার ইঙ্গিত রেমঁ তাঁর লেখায় দিয়েছেন। আর এখানেই রেমঁর লেখাতেও বোঝা যাচ্ছে, বিবেকানন্দকে প্রথমবার দেখতে এবং শুনতে যাওয়ার পিছনে মার্গারেটের কোনো অধ্যাত্মচিন্তা কাজ করেনি। আধ্যাত্মিক টান তো দূরের কথা।

প্রথমে যা ছিল নিতান্তই কৌতূহলে যাওয়া, তা-ই কিন্তু পরে আকর্ষণে পরিণত হয়। এর বড় কারণ, বিবেকানন্দের বক্তব্যের ভিতর মার্গারেট লক্ষ করেছিলেন একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা, যা অন্য পাঁচজন ধর্মপ্রচারক বা সমাজসেবকের বক্তব্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অর্থাৎ, বিবেকানন্দ ভাবনার একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন মার্গারেটের সামনে। প্রথমদিন লেডি মার্গেসনের বাড়িতে বিবেকানন্দের বক্তব্য শুনে মার্গারেট এবং আরও অনেকেরই মনে হয়েছিল 'নতূনত্ব কিছুই নেই।' কিন্তু পরে যখন এই হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তব্য নিয়ে একান্ত চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন মার্গারেট, তখন তাঁর মনে ধীরে ধীরে বিবেকানন্দর বক্তব্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জন্ম নিয়েছিল। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, ' কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, সেই সপ্তাহের নির্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে আমার নিকট ইহা প্রতিভাত হইল যে, এক অপরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত, এক নূতন ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এইরূপ উড়াইয়া দেওয়া কেবল অনুদারতার পরিচয় নহে, পরন্তু উহা অন্যায়; আমার মনে হইল, ইনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কথা পূর্বে আমি শুনিয়া অথবা ভাবিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু এ পর্যন্ত যাহা কিছু আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে, সে সমস্ত মাত্র একঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার জীবনের ঘটে নাই। সুতরাং স্বামীজির লন্ডন অবস্থানকালে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার যে দুইটা মাত্র সুযোগ মিলিয়াছিল, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম।' নিবেদিতার লেখার এই অংশটা পড়লেই বোঝা যায়, লেডি মার্গেসনের বাড়িতে স্বামীজির বক্তব্য শুনে আসার কদিন পর থেকেই মার্গারেটের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে আগ্রহ বিবেকানন্দকে আরও জানার এবং বোঝার। বিবেকানন্দ অনুগামিনী হয়ে পড়ার কোনো বাসনা তখনও তাঁর ভিতর দেখা যায়নি। বরং বিবেকানন্দের কথাগুলি আগ্রহ সহকারে শোনার পরও নানাবিধ সংশয় দেখা দিত তাঁর মনে। বিবেকানন্দের পথ এবং মত সম্পর্কেও নানাবিধ প্রশ্ন জন্ম নিত। এ বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'স্বামীজির উপদেশের ভিতর এমন বহু বিষয় ছিল, যাহার সত্যতা শ্রবণমাত্রেই সকলের বোধগম্য হইত। যেমন, সাধারণতঃ যেভাবে সত্য বলিয়া দাবি করা হয়, কোন ধর্মই সেভাবে সত্য না হইলেও সকল ধর্মই এক হিসেবে সমভাবে সত্য— এই মতটাকে আমাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যখন তিনি বলিলেন, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিরাকার, কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপ কুহেলিকার মধ্য দিয়া দেখার জন্য সাকাররূপে প্রতিভাত হন, তখন ভাবটির সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলাম। যখন তিনি বলিলেন, কোন কার্যের পশ্চাতে অবস্থিত ভাবটি ঐ কার্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী, অথবা যখন তিনি নিরামিষ

ভোজনের প্রশংসা করিলেন, তখন আমরা ভাবিলাম, সহজেই উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে তাঁহার সমগ্র মতবাদকেই আমি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। জগতের কতকগুলি ধর্মমত এইরূপ যে, যদি কেহ ঐগুলি প্রথমে মানিয়া লয়, তবে পরে নিশ্চিতই তাহাকে উহাদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অবশেষে পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার মনে হইল, স্বামীজির ধর্মমতও ঐরূপ ধর্মমতের অন্যতম। আর এইভাবে মত পরিবর্তনের ফলে কতটা যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিলে আর কেহ ও পথে অগ্রসর হইতে চাহে না।।' অর্থাৎ, স্বামীজির ধর্মমতের প্রতি ভবিষ্যতে তিনি আস্থা রাখতে পারবেন কিনা, সে সংশয়ও প্রথমে দেখা দিয়েছে মার্গারেটের মনে।

সব বিষয়ে তিনি যে ঘোরতরী সংশয়ী—এটি নিবেদিতা নিজেও জানতেন। লন্ডনে প্রথমবার স্বামীজির সবকটি বেদান্তের ক্লাসে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'ক্লাসের অপর সকলে আমার এইরূপ সন্দেহের ভাব অবগত ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান এক শিষ্য বহু পরে স্বামীজির সম্বন্ধে এই বিষয় লইয়া আমাকে পরিহাস করিয়া বলিতেছিলেন যে, তিনি কিন্তু বরাবরই স্বামীজির মুখে শোনা প্রত্যেকটি কথা মানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামীজি সে সময়ে এই কথাবার্তায় কোনো মনোযোগ দেন নাই বলিলেই হয়, কিন্তু পরে এক সুযোগে আমাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "কেহ যেন এই ভেবে দুঃখ না করে যে, তাকে বোঝাবার জন্য অপর কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে। আমি দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে আমার গুরুদেবের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, ফলে পথের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে।"

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে গিয়ে কখনও নিজের 'লার্জার দ্যান লাইফ' ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুসারী। পরমহংসদেব যেমন আর-পাঁচজন ধর্মগুরুর মতো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে বাহবা কুড়োনোর বদলে সাধারণের মাঝে উদার ধর্মমতের প্রসার ঘটানোকেই বড় করে দেখতেন, বিবেকানন্দও তা-ই। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দও বলেছেন, 'আমি কোন গুপ্তবিদ্যার সমিতির পক্ষ থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের কুহক দেখাতে আসিনি, আর ওসবে কারও মঙ্গল হয় বলেও বিশ্বাস করি না। সত্য স্বপ্রকাশ, দিনের আলোয় পেঁচার মতো মুখ লুকায় না সে, সবাই তাকে যাচাই করে নিতে পারে।' ফলে, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে নিছক শুষ্ক ধর্মকথা প্রচার করেননি। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উদার ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে মানব সেবার কথাটি তিনি প্রচার করে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের বক্তব্যের এই আবেদনটা মার্গারেটের ভালো লেগেছিল। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'কিন্তু স্বামীজির উপদেশের মধ্যে দুইটি ব্যতীত আর একটি তৃতীয় জিনিস

ছিল— যাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং সেজন্যই আমার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। উচ্চ উচ্চ ভাবের ব্যখ্যাতা বহু বক্তাকে ধর্মমন্দিরের বেদী হইতেও বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি— স্বামীজি ঠিক তাঁহাদের মতই একজন বক্তা মাত্র ছিলেন না, তাহা আমি সহজেই ধরিতে পারিয়াছিলাম। ধনী ও অলস উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের তৃপ্তিরজন্য তাহাদের সামনে কাব্য ও তর্কযুক্তির সৌখীন খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করা স্বামীজির একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না...আমাদের মধ্যে যাহাকিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি নিজ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন।'

স্বামীজি যখন প্রথমবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ৩২। মার্গারেট নোব্‌লের বয়স ২৮। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজির বক্তব্যে এক তারুণ্যের দীপ্তি ছিল, ছিল নতুন প্রজন্মের ধর্ম এবং সমাজভাবনা। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি বলেই বিবেকানন্দ ধর্মকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করে দেখতেও চাননি। নিভৃতে বসে ধর্মসাধনার বদলে সন্ন্যাসীর সেবাধর্মের ওপরই জোর দিয়েছিলেন তিনি। মিশনারি, ব্রাহ্ম এবং কট্টর হিন্দু—এঁরা প্রত্যেকেই বিবেকানন্দের নতুন প্রজন্মের ধর্মভাবনা থেকে ছিলেন অনেকটা পিছিয়ে। এঁরা আবদ্ধ ছিলেন স্ব-স্ব গণ্ডিতেই। বিবেকানন্দের ভাবনার ভিতর এই তারুণ্যের দীপ্তিই আকৃষ্ট করেছিল মার্গারেট নোব্‌লকে। কেননা, ২৮ বছরের যুবতী মার্গারেটও প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ছিন্ন করে নতুনের খোঁজই করেছিলেন। সে কারণেই রেক্সহ্যামে সেন্ট মার্কস চার্চের কর্মী হিসেবে জনসেবার কাজ করতে গিয়ে চার্চের প্রাচীনপন্থী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হতাশ করেছিল মার্গারেটকে। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন চার্চের সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন করতে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার ইংল্যান্ডে এসেছিলেন ১৮৯৫ সনের ১০ সেপ্টেম্বর। ২৭ নভেম্বর স্বামীজি ইংল্যান্ড ত্যাগ করে আমেরিকার দিকে যাত্রা করেন। অর্থাৎ, সাড়ে তিন মাসের মতো সময় তিনি প্রথমবার ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেছিলেন। ইংল্যান্ডে তাঁর প্রথম বক্তৃতাই যে বেশ ভালো সাড়া ফেলেছিল এবং আমেরিকার থেকে ইংল্যান্ডে যে তিনি অনেক ভালোভাবে কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ বিবেকানন্দের লেখাতেই রয়েছে। ১৮৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর লন্ডন থেকে শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে, আর 'স্ট্যান্ডার্ড' কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবে, লোকে তা কেমন ভালভাবেই নিয়েছে। 'স্ট্যান্ডার্ড' রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলোর মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার লন্ডনে গিয়ে ৮০ ওকলি স্ট্রীট, (Chelsea London, s.w.) ঠিকানায় একমাস থাকব। তারপর আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে আসব। এ পর্যন্ত দেখছ, ইংলন্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে।'

আমেরিকার থেকে ইংল্যান্ড যে বিবেকানন্দকে বেশি মুগ্ধ করেছিল, এবং ইংলন্ডের মাটিকে তিনি তাঁর কাজের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলেন, তার আরও প্রমাণ বেশ কয়েকটি চিঠিপত্রে রয়েছে। ১৮৯৫-র অক্টোবরে ইংল্যান্ড থেকে শ্রীমতী লেগেটকে একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'এখানে ইংরেজরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। কতিপয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যতিরেকে কেউ কালা আদমীদের ঘৃণা করে না। এমনকি রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য করে কেউ ব্যঙ্গ রব করে না। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, তাহলে কি আমার মুখের রং সাদা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আরশিতে সত্য ধরা পড়ে, তবু এখানে সবাই বন্ধুভাবাপন্ন।

'আবার যে সকল ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ষকে ভালবাসে, তারা হিন্দুদের চেয়েও বেশি 'হিন্দু'। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে, এখানে আমি নিঁখুত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রচুর তরিতরকারি পাচ্ছি। যখন একজন ইংরেজ একটি জিনিস ধরে, সে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ করে। গতকাল জনৈক অধ্যাপক মিঃ ফ্রেজারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি এখানে একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী। তিনি তাঁর অর্ধেক জীবন ভারতে কাটিয়েছেন; প্রাচীন চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে তিনি এতখানি পুষ্ট হয়েছেন যে, ভারতের বাইরে কোন কিছুর জন্য তিনি মোটেই পরোয়া করেন না। শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অনেক চিন্তাশীল ইংরেজ নরনারী মনে করে যে, হিন্দুদের জাতিবিভাজনই সামাজিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। আপনি হয়তো কল্পনা করতে পারবেন না, সেই ধারণা মাথায় নিয়ে তারা সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের—কতখানি ঘৃণা করে।। আবার এখানে পুরুষরা— অতি উচ্চশিক্ষিতেরা— ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীর আগ্রহশীল, সে তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। আমেরিকার চেয়ে এখানে মেয়েদের জীবনের পরিধিও সঙ্কীর্ণতর।'

বিবেকানন্দের এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, প্রথমবার ইংল্যান্ডে পা রেখেই তাঁর ভালো লেগেছিল। স্বামীজির এই চিঠিটি থেকে আরও দু-একটি বিষয় সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, আমেরিকায় যে ধরনের বর্ণ বৈষম্যের শিকার তাঁকে হতে হয়েছিল, ইংল্যান্ডে তা হয়নি। ইংল্যান্ডকে ভালো লেগে যাওয়ার এটাই হয়তো একটা অন্যতম কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত—স্বামীজি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতীয় দর্শন এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে শিক্ষিত ব্রিটিশ সমাজের আগ্রহ মার্কিন সমাজের তুলনায় বেশি। তৃতীয়ত, মার্কিন মহিলাদের তুলনায় তখন ব্রিটিশ মহিলারা অনেকটাই রক্ষণশীল।

আমেরিকার তুলনায় ইংল্যান্ড যে স্বামীজির ভালো লাগছিল তার আর একটি প্রমাণ মেলে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে। ১৮৯৫-র সেপ্টেম্বর মাসে লেখা এই চিঠিতে স্বামীজি বলেছেন, 'শ্যামবর্ণ ব্যক্তিমাত্রেই নিগ্রো—আমেরিকারনদের এই অদ্ভুত ধারণা এখানে মোটেই দেখা যায় না। রাস্তায়

কেউ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েও থাকে না। ভারতের বাইরে আর কোথাও এরূপ সুস্থির বোধ করিনি। ইংরেজরা আমাদের বোঝে, আমরাও তাদের বুঝি। এ দেশে শিক্ষা, সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরের; সেজন্য এবং শিক্ষার ফলে এতটা পার্থক্য।' এই চিঠিতে অন্তত মার্কিন সমাজের সঙ্গে ব্রিটিশ সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্য স্বামীজি করেছেন। এ চিঠিটি পড়লে এ সংশয় আর থাকে না যে, বর্ণ বৈষম্যজনিত যে অস্বস্তির মুখে স্বামীজিকে পড়তে হয়েছিল আমেরিকায়, তা এখানে না হওয়ায় ইংল্যান্ডকে অনেক বেশি ভালো লেগেছিল স্বামীজির। ফলে, ইংল্যান্ডে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তা প্রথম থেকেই স্বামীজির ভাবনায় এসেছিল। ১৮৯৫-এর অক্টোবর মাসেই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা আর-একটি চিঠিতে স্বামীজি বলছেন, 'এখানে চলে এসে একটা ক্লাস গড়ে ফেল না। বলতে গেলে এখানে এখনও কিছুই করে উঠতে পারিনি। কাজ ঠিকমত চালু করতে বেশ সময় লাগে। আমেরিকায় নিউইয়র্কে সামান্য যা কিছু হয়েছে তাতেই আমার দুই বৎসর লেগে গেল।' প্রথমবার ইংল্যান্ডে এসেই যে কেন্দ্র গড়ার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন বিবেকানন্দ তা আরও একটি চিঠিতে বোঝা যায়। কলকাতা থেকে নিজের কোনো গুরু ভাইকে ইংল্যান্ডে এনে কেন্দ্র শুরু করার ভাবনাও তখনই ভেবে ফেলেছিলেন তিনি। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ড থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন—'এ ক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্বশক্তিমান। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

'ইতঃপূর্বে শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) আসিবার টাকা পাঠাইয়াছি ও পত্র লিখিয়াছি। শরৎ বা শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) দুই জনের একজন যাহাতে আইসে তাহাই করিবে। শশীর রোগ যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইবে। চর্মরোগ শীতপ্রধান দেশে বড় প্রবল হইতে পারে না—উহা এই দারুণ শীতে একদম সারিয়া যাইতে পারে। নতুবা শরৎকে।' স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎ ১০ নভেম্বর, ১৮৯৫। তার আগেই শিক্ষিত ব্রিটিশ সমাজ সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা প্রকাশ করেছেন স্বামীজি। লন্ডনে একটি কেন্দ্র গড়ার বাসনাও প্রকাশ করেছেন। মার্গারেট যখন স্বামীজিকে প্রথমবার লন্ডনে দেখেন, তখন কিন্তু স্বামীজির প্রথমবার ইংল্যান্ড বাসের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। এর ঠিক ষোল দিন পরেই স্বামীজি আমেরিকার পথে যাত্রা করেন। ফলে, সে দফায় স্বামীজির বক্তব্য শোনার পর, তা তাঁকে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে, যা-ই সংশয় থাকুক মনে, মার্গারেট কিন্তু এরপরে লন্ডনে স্বামীজির আরও দুটি বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন।

স্বামীজির ওই বক্তব্য শ্রবণ করে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা নিজেই তা লিখে গিয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেন,

' অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আমাদের মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে, বারবার শ্রবণে তাহা বর্ধিত ও গাঢ় হয়। সেই রূপ সেই বক্তৃতা দুইটির লিপিবদ্ধ সারাংশ এখন পড়িতে পড়িতে, তখনকার অপেক্ষা বহুগুণ বিস্ময়কর মনে হইতেছে। কারণ, তখন আমি আচার্যদেবের নিকট যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করিতাম, তাহাতে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল, পরে তাহার জন্য আমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। যখন তিনি বলিতেছিলেন—"জগৎ হইল মাকড়সার জালের মতো, এবং মনগুলি সব মাকড়সা; কারণ মন এক, আবার বহু "—তখন তিনি এরূপ ভাষায় কথা বলিতেছিলেন, যাহা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। তাঁহার বক্তৃতা আমি টুকিয়া লইয়াছিলাম, ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই; মানিয়া লওয়া দূরের কথা। তাঁহার উপদেশাবলী আমি কিভাবে গ্রহণ করিতাম ইহাই তাহার সঠিক বর্ণনা; এমনকি পর বৎসরেও যখন তাঁহার ঐবারকার সমুদয় বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি—কেবল তাহা কেন, বলা চলে, যেদিন আমি ভারতে পদার্পণ করি, সম্ভবত: সেইদিন পর্যন্ত, আমার এই রূপ মনোভাবটা ছিল।' অর্থাৎ বিবেকানন্দের বক্তৃতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁকে ভাবাচ্ছিল, বিবেকানন্দ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলছিল তাঁকে—তবু তাঁর মনে প্রশ্নও যে ছিল, তা নিবেদিতাই নিজমুখে স্বীকার করেছেন। তাঁর আচার্যের সঙ্গে নিবেদিতার এই বিতর্ক কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নানা বিতর্ক, নানাবিধ প্রশ্ন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই বিবেকানন্দকে যে নিজের মতো করে পেতে চেয়েছেন নিবেদিতা, নিবেদিতা-বিবেকানন্দ সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আরও বিস্তারিত আলোচনাতেই তা ধরা পড়বে।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'যে অসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বলে স্বামীজী জগৎ জয় করিয়াছিলেন, তাহার দুর্নিবার প্রভাব অতিক্রম করিবার ক্ষমতা বিদুষী ও বিচারসম্পন্না মার্গারেটেরও ছিল না। সুতরাং ইংলন্ড পরিত্যাগের পূর্বেই তিনি তাঁহাকে আচার্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।' লিজেল রেঁমও প্রায় একই কথা লিখেছেন। লিখেছেন, 'নিজের অধ্যাত্ম অনুভবগুলো চিরে-চিরে বিচার করবার অধিকার কোন মতেই যেন ওর হাত থেকে ফস্‌কে না যায়, সেই ভয়ে সব সময় হুঁশিয়ার থাকে, তর্ক করে প্রাণপণে। কিন্তু ঐ দার্শনিক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই কতবার কল্পনায় ও চকিত আভাস পেয়েছে সেই পরমলগ্নের, যা ওর যুক্তি-বুদ্ধির সকল দাবি মিটিয়ে দিয়েছে অনিঃশেষে।

'মার্গারেট বুঝতে পারে, বিবেকানন্দ ওকে এমন কতকগুলো ভূমির সন্ধান দিয়েছেন যেখান থেকে অন্তরের গহনে ঝাঁপ দিয়ে অনেক সন্ধানী প্রশ্নই নিজের মনকে করা চলে। এতদিন পর এমন ধর্মের খোঁজ ও পেয়েছে, যার ভিত্তি, তত্ত্বসংখ্যান ও

সাধনপাদ্ধতি সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মারফত ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এ-ধর্মে অসম্ভব নয়। মানুষের যা কিছু মহান, যা কিছু উদার, তারই পরে এর বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। এ-ধর্ম গ্রহণ করার অর্থ পাপের ভারে নুয়ে পড়ে কারও দাসত্ব স্বীকার করা নয়, অগ্র্যাবুদ্ধির স্বারাজ্য সিদ্ধিই এর লক্ষ্য।'

আর নিবেদিতা কী লিখেছেন পরবর্তীকালে? লিখছেন, 'স্বামীজীর ইংলন্ড পরিত্যাগের পূর্বেই এমন দিন আসিয়াছিল, যখন আমি তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন তাহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতি প্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই আনুগত্য স্বীকার শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই। আমি দেখিতে পাইলাম যে, ধর্মোপদেষ্টারূপে জগৎকে দিবার জন্য তাঁহার একটি স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু যদি তিনি অন্য কোথাও সত্যের প্রকাশ দেখেন, তাহা হইলে মুহূর্তের জন্যও তিনি ঐ মতবাদের কোন অংশ অসমর্থন করিবেন না। আর এই বিষয়টি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তত দূর পর্যন্তই আমি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম।' অর্থাৎ আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক প্রধান চরিত্র মার্গারেট নোব্‌লকে সেদিন আকৃষ্ট করেছিলেন চিকাগোর ধর্মমহাসভায় ভাষণ দিয়ে আসা হিন্দু সন্ন্যাসী নন। আকর্ষণ করছিলেন যুক্তিবাদী, স্বচ্ছ চিন্তাসম্পন্ন, উদারমনস্ক, জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দ। আর তখন থেকেই মার্গারেট নোব্‌লের জীবনে ঘটতে শুরু করেছিল এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন। ক্রমে ক্রমে তিনি হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন ভারতভূমির প্রতি নিবেদিতা।

মার্গারেটের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন-তারিখ নিয়ে একটু সংশয় দেখা দিতে পারে। নিবেদিতার সব জীবনীকারেরাই লিখেছেন, লেডি মার্গেসনের বাড়ির ওই সভায় বিবেকানন্দকে প্রথম দেখেন মার্গারেট। কিন্তু, ১৮৯৫-এর ৪ অক্টোবর মার্গারেট নোব্‌লকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, 'স্নেহের মার্গারেট, পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। ... আমার ভালবাসা জানবে।' এই চিঠিটি কেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ মার্গারেটকে লিখেছিলেন, তা জানা যায় না, তবে চিঠিটি পড়লে একটু আন্দাজ করা যায়। লেডি মার্গেসনের বাড়িতে দেখা হওয়ার পূর্বেই কোথাও হয়তো বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের একটা স্বল্প সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাতের সূত্র ধরেই এই চিঠি। এ চিঠি থেকে এরকম আন্দাজ করা খুব শক্ত নয় যে, কোনো বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে মার্গারেট হয়তো তখন দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। এবং তা জেনেছিলেন স্বামীজি। যে কারণেই তাঁকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ

দিয়েছিলেন স্বামীজি। পরে, স্বামীজির অনুরক্ত হয়ে পড়ার পরও দীর্ঘ তিনবছর মার্গারেটকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, স্বামীজির ভারতে পা রাখার জন্য। আরও অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণরূপে জানার জন্য। নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী তাঁহার ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড-আগমনকালে উভয়বারই আমি শ্রবণ করিয়ছিলাম, তথাপি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে ভারতে আসিবার পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অতি অল্পই জানিতাম, এমনকি কিছুই জানিতাম না বলিলেও চলে।'

১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথমবার ইংল্যান্ড সফর শেষ করে আমেরিকার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পাঁচ মাস পরে ১৮৯৬-এর এপ্রিলে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য ফিরে এসেছিলেন ইংল্যান্ডে। এই পাঁচ মাসের ভিতরই কিন্তু সংশয়ী, রাজনীতি সচেতন আইরিশ জাতীয়তাবাদী, শিক্ষাব্রতী মার্গারেট নোব্‌লের চিন্তার জগতে একটি বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে পা রেখে তা বুঝেছিলেন বিবেকানন্দ। আর দ্বিতীয়বারের এই ইংল্যান্ড সফরেই তাঁর সঙ্গে মার্গারেটের মানসিক যোগসূত্রটি সুদৃঢ় হয়েছিল।

নয়

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড পরিভ্রমণে আসেন ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে। আর, ১৮৯৬-এর শেষ দিকে, ডিসেম্বর মাসে, ইংল্যান্ড থেকে ভারতের পথে যাত্রা করেন স্বামীজি। ১৮৯৬ সালে ২০ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ এসে কাভারশামে পৌঁছোন। এখানে স্টার্ডির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন তিনি। এর আগেই অবশ্য স্বামীজির ডাকে ১৮৯৬-র ১ এপ্রিল সারদানন্দ ইংল্যান্ডে এসে উপস্থিত হন। সারদানন্দ স্টার্ডির বাড়িতেই উঠেছিলেন। সেখানে দিন সাতেক কাটানোর পর স্বামীজি, সারদানন্দ এবং স্বামীজির সচিব যোশুয়া গুডউইন মিডসে আঁরিয়েতা মুলারের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তার একসপ্তাহ পরে স্বামীজি চলে আসেন লন্ডনে। ওঠেন ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড ঠিকানার বাড়িতে। এই বাড়িটির মালিক ছিলেন লেডি মার্গেসন। স্টার্ডি স্বামীজির থাকার জন্য মার্গেসনের কাছ থেকে এই বাড়িটি ভাড়া নেন। এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল, এই বাড়িতে থেকে স্বামীজি লন্ডনে তাঁর প্রচার কার্য আরও ভালোভাবে চালাতে পারবেন। ৬ মে তারিখে স্বামীজি এই বাড়িতে এসে ওঠেন। পাঁচ মাসের জন্য এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সকালে এবং সন্ধ্যায়—দু দফায় স্বামীজি এখানে বেদান্তের ক্লাস নিতেন।

বাড়ির দোতলায় একটি বড় বসার ঘরে এই ক্লাসগুলি নিতেন স্বামীজি। এই ঘরে একবারে মোট একশোজনের মতো শ্রোতা বসতে পারতেন। ঘরের জানলার সামনে, চেয়ারে বসে, ক্লাসগুলি নিতেন স্বামীজি। পাশেই একটি চেয়ারে বসে গুডউইন স্বামীজির বক্তব্য নোট করতেন। সকালের দিকের ক্লাসগুলিতে মহিলারাই বেশি আসতেন। একতলায় একটি বড় জানালাওয়ালা ঘরকে স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীরা বসবার এবং খাওয়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই ঘরের ঠিক পিছনেই একটি ছোট ঘরে স্বামীজি শুতেন। সেই ঘরটিতে কোনো জানালা ছিল না। ঘরের দরজার উপরে লাগানো কাচ দিয়ে যেটুকু যা আলো এসে পড়ত এই ঘরে। এর প্রায় তিন বছর বাদে, স্টার্ডি

যখন লন্ডনে বিবেকানন্দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানাবিধ সমালোচনা করেছেন, তখন ক্ষুব্ধ-ব্যথিত স্বামীজি একটি চিঠি লিখেছিলেন স্টার্ডিকে। তাতেই আঁচ করা যায় স্টার্ডির এই ভাড়া করা বাড়িতে ঠিক কীরকম ছিলেন তিনি। ১৮৯৯ সালের ১২ নভেম্বর ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, '...ইংলণ্ডে আমার শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের চাপের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ অমানুষিক খাটিয়ে। এখন আবার বিলাস ব্যসন নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছে।। তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটি কোট দিয়েছ, বলতে পারো? কেউ একটা সিগার? এক টুকরো মাছ বা মাংস? তোমাদের মধ্যে একথা বলবার দুঃসাহস কার আছে যে, তোমাদের কাছে আমি খাবার, পানীয়, সিগার, পোশাক বা টাকা চেয়েছি? জিজ্ঞেস কর, ঈশ্বরের নামে বলছি, জিজ্ঞেস কর, তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর এবং সবচেয়ে আগে জিজ্ঞেস কর তোমার নিজের অন্তর্যামী ভগবানকে—যিনি কখনও ঘুমান না।' স্টার্ডির এই প্রসঙ্গটি পরে বিশদে আসবে। তার আগে দেখি ১৮৯৬ সালে, দ্বিতীয় দফায় ইংল্যান্ডে কেমন কাটিয়েছিলেন স্বামীজি।

সেন্ট জর্জেস রোডের এই বাড়িটিতে সকাল নটায় স্বামীজি প্রাতঃরাশ করতেন। প্রাতঃরাশ করতে করতেই খবরের কাগজ পড়তেন এবং স্বামী সারদানন্দ ও গুডউইনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এই আলোচনার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকত সমকালীন রাজনীতি। স্বামীজির ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত পরে তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'এই বাড়িতে থাকার সময়েই স্বামীজি স্রেফ মনের জোরে ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়া থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। সারদানন্দকেও মনের জোর দিয়ে সুস্থ করিয়ে তুলেছিলেন।' এই বাড়িতে থাকাকালীন স্বামীজি কম করেও বেদান্তের ওপর পঁয়তাল্লিশটি ক্লাস নিয়েছিলেন।

১৮৯৬ সনের ১৮ জুলাই পর্যন্ত স্বামীজি এই বাড়িতেই ছিলেন। এখান থেকে স্বামীজি ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করতে বেরোন। সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। ফিরে এসে হ্যাম্পস্টিডে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের বাড়িতেই একটি সপ্তাহ কাটান। এরপর চলে আসেন উইম্বলডনে, এয়ারলি লজে, অঁরিয়েতা মুলারের বাড়িতে। এই সময় স্বামী অভেদানন্দও লন্ডনে এসে পৌঁছোন এবং স্বামীজির সঙ্গে এই বাড়িতে থাকেন। এই বাড়িটি উইম্বলডনের নোব্‌ল পরিবারের বাড়ি থেকে ছিল হাঁটা পথের দূরত্বে। স্বামীজি নিজেই লিখেছেন, এই বাড়িতে তাঁকে বাদাম আর ফলমূল খেয়েই থাকতে হয়েছিল। অঁরিয়েতা মুলারের সঙ্গ যে খুব সুখের হয়নি তা-ও স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীদের নানা লেখা থেকেই জানা যায়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'মিস মুলার একেই স্ত্রীলোক তাতে আবার বুড়ি, মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে, কাহারও সহিত তাঁহার বনিবনা হইত না।' বিবেকানন্দের সঙ্গী সারদানন্দ মিস মুলারের

সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন 'দেবী ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।' আঁরিয়েতো মুলারের এই মেজাজি চরিত্র ধরা পড়েছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচারণেও। একদিনের কথা স্মরণ করে মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, শ্রীমতী মুলার সারদানন্দকে ভারতের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— তিনি দেখেছেন ভারতের রাস্তায় রোগা কুকুর, রোগা গোরুর ভিড়। কিন্তু ইংল্যান্ডে এরকম হয় না। কারণ, গোরু রোগা হলেই ইংরেজরা তাকে মেরে মাংস খেয়ে নেয়। শ্রীমতী মুলার বলেছিলেন, 'We english, are very kind people.'

মহেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, সারদানন্দ নীরবে বোকার মতো অনেকক্ষণ ধরে মিস মুলারের গল্প শুনেছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর তিনি বলে উঠলেন, 'বাপ-মা বুড়োবুড়ি হলে জীবন বড় কষ্টদায়ক হয়, তখন কেন তাদের মেরে ফেলেন না?' মিস মুলারের মা তখন জীবিত। এই কথা শুনে মিস মুলার প্রচন্ড খেপে যান। পরে, এসব শুনে, বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই খ্যাপ্‌তান মাগীর জ্বালা অস্থির করে তুলেছে, ওরে বাপু, তোরা বুড়ি মাগীর সঙ্গে খুব সাবধানে চলবি। যেভাবেই হোক বুড়িকে সন্তুষ্ট করবি। আর পারিনি বাবু, সারাদিন লেকচার করতে হবে, আবার বুড়িকেও সন্তুষ্ট করতে হবে।' এয়ারলি লজের এই বাড়িতে প্রায় ৩০-৪০ জন অভ্যাগতের সামনে ৬ অক্টোবর তারিখে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রেখেছিলেন স্বামীজি। 'উইম্বলডন পোস্ট' কাগজে স্বামীজির সেই সভার খবরও বেরিয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দও তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'এই বাড়িতে থাকার সময়ই স্বামীজি বাচ্চা ছেলের মতো সাইকেল চালানো শিখেছিলেন।'

এয়ারলি লজ থেকে ১০ অক্টোবর তারিখে স্বামীজি গ্রে-কোর্ট গার্ডেন্সের একটি ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে এসে ওঠেন। সেখানে ওঠার কারণ, লন্ডন শহরের কেন্দ্রস্থলে থেকে আরো ভালোভাবে বেদান্ত প্রচার চালানো। তবে, যথেষ্ট পয়সা না থাকার জন্য গ্রে-কোর্ট গার্ডেন্সে বেসমেন্টের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে হয়েছিল স্বামীজিকে। এই বেসমেন্টের অ্যাপার্টমেন্টে কোনো আলো-হাওয়া ঢুকত না। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে এই অ্যাপার্টমেন্টটির নাম দিয়েছিলেন স্বামীজি 'লন্ডনের অন্ধকূপ'। স্বামীজি নিজেই লিখেছেন, 'তারপর এলাম লন্ডনের 'অন্ধকূপে'। এখানে আমাকে প্রায় দিনরাতভোর কাজ করতে হত। সময় সময় ৫-৬ জনের জন্য রান্নাও করতে হত এবং এখানেও বেশিরভাগ রাত্রেই শুধু পাউরুটি আর মাখন খেয়ে থাকতে হত।' এই বাড়িতে অভেদানন্দ এবং গুডউইন থাকতেন স্বামীজির সঙ্গে। গ্রে-কোর্ট গার্ডেন্সে থাকার সময়েই ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট অফিসপাড়ায় একটি বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নেন স্বামীজি। এই ঘরটিতেও স্বামীজি বেদান্তের ক্লাস নিতেন।

দ্বিতীয় দফায় ইংল্যান্ডে থাকাকালীনই বিবেকানন্দ ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে অক্সফোর্ডে গিয়ে দেখা করেন। স্টার্ডিকে সঙ্গী করে ২৮ মে তারিখে বিবেকানন্দ যান ম্যাক্সমুলারের

কাছে। সারাদিন ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসেন তিনি। ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ স্বামীজিকে যথেষ্ট উজ্জীবিত করেছিল। ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসার পর ৩০ মে, ১৮৯৬ তারিখে সারা বুলকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন '....গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আমার বেশ দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তাঁর বয়স ৭০ হলেও তাঁকে যুবা দেখায়; এমনকি তাঁর মুখে একটি বার্ধক্যের রেখা নাই। হায়। ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যেরূপ ভালোবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত। তার উপর তিনি যোগশাস্ত্রর প্রতিও অনুকূলভাব পোষণ করেন এবং তাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না।

'সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইনন্টিন্থ্ সেঞ্চুরি'তে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করার জন্য কি করছেন?' রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বৎসর যাবৎ মুগ্ধ করেছেন। এটা কি সুসংবাদ নয়?'

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন বিবেকানন্দ যে ম্যাক্সমুলারকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনায় রাজি করিয়েছিলেন তার প্রমাণও একটি চিঠিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালের ২৪ জুন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'শ্রীজীর(রামকৃষ্ণ পরমহংস) সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে প্রকাশিত হবে। তিনি তাঁর একখানি জীবনী লিখতে রাজি হয়েছেন। তিনি শ্রীজীর সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে। তোমাকে এ কাজ এখনই শুরু করতে হবে। শুধু যেসব কথা ইংরেজিতে অচল, সেগুলি বাদ দিও। বুদ্ধি করে সে সকল জায়গায় অন্য কথা দিবে। 'কামিনী কাঞ্চন'-কে 'কাম-কাঞ্চন' করবে – lust and gold etc— অর্থাৎ তাঁর উপদেশের সার্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা চাই। এই চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্যক নাই। তুমি উক্ত কার্য সমাধা করে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তর্জমা ও Classify (শ্রেণী ভাগ) করে 'প্রফেসর ম্যাক্সমুলার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংলণ্ড' ঠিকানায় পাঠাবে।'

দ্বিতীয় দফায় তাঁর ইংল্যান্ড সফর যে সফল হয়েছিল তা-ও জানা যায় বিবেকানন্দের চিঠি থেকে। ১৮৯৬ সলের ৮ জুলাই হেল বোনদের একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'ইংরেজ জাতটা খুব উদার। সেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরৎকালের কাজের নূতন বাড়ির জন্য ১৫০ পাউন্ড (প্রায় ২২৫০ টাকা) চাঁদা উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা সেই মুহূর্তেই ৫০০ পাউন্ড দিত। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কাজ করতে চাই —হঠাৎ কতকগুলো খরচপত্র করতে চাই

না। এখানে এই কাজটা চালাতে অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে— ইংরেজ চরিত্রের গভীরতা এখানেই (যে ভাবটা তাদের মাথায় ঢোকে, সেটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না)।'

এই দ্বিতীয়বারের লন্ডন সফরেই অ্যানি বেসান্তের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে থিওজফিস্টদের সভায় বিবেকানন্দ ভাষণ দিয়ে এসেছিলেন। তবে, কৌশলগত কারণেই অ্যানি বেসান্তের বাড়িতে তিনি ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন, তা-ও একটি চিঠিতেই জানিয়েছেন স্বামীজি। ১৮৯৬ সালের ৮ আগস্ট শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতেই স্বামীজি লিখেছেন, 'ভাল কথা, অ্যানি বেসান্ত একদিন আমাকে তাঁদের সমিতিতে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি এক সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিই— কর্নেল অলকট্ও উপস্থিত ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই আমার সহানুভূতি আছে, এটি দেখাবার জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম; কিন্তু আমি কোন আজগুবিতে যোগ দেব না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলো, অধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই শিক্ষক—বিদেশীরা নয়। ইহলোকের বিষয়ে অবশ্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে।' থিওজফিস্ট ভাবধারার প্রতি কোনো সমর্থনই যে তাঁর ছিল না, শুধুমাত্র নিজের ধর্মীয় উদারতা প্রমাণের জন্যই অ্যানি বেসান্তের বাড়ি তিনি গিয়েছিলেন তা এই পত্রে বিবেকানন্দ নিজেই পরিষ্কার করেছেন।

এই দ্বিতীয় দফায় ইংল্যান্ড সফরেই মার্গারেট নোব্লের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বিবেকানন্দের। আচার্য এবং শিষ্যার মধ্যে একটি মানসিক যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল। তার আগে, প্রথম দফায় বিবেকানন্দ ইংল্যান্ড ভ্রমণ শেষ করে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার পর, মাঝের এই চার মাস মার্গারেটও সময় পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিজের মনোভাবটি গড়ে নিতে। দ্বিতীয় দফায় বিবেকানন্দ যখন লন্ডনে এসেছিলেন, তখন তাঁর যাবতীয় সংশয়, যাবতীয় প্রশ্ন—এসব নিয়েই মার্গারেটও যেন প্রস্তুত হয়ে ছিলেন বিবেকানন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন বলে।

১৮৯৫-এর নভেম্বর মাসে প্রথমবার ইংল্যান্ড সফরের পরে বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিলেন— সেই সময়টুকু মার্গারেটের কীভাবে কেটেছিল? লিজেল রেমঁর লেখায় এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম দফায় ইংল্যান্ড সফরের সময় মার্গারেটকে দেখার পরই বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, এঁর ভিতর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, বিবেকানন্দ নিজেই মার্গারেটকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য অনেকটাই সময় দিয়েছিলেন। রেমঁ লিখেছেন, লেডি মার্গেসনের বাড়িতে বিবেকানন্দের ভাষণ শোনার পর মার্গারেট আরো বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজির ভাষণ থাকলে শুনতে যেতেন। তবে, কোনো বড় সমাবেশের বদলে ছোট ছোট ঘরোয়া সভায় স্বামীজির ভাষণ শুনতেই মার্গারেটের বেশি ভালো লাগত। রেমঁ লিখছেন,

'বিবেকানন্দ নীরবে চেয়ে দেখেন। ও আসে তাঁকে দেখতে। তাঁর মুখে একান্ত হিতৈষীর একটুকরো করুণ হাসি। ঐ যেন দুজনের আলোচনার গ্রন্থি। ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ওর তেজোদৃপ্ত স্বভাবের জোরে দুঃসাহসীর মতো তাঁর সামনে এসে ও প্রশ্ন করে। নিজের ব্যক্তিত্বকে ও খাটো করতে রাজী নয়। তিনি কখনও মার্গারেটকে 'আমার শিষ্যা' বলে উল্লেখ করতেন না, জানতেন সে সময় এখনও আসেনি। কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ সম্ভবনা যে উজ্জ্বল, সে কথা স-প্রশংসায় বলতে তাঁর বাধত না। সঙ্কীর্ণ অহং-এর অন্তরালে তিনি দেখেছিলেন ওর দীপ্ত স্বরূপ। ওর অন্তরৈশ্বর্যের খবর ও নিজে রাখে না। ওর চরিত্রের আশ্চর্য সংবেগ, দুর্জ্ঞেয় পরমসত্যের প্রতি ওর সহজ বিশ্বাস এগুলো তিনি তখনই ধরতে পেরেছিলেন। ভারতের কাজ করতে যেমন মেয়ে দরকার, ও ঠিক তেমনটি। কিন্তু যে ফল আপনি পরিণতি লাভ করছে তাকে নিয়ে তার গর্ব করার কি আছে? ওর অন্তরে যে ভাবের বীজ পুষ্ট হচ্ছে, তা হয়তো একদিন তাঁর কাজে লাগবে এই পর্যন্ত।'

রেমঁর এই লেখা থেকে অন্তত তিনটি ধারণা করা যায়। প্রথমত, ইংল্যান্ডে প্রথমবার মার্গারেটের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই বিবেকানন্দ তাঁর প্রতিভা এবং দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বিবেকানন্দ এ-ও উপলব্ধি করেছিলেন যে, মার্গারেটের উপর চট জলদি কোনো প্রভাব খাটাতে যাওয়া উচিত হবে না। যে কারণেই, রেমঁর লেখা অনুযায়ী, তখনও বিবেকানন্দ মার্গারেটকে 'আমার শিষ্যা' বলে উল্লেখ করতেন না। রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রসারিত করার কাজে মার্গারেট যে উপযুক্ত হবেন এমনটি তখনই মনে হয়েছিল বিবেকানন্দের। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দকে লেডি মার্গেসনের বাড়িতে দেখার পর স্বামীজির বিভিন্ন ঘরোয়া সভায় তাঁকে যতই দেখেছিলেন, ততই এক ধরনের মুগ্ধতা মার্গারেটের মনে জন্ম নিচ্ছিল। এবং তৃতীয়ত, মুগ্ধ হচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজির সামনেও নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে মার্গারেট প্রথম থেকেই চলতে অভ্যস্ত ছিলেন।

তাঁর রামকৃষ্ণ আন্দোলনের কাজে মার্গারেটকে উপযুক্ত মনে করেছিলেন বিবেকানন্দ এবং মার্গারেটকে এই কাজে তিনি যে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালের ৭ জুন মার্গারেটকে লেখা একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই : মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

'কুসংস্কারের শৃঙ্খলে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত —সে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়নকারী, সে আমার আরও বেশী করুণার পাত্র।

'এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে বেশী সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।

'এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে— তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্ত্বের কোন্ কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আঁটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগো।' এই তাৎপর্যপূর্ণ পত্রটি মার্গারেটের হাতে পৌছে দিয়েছিলেন স্বামীজির ব্যক্তিগত সচিব গুডউইন।

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসারের কাজে, বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে বিবেকানন্দ যে মার্গারেটকে সর্বতোভাবেই পাশে চেয়েছিলেন, তার উল্লেখ নিবেদিতার লেখাতেও পাওয়া যায়। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে ১৮৯৬ সালে স্বামীজির দ্বিতীয়বারের লন্ডন সফরের কথা স্মরণ করে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আর একদিন ঘটনা প্রসঙ্গে ইহা অপেক্ষা সামান্য এক ঘটনা উপলক্ষে তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন— "স্বদেশে নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সঙ্কল্প আছে। আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।" আমি বুঝিলাম, আমার নিকট এমন এক আহ্বান আসিয়াছে, যাহা জীবনকে পরিবর্তিত করিয়া দিবে। এই সঙ্কল্পগুলি কী ধরনের তাহা আমি জানিতাম না, এবং ভাবী জীবনের যে চিত্র অঙ্কনে আমি অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা ত্যাগ করা সেই সময়ে এত কষ্টকর বোধ হইয়াছিল যে, ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করিতে চাহি নাই।'

শুধু স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজেই যে বিবেকানন্দ মার্গারেটের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তা নয়; নিবেদিতার লেখার এই অংশেই উল্লেখ আছে সাম্রাজ্যবাদী

শোষণের বিরুদ্ধে স্বামীজির তীব্র ক্ষোভ এবং ঘৃণার পরিচয়ও সেই সময় তিনি পেয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'একবার আমি লন্ডন নগরীকে সৌন্দর্যশালিনী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। স্বামীজি তীব্রস্বরে উত্তর দেন, "আর তোমরা অন্য শহরগুলিকে শশ্মান করে তুলেছ।" আমার নিকট লন্ডন নগরীর রহস্যময়তা ও দুঃখপূর্ণতা বহুদিন হইতে সমগ্র মানবজাতির সমস্যা বলিয়াই বোধ হইত—সমগ্র জগৎ যাহা চাহিতেছে, তাহারই একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। "আর তোমরা তোমাদের এই নগরীকে সৌন্দর্যশালিনী করবার জন্য অন্য নগরগুলিকে শ্মশানপুরী করে তুলেছ।" তিনি আর বেশি কিছু বলিলেন না, কিন্তু কথাগুলি বহুদিন ধরিয়া আমার কানে বাজিতে লাগিল।' মার্গারেটের জাতীয়তাবোধ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ— এসবের সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগসূত্রটা কোথায় তা বুঝে নিতে এরপর আর অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়বার এই ইংল্যান্ড সফরকালেই স্বামীজির স্বদেশপ্রেমের পরিচয়টিও মার্গারেট পেয়েছিলেন। নিবেদিতার গ্রন্থেই উল্লেখিত, 'যে মহিলা বন্ধু আমায় পরে ভারতে তাঁহার সহকর্মিণী হইবার জন্য আহ্বান করেন, এক সন্ধ্যাকালে স্বামীজি ও আমি ঘন্টাখানেকের জন্য লণ্ডনে তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে, আমি স্বামীজিকে জানাই যে, তাঁহার কার্যে যোগদান করিতে আমার আগ্রহ আছে। স্পষ্টতই তিনি ইহা শুনিয়া বিস্মিত হন, কিন্তু শান্তভাবে বলেন, "আমার কথা বলতে গেলে, আমি স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যে কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তা সম্পন্ন করবার জন্য প্রয়োজন হলে দুশবার জন্ম গ্রহণ করব।"

নিবেদিতার এই লেখাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়, ১৮৯৬ সালে, ঘনিষ্ঠভাবে যখন তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, তখন স্বামীজির চরিত্রের এই দিকগুলিই তাঁকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করেছিল।

বিবেকানন্দের প্রথম এবং দ্বিতীয় ইংল্যান্ড সফরের মধ্যবর্তী সময়টুকুতেও যে মার্গারেট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবলভাবেই জড়িত ছিলেন সে হদিশও রেমঁর লেখায় পাওয়া যায়। রেমঁ জানিয়েছেন, মার্গারেটের বন্ধু রোনাল্ড ম্যাকনিল তখন আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের প্রবল বিরোধী। ম্যাকনিল তখন স্বায়ত্তশাসনের প্রবল বিরোধিতা করছেন। স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ সংসদে ভাষণ দিয়েছেন। সেই নিয়ে চারদিকে তখন বিতর্ক। মার্গারেট স্বায়ত্তশাসনের অন্যতম সমর্থক। আয়ারল্যান্ডে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে তখন মার্গারেট জোরদার প্রচার করেছেন, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। ম্যাকনিলের আক্রমণের সমালোচনার হাত থেকে মার্গারেটও রেহাই পাচ্ছেন না।

তবে, বিবেকানন্দকে প্রথম দেখার পর এবং তাঁর বক্তব্যগুলি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার পর এক ধরনের আন্তর্জাতিকতাবাদও যে মার্গারেটকে ভাবাচ্ছিল না এমন নয়। শুধু

নিজেকে রাজনৈতিক গণ্ডিটুকুর ভিতর আবদ্ধ না রেখে আরও প্রসারিত করা যে দরকার এরকমই মার্গারেট ভাবছিলেন। রেমঁ লিখছেন, 'ও বলে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও মানুষ ক্রমে ক্রমে নিজেকে বিস্ফারিত করবে। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতার 'পরে তার কর্তব্য আছে, কর্তব্য আছে আপন গ্রাম-নগর-দেশের প্রতি, কর্তব্যের পরিধি ছড়িয়ে যায় ক্রমেই। কিন্তু এসব ক্ষুদ্র স্বার্থ। যার জন্য এমনি করে প্রাণপাত করে মানুষ, তা তখনই লোকোত্তর হয়ে ওঠে যখন সে হয় বিশ্বের নাগরিক, বসুধা হয় তার কুটুম্ব, মানুষের সেবা করতে গিয়ে দেবতাকে সে দেখে।' আসলে, বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ বা স্বদেশপ্রেম যে কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, বরং দেশকে ভালোবেসে সঙ্কীর্ণতার বাইরে বেরোতেই যে বলতেন স্বামীজি, তা উপলব্ধি করেছিলেন মার্গারেট। নিবেদিতার লেখাতেই রয়েছে, 'স্বামীজি একদিন আমাকে বলেন, "ইংরেজরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সর্বদা তাদের চেষ্টা দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা।" আমার সম্পর্কে এ মন্তব্যটা যথার্থ ছিল। পিছনে ফিরিয়া আমার জীবনের ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারি, আমার আদর্শগুলি তখন পর্যন্ত কতদূর সঙ্কীর্ণ ছিল।' বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার মানসিকতার মধ্যে এই সাযুজ্য লক্ষ্য করেই মণি বাগচি নিবেদিতার জীবনী রচনা করতে গিয়ে লিখছেন, 'মার্গারেটের স্বাধীন প্রকৃতি ও আইরিশ প্রীতির সহিত মিলিয়াছিল বিবেকানন্দের স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বদেশ-প্রীতি। পরবর্ত্তীকালে, এই মার্গারেটের ভিতর হইতে যখন নিবেদিতার আবির্ভাব হইল, তখন স্বামীজির ভারত-প্রীতি শিষ্যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সংক্রামিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দের প্রতি মার্গারেটের আকৃষ্ট হইবার ইহাই মুখ্য কারণ। ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্মভাব গৌণ কারণ।' নিবেদিতার বিভিন্ন রচনা এবং নিবেদিতার জীবনের নানা ঘটনাবলী পাঠ করলেও কিন্তু এই ধারণাই প্রবল হয়।

বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বারের ইংল্যান্ড সফরের বর্ণনা করতে গিয়ে রেমঁ লিখেছেন, 'সপ্তাহে চারবার স্বামীজি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের আলোচনা করেন। তাঁর ঐকান্তিকতা দেখে মনে হয় যেন ভারতেই আছেন তিনি।...শুক্রবারটি রাখা হয়েছে প্রশ্নোত্তরের জন্য। প্রত্যেকদিন স্বামীজিকে দস্তুরমত জেরায় ফেলে মার্গারেট, অন্যেরা শোনে উন্মুখ আগ্রহে। ওর সুস্পষ্ট কণ্ঠে আসন্ন সংগ্রামের সূচনা : 'কিছু মনে করবেন না স্বামীজি, আপনি যে বললেন...'শুরু হয় তুমুল তর্ক। দ্বিতীয় সারিতে দক্ষিণ ঘেঁষে মার্গারেট বসে। অমনি সবার চোখ পড়ে ঐদিকে।

'ওর চাইতে বয়সে কিছু বড় এক আমেরিকান মহিলার সঙ্গে এখানে ওর আলাপ হয়েছে, তাঁর পাশেই ও সবসময় বসে। ভদ্রমহিলার নাম ম্যাক্লয়েড, স্বামীজির সঙ্গে তাঁর বহুদিনের আলাপ। পয়সা-কড়ি ঢের আছে, মতটা উদার, চলা-ফেরায় খুবই স্বচ্ছন্দ। বিবেকানন্দকে আচার্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে উনি লন্ডনে এসেছেন।

মার্গারেটকে তাঁর মনে ধরেছে, প্রায়ই একখানা 'ক্যাব' ভাড়া করে ওকে উইম্বলডনে পৌঁছে দেন। পথে নানা বিষয়ে কথা হয়। দুজনেরই দর্শনালোচনায় সমান আগ্রহ। এমনিভাবে ওঁদের মধ্যে যে-অন্তরঙ্গতার শুরু হল, আজীবন তা অক্ষুণ্ণ ছিল।'

এই মার্কিন ভদ্রমহিলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। স্বামীজির আমেরিকান অনুগামী। স্বামীজি আদর করে তাঁকে সম্বোধন করতেন 'জো'। নিবেদিতা ডাকতেন 'ইউম' বলে। জোসেফিন ম্যাকলিয়ড স্বামীজির আহ্বানে বেশ কয়েকবার ভারতে এসেছেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠায় পিছনে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন প্রসারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। আজন্ম সুহৃদ ছিলেন স্বামীজির। নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে উঠেছিলেন। এতটাই ঘনিষ্ঠ যে, প্রতিদিন একটি করে চিঠি লিখতেন নিবেদিতা জোসেফিনকে। জোসেফিনকেই নিবেদিতা তাঁর ব্যক্তিগত সমস্ত কথা জানাতেন। বলতে গেলে, জোসেফিনকে লেখা নিবেদিতার চিঠিগুলি পড়লেই নিবেদিতার দৈনন্দিন জীবনের আভাসও পাওয়া যায়।১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীমতী ম্যাকলিয়ডকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে নিবেদিতা বিবেকানন্দের উল্লেখ করে বলেছিলেন '...don't you remember Swamiji telling us? never thought He could bring others in. He could only show what He had and let them do as they liked and go their own ways.'

জোসেফিন ম্যাকলিয়ড তাঁর স্মৃতিচারণায় স্বামীজি সম্পর্কে লিখেছেন, 'On the twenty-ninth of January 1895, I went with my sister in 54 West 33rd street, New York, and heard Swami Vivekananda in his sitting room where were assembled fifteen or twnety ladies and two or three gentlemen. The room was crowded. All the armchairs were taken; so I sat on the floor in front row. Swami stood in the corner. He said something, the particular words of which I do not remember, but instantly to me that was truth, and the second sentence he spoke was truth, and the third sentence was truth. And I listened to him for seven years and whatever he uttered was to me Truth. From that moment life had a different import. It was as if he made you realm; that you were in eternity. It never altered. It never grew. It was like the sun that you will never forget once you have seen it.

'...I feel that Swamiji is a Rock for us to stand upon. That was his function in my life, not worship, not glory, but a steadiness under one's feet for experiments! At last I'm free. It's so curious to feel free, not needed any more in the West, but all my characteristics– in India.' বোঝাই যায়, তাঁর এই আমেরিকান অনুরাগিণীকে ভারত,

ভারতীয় দর্শন এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতটা আগ্রহী করে তুলতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে স্বামীজি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে পরপর মায়াবাদের ওপর বক্তব্য রেখেছিলেন। রেমঁ লিখেছেন, স্বামীজির এই মায়াবাদের ব্যাখ্যা মার্গারেটের কাছে সহজবোধ্য ছিল না। বরং ক্রমশই তা কঠিন হয়ে উঠেছিল। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কেননা, প্রাচ্যের বেদান্ত দর্শনটা বিবেকানন্দের আগে মার্গারেটের কাছে কার্যত অজানাই ছিল। পাশ্চাত্যের মিশনারিদের বক্তব্য এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে মার্গারেটের সম্যক ধারণা থাকলেও প্রাচ্যের দর্শন এবং সেই দর্শনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, বলতে গেলে, মার্গারেট তখনও প্রায় অজ্ঞই ছিলেন। রেমঁর কথায়, 'মায়াবাদ মার্গারেটের তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে একটা দুরন্ত বাধা হয়ে উঠল। কিছুতেই ওটা আয়ত্ত হয় না। প্রায় হয়রান হয়ে পড়ল ও। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত, নিজের মতো করে মায়াবাদকে এই বলে তরজমা করল, "মায়া বলতে বোঝায় যেন এই আছে, এই-নাই একটা ঝলমলানি। সত্য-মিথ্যায় জট পাকানো একটা রহস্য। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়-নির্ভর মনের মাধ্যমে তার সঙ্গে ঘটে আমাদের পরিচয়। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, "এই সব কিছু ছেয়ে আছেন যিনি, তিনিই সেই।" মায়া আর ব্রহ্ম এই দুটি তত্ত্বের বন্ধনীর মাঝে ধরা পড়েছে হিন্দুর গোটা অধ্যাত্মশাস্ত্রটা।'

এই সময়ের কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা তাঁর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'স্বামীজি নিজে মনে করিতেন, এইকালে মায়া-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলির মধ্যেই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটিয়াছে। মনোযোগ সহকারে ঐগুলি পাঠ করিলেই ধারণা করিতে পারা যায় যে, আধুনিক ইংরেজী ভাষায় ঐ সকল ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি কি দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ অধ্যায়গুলি আগাগোড়া পাঠ করিলে আমাদের মনে হয়, সুপষ্টভাবে অনুভূত একটি ভাবকে প্রকাশের অনুপযোগী এক ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। স্বামীজি বলেন, "মায়া" শব্দটি ভুল করিয়া মিথ্যাজ্ঞান (delusion) অর্থে বুঝা হয়। সর্বপ্রথম ইহা দ্বারা ইন্দ্রজালের (magic) মতো একটা কিছু বুঝাইত, যেমন 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"— ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়ায় নানারূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অর্থ লোপ পায়, এবং শব্দটির এক এক করিয়া বহু অর্থান্তর ঘটে। কিরূপে এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে একটি অর্থ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল,তাহার নিদর্শন নিম্নোক্ত বাক্যে পাওয়া যায়—" নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অসুতৃপ উক্ থাশাসশ্চরন্তি।"—অর্থাৎ, যেহেতু আমরা বৃথা বাক্যলাপ করিয়া থাকি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি এবং বাসনারই অনুবর্তন করি— সেই হেতু সত্য বস্তুকে যেন কুয়াসার দ্বারা আচ্ছাদিত

করি। অবশেষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকেই দেখা যায়, শব্দটি উহার সর্বশেষ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে—"মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্", অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর যিনি মায়াধীশ, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। স্বামীজি বলেন, বেদান্তে "মায়া" শব্দ সর্বশেষে যে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার অর্থ —যাহা ঘটিতেছে তাহার উল্লেখমাত্র— প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা এবং চতুর্দিকে যাহা দেখিয়া থাকি, তাহারই উল্লেখ।'

এই সময় বিবেকানন্দের বেদান্ত সভাগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে নিবেদিতা আর-এক জায়গায় লিখেছেন, 'একদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাসে কথায় কথায় কিছু বাদানুবাদ ঘটে। সহসা স্বামীজি, যাহাকে তিনি 'বোমা ছুড়িয়া চমৎকৃত করা' বলিতেন সেইরূপ এক সংকল্পের বশবর্তী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জগতে আজ কিসের অভাব জানো? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, " ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল। কে কে যেতে প্রস্তুত?" বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কাহাকেও কাহাকেও তিনি ইঙ্গিত করিতেছেন তাঁহার সহিত যোগদান করিতে। "কিসের ভয়"? তারপর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখনও আমার কানে বাজিতেছে, "যদি ঈশ্বর আছেন একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কি?"

'তাঁহার ক্লাসের এক সদস্যাকে তিনি এই সময় এক পত্রে লেখেন, "জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজও সেইরূপ মানুষেরই প্রয়োজন, যাদের জীবন জ্বলন্ত প্রেমস্বরূপ, যারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রত্যেক বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে। জাগো জাগো মহাপ্রাণ, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে।"

ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দ এই সময় কী ভাবছিলেন তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাঁর লেখা একটি চিঠিতে। জনৈকা শিষ্যাকে ওই চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তন বিরোধী থসথসে জেলিমাছের মতো ওই বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কিনা দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব— একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল— সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ। যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নন— তত্ত্ব মাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র।... ধর্ম এছাড়া আর কিছুই নয়, এই একত্ব অনুভব বা প্রেমই এর সাধন; সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন?'
বিবেকানন্দের এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, লন্ডনে বেদান্তের ব্যাখ্যা যখন তিনি

করছিলেন, তখন পাশাপাশি, ধর্ম আন্দোলনে নতুন ভাবধারা, নতুন চিন্তা এবং ধর্ম ভাবনায় সংস্কার আনার কথাও তিনি গুরুত্ব দিয়েই ভাবছিলেন। তদুপরি, ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দের ওই বেদান্ত ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে এ-ও বোঝা যাচ্ছিল যে, অদ্বৈত সাধনার ওপর তিনি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, যা পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছিল পরে তাঁর শিষ্য ব্রিটিশ দম্পতি ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এবং শ্রীমতী সেভিয়ারের সহায়তায় মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপনে।

তবে, বিবেকানন্দ এবং মার্গারেটের ভাব বিনিময় যে শুধুমাত্র ধর্মীয় তত্ত্ব আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ১৮৯৫-এ বিবেকানন্দকে প্রথম দেখার পর, যাবতীয় সংশয় সত্ত্বেও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে এবং বক্তব্যে মার্গারেট মুগ্ধ হয়েছিলেন আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্বামীজির প্রতি এ সত্য; নিবেদিতা নিজেই পরে লিখেছেন যে, ১৮৯৫ সালে প্রথমবার ইংল্যান্ড পরিভ্রমণের শেষে স্বামীজি আমেরিকায় ফেরার আগেই 'এমন দিন আসিয়াছিল, যখন আমি তাঁহাকে 'গুরুদেব' (Master) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতি প্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই আনুগত্য স্বীকার শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই। আমি দেখিতে পাইলাম যে, ধর্মোপদেষ্টা রূপে জগৎকে দিবার জন্য তাঁহার একটি স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু যদি তিনি অন্য কোথাও সত্যের প্রকাশ দেখেন, তাহা হইলে মুহূর্তের জন্য তিনি ঐ মতবাদের কোন অংশ সমর্থন করিবেন না। আর এই বিষয়টি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ততদূর পর্যন্তই আমি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম।' নিবেদিতার এই লেখাতেই পরিষ্কার, ১৮৯৫-এ ধর্মপ্রচারক বিবেকানন্দের বদলে যুক্তিবাদী, স্বদেশপ্রেমী বিবেকানন্দই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিলেন। স্বামীজির প্রথমবার ইংল্যান্ড পরিভ্রমণকালেই যদিও মার্গারেট তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেছিলেন, তবু গুরু-শিষ্যার ঘনিষ্ঠতা কিন্তু গড়ে ওঠে ১৮৯৬ সালে, স্বামীজির দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ কালে। তবে, ১৮৯৫ সালের ৪ অক্টোবর মার্গারেটকে লেখা স্বামীজির চিঠিটিকে (আগে এর উল্লেখ করেছি) যদি ধরা যায়, তাহলে মনেই হবে, প্রথমবার ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ কালে লেডি মার্গেসনের বাড়ির ওই সভার আগেই মার্গারেটের সম্পর্কে বিশদ তথ্য কারও কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। এই প্রথম চিঠিটিতেই বিবেকানন্দ মার্গারেটের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। চিঠির সেই পঙ্‌ক্তি কয়টি আর একবার উল্লেখ করছি—'...পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।... আমার ভালবাসা জানবে।' আগে বলেছি, কী পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ এই চিঠি মার্গারেটকে লিখেছিলেন, বা কে তাঁকে তখন মার্গারেট সম্পর্কে সম্যক অবহিত করেছিল— তা জানা যায় না।

১৮৯৬ সালে দ্বিতীয়বার স্বামীজির ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ কালে বিবেকানন্দ এবং মার্গারেট ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে বুঝলেন। দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দকে দেখার পর মার্গারেটের মনে হল, স্বামীজিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁকে আশ্বাস এবং আশ্রয় দিতে পারবেন। তাঁকে চলার পথে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ করতে পারবেন। তেমনি এই সময়েই বিবেকানন্দও নিবেদিতার কর্মকাণ্ড এবং চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আরও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হলেন। হৃদয়ঙ্গম করলেন ভারতে তিনি যে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করেছেন, সেই কাজে মার্গারেট তাঁর অন্যতম সহায়ক কর্মী হতে পারবেন। মার্গারেটের ভিতর সম্ভাবনা যে তখন প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিবেকানন্দ তাঁর প্রমাণ ১৮৯৬ সালের ৭ জুন লেখা একটি চিঠি। মার্গারেটকে লেখা ওই চিঠির এক জায়গায় বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'তোমার মধ্যে একটি জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে।' কী কাজে তিনি মার্গারেটকে চান এই চিঠিতে কোথাও তার কোনো ইঙ্গিত দেননি স্বামীজি। শুধুমাত্র মার্গারেটের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কোন কাজে তিনি মার্গারেটকে চান সে ইঙ্গিত পরিষ্কারভাবে স্বামীজি হয়তো তখন দেননি এই কারণেই যে, মার্গারেটকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আরও সময় তিনি দিতে চাইছিলেন। নিজে থেকে তাঁর উপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন না তিনি। বিবেকানন্দ-নিবেদিতা— গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভবিষ্যতেও স্বামীজি নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবেই চলতে দিয়েছেন। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা নির্দেশ তাঁর ওপর জোর করে আরোপ করেননি। এমনকী কখনও কখনও নিবেদিতার চলার পথ তাঁর পছন্দ না হলেও, তা করেননি। আসলে, নিবেদিতার চরিত্রের যে স্বাধীনচেতা দিকটি ছিল তা সম্পর্কে প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বুঝেছিলেন, নিবেদিতাকে চলার পথে স্বাধীনতা দিতেই হবে। আর-পাঁচজন শিষ্য-শিষ্যার মতো তাঁকে মঠ-মিশনের নিয়মতন্ত্রে বেঁধে রাখা যাবে না।

১৮৯৫ সালে বিবেকানন্দকে প্রথম দেখার পর এবং ১৮৯৬ সালে স্বামীজির আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতীয় জীবনযাত্রা, রাজনীতি, ধর্মচর্চা, সংস্কৃতি—এসব সম্পর্কে মার্গারেট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন, তা কিন্তু নয়। বরং, পরবর্তীকালে নিবেদিতা নিজেই স্বীকার করেছেন, ১৮৯৮ সালে ভারতে আসার আগে পর্যন্ত ভারতীয় জীবনযাত্রা, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্মচর্চা সম্পর্কে তাঁর সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। এমনকী, ১৮৯৫ এবং ১৮৯৬ সালে লন্ডনে বিবেকানন্দকে দেখার পরও যে স্বামীজির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিলেন, তা-ও নিবেদিতা লিখেছেন 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে। লিখেছেন, 'আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী তাঁহার ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে

ইংলন্ডে আগমনকালে উভয় বারই আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তথাপি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ভারতে আসিবার পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অতি অল্পই জানিতাম; এমনকি কিছুই জানিতাম না বলিলেও চলে।' তাঁর এই অজ্ঞতা অবশ্য মার্গারেট কখনই আড়াল করার চেষ্টা করেননি। প্রথমবার ভারতে আগমনের পর ১৮৯৮ সনের ৩১ জানুয়ারি শ্রীমতী হ্যামন্ডকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন মার্গারেট, সেখানেও তাঁর না জানাটাকে তিনি অকপটেই প্রকাশ করেছেন। ওই চিঠিটিতে মার্গারেট লিখেছেন, 'The gentleman who was sent to teach me Bengali yesterday began by laying down two little books– "Containing our Lord's Saying in Bengali– which you shall translate as soon as you are able." I think it says world for the unsectarian character of Swami that my reply was– " Our Lord?- But which? - Krishna?" Fortunately he misunderstood my difficulty and said " Yes, our Lord, Sri Ramakrishna"- and then I knew;'

তবে, বিবেকানন্দের মায়াবাদের ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হলেও, ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনা ততদিনে অনেকখানিই আলোড়িত করেছিল মার্গারেটকে। ১৮৯৭ সালে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় ওই বিষয়ে নিজের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্গারেট (তখনও নিবেদিতা হননি) লিখেছিলেন, 'To one, the very conception of a religion which preached universal tolerance– which held that we proceed from truth to truth, and not from error to truth–was enough... to another, deeply versed in our modern literature and especially in poetry, with it's ever recurring flashes of supreme intuition–it was the never said before. Others there were who have been vaguely troubled by the anthropomorphism of our christian doctrine of the Fatherhood of God, and this found in Bhakti-Yoga that such a conception was not final, but only one of the series passing by degrees into the sense of Divine union... yet again, it was the unity of Man that was the touch needed to rationalise all previous experiences and give logical sanction to the thirst for absolute service never boldly avowed in the past. Some by one gate, and some by other, we have all entered into a great heritage, and we know it.'

১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দ-মার্গারেটের দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের পর গুরু-শিষ্যা কীভাবে ক্রমশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, তার একটি বিস্তারিত বিবরণ রেমঁ দিয়ে গিয়েছেন। রেমঁ লিখছেন, 'বিনা আড়ম্বরে বিশ্বস্ত হৃদয়ে ও (মার্গারেট) তাঁকে (বিবেকানন্দ) সব কথা বলে। তার সমস্যাগুলো তিনি সমাধান করে দেবেন এমন

আশা ও করে না, তিনি শুধু শিখিয়ে দেবেন কেমন করে মিথ্যা আসক্তি আর মমতার সংস্কার কাটিয়ে অহং-বর্জিত হয়ে ও সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারবে। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে নিজের চারপাশে ও যে একটা গণ্ডি রচেছিল, সেটা নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা ওর এই প্রথম। নিজের শুদ্ধ সত্তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় চায় ও। হয়তো ভাবতেও পারেনি কেমন করে বিবেকানন্দ ওকে অলক্ষিতে ভাবের রসদ যুগিয়েছেন, যার ফলে দিগ্‌ভ্রষ্ট মনের সংশয়, আঁধার পিছনে ফেলে ক্ষিপ্র গতিতে ও আজ এগিয়ে চলেছে।'

রেমঁর লেখায় এই সময়কালের বিবরণ পড়লেই বোঝা যায় ধর্মপ্রচারকের পোশাকের আড়ালে বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিক চরিত্রটির জন্যই মার্গারেট আরও বেশি কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁর। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যায়, মার্গারেটের পিতা এবং মাতামহও ধর্মযাজকের বেশের আড়ালে ছিলেন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মী। পিতা এবং মাতামহের চরিত্রের ছায়াই হয়তো বিবেকানন্দের ভিতর দেখেছিলেন মার্গারেট। রেঁম-র লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, এই সময় থেকেই বিবেকানন্দের উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে মার্গারেটের। মার্গারেটের মনে হয় ওঁর ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিও বিবেকানন্দের গোচরে আনা দরকার এবং তা নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে আলোচনা করাও দরকার। মার্গারেটের এই মানসিকতার একটি বিশ্লেষণ অবশ্যই করা যায়। শৈশবে এবং কৈশোরে যথাক্রমে পিতা এবং মাতামহই ছিলেন মার্গারেটের বড় আশ্রয়স্থল। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা এবং কর্মধারাই প্রথমাবধি মার্গারেটকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শৈশবে এবং কৈশোরে পিতা এবং মাতামহকেই নিজের ভরসার জায়গা বলে যেহেতু মনে করতেন মার্গারেট, যৌবনে বিবেকানন্দের মধ্যে তাঁর প্রয়াত পিতা আর মাতামহের ছায়া যদি প্রত্যক্ষ করে থাকেন মার্গারেট, তবে স্বাভাবিকভাবেই সেই বিবেকানন্দকেই যে তিনি অন্যতম ভরসাস্থল হিসাবে বেছে নেবেন—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁর শিষ্যাটি যে তাঁকে ভরসাস্থল হিসাবে দেখছেন, ভবিষ্যতে তাঁকে নির্ভর করেই পথ চলতে চাইছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বিবেকানন্দও। শুধু তা-ই নয়, শিষ্যার এই ভরসাস্থলটি তিনি কোনোদিন ভেঙেও দেননি। বরং, চিরকাল তাঁর পাশে থাকার আশ্বাসই জুগিয়ে গিয়েছেন। মার্গারেট প্রথমবার ভারতে আসার আগে, ১৮৯৭ সনের ৩ নভেম্বর বিবেকানন্দ তাঁর একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে (এডওয়ার্ড স্টার্ডি) লিখব। সে তোমার ঠিকই বলেছে, বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি একটুকরো রুটি পাই, নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকুই পাবে।' এতখানি ব্যক্তিগত ভরসা, এর পূর্বে বা পরে বিবেকানন্দ তাঁর অন্য কোনো শিষ্য বা শিষ্যাকে দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

রেমঁ লিখছেন, 'আর একটা কাজ করল মার্গারেট। নিজের কাজকর্মের কথা বলল তাঁকে এতদিনে, সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও পেল। স্বামীজি হলেন আজন্ম সংস্কারক। কিন্তু তিনি ভাবুক, দেশের প্রতি তাঁর গভীর মমতা আর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশায় প্রচন্ড ক্ষোভ; এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে উঠতে পারেননি কোনোদিনই। বাড়িতে যখন ছিলেন, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা যে কী মর্মান্তিক সে-অভিজ্ঞতা তাঁর তখনই হয়েছিল। মার্গারেটেরও এ অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের বাধাকে ও অনায়াসে কাটিয়ে উঠেছে। মানুষের জীবনে আর যেসব কঠিন সমস্যা আছে ও এখন তা নিয়েই ভাবে।'

রেমঁর লেখা নিবেদিতার জীবনীগ্রন্থের এই অংশ পাঠ করলে জানা যায়, মার্গারেট তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক আদর্শ কোনোটিই গোপন করেননি বিবেকানন্দের কাছে। বরং, তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করাতে বিবেকানন্দকেও নিয়ে গিয়েছেন তিনি। রেক্সহ্যামে খনি শ্রমিকদের ভিতর কাজ করতে গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছে— তা জানিয়েছেন স্বামীজিকে। যেসব রাজনৈতিক সম্মেলনে, কী আলাপ-আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন— সেসব জায়গাতেও নিয়ে গিয়েছেন স্বামীজিকে। মার্গারেটের এই সব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে বিবেকানন্দের দিক থেকে কোনোরকম আপত্তি এসেছে— সে প্রমাণও পাওয়া যায়নি। বরং, রেমঁ জনিয়েছেন, বিবেকানন্দ যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে মার্গারেটের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন আগ্রহ সহকারেই শ্রবণ করেছেন। অর্থাৎ, এটা মনে করা যেতেই পারে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক সক্রিয় আইরিশ নেত্রীকে বিবেকানন্দ সচেতনভাবেই পরাধীন ভারতে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর পারিবারিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাবে মার্গারেট প্রথমাবধিই ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তাঁর এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশই তীব্রও হয়ে উঠতে থাকে। তদুপরি, পিটার ক্রপটকিনের মতো রাশিয়ান বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও অনুগামী হয়ে ওঠেন মার্গারেট। এই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর অনুরাগ বরাবরই ছিল। বিবেকানন্দের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় মার্গারেট একাধারে যেমন শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তেমনই প্রবল জাতীয়তাবাদী এক আইরিশ বিপ্লবীও বটে। মার্গরেট তখন মাৎসিনি পাঠ করছেন, বিবেকানন্দের কাছে নিজের জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করছেন। বিবেকানন্দও স্বদেশপ্রেমী, তাঁর ভিতরেও জাতীয়তাবাদী বোধ কাজ করে। তিনি মার্গারেটকে গণশিক্ষার উপর জোর দিতে বলেছেন, গণশিক্ষা ব্যাতীত যে দেশের মানুষের চেতনা জাগ্রত করা যাবে না তা পরিব্রাজক জীবনেই উপলব্ধি করেছেন

বিবেকানন্দ। সমাজজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব যে কতখানি ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় ঘুরে তা আরও উপলব্ধি করেছেন বিবেকানন্দ। ইংল্যান্ডে তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Education, education, education alone! Travelling through many cities of Europe and observing in them the comfort and education of even the poor people, there was brought to my mind that state of our own people and I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I got...it will be necessary to start centres for women exactly like those for men.' শিক্ষার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বিবেকানন্দ মার্গারেটকে বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তারই ফল বাগবাজারে নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়। ১৮৯৫ সনে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লন্ডন থেকে লেখা একটি চিঠিতেও বিবেকানন্দের এই 'গণশিক্ষা'-র ওপর জোরই দিচ্ছেন। ওই চিঠিতে ব্রহ্মানন্দকে তিনি লিখছেন, 'যদি lower class দের education দিতে পারো, তাহলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে— বিদ্যা শেখাতে পারো?'

রেমঁ লিখছেন, বিবেকানন্দের ইংল্যান্ড আসা একান্তই প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল এ কারণেই যে, ব্রিটিশদের শুধু বিদ্বেষের চোখে দেখা নয়, ব্রিটিশদের গুণাবলীও তাঁর জানা জরুরি ছিল। ব্রিটিশদের গুণাবলী স্বীকার করে নেওয়ার মতো উদারতার অভাব অবশ্য বিবেকানন্দের ছিল না। ব্রিটিশদের গুণটুকু তিনি স্বীকার করে নিয়েওছিলেন। ১৮৯৫ সনে শ্রীমতী লেগেটকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন,'যখন একজন ইংরেজ একটি জিনিস ধরে, সে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ করে।'

রোঁম লিখেছেন, মার্গারেটের কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক মতবাদ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেই বিবেকানন্দ তাঁকে আরও ধীরস্থির এবং বিচক্ষণ হওয়ার পরামর্শ তখনই দিয়েছিলেন। মার্গারেটের আবেগপ্রবণ চেহারাটি প্রত্যক্ষ করে আসলে তখনই বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল বিচক্ষণ বা স্থিতধী না হলে মার্গারেট তাঁর চলার পথে বিভ্রান্ত হতে পারেন। মার্গারেটের প্রাণশক্তিকে সঠিক পথে, সঠিক লক্ষ্যে চালনা করাও যে একটা বড় কাজ— তা তখনই বুঝেছিলেন বিবেকানন্দ। সেই প্রথম পরিচয়ের পর্বটি থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মার্গারেটকে এভাবেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯০০ সালে প্যারিস থেকে একটি চিঠিতে নিবেদিতাকে লিখেছিলেন বিবেকানন্দ, '... আমার ভয়, তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকবে, তুমি অন্যের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনও কখনও কোন বিশেষ প্রভাব থেকে তোমায় দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই।' এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় নিবেদিতার প্রতি কতখানি যত্নবান এবং সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর।

দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড সফরের সময়ই উইম্বলডনে মার্গারেটের স্কুল পরিদর্শন করতে যান বিবেকানন্দ। নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন মার্গারেট—তা দেখে যথেষ্ট মুগ্ধও হন বিবেকানন্দ। আরও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি দেশে যে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করবেন ভাবছেন সে-কাজে মার্গারেটই তাঁর সব থেকে বড় সহায় হতে পারেন।

উইম্বলডনে নিবেদিতার স্কুল পরিদর্শনের পর মার্গারেট এবং বিবেকানন্দের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরেছেন রেমঁ। তা এখানে উল্লেখ করলাম, '(মার্গারেট) সরলভাবে স্বীকার করে, 'এখনও পরীক্ষাই চলছে, একটা চরম সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছাইনি। প্রতিদিনিই একটা না একটা নতুন কিছু চোখে পড়ে। শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছি, কিন্তু সকলের মনের সমান হচ্ছে না। কারও কারও বুদ্ধির উন্মেষ হচ্ছে ধীরে ধীরে। সেটা আমারই দোষ। ওদের মনের জট কি করে ছাড়িয়ে দিতে হবে বুঝে উঠতে পারি না। ছোট ছেলের মন পুরোদস্তুর একটা বৈজ্ঞানিকের জগৎ। পুরোপুরি ফুটে ওঠার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। মনোবিকাশের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য, আমি ওদের সেইটাই দিতে চাই।

'অস্ফুটকণ্ঠে বিবেকানন্দ বলে ওঠেন, 'আর আমার দেশের দীন, দরিদ্র, অভাগা ছেলেরা, ঘোর অন্ধকারে ওরা ডুবে রয়েছে। এমনি শোচনীয় ওদের অবস্থা যে ধনীর হাতের লাঞ্ছনায় ভুগতে ওদের জন্ম, এই ওদের ধারণা। ব্যক্তিত্ব বোধ জিনিসটা ওদের নাই বললেই চলে। ওদের দুঃখ কল্পনা করতে পার কি? আজ যদি প্রতি গ্রামে গ্রামে ওদের জন্য আমরা বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করি, তবুও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না। পেটের ভাতের জন্য মাঠেঘাটে খাটতে বাধ্য ওরা, এমনি কঠোর দারিদ্র্য। কিন্তু সে তো দূরের কথা। আসলে আমাদের টাকাই নাই, আমরা বিদ্যাদান করব কি? মনে হয় এ সমস্যা মেটাবার নয়। আমি একটা সমাধানের কথা ভাবছি বহুদিন ধরে। পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে মহম্মদই যাবেন পর্বতের কাছে। গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে না আসতে পারে, স্কুলই যাবে তাদের কাছে, মাঠে কারখানায় সব জায়গায়...।' বোঝাই যায় শিক্ষা নিয়ে কতটা গভীর, আন্তরিক এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা বিবেকানন্দ করেছিলেন।

স্বামীজির দ্বিতীয়বারের এই ইংল্যান্ড পরিভ্রমণকালে যে মার্গারেট তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, দুজনেই পরস্পরকে আরও ভালোভাবে, আরও কাছ থেকে জানতে এবং বুঝতে পেরেছিলেন তা নিবেদিতার সমস্ত জীবনীকাররাই লিখেছেন। তবে, এই সময় মার্গারেট ঠিক কীভাবে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দকে, কীভাবে তাঁর পাশে থেকে তাঁর সমস্ত কাজে সহায়িকা হতে চেয়েছিলেন— সে সম্পর্কে রেমঁই একমাত্র স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্য জীবনীকাররা সে প্রসঙ্গটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। প্রব্রাজিকা

মুক্তিপ্রাণার লেখায় পরিষ্কার করে কিছু বলা না থাকলেও, একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কী লিখছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সেইটি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক।

'বস্তুতঃ স্বামীজিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলেও প্রাচ্যের গুরুশিষ্যের সেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্গারেটের ধারণা তখনও পরিষ্কার এবং দৃঢ় হয় নাই। অপরপক্ষে, স্বামীজির চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যতখানি জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই যে, স্বামীজি কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বন্ধন গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ। যাঁহার কথাবার্তা, চালচলন এবং প্রতি আচরণের মধ্যে সর্ববিধ বন্ধনের বাহিরে চলিয়া যাইবার প্রচেষ্টা নিরন্তর বিদ্যমান, তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত বন্ধনের স্থান কোথায়? মার্গারেট তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই, স্বামীজির প্রতি তাঁহার যে অকপট আনুগত্য, শ্রেষ্ঠ আচার্যের ন্যায় স্বামীজি তাঁহাও উপেক্ষা করিবেন।'

মুক্তিপ্রাণা এই যে 'ব্যক্তিগত বন্ধন'-এর ইঙ্গিত দিয়েছেন, রেমঁর লেখায় তা স্পষ্টভবে বর্ণিত হয়েছে। রেমঁ লিখেছেন, ' স্বামীজী... বলে মার্গারেট তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে ইতস্তত করতে থাকে। একটু মৌনী থাকে, গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে। কথাটা পাড়াই শক্ত, কিন্তু পাড়তেই হবে।

'স্বামীজির বেদনায় হৃদয় বিচলিত হয়েছে ওর। তাঁর দেশহিতৈষণার এই বিপুল আবেগ অনুগামীদের মাঝেও সঞ্চারিত হ'ক। এতে প্রাণ জাগবে, কল্যাণ হবে সকলের— এটা মার্গারেট ভাল করেই বুঝেছে। অথচ একা স্বামীজি কিছুই করে উঠতে পারছেন না, কারণ তাঁর কোন কিছুরই স্থিরতা নাই। সংগঠন শক্তির অভাবও আছে খানিকটা, মার্গারেটের মতে। ইতিমধ্যেই ও তাঁকে কতকগুলো সঙ্কট পার হতে সাহায্য করেছে সলা-পারমর্শ দিয়েছে। ও তো আরো নানারকমে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। কেমন করে তাঁর কাজ গুছিয়ে দিতে হবে তা ও বেশ বুঝেছে। ওর নিজের জীবনে আজ কোনও বন্ধন নাই। প্রেমের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে চিরদিনের মত, ও তো সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে ও কি তাঁর ডান হাত হয়ে উঠতে পারে না, তাঁর কাজে নিজের জীবনকে বাঁধা দিতে পারে না তাঁর কাছে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে ওর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই এশিয়া বা আফ্রিকা-যাত্রী পাদ্রীদের বিয়ে করেছে ও জানে...

'... "তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা, আমি আসব আপনার পাশে... আপনার কাজে যোগ দেব... আমরা একসঙ্গে খাটব একই উদ্দেশ্য নিয়ে"...?'

মিশনারিদের মতোই বিবাহ করে একত্রে ধর্ম ও সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন—মার্গারেট যদি এরকম ভেবে থাকেন এবং এরকম প্রস্তাব সেই সময় দিয়ে থাকেন বিবেকানন্দকে, তাহলে তার অন্যতর ব্যাখ্যা করা উচিত হবে না, বা, তা অন্যায় বলেও ভাবাও ঠিক হবে না। কারণ, মার্গারেটের পক্ষে এইরকম একটি প্রস্তাব দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, মার্গারেট কিন্তু তখনও প্রাচ্য সংস্কৃতি, প্রাচ্য

জীবনযাত্রা, প্রাচ্যের ধর্মাচরণ এসব সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজ্ঞ। প্রাচ্যের সন্ন্যাসী-ধর্মপ্রচারকদের ব্যক্তিগত জীবন কেমন হয় তা-ও তখন জানেন না তিনি। খ্রিস্টান মিশনারি ধর্মপ্রচারকদের জীবনযাত্রাই মার্গারেট তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। এই মিশনারি ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মযাজকরা অনেকেই সংসারধর্ম পালন করতেন। মার্গারেটের পিতা এবং মাতামহই তার উদাহরণ। কাজেই, মার্গারেটের পক্ষে এরকম প্রস্তাব দেওয়ার ভিতর অন্যায় বা অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। বরং সেটা ছিল, সম্পূর্ণত বিবেকানন্দের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে স্বামীজির সব কাজে তাঁর পাশে থাকার এক দুরন্ত আকাঙ্খা।

মার্গারেটের এ প্রস্তাবে বিবেকানন্দ কী করেছিলেন? রেমঁ লিখছেন, ‘এ প্রস্তাবের পিছনে কতখানি আত্মত্যাগ রয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ তা বুঝলেন। এমন কথা এক মার্গারেটই বলতে পারে। কিন্তু ওর সন্দেহ মাত্র হয়নি যে স্বামীজি সন্ন্যাস-ব্রত নিয়েছেন, কঠিন তার বিধি-বিধান।

‘তিনি ওর কথা শুনে নতমস্তকে রইলেন বহুক্ষণ। তারপর বললেন, ‘আমি সন্ন্যাসী।’

‘আর কোনও ব্যক্তিগত কথাই হল না।’

রেমঁ-র লেখা পাঠ করে বোঝা যায় একজন স্থিতধী, সর্বত্যাগী, প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর যেরকম আচরণ করা উচিত— বিবেকানন্দ তা-ই করেছিলেন। তাঁর এই আচরণ তাঁকে চিনে নিতে মার্গারেটকে আরও বেশি সাহায্য করেছিল মনে হয়। কারণ, বিবেকানন্দের এই নির্লিপ্তি মার্গারেটকে কখনও দূরে সারিয়ে দেয়নি। বরং, আরও বেশি করে বিবেকানন্দের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার আগ্রহ এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মার্গারেট। এবং এরপরই তিনি ভারতে আসার কথা চিন্তা করতে থাকেন। যে ভারত তাঁর কাছে একেবারেই অজ্ঞাত, যে প্রাচ্য জীবনযাত্রা তাঁর একেবারেই অজানা, সব ত্যাগ করে সেই ভারতে আসার আকর্ষণও যে ছিলেন মূলত বিবেকানন্দই তা বলে দিতে হয় না।

দশ

১৮৯৩ সালে সেই চিকাগো বক্তৃতার সময় থেকেই বিবেকানন্দ বলতে গেলে সেভাবে বিশ্রাম পাননি। বরং, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে তাঁকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে। বেদান্ত প্রচার করতে হয়েছে। বিদেশে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের শক্ত ভূমি তৈরি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছে। পাশাপাশি মঠ স্থাপনের চিন্তা তাঁকে ব্যস্ত রেখেছে সবসময়। এই অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে একটু বিশ্রাম দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁর। ফলে, ১৮৯৬ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি শ্রীমতী অরিয়েঁতা মুলারের আমন্ত্রণে সুইজারল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় বেড়াতে গেলেন স্বামীজি। শ্রীমতী মুলার, সেভিয়ার দম্পতি এবং স্বামীজির সচিব জোশুয়া গুডউইন সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালের ২৫ জুলাই সুইজারল্যান্ড থেকে শ্রীমতী সারা বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আমি জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আসছে দু-মাসের জন্য; একটু কঠোর সাধনা করতে চাই। ওই আমার বিশ্রাম।... পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব শান্তির ভাব আসে। এখানে আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে, এমন অনেক দিন হয়নি।' এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, টানা পরিশ্রমে কতখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন স্বামীজি এবং কিছুদিনের জন্য সব কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও আকুল হয়ে পড়েছিলেন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিস মুলারের আমন্ত্রণে জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিনি সুইজারল্যান্ড এবং য়ুরোপের অন্যান্য স্থানগুলিতে বেড়াইতে গেলেন। সেপ্টেম্বরে স্বামীজি লন্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন মিঃ সেভিয়ারের হ্যাম্পস্টেডের বাড়ীতে এবং পরে রিজওয়ে গার্ডেন্সে মিস মুলারের এয়ারলি লজে অবস্থান করেন।'

সুইজারল্যান্ডে পরিভ্রমণকালে, সেখানকার পার্বত্যশোভায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীজিও স্থির করেন হিমালয়ের কোলে একটি নিভৃত অদ্বৈত সাধনার আশ্রম গড়ে তুলবেন। স্বামীজির এই ভাবনাকে রূপ দিতে সাগ্রহে এগিয়ে এলেন সেভিয়ার দম্পতি। এই দম্পতি ইতিমধ্যেই স্বামীজির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। স্বামীজির সঙ্গে তাঁরাও যেতে চান ভারতে। হিমালয়ের কোলে এইরকম একটি নিভৃত জায়গা খুঁজে দেওয়ার জন্য স্বামীজি সেই সময়ে পত্র লেখেন তাঁর আলমোড়া নিবাসী ঘনিষ্ঠ অনুরাগী লালা বদ্রি শাহকে। ১৮৯৬ সালের ৫ আগস্ট বদ্রি শাহকে ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আপনার কাছে একটি বিষয় জানবার আছে। দয়া করে সংবাদটি জানালে বাধিত হবে। আমি একটা মঠ স্থাপন করতে চাই— আলমোড়ায় বা আলমোড়ার কাছে হলেই ভাল। আমি শুনেছি, মিঃ র‍্যামজে নামক জনৈক ভদ্রলোক আলমোড়ার কাছে একটি বাংলোতে বাস করতেন, ঐ বাংলোর চারিদিকে একটি বাগান আছে। ঐ বাংলোটি কেনা সম্ভব হবে কি? দাম কত? যদি কেনা সম্ভব না হয়, তবে ভাড়া পাওয়া যাবে কি?

'আলমোড়ার কাছে সুবিধামত জায়গা আপনার জানা আছে কি, যেখানে বাগ-বাগিচা-সহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সঙ্গে বাগান প্রভৃতি অবশ্যই থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।' লালা বদ্রি শাহ পরে মায়াবতীতে স্বামীজির মনোমতো জায়গা খুঁজে দিয়েছিলেন। এইখানেই অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেভিয়ার দম্পতি এই অদ্বৈত আশ্রমে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অতিবাহিত করে গিয়েছেন।

তিন মাস সুইজারল্যান্ড এবং ইয়োরোপের অন্যান্য জায়গায় কাটিয়ে অক্টোবর মাসে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন লন্ডনে। বিদেশ বাস শেষ করে তখন বিবেকানন্দ ফিরতে চাইছেন ভারতে। তিন বছর দেশ ছাড়া তিনি। এবার দেশে ফিরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে আরও সংগঠিত করতে হবে, মিশনের কর্মধারা দেশের মাটিতে বিস্তার করতে হবে—এটি তখন বুঝতে পারছেন স্বামীজি। ইতিমধ্যে 'রাজযোগ' বইটি লেখার কাজও প্রায় শেষ করে এনেছেন। বেদান্তের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়েও বিস্তারিত একটি লেখা লিখেছেন। ওই সময় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বড় রকমের একটা কিছু লিখতে ব্যস্ত আছি। বেদান্তের ত্রিবিধভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে সকল বচন আছে, সেগুলি সংগ্রহ করেছি। তুমি যদি এমন একটি লোক যোগাড় করতে পারো যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও পুরাণগুলি থেকে প্রথমতঃ দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শেষে অদ্বৈতবাদাত্মক যত অধিক শ্লোক সংগ্রহ করে দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়।'

এর কিছুদিন পরে আলাসিঙ্গাকে লেখা আর একটি চিঠিতে (২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬) তাঁর ভারতে ফেরার কথাও স্বামীজি লেখেন। ওই চিঠিতে স্বামীজি আলাসিঙ্গাকে জানাচ্ছেন, 'খুব সম্ভব মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আর মিস মূলার ও মিঃ গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব। মিস মূলারকে তো তুমি জানই; সম্ভাবতঃ ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার অন্ততঃ কিছুদিন আলমোড়ায় বাস করবার জন্য যাচ্ছেন; আর গুডউইন সন্ন্যাসী হবে।'

সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে স্বামীজি যখন দেশে ফেরার তোড়জোড় করছেন তখন মার্গারেট কী করছেন? অক্টোবর মাসে স্বামীজি লন্ডনে ফিরে আসার পর মার্গারেট আরও বেশি করে স্বামীজির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে ফেললেন। রেমঁ জানাচ্ছেন, এই সময় স্বামীজির সচিবের কাজটাই মার্গারেট করে দিতেন। রেমঁ লিখছেন, 'তাঁর সংসর্গের প্রতিটি মুহূর্ত ওকে নতুন করে গড়ে তুলছে। মার্গারেট এখন তাঁর সেক্রেটারি। সবিস্ময়ে ও লক্ষ্য করে, একসঙ্গে একরাশ কাজ হাতে নিয়েছেন উনি, অথচ প্রত্যেকটার উপরেই নজর রয়েছে। কোনটার খেই হারিয়ে ফেলেননি।' মার্গারেটকে তিনি ঠিক কোন কাজে নিয়োজিত করতে চান— এই সময়েই তার পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এই সময়েই কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ মার্গারেটকে বলেছিলেন, 'স্বদেশে স্ত্রীশিক্ষার একটা পরিকল্পনা করছি। মনে হয়, তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাব।' মার্গারেটকে যে তাঁর প্রয়োজন তা পরে একটি চিঠিতেও ব্যক্ত করেছেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সনের ২৯ জুলাই, লন্ডনে থেকে দেশে ফিরে আসার পর, একটি পত্রে স্বামীজি মার্গারেটকে লিখছেন, ' তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী মহিলার জন্ম দান করতে পারছে না, তা অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্‌টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই রূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীশক্তি জাগরণের উপর বিবেকানন্দ যে বারবার এভাবে জোর দিতেন, তার বোধহয় একটি ব্যক্তিগত কারণও ছিল। বিবেকানন্দের এক বোন শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা বিবেকানন্দকে যথেষ্ট পীড়িত করেছিল। এবং এই ঘটনা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীশক্তির জাগরণ কতখানি জরুরি। পরবর্তী কালে বিদেশে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যখনই বক্তব্য রেখেছেন স্বামীজি, তখন প্রায়শই কথা প্রসঙ্গে তাঁর ওই হতভাগিনী বোনের প্রসঙ্গটি এনেছেন।

সুইজারল্যান্ড এবং ইয়োরোপ ভ্রমণ সেরে আসার পর স্বামীজি তখন দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দেশে ফেরার মূল কারণ তাঁর দুটি। এক, দেশের ভিতর রামকৃষ্ণ মিশনকে আরও প্রসারিত করা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে যে কর্ম পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা কার্যকর করা। এবং দুই, বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে একটি সুসংহত রূপ দেওয়া। স্বামীজি এটুকু বুঝেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং উপস্থিত না থাকলে, সুদূর বিদেশ থেকে শুধুমাত্র নির্দেশ দিয়ে একাজ করানো যাবে না। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের রূপরেখাটি কেমন হবে, কেমন হবে সেই সংগঠনের সংবিধান—তা লন্ডনে বসেই ভেবে ফেলেছিলেন বিবেকানন্দ। ১৮৯২ সালের ২৭ এপ্রিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি দীর্ঘ চিঠিতে স্বামীজি মঠের রূপেরেখা, মঠের সংবিধান, নিয়মাবলী ইত্যাদি কেমন হবে— তার নির্দেশ দিয়ে পাঠান। মঠের সন্ন্যাসীরা কীভাবে মঠে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবেন, কীভাবে মঠ পরিচালিত হবে, মঠের কর্মসমিতি কীভাবে নির্বাচিত হবে, কোন কোন বিধান থাকবে মঠে— তা বিস্তারিতভাবে ওই চিঠিতে লিখেছিলেন স্বামীজি। ওই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় মঠ সম্পর্কে কত গভীরভাবে তিনি তখনই চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

পাশাপাশি, তিনি দেশে ফিরে গেলেও পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের কাজে যাতে ছেদ না পড়ে এবং পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে যাতে আরও প্রসারিত করা যায় তার চিন্তাও স্বামীজির ছিল। পাশ্চাত্যে তাঁর বিদেশি শিষ্য-শিষ্যারা ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি এটুকু অনুভব করেছিলেন, শুধু এই বিদেশি শিষ্য-শিষ্যাদের দ্বারাই বেদান্ত প্রচার সম্ভব হবে না। সে কারণে, ভারত থেকে তাঁর কয়েকজন গুরুভাইকে নিয়ে আসা দরকার। বেদান্ত প্রচার এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রসারের মূল কাজটা তাঁরাই করবেন। পাশ্চাত্যের শিষ্য-শিষ্যারা তাঁদের সহায়তা করবেন। এই কাজে বিবেকানন্দ তাঁর দুই গুরুভাইকে বেছে নিয়েছিলেন—স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ। বিবেকানন্দ স্থির করেছিলেন সারদানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের দায়িত্ব নেবেন, অভেদানন্দ দায়িত্বে থাকবেন ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের। দ্বিতীয় দফায় স্বামীজি লন্ডনে থাকাকালীনই তাঁর এই দুই গুরুভ্রাতাকে বিলেতে আনিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সময়ে বিলেত থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে স্বামীজির এই পরিকল্পনার কথা জানা যায়। দুই গুরুভ্রাতাকে বিলেতে আনতে কতখানি উদগ্রীব হয়েছিলেন স্বামীজি তা ১৮৯৬ সালের ৩ জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায়। ওই পত্রে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'এই পত্রপাঠ কালীকে ইংল্যান্ড পাঠাইয়া দিবে। পূর্বের পত্রে সংবাদ পাইয়াছ। কলকাতার মেসার্স গ্রিন্ডলে কোম্পানির নিকট তাহার 2nd class passage গিয়াছে ও কাপড়-চোপড় কিনিতে যাহা কিছু লাগে তাহাও গিয়াছে। কাপড়-চোপড় অধিক কিছু আবশ্যক নাই।'

'কালীকে (স্বামী অভেদানন্দ) কতকগুলি বই আনতে হবে। আমার কাছে কেবল ঋগ্বেদ-সংহিতা আছে। কালী যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব-সংহিতা ও শতপথাদি যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় এবং কতকগুলো সূত্র ও যাস্কর নিরুক্ত যদি পায়, সঙ্গে করেই যেন আনে। অর্থাৎ ঐ বইগুলি আমার চাই।... ঐ বই একটা কাঠের বাক্সয় পুরে আনলেই হবে।

'গড়িমসি যেমন শরতের বেলায় হয়েছিল, তা যেন না হয়; পত্রপাঠ চলে আসবে। শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে। তার এখানে কোন কাজ ছিল না—অর্থাৎ ছ-মাস বাদে এল, তখন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় যেন। চিঠি হারিয়ে যেন না যায়— শরতের বেলার মতো। তৎপর পাঠিয়ে দিবে।'

এর আগে তিনি বলার পরও সারদানন্দ বিলেতে আসতে দেরি করায় বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন স্বামীজি। তাঁর সেই ক্ষোভের প্রকাশ পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, '... আমি শীঘ্র ইংলন্ড যাইতেছি। শরতের (স্বামী সারদানন্দ) এখানে আসিবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ আমি নিজেই ইংলন্ড যাইতেছি। যাদের মনের ঠিকানা করতে ছ-মাস লাগে, তাদের আমার দরকার নাই। তাকে ইউরোপ বেড়াবার জন্য আমি ডাকিও নাই এবং টাকাও আমার নাই।'

শুধু নিজের গুরুভ্রাতা নয়, ভারত থেকে একাজের জন্য যোগ্য তাঁর কোনো শিষ্যকে পাওয়া যায় কিনা সে খোঁজও স্বামীজি করেছিলেন। ১৮৯৫ সালে লন্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠি এর প্রমাণ। ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন, 'কলকাতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি; তাকে লণ্ডনে কাজের জন্য রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আর একজন আবশ্যক। তোমরা কি মাদ্রাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পার না? অবশ্য তার খরচপত্র সব আমি দেবো। তার ইংরেজী ও সংস্কৃত দুই-ই ভাল জানা চাই— ইংরেজীটা একটু বেশি। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়। অধিকন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হতে হবে।' স্বামীজি তাঁর চাহিদা মতো সেরকম যোগ্য লোক পাননি বোঝাই যায়। কারণ, সারদানন্দ এবং অভেদানন্দকেই আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছিল।

সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পরই স্বামীজি মনস্থির করেন ১৮৯৬ সালের শেষদিকে তিনি ভারতের দিকে যাত্রা করবেন। সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ১৮৯৬ সালের নভেম্বরে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে তিনি চিঠিতে লিখছেন, 'আগামী ১৬ ডিসেম্বর আমি ইংলন্ড থেকে যাত্রা করছি। ইটালিতে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্‌সে

জার্মান লয়েড লাইনের S. S. Prinz Regent Leopold নামক জাহাজ ধরব। আগামী ১৪ জানুয়ারি স্টীমার কলম্বো গিয়ে লাগবার কথা। সিংহলে অল্পস্বল্প দেখার ইচ্ছা আছে— তারপর মান্দ্রাজ যাব।

'আমার সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার -দম্পতি ও গুডউইন। মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর সহধর্মিনী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন করতে যাচ্ছেন। ঐ হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্যের শিষ্যেরা সেখানে এসে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরূপে বাস করতে পারবে। গুডউইন একজন অবিবাহিত যুবক, সে আমার সঙ্গে থাকবে ও ভ্রমণ করবে। সে ঠিক সন্ন্যাসীর মতো।' বন্ধু লালা বদ্রি শাহকেও ওই সময়ে একটি চিঠিতে স্বামীজি জানিয়েছিলেন, '৭ জানুয়ারি নাগাদ আমি মান্দ্রাজ পৌঁছব; কয়েকদিন সমতলে থেকে আমার আলমোড়া যাবার ইচ্ছা।'

স্বামীজির ভারতে প্রত্যাবর্তনের দিনক্ষণ যখন প্রায় ঠিকঠাক তখন, মার্গারেটের ইচ্ছা হল তিনিও স্বামীজির সঙ্গেই ভারতে যাবেন। সেখানেই স্বামীজির কর্মযোগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে ভারতে যাওয়ার এই ইচ্ছাটি তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। শরণাপন্ন হলেন আঁরিয়েতা মুলারের। নিবেদিতার জীবনীকাররা জানাচ্ছেন, ওই সময় একদিন বিকেলে স্বামীজি এবং মার্গারেট দুজনেই অতিথি হয়েছেন মিস মুলারের বাড়িতে। ওই সময় মিস মুলার স্বামীজিকে জানান, মার্গারেট তাঁর সঙ্গে ভারতে গিয়ে কাজ করতে চান। স্বামীজি এই প্রস্তাবে রাজি হননি। বরং বলেছিলেন, 'আমি আমার কথাই বলতে পারি। দেশের যে কাজের ভার মাথায় নিয়েছি, তার জন্য দুশোবার জন্ম নিতে আমি রাজি।' আর মার্গারেটকে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষই তোমার আপন ঠাঁই। কিন্তু তার জন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে তিলে তিলে।'

প্রশ্ন উঠতেই পারে, ১৮৯৬ সালে ক্যাপ্টেন এবং শ্রীমতী সেভিয়ার ও যোশুয়া গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে ফিরলেও কেন সেবার মার্গারেটকে সঙ্গে আনতে রাজি হননি স্বামীজি। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। মার্গারেটের আবেগপ্রবণ চরিত্রটি বিবেকানন্দ লক্ষ করেছিলেন। বিবেকানন্দ চাইছিলেন না আবেগের বশে মার্গারেট কোনো সিদ্ধান্ত নিন। তাঁর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে মার্গারেট স্থির সিদ্ধান্তে আসুন— সেইটিই চাইছিলেন বিবেকানন্দ। সে কারণেই মার্গারেটকে মানসিকভাবে আরও প্রস্তুত হওয়ার সময় দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি, ১৮৯৮-এর শেষে মার্গারেট যখন ভারতের দিকে রওয়ানা হন, তার আগেও বিবেকানন্দ তাঁকে চিঠিতে এ দেশে বসবাসের নানাবিধ অসুবিধার কথা উল্লেখ করে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে তবেই আসতে বলেছিলেন। আসলে, বিবেকানন্দ চাইছিলেন না আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে যেন মার্গারেট মোহভঙ্গের বেদনায় না পড়েন।

দ্বিতীয়ত, আর একটি কারণও হয়তো এর পিছনে ছিল। তাঁর অবর্তমানে ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের দায়িত্ব স্বামী অভেদানন্দকে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজি। কিন্তু এটাও বুঝেছিলেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত অভেদানন্দের পক্ষে একা ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ জন্য তাঁর দরকার কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশীয় শিষ্য-শিষ্যা, যাঁদের ইংল্যান্ডের শিক্ষিত সমাজে গ্রহণযোগ্যতা আছে, যাঁরা উৎসাহী এবং একই সঙ্গে দক্ষ সংগঠক এবং বক্তা। স্বামীজির অনেক শিষ্য-শিষ্যারই শিক্ষিত সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু তাঁদের ভিতর দক্ষ সংগঠক এবং সুবক্তা ছিলেন না। সেদিক দিয়ে মার্গারেট ছিলেন ব্যতিক্রম। মার্গারেটের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে স্বামীজি বুঝেছিলেন, এই আইরিশ কন্যা একজন দক্ষ সংগঠক এবং সুবক্তাও বটে। লন্ডনে অভেদানন্দের কাজে মার্গারেট যে অত্যন্ত সহায়ক হবেন, তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি বিবেকানন্দের। সে কারণে তাঁর অনুপস্থিতিতে অভেদানন্দের সঙ্গে মার্গারেটকেও সংগঠন গড়ে তোলার একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে এসেছিলেন স্বামীজি।

প্রব্রজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, প্রাথমিক আবেগের পর মার্গারেটও স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করে বুঝেছিলেন, চাইলেই স্বামীজির সঙ্গে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা তাঁর পক্ষে অবিবেচকের মতোই হয়ে যাবে। কেননা, উইম্বলডনে তিনি যে স্কুলটি চালু করেছেন তার একটি ব্যবস্থা না করে যাওয়া অন্যায় হবে। তদুপরি, সংসারের অনেক দায়িত্ব তাঁর উপর রয়েছে। সেসব ছেড়ে দিয়ে তাঁর পক্ষে হঠাৎ করে ভারতে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। এসবের বিলি-ব্যবস্থা করতে তাঁর অন্তত আরো একবছর সময় লাগবে। অতএব, মার্গারেট মনস্থির করলেন বছরখানেক পরে তিনি ভারতে গিয়ে স্বামীজির কাজে যোগদান করবেন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, ' ১৬ ই ডিসেম্বর স্বামীজির যাত্রা স্থির হইল। ১৩ ই ডিসেম্বর, রবিবার, পিকাডেলিতে 'রয়েল সোসাইটি অব পেন্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স'- এ তাঁহার বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন হইল। প্রায় পাঁচশত শ্রোতার সমাগমে সভাগৃহে পূর্ণ। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। সকলের অন্তর বেদনায় রুদ্ধ। অনেকেরই চক্ষু সজল। ইংরেজ-জাতি মনোভাব প্রকাশের বিরোধী। এই তরুণ সন্ন্যাসী কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা নহে, তাঁহার অপূর্ব মানব প্রেমের দ্বারাই সকলের চিত্ত জয় করিয়াছেন। তাঁহার উদার বাণী সকলের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছে প্রেম ও শান্তি।

'সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করা হইলে স্বামীজি গম্ভীর, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন। সমবেত জনতার মধ্যে দিয়া যাইবার সময় আন্তরিকতা-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়।'

নিবেদিতা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'-এ লিখছেন, 'লন্ডনে তাঁর শেষ বক্তৃতায় তিনি দেখাইয়া দেন যে, ইতিহাসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং রোমরাজ্যে শান্তি বিরাজ করার ফলেই খ্রীষ্টধর্ম সংস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। দূরদৃষ্টির ফলে তাঁহার স্থির ধারণা ছিল, তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, ভবিষ্যতে বিরাট একদল ভারতীয় প্রচারক পাশ্চাত্যে আগমন করিয়া তাহার ফল উপভোগ করিবেন, এবং তাঁহারাও ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্য নূতন নূতন বীজ বপন করিয়া যাইবেন। সম্ভবত, তাঁহার চালচলনে বুদ্ধের ন্যায় যে প্রশান্ত-গম্ভীর ভাব আমাদের এত মুগ্ধ করিয়াছিল, উহা তাঁহার ঐ দূরদৃষ্টি ও স্থির ধারণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।'

১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৬ স্বামীজি ভারতের দিকে যাত্রা করলেন। ইংল্যান্ডে কাজের দায়িত্বে রইলেন স্বামী অভেদানন্দ। অভেদানন্দের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বেদান্ত ভাবধারা প্রচারে অংশ নিলেন এডওয়ার্ড স্টার্ডি। আর এঁদের দুজনের সহযোগী হয়ে মার্গারেটও আসরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি স্বামীজি এসে পৌঁছলেন কলম্বোয়। সেখান থেকে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায়। দেশে ফিরে যে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা স্বামীজি পেয়েছিলেন, তাকে কাজে লাগিয়েই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি সুসংহত ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। যদিও আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একটি স্থায়ী এবং সুসংহত রূপ দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন তিনি। এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তিনি তখন থেকেই নিতে শুরু করেছিলেন আর তাঁর গুরুভাইদেরও এই বিষয়ে সচেতন এবং সক্রিয় করে তুলতে চাইছিলেন। ১৮৯৬ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তাতে তিনি পরিষ্কারই লিখেছিলেন, 'মঠের জন্য একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভাড়া লইবে, অথবা বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য একটা ছোট ঘর হয়। একটা বড় হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য, এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর—সেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয়—আরও একটা বড় হল ঐ বাটীতে থাকার আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা সাধারণের জন্য হইবে।' এই চিঠিখানি পড়লেই বোঝা যায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি স্থায়ী রূপ দেওয়ার চিন্তা তিনি বিলেতে বসেই করেছিলেন। অবশ্য স্বামীজি বিলেত যাত্রা করার অনেক আগেই আলমবাজারে তিনি এবং তাঁর গুরুভ্রাতারা রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেই মঠ তখনও কোনো সুসংহত রূপ পায়নি। স্বামীজি যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও মঠ আলমবাজারেই। স্বামীজির গুরুভ্রাতারাও তখন চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। কেউ পরিব্রাজক হয়ে ঘুরছেন, কেউ বা কলকাতার আশেপাশেই স্বাধীনভাবে কাজ করছেন। স্বামীজি উপলব্ধি করলেন যে, রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে যদি একটি সার্থক ও সফল রূপ দিতে

হয় তাহলে তাঁর সমস্ত গুরুভ্রাতাকে একত্রিত করতে হবে। সেই সঙ্গে যে অনুরাগী এবং ভক্তমণ্ডলী দেশ-বিদেশে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তাঁদেরও একটি ছাতার তলায় টেনে আনতে হবে। এ ব্যতীত যা তিনি ভাবছেন, তার রূপায়ণ করা যাবে না। আর এর জন্য প্রথমেই চাই মঠের একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা, যেখানে তাঁর গুরুভাইরা এবং অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী মিলিত হতে পারবেন, দরকার একটি সংবিধান এবং একটি কার্যকরী সমিতি—যার মাধ্যমে মঠ-মিশনের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা যাবে। মঠ-মিশনের সংবিধানটি কেমন হবে, সে আভাসও তিনি রামকৃষ্ণানন্দকে ওই চিঠিতে দিয়েছিলেন।

দেশে ফিরে মঠ-মিশনের এমন একটি স্থায়ী সার্বিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে স্বামীজি আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে থাকাকলীনই তাঁর বিদেশি ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বিদেশি ভক্তরা এ-বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, এবং এ-কাজে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁর আমেরিকান শিষ্যরা স্বামীজিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, মঠের জন্য জায়গা পছন্দ করলেই তাঁরা মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসাহায্য পাঠাবেন। আর এডওয়ার্ড স্টার্ডি তো ইংল্যান্ডে স্বামীজির অনুরাগীদের সঙ্গে আলোচনা করে চারহাজার পাউন্ড স্বামীজির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে। এর আগে শ্রীমতী সারা বুল স্বামীজিকে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজি তখন নেননি। আসলে, স্বামীজি চেয়েছিলেন দেশে ফিরে অবস্থা দেখে তবেই যা চাওয়ার তা চাইবেন। দেশে ফিরে সব কিছু দেখার পর ১৮৯৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী বুলকে স্বামীজি লেখেন, ' আপনি তো বেশ জানেন, বাধা যত বাড়ে আমার ভেতরের দৈত্যটাও তত বেশি জেগে ওঠে। সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

'আমি ইংলন্ড থেকে ৫০০ পাউন্ড এবং মিঃ স্টার্ডির থেকে ৫০০ পাউন্ড পূর্বেই পেয়েছি। ঐ সঙ্গে আপনার দেওয়া অর্থ যোগ করলে দুটো কেন্দ্র আরম্ভ করতে পারব নিশ্চয়। সুতরাং যথাসম্ভব সত্বর আপনার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় মনে হচ্ছে—আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে আপনার ও আমার দুজনের নামে টাকা জমা দেওয়া, যাতে আমাদের যে-কেউ টাকাটা তুলতে পারে। যদি টাকা তোলবার আগেই আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনি ঐ টাকার সবটা তুলে আমার অভিপ্রায় অনুসারে খরচ করতে পারবেন। তা হলে আমার মৃত্যুর পর আমার বন্ধুবান্ধবদের কেউ আর ঐ টাকা নিয়ে গোলমাল করতে পারবে না। ইংলন্ডের টাকাও ঐ[illegible] আমার [illegible] মিঃ স্টার্ডির নামে ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে।' এসবের পাশাপাশি,

স্বামীজি বিলেতে বক্তৃতা দিয়ে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তা তো ছিলই। এদেশে তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দের কাছে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে—এমন আশাও স্বামীজি করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন স্থাপনের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ১৮৯৭ সনের ১ মে স্বামীজি বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে তাঁর গুরুভাই এবং অন্যান্য ভক্ত-অনুরাগীদের একটি সভা ডাকলেন। ওই সভায় স্বামীজি সংঘ গঠনের আবশ্যকতা, সংঘের কর্মধারা, আদর্শ সব ব্যাখ্যা করলেন। পত্তন হল রামকৃষ্ণ মিশন। বিবেকানন্দ হলেন মিশনের প্রথম সাধারণ সভাপতি (জেনারেল প্রেসিডেন্ট) এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ হলেন সভাপতি (প্রেসিডেন্ট)। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৮৯৫-এর ৫ মে মার্গারেটকে একটি চিঠিতে তা জানালেন স্বামীজি। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসার পর মার্গারেটকে লেখা এটিই প্রথম চিঠি স্বামীজির। ওই চিঠিতে তিনি লিখলেন, ' হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরও কতকিছু করছে ; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না। দুনিয়াতে আর্থিক সাহায্য বলতে আমি শুধু পেয়েছি ইংলন্ডে মিস —এবং মিস্টার— র কাছে।... ওখানে থাকতে আমার ধারণা ছিল যে, এক হাজার পাউন্ড পেলেই অন্ততঃ কলকাতার প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপন করা যাবে; কিন্তু আমি এই অনুমান করেছিলাম দশ-বারো বছর আগেকার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসের দাম তিন-চার গুণ বেড়ে গেছে।

' যাই হোক, কাজ আরম্ভ করা গেছে। একটি পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ি ছ-সাত শিলিং ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে এবং তাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছে।... শুনতে পেলাম লণ্ডনের কাজ মোটেই ভাল চলছে না। প্রধানতঃ এই কারণেই আমি এখন লণ্ডনে যেতে চাই না, যদিও জুবিলী উৎসব (রানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের হীরক জয়ন্তী) উপলক্ষে ইংলণ্ডযাত্রী আমাদের কয়েকজন রাজা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।'

ওই চিঠিতে মার্গারেটকে আরও লেখেন স্বামীজি, 'এ পর্যন্ত তো কেবল কাজের কথা হলো। এখন তোমার নিজের কথা পড়ছি। কল্যানীয়া মিস নোব্‌ল্, তোমার যে অনুরাগ ভক্তি বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আছে, তা যদি কেউ পায়, তবে সে জীবনে যত পরিশ্রমই করুক না কেন, ওতেই তার শতগুণ প্রতিদান হয়। তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল হোক। আমার মাতৃভাষায় বলতে গেলে, তোমার কাজে সারা জীবন দিতে পারি।'

স্বামীজি লন্ডন ছেড়ে আসার পর ওই দেশে তাঁর বিদেশি ভক্তমন্ডলীর ভিতর কিছুটা যে অনুদ্যম দেখা দিয়েছিল তা রেমঁ লিখেছেন। স্বামীজির এই চিঠিটি পাঠ করেও বোঝা যায়, লন্ডনে বেদান্ত প্রচারের কাজ তখনও তেমনভাবে এগোচ্ছিল না। যদিও অভেদানন্দকে ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের কাজে সহায়তা

করছিলেন মার্গারেট। উইম্বলডনে একটি বেদান্ত সেন্টারও স্থাপন করেছিলেন তিনি। ওই সময়ে অভেদানন্দ লন্ডনে বিভিন্ন ঘরোয়া সভায় বেদান্তের ব্যাখ্যাও করেছেন। স্টার্ডি এই সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেছেন। 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় মার্গারেট মাঝেমাঝেই এইসব সভাগুলির বিবরণ লিখতেন। কিন্তু, ১৮৯৭ সালের মাঝামাঝি বেদান্তের ওই ক্লাসগুলি বন্ধ হয়ে গেল। ১৮৯৭-র সেপ্টেম্বরে এই বিষয়ে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় মার্গারেট লিখছেন, 'It does not follow, however, that Vedanta is dead or even asleep amongst us. Some of us regard these breathing periods as the most valuable influence of all, in extending the sphere of conviction. The thoughts that vedantic teaching brings, to a mind hearing it for the first time, are too vast and too new in kind for speedy assimilation. There must be rest and solitude, and fate has ordained that instead of our going away into the wilderness to find these, our interpreters shall go away form us and leave us to fight with our ignorance alone.'

১৮৯৭-এর গ্রীষ্মের শেষে বেদান্ত ক্লাস আবার শুরু হয় বটে, কিন্তু তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। কেননা ইতিমধ্যে এডওয়ার্ড স্টার্ডির সঙ্গে বিভিন্ন কারণে অভেদানন্দের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ফলে, অভেদানন্দ ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান। তিনি আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর বেদান্তের ক্লাসও বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৬ সনের ১৯ আগস্ট শ্রীমতী বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন, 'ইংলণ্ড থেকে সংবাদ পেলাম যে মিঃ স্টার্ডি অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে পাঠাচ্ছেন। আমাকে বাদ দিয়ে ইংলণ্ডের কাজ চলা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। এক্ষণে একটি মাত্র পত্রিকা মিঃ স্টার্ডি চালাবেন। এই মরসুমেই আমি ইংলণ্ডে যাবার আগেই ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ডাক্তারদের বোকামিতে বাধা পেলাম। ভারতবর্ষের কাজ চলছে।'

অভেদানন্দ আমেরিকা চলে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও মার্গারেটের উৎসাহে কিন্তু ভাটা পড়েনি। স্বামীজির আরও দুই অনুরাগী এরিক হ্যামন্ড এবং শ্রীমতী অ্যাশটনের সঙ্গে মার্গারেট ছোট আকারে হলেও বেদান্ত প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ভারতে মিশনের কাজকর্ম কেমন চলছে তা মার্গারেট একটি চিঠিতে জানতে চান ব্রহ্মানন্দের কাছে। এ সম্বন্ধে মার্গারেট কিছু প্রশ্নাবলীও পাঠান ব্রহ্মানন্দকে। মার্গারেটের এসব প্রশ্নের উত্তর স্বামীজি ব্রহ্মানন্দকে একটি চিঠিতে লিখে জানান। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ স্বামীজি ব্রহ্মানন্দকে ওই চিঠিতে লেখেন, 'মিস নোব্‌ল্ তার পত্রে যেসব প্রশ্ন করেছে সেগুলি সম্বন্ধে আমার উত্তর এই—

'১। প্রায় সব শাখা-কেন্দ্রই খোলা হয়েছে, তবে এখনও আন্দোলনের আরম্ভ মাত্র।

'২। সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই শিক্ষিত, যারা তা নয় তারাও লৌকিক শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু অকপট নিঃস্বার্থপরতাই সৎকার্যের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে অন্য সব শিক্ষার চেয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকেই সমধিক মনোযোগ দেওয়া হয়।

'৩। লৌকিক বিদ্যার শিক্ষকবৃন্দ ঃ আমরা যাদের কর্মিরূপে পাচ্ছি তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। এক্ষণে আবশ্যক শুধু তাহাদিগকে আমাদের কার্যপ্রণালী শেখানো এবং চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য— তাহাদিগকে আজ্ঞানুবর্তী ও নির্ভীক করা; আর তার প্রণালী হচ্ছে— প্রথমতঃ গরিবদের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা এবং ক্রমে মানসিক উচ্চতর স্তরগুলির দিকে এগিয়ে দেওয়া।

' শিক্ষা ও কলা ঃ অর্থাভাবহেতু আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্গত এই অংশ এখনও আরম্ভ করতে পারছি না। বর্তমানে যে সোজা কাজটুকু করা চলে, তা হচ্ছে—ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয়, তার জন্য বাজার সৃষ্টি করা। যারা নিজেরা দালাল নয়, পরন্তু এই শাখার সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদের দ্বারাই এ কাজ করানো উচিত।

'৪। জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ততদিনই প্রয়োজন হবে, যতদিন না জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অন্য সব কিছু অপেক্ষা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের ধর্মভাব ও ধর্মজীবন সমধিক কার্যকর হবে।

'৫। সকল জাতির মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। এ পর্যন্ত উচ্চস্তরের মধ্যেই কেবল কাজ হয়েছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ-সাহায্য কেন্দ্রগুলিতে আমাদের কর্মবিভাগের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নিম্নতর জাতিগুলিকেও আমরা প্রভাবিত করতে পারছি।

'৬। প্রায় সকল হিন্দুই আমাদের কাজ সমর্থন করেন; কিন্তু এই জাতীয় কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে তাঁরা অভ্যস্ত নহেন।

'৭। হ্যাঁ, আমরা গোড়া থেকেই আমাদের দান ও অন্যান্য সৎকার্যে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইতরবিশেষ করি না।

'এই সূত্র অনুসারে মিস নোব্‌ল্‌কে চিঠি লিখলেই হবে।'

মার্গারেটের পত্রের উত্তরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, বলে দিতে হয় না, তার বয়ান কার্যত স্বামী বিবেকানন্দের তৈরি করা। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম বৈঠকের কার্যবিবরণী একটি খাতায় টুকে তা-ও মার্গারেটের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ।

বিবেকানন্দের এই চিঠিতে একটি বক্তব্য সবিশেষ লক্ষণীয়। পত্রের এক জায়গায় স্বামীজি 'স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার' এবং 'ভারতীয় দ্রব্যাদির বিদেশের বাজারের প্রসার' লাভের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এর ভিতর দিয়ে স্বামীজির জাতীয়তাবোধের যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী করে তোলার একটি প্রচেষ্টাও যে স্বামীজির ভাবনায় কাজ করছিল তা-ও বোঝাই যায়। অন্তত এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বামীজির একটি পরোক্ষ অনুপ্রেরণা এবং সমর্থন ছিল। স্বামীজির এই স্বদেশ চেতনাই কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের, বিশেষত সশস্ত্র সংগ্রামে যাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের কাছে অনুপ্রেরণা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীজির পত্রের এই সব বক্তব্য যে জাতীয়তাবাদী মার্গারেটকেও উৎসাহিত করেছিল, তা না বলে দিলেও বোঝা যায়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে চিঠি পাঠিয়ে মার্গারেটের মিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার দুটি কারণ ছিল; 'প্রথম, পরিকল্পনাবিহীন কোন কার্যে পাশ্চত্যবাসীর আস্থা নাই; দ্বিতীয়, মার্গারেটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, লন্ডনের বেদান্ত সমিতিতে মিশনের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা উপস্থিত করা, যাহাতে সদস্যগণ অনুকূল ও উদার মত পোষণ করিতে পারেন।' ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট এসে পৌঁছোনোর পর মার্গারেট উৎসাহভরে লন্ডনে স্বামীজির অনুরাগীদের একটি সভায় ডাকলেন। সেই সভায় রিপোর্টটি পড়ে শোনানো হল সবাইকে। এ সম্পর্কে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে মার্গারেট লিখছেন, 'One feature which will be of vast interest to our first gathering is a report of the Math Brotherhood and its work, which has been sent to us from Baranagore by Swami Brahmananda. This document will also be printed and distributed amongst all friends known to us in this country and America, and anyone else who desires to see it has only to send for a copy. In this interesting and exhaustive statement, all who have read it feel that we take an important step towards true realisation of our solidarity with our Indian brethern. The Ramakrishna mission is an idea that appeals ot us particularly, not only for the honour of the Saint after whom it is named, and many of us in England have learned to love– but also because it aims and methods are congenial to our own. This and the Alambazar Famine Relief are a splendid vindication of the spiritual life from the charge of passivity so often preffered against it by the materialitic West.

এরপর নভেম্বর মাসে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় মার্গারেট আবার লিখলেন, 'Great interest was expressed in the work of femine relief and in the Ramakrishna Mission. These are developments which appeal to the West in a peculiar way, and it may be hoped that eventually the English centres will do their share towards sending out those secular and spiritual educators who shall carry on Hindu work on Hindu lines as some slight acknowledgement of the great benefits conferred on themselves by the awakening missionary zeal of Iidia.'

এই সময়টিতে মার্গারেটের সঙ্গে স্বামীজির নিয়মিত চিঠি পত্রে যোগাযোগ ছিল। মার্গারেট লন্ডনের কাজকর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দকে নিয়মিত অবহিত করেতন। স্বামীজি মার্গারেটকে এদেশের কাজকর্ম কেমন চলছে তা জানাতেন, চিঠির মাধ্যমে। ১৮৯৭ সনের ২০ জুন মার্গারেটকে স্বামীজি লিখেছেন, '...তোমাকে সরলভাবে জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার কাছে মূল্যবান, তোমার প্রত্যেকখানি চিঠি আমাকে খুবই আনন্দ দেয়। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ হবে, তখনই তুমি নিঃসঙ্কোচে লিখো এবং জেনো যে, তোমার একটি কথাও আমি ভুল বুঝব না, একটি কথাও উপেক্ষা করব না। অনেক কাল কাজের কোন খবর পাইনি। তুমি আমায় কিছু জানাতে পারো কি? ভারতে আমাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন, আমি এখানে কোন সাহায্যের আশা রাখি না। এরা এত দরিদ্র!

'তবে আমি নিজেও যেভাবে শিক্ষালাভ করেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই গাছের তলায় আশ্রয় করে এবং কোনরকম অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কাজের ধারাও অনেকটা বদলেছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আর আমার চিরকালের ধারণাও ছিল তাই যে, হৃদয় —শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যায়। সুতরা বর্তমান পরিকল্পনা এই যে, বহু যুবককে গড়ে তুলতে হবে— (উচ্চশ্রেণীকে নিয়েই আরম্ভ করব, নিম্নশ্রেণীকে নিয়ে নয়; ওদের জন্য আমায় একটু অপেক্ষা করতে হবে) এবং কোন একটি জেলায় তাদের জনাকয়েককে পাঠিয়ে দিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুরু করব। ধর্মরাজ্যের এই অগ্রগামী কর্মিগণ যখন পথ পরিষ্কার করে ফেলবে, তখন তত্ত্ব ও দর্শন বলার সময় আসবে।

'জনাকয়েক ছেলে ইতোমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম, গত ভূমিকম্পে তা ভেঙে গেছে; তবে বাঁচোয়া একটু যে এটা ভাড়া-বাড়ি ছিল। যাক, ভাববার কিছু নেই; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ পর্যন্ত আমাদের সম্বল শুধু মুণ্ডিত মস্তক, ছেঁড়া কাপড়,

অনিশ্চিত আহার। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক এবং পরিবর্তন হবে নিশ্চয়; কারণ আমরা মনে-প্রাণে এই কাজে লেগেছি...

'এক হিসাবে এটা সত্য যে, এ দেশের লোকের ত্যাগ করবার কিছু নেই বললেই চলে, তবু ত্যাগ আমাদের মজ্জাগত। যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ভারতের এটি একটি উচ্চপদ। সে খড়কুটোর মতো ঐ পথ ত্যাগ করেছে।...'

স্বামীজির এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, রামকৃষ্ণ মিশন শুরুর সেই প্রথম দিনে, কতখানি কষ্ট সহ্য করে, কীভাবে তিলে তিলে স্বামীজি গড়ে তুলেছেন তাঁর এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'স্বামীজির এই সময়কার পত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্যদেশের অন্যান্য বন্ধুগণকে লিখিত চিঠিগুলির সুর হইতে মার্গারেটকে লিখিত চিঠিগুলির সুর সম্পূর্ণ পৃথক।' মুক্তিপ্রাণার এই বক্তব্যের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণ, এই সময়ে মার্গারেটকে লেখা স্বামীজির চিঠিগুলি পড়লেই দেখা যায় একইসঙ্গে আন্তরিকতা এবং মার্গারেটের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাই প্রতিটি চিঠিতে ধরা পড়েছে। ১৮৯৭-এর ৪ জুলাই মার্গারেটকে বিবেকানন্দ লিখছেন, 'আশ্চর্যের কথা, আজকাল ইংলণ্ড থেকে আমার উপর ভাল ও মন্দ দুই প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়া চলছে— প্রত্যুত তোমার চিঠিগুলি উৎসাহ ও আশার আলোকে পূর্ণ এবং আমার হৃদয়ে বল ও আশা সঞ্চার করে— আর আমার এখন এগুলি বড়ই প্রয়োজন। প্রভুই জানেন।

'...এখন আমি দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি, এবং জনকয়েক যুবককে ভাবী কাজের জন্য গড়ে তোলা ছাড়া শিক্ষাকার্যে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারিনি। অন্ন সংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যদিও এ পর্যন্ত অতি সামান্যভাবেই কাজ করতে পেরেছি, তবু অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।

'ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশি কাজ হবে না। প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলেতে গেলে 'খোদার মর্জি হলে'— আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর।... তোমাদের সমিতির কার্যপ্রণালীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত— এবং ভবিষ্যতে তুমি যাই কর না কেন, তুমি ধরে নিতে পার, তাতে আমার সম্মতি থাকবে। তোমার ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এর মধ্যেই আমি তোমার কাছে প্রভূত ঋণে ঋণী, এবং প্রতিদিন আরও অশেষভাবে বাধিত করছ। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা যে, এই সমস্তই পরের জন্য। নতুবা উইম্বলডনের বন্ধুরা আমার প্রতি যে অপূর্ব অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। তোমরা

ইংরেজরা বড় ভাল, বড় স্থির, বড় খাঁটি— ভগবান তোমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করুন। আমি দূর থেকে প্রতিদিন তোমার আরও বেশী গুণগ্রাহী হচ্ছি।'

মার্গারেটের প্রতি তাঁর নির্ভরতা কতখানি এবং মার্গারেটকে কাজকর্মের বিষয়ে কতখানি স্বাধীনতা তিনি দিতে চাইছেন— স্বামীজির এই চিঠিতে তা লক্ষণীয়।

এখানে আরও একটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে, স্বামীজির সঙ্গে চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও, এবং স্বামীজি তাঁর সব কাজকর্মের বিষয়ে বিশদ সংবাদ রাখলেও, এ পর্যন্ত মার্গারেটকে ভারতে আসার কোনো আহ্বান স্বামীজি জানাননি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন স্বামীজি মার্গারেটকে বলেছিলেন, ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজে মার্গারেটের সাহায্য তাঁর সবিশেষ দরকার। কিন্তু দেশে ফিরে স্বামীজি এ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করায় মার্গারেট কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। তিনি আশা করেছিলেন স্বামীজির কাছ থেকে একটি ডাক আসবেই। ভারতে এসে স্বামীজির কাজে যোগদানের বিষয়ে মার্গারেট এতটাই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে তাঁর স্কুল এবং অন্যান্য কাজকর্মগুলিও তিনি ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনছিলেন। মানসিকভাবে নিজেকে অনেকটা প্রস্তুত করে তুলেছিলেন ভারতে যাওয়ার জন্য।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, স্বামীজি কেন মার্গারেটকে ভারতে আসার ডাক তখনো পাঠাননি। এক্ষেত্রে দুটি কারণ প্রধান মনে হয়। প্রথমত, রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মলগ্নে তখন যথেষ্ট কষ্ট করে বিবেকানন্দকে মিশনের কাজ চালাতে হচ্ছিল। মিশনের কাজের তখনও পর্যন্ত একটি প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থের অভাব। কাজেই, স্বামীজির একটি স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল, ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাঁর এই বিদেশিনী শিষ্যা এদেশে এসে এই কষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন কিনা। নিছক আবেগের বশে এদেশে এসে তারপর হত্যোদম ও হতাশ হয়ে দেশে ফিরে যান মার্গারেট—এমনটি কখনও চাননি স্বামীজি। যে কারণে মার্গারেট এদেশে আসার আগের মুহূর্তেও স্বামীজি তাঁকে এদেশের অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত আরও একটি কারণেও স্বামীজি সময় নিচ্ছিলেন। স্বামীজি চাইছিলেন, আরও সময় নিয়ে, মানসিকভাবে আরও দৃঢ় সংকল্প হয়ে তবেই মার্গারেট ভারতের মাটিতে পা রাখুন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নানারূপ অভিজ্ঞতা হইতে স্বামীজির ধারণা হয়, যে কোন পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষে ভারতে কার্য করা কঠিন। ইহার কারণ— ভারতের উষ্ণ জলবায়ু, য়ুরোপীয় ধরনের জীবনযাত্রায় অসুবিধা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অনন্ত সম্ভাবনা। সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়ায় যে আশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী, তাহা আদর্শের দিক হইতে উচ্চ হইলেও উহা ভারতের জনসাধারণের জন্য নয়। গুডউইন মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত কাজ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে

মধ্যে নানা বাধা-বিপত্তি তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং স্বামীজি ভাবিতেছিলেন ইংলণ্ডেই মার্গারেট তাঁহার আদর্শ প্রচার কার্যে অধিক সাহায্য করিতে পারিবেন। বাগ্মিতা ও লেখনীর সাহায্য তিনি ইংলণ্ডের জনগণকে ভারতের প্রকৃত বন্ধুতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন। সর্বোপরি ভারতের জন্য, অর্থ সাহায্য করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব।'

১৮৯৭ সালের ২৩ জুলাই স্বামীজি মার্গারেটকে একটি চিঠিতে লিখলেন, ' কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে— দুর্ভিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান। এখন পর্যন্ত অবশ্য খুব সামান্যভাবেই চলছে, যেসব ছেলেরা শিক্ষাধীন, তাদের সুবিধামত কাজে লাগানো হচ্ছে।

'বর্তমানে মান্দ্রাজ ও কলকাতাই আমাদের কাজের জায়গা। গুডউইন মান্দ্রাজে কাজ করছে। কলম্বোতেও একজন গেছে। যদি ইতোমধ্যে পাঠানো না হয়ে থাকে, তবে আগামী সপ্তাহ থেকে তোমাকে সমস্ত কাজের একটি করে মাসিক বিবৃতি পাঠানো হবে। আমি বর্তমানে কর্মকেন্দ্র থেকে দূরে আছি— তাই সবই একটু ঢিলে চলছে, তা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু মোটের উপর কাজ সন্তোষজনক।

' তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান্ তোমাকে আশীর্বাদ করুন।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, স্বামীজির এই চিঠি মার্গারেটকে অত্যন্ত হতাশ করেছিল। যে সময়ে তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন কখন স্বামীজির ডাক আসে, সেই সময়ে এই চিঠি তাঁকে যথেষ্ট আহত করল। মার্গারেটের জীবনীকারদের লেখা পড়লেই বোঝা যায়— মার্গারেট এই সময়ে মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। মার্গারেটের সঙ্গে যখন স্বামীজির চিঠি আদান-প্রদান চলেছে, সেই সময় মার্গারেট একটি বড় কাজ করে ফেলেছিলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণকার্যে স্বামীজি নিজে এবং রামকৃষ্ণ মিশন উদ্যোগী হয়েছেন, এটা জানতে পেরে মার্গারেট লন্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের বয়ানটি ছিল এইরকম: 'এক অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠান, খৃস্টান, মুসলমান ও হিন্দুর সমন্বয়ে গড়া এমন সংঘ বুদ্ধের পর থেকে আর হয়নি। মুক্ত হস্তে দান করুন আপনারা। এক মাসের মধ্যে দশ হাজার লোককে দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে এই সংঘ। এক মুঠো চালের বিনিময়ে একটা মানুষকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। আমাদের সাহায্য আজ নিতান্ত প্রয়োজন।' মার্গারেটের এই বিজ্ঞপ্তিতে ভালোই সাড়া পড়েছিল। এবং মার্গারেটও মিশনের কাজের জন্য বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিতে পেরেছিলেন

স্বামীজিকে। মার্গারেটের এই কাজের জন্য স্বামীজি পত্রে তাঁর কছে 'ঋণ স্বীকার' করেছিলেন। মার্গারেটকে লিখেছিলেন 'তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করতে পারবে।'

তবে, মার্গারেট এভাবে দূরে থেকে কাজ করতে আর আগ্রহী হচ্ছিলেন না। ভারতে যাবেনই— এমনই দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছেন মার্গারেট। মার্গারেটের ঘনিষ্ঠ জনেরাও ততদিনে জেনে গিয়েছেন, ভারতে যাওয়ার বিষয়ে মার্গারেট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বামীজির কাছ থেকে কোনোরকম ইতিবাচক সাড়া আসছে না দেখে মার্গারেট এই সময় শরণাপন্ন হলেন এডওয়ার্ড স্টার্ডি এবং আঁরিয়েতা মুলারের। শ্রীমতী মুলার অবশ্য ইতিমধ্যে ভারতে চলে এসেছেন। আলমোড়ায় সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে আছেন। ভারতে গিয়ে শ্রীমতী মুলারের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মার্গারেট। মার্গারেটের এই ইচ্ছা স্টার্ডি এবং শ্রীমতী মুলার— দুজনেই জানালেন স্বামীজিকে। স্টার্ডি এবং মুলারের কাছ থেকে মার্গারেটের এদেশে আসার ইচ্ছার কথা শুনে আর বিশেষ আপত্তি করেননি স্বামীজি। বরং, স্বামীজি বুঝেছিলেন, ভারতে আসার বিষয়ে মার্গারেট একপ্রকার মনস্থির করেই ফেলেছেন। এরপর তাঁকে বাধা দেওয়া নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। তবু, মার্গারেটকে আরও একবার এদেশের বিবিধ সমস্যার কথা জানিয়ে এবং সেসব সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার মতো মানসিক ধৈর্য্য বাজায় রেখেই মার্গারেটকে এদেশে আসতে লিখলেন স্বামীজি। ২৯ জুলাই ১৮৯৭ মার্গারেটকে তিনি লিখলেন, 'স্টার্ডির একখানা চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে, তুমি ভারতে আসতে এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ়সংকল্প। কাল তার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু মিস মুলারের কাছ থেকে তোমার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে যা জানতে পারলাম, তাতে এ পত্রখনিও আবশ্যক হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, সরাসরি তোমাকে লেখা ভাল।

'তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমারও দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।

'কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশে দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারো না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা— ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই হোক— তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের

খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে।

'তাছাড়া জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশে প্রায় সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মতো, আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদাই আগুনের হলকা চলেছে।

'শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই। এসব স্বত্ত্বেও তুমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি। আমি কেউ নই— তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই তোমায় সাহায্য করব।

'কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে— তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই থাকো। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার তোমাকে একটু সাবধান করা দরকার— তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস মূলার বা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তাঁর নিজের ভাবে মিস মূলার চমৎকার মহিলা, কিন্তু দুর্ভগ্যক্রমে এই ধারণা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মাথায় ঢুকেছে যে, তিনি আজন্ম নেত্রী আর দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিতে টাকা ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এই মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই বারবার মাথা তুলেছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে যে, তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলা অসম্ভব। তাঁর বর্তমান সঙ্কল্প এই যে, তিনি কলকাতায় একটি বাড়ি ভাড়া নেবেন— তোমার ও নিজের জন্য, এবং ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে যেসব বন্ধুদের আসার সম্ভাবনা আছে তাঁদেরও জন্য। এটা অবশ্য তাঁর সহৃদয়তা এবং অমায়িকতার পরিচায়ক; কিন্তু তাঁর মঠাধ্যক্ষাসুলভ সঙ্কল্পটি দুটি কারণে কখনও সফল হবে না— তাঁর রুক্ষ মেজাজ এবং অদ্ভুত অস্থিরচিত্ততা। কারও কারও সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাল; যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

'মিসেস সেভিয়ার নারী কুলের রত্নবিশেষ; এত ভাল, এত স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না; এমনকি স্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি। কিন্তু তাঁদের এখনও কোনও নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী নেই। তুমি এলে তোমার সহকর্মিরূপে তাঁদের পেতে পারো এবং তাতে তোমার ও তাঁদের—উভয়েরই সুবিধা হবে। কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

'আমেরিকার সংবাদে জানলাম যে, আমার দুজন বন্ধু মিস ম্যাকলাউড ও বস্টনের মিসেস বুল এই শরৎকালেই ভারত পরিভ্রমণে আসছেন। মিস ম্যাকলাউডকে তুমি লণ্ডনেই দেখেছ— সেই প্যারি-ফ্যাশনের পোশাক পরা মহিলাটি! মিসেস বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁরা ইউরোপ হয়ে এদেশে আসছেন, সুতরাং আমার পারমর্শ এই যে, তাঁদের সঙ্গে এলে তোমার পথের একঘেয়েমি দূর হতে পারে।

'মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। কিন্তু চিঠিটি বড় শুষ্ক এবং প্রাণহীন। লণ্ডনের কাজ পণ্ড হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন বলে মনে হয়।'

স্বামীজির এই চিঠিটি থেকে দু-তিনটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় মনে হয়। প্রথমত মার্গারেটকে দেওয়া তাঁর আশ্বাস। আজীবন মার্গারেটের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন স্বামীজি। বলছেন, তাঁর এ আশ্বাসের নড়চড় হবে না, 'মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত।' দ্বিতীয়ত, মার্গারেটকে অন্য কারও ওপর নির্ভর না করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এদেশে— একথাও বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বামীজি। তৃতীয়ত— তাঁর কয়েকজন বিদেশি শিষ্য-শিষ্যা সম্পর্কে স্বামীজির ধারণাটিও এই পত্রে ধরা পড়েছে। শ্রীমতী মুলার যে মিশনের সংস্কৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত নন তা স্বামীজি ইংল্যান্ডে থাকাকালীনই বুঝেছিলেন। ওই সময়ে শ্রীমতী মুলারের বাড়িতে তাঁর দুই গুরুভ্রাতাকে নিয়ে থাকতে গিয়ে স্বামীজিকে বেশ অস্বস্তিকর অবস্থার ভিতর পড়তে হয়েছিল। যদিও শ্রীমতি মুলার রামকৃষ্ণ মঠ গড়ার প্রথম লগ্নে স্বামীজিকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু স্বামীজি এ-ও বুঝেছিলেন যে, মুলারের অহংবোধই বোধহয় যে কোনো কাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে— যে কারণে মার্গারেটকে তিনি প্রথমেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী মুলারকে কেন্দ্র করে কোনোরকম তিক্ততার সৃষ্টি হোক তা তিনি কখনওই চাননি। শ্রীমতী মুলারও স্বামীজির জীবদ্দশাতেই মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। ১৮৯৬ সনের ১ জানুয়ারি শ্রীমতী সেভিয়ার আলমোড়া থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'মিস মূলার স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের প্রচারের কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তাঁর সম্পর্কে ছিন্ন করেছেন এবং তিনি পুনরায় খ্রিস্টধর্মে ফিরে এসেছেন।' শ্রীমতী মুলার যে দীর্ঘদিন মঠের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারবেন না তা যেন আগেই বুঝেছিলেন স্বামীজি।

এরপর ১৮৯৭ সালের ১ অক্টোবর শ্রীনগর থেকে একটি চিঠিতে মার্গারেটকে স্বামীজি লিখলেন, 'অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মতো

অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও সে-ই সমগ্র বাড়ির রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, এই হলো নেতৃত্বের মূল রহস্য... অনুভব অনেকেই করে সত্য, কিন্তু জনকয়েকই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যের প্রতি অন্তরের প্রেম... প্রশংসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, তাই একজনকে অপরের অপেক্ষা ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্য দান করে।...'এই চিঠিতে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এর আগের সব চিঠিগুলিতে মার্গারেটকে 'কল্যাণীয়া মিস নোব্‌ল' বলে সম্বোধন করেছেন স্বামিজি। এই চিঠিতে সম্বোধন করেছেন 'কল্যাণীয়া মার্গো' বলে। সম্বোধনের এই পরিবর্তনই বুঝিয়ে দিচ্ছে, ইতিমধ্যে স্বামীজির কতটা স্নেহভাজন এবং আপনার হয়ে উঠেছেন মার্গারেট।

এরপর মার্গারেটকে স্বামীজি চিঠি লিখছেন ৩ নভেম্বর ১৮৯৭। অর্থাৎ মার্গারেট ভারতের পথে রওয়ানা হওয়ার দু মাস আগে। ওই পত্রে স্বামীজি লিখলেন, 'অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে; 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'—এই হবে মূল মন্ত্র।

'আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে, বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি একটুকরো রুটি পাই, নিশ্চয় জেনো, তার সবটুকুই তুমি পাবে। আমি কাল লাহোরে যাচ্ছি; সেখানে পৌছে স্টার্ডিকে চিঠি লিখব। কাশ্মীরে মহারাজের কাছ থেকে কিছু জমি পাবার আশায় গত পনের দিন আমি ওখানে আছি। যদি এদেশে থাকি তো আগামী গ্রীষ্মে আবার কাশ্মীর যাব এবং সেখানে কিছু কাজ শুরু করব ভাবছি।'

এই চিঠিতে মার্গারেটকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বামীজি লিখলেন, 'আমি দেখতে পাই—অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালোবাসাই আমাকে অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তাহলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। নিজের গণ্ডির বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত নয়—এমন লোকও আছে যারা ঐরূপ প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশি সম্ভব লোকের উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডির বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা কলহে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন ব্যক্তির গণ্ডির বাইরে। আমার বিশ্বাস—তুমি একথা বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, নেতা অপরের শ্রদ্ধাকে পাশুার মতো নিজের কাজে লাগাবেন, আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই, তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালোবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'—তেমনি আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয় উৎপাটিত করতে পারি।

এ প্রেমে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু কোন বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্তু চেতনে পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ এই হল আমাদের বেদান্তের সার কথা। একই সদ্বস্তু অজ্ঞানীর চক্ষে 'জড়' এবং জ্ঞানীর চক্ষে 'ভগবান্' বলে প্রতিভাত হন এবং জড়ের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয় লাভ—তাই হলো সভ্যতার ইতিহাস। অজ্ঞানীরা নিরাকারকেও সাকাররূপে দেখে, জ্ঞানী সাকারেও নিরাকারের দর্শন পান। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যেও আমরা শুধু এই শিক্ষাই পাচ্ছি।...অতিরিক্ত ভাব প্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। 'বজ্রের মতো দৃঢ় অথচ কুসুমের মতো কোমল'—এটিই হচ্ছে সার নীতি।'

স্বামীজির চিঠির এই অংশটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণে। প্রথমত, স্বামীজি দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে, প্রাচ্য সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতই, মার্গারেট তাঁকে বিবাহ করে একত্রে তাঁর সঙ্গে কাজে আত্মনিয়োগ করার কথা ভেবেছিলেন। মার্গারেটের এই প্রস্তাবে স্বামীজি মার্গারেটকে সেদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন সর্বত্যাগী বন্ধনহীন সন্ন্যাসী। তিনি সকলের। কোনো একজনের তিনি হতে পারেন না। মার্গারেট ভারতে আগমনের মুহূর্তেও স্বামীজি তাঁকে হয়তো আরও একবার এইটিই যেন স্মরণ করিয়ে দিলেন। লিখলেন, 'আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডির বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।' লিখলেন, 'প্রতিদানে কোনও ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তাহলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।' তিনি যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নন, বরং সমস্ত ব্যক্তিগত বন্ধনের ঊর্ধ্বে— একথা কিন্তু বিবেকানন্দ পরেও বরাবরই স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসেছেন তাঁর শিষ্যাকে। এই চিঠিতেই স্বামীজি এ-ও লিখেছেন, 'অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর।' স্বামীজির এই কথাটি লেখারও যথেষ্টই কারণ ছিল। মার্গারেটের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং ইংল্যান্ডে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে পর্যালোচনা করার পর স্বামীজির বুঝতে বিলম্ব হয়নি মার্গারেট যথেষ্টই ভাবপ্রবণ। শুধুমাত্র আবেগের বশে তিনি অনেক কাজই করে থাকেন। পরবর্তী জীবনেও এই ভাবপ্রবণতা থেকে মার্গারেট মুক্ত হতে পারেননি। এমনকী স্বামীজির কাছে দীক্ষার পর নিবেদিতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও নয়। এই ভাবপ্রবণতা ভবিষ্যতে মার্গারেটের কাজের পক্ষে অন্তরায় হতে পারে— হয়তো এমন মনে করেই চিঠিতে এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন স্বামীজি।

তিনি কী বলতে চান তা এই চিঠিতেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন স্বামীজি। এ-ও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, মার্গারেটকে ভারতে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যোগ দিতে হলে কোন মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে। মার্গারেটও উপলব্ধি করেছিলেন

স্বামীজির এই বক্তব্য। তবে ততদিনে মার্গারেট ভারতে আসার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভারতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মার্গারেটের ভাই রিচমন্ডের বয়স তখন কুড়ি। উইম্বলডনে মার্গারেট যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই রাস্কিন স্কুলের দায়িত্ব তিনি বুঝিয়ে দিলেন বোন মে-কে। লিজেল রেমঁ লিখছেন, মার্গারেটের বন্ধুবান্ধবদের ধারণা ছিল, মার্গারেট কিছুদিনের জন্যই ভারতে যাচ্ছেন। একমাত্র এডওয়ার্ড স্টার্ডিই মার্গারেটের পরিকল্পনার কথা জানতেন। কারণ, স্টার্ডির সঙ্গেই মার্গারেট ভারতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করার বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা করতেন। এবং স্টার্ডিও ভারতে যাওয়ার বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ জোগাতেন।

মার্গারেট তাঁর ভারত যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘনিষ্ঠ জনদের জানাতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্টোভিয়াস বিটি আপত্তি জানিয়েছিলেন— একথা লিখেছেন রেমঁ। অবশ্য মার্গারেটের জেদের কাছে বিটিকে হার মানতে হয়েছিল। অবশেষে ১৮৯৮-এর ৫ জানুয়ারি মোম্বাসা জাহাজে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন মার্গারেট।

যখন ভারতের দিকে রওয়ানা দিলেন, সেই সময়ে তরুণী মার্গারেটের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এরিক হ্যামন্ড লিখেছেন, 'Her portrait, at the period of her sailing, shows us a young but distinctive woman with luminous grey-blue eyes, with hair of light golden brown, with a complexion radiant in it's clearness; with a smile ingratiating and alluring, Of medium height; alert in every muscle and movement; eager, enterprising, dauntless. She derived from, and was proud of, Irish ancestry, and, generous, impulsive, ardent, she embodied much of the charm, the power of ready speech, the fascination of the celt at her best. All this she carried from the Emerald Isle, by way to England, to India, the home of her adoption.'

মার্গারেটের ভারত যাত্রার দিনটি স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর ভাই রিচমন্ড পরে লিখেছেন, 'I still remember the day she first left for India. She was journeying on the British-India Line. We had gone to see her off at the Tilbury Dock. My other sister and mother were there. And there were two more friends, Ebenzer Cooke and Octovius Beeti...Mother and sister started crying.'

যাত্রার দিনটি বর্ণনা করতে গিয়ে রেমঁ লিখছেন, ' যাওয়ার দিন কনকনে ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি। যে ক্যাবখানা চড়ে ওরা টিল্‌বারি চলেছে তার খড়খড়িতে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ছাট। প্রত্যেকেরই ভিতরটা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। মার্গারেটের মা, বোন, ভাই, অক্টোভিয়াস বীটি আর এবেনজার কুক্ বন্দরে দাঁড়িয়ে

রইলেন। ধীরে ধীরে জাহাজখানি কুয়াশার মাঝে একেবারে মিলিয়ে গেল। মা বোন কাঁদতে লাগলেন।

'অনেকক্ষণ ধরে ওঁরা দেখলেন, মার্গারেট দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর। মাথায় হ্যাট নাই, মুখখানিকে ঘিরে সোনালী চুলের রাশ। আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল ওকে। কী প্রশান্ত, কী গম্ভীর! আর সে ওঁদের কেউ নয়। তবু ওর অফুরন্ত ভালবাসা যেন দেবতার আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ছে ওঁদের 'পরে। ওর পিঙ্গল দৃষ্টি অপলকে খুঁজে ফিরছে কোন্ সুদূরের আলো, যার উদ্দেশে এই অভিসার?...

'হাতের মুঠোয় বিবেকানন্দের লেখা সেই চিঠিখানি, 'মরদ কী বাত, হাথী কা দাঁত', পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব, কথা দিচ্ছি তোমায়!'

এগারো

২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৮, মোম্বাসা জাহাজ এসে থামল মাদ্রাজে। পুরো একদিন মাদ্রাজ বন্দরে দাঁড়িয়ে রইল জাহাজ। মাদ্রাজ বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কিছু আগে যোশুয়া গুডউইন এসে দেখা করে গেলেন মার্গারেটের সঙ্গে। গুডউইনকে দেখে মার্গারেটের যাত্রাপথের নিঃসঙ্গতাও কিছুটা লাঘব হল। মাদ্রাজ বন্দর ছেড়ে মোম্বাসা রওয়ানা হল কলকাতার দিকে। দিন চারেক লাগবে কলকাতা পৌঁছতে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'সহসা মার্গারেট অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেকের জন্য মনে হইল তিনি কি ভুল করিয়াছেন! কলিকাতার দুই-একজন ইংরেজ কর্মচারীর সহিত পত্র বিনিময় হইয়াছে, তাঁহারাও যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু সে চিন্তা কিছুমাত্র সান্ত্বনা ছিল না। কলিকাতায় তাঁহাকে একাকী থাকিতে হইবে। মিস মুলার ইতিপূর্বেই আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি তখন আলমোড়ায়।' কলকাতার কাছাকাছি যখন এসে পড়েছেন মার্গারেট তখন ডায়েরিতে লিখলেন, 'Inspite of infinite kindness–very very lonely, what Calcutta will feel like I tremble to think.'

২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৮। মার্গারেটের জাহাজ এসে ভিড়ল কলকাতা বন্দরে। স্বয়ং বিবেকানন্দ জাহাজঘাটায় এলেন তাঁকে স্বাগত জানাতে। এর একটা বিবরণ পাওয়া যায় লিজেল রেমঁর লেখায়। রেমঁর বর্ণনা অনুযায়ী, বন্দরে বেশ মানুষের ভিড়। অনেকেরই পরিচিত জনেরা আসছেন জাহাজে। যাঁরা অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন, তাঁরা হাওয়ায় রুমাল নাড়াচ্ছেন। কারও কারও হাতে ফুলের মালা। রীতিমতো ঠেলাঠেলি করে নামতে হল মার্গারেটকে। মাটিতে পা দিয়েই মার্গারেট দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে আসছেন ওঁর দিকে। স্বামীজির পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। পায়ে স্যান্ডেল। স্বামীজিকে সবে নমস্কার করতে যাবেন, তখন গেরুয়া পরা আর একজন সন্ন্যাসী এসে মার্গারেটের গলায় একখানি মালা পরিয়ে স্বাগত

জানালেন। জুঁই আর গোলাপে মেশানো সাদা ফুলের মালা। মার্গারেট অভিভূত হয়ে পড়লেন।

রেঁম লিখছেন, 'কুলিরা ছুটে চলেছে পাহাড় প্রমাণ বোঝা মাথায় নিয়ে, নগ্নদেহে ঘামের ধারা বইছে। পিছনে পিছনে জাহাজের যাত্রীরা চলেছে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি করে। সোনালী-কিনারা-দেওয়া ইউনিফর্ম পরা পাহারাওয়ালারা হাতের ছড়ি দিয়ে একবার তাদের তাড়া করছে, একবার ঠেলে দিচ্ছে। কোনও-কোনও যাত্রীর গলায় সুগন্ধি মালার বোঝা, তাকে ঘিরে ঘোমটা-ঢাকা মেয়েরা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্দরের ঠিক বের'বার পথটিতে কেবল ভিড়েরই ঠেলা, তার বিশৃঙ্খল শ্লথ গতিতে পথ না ছেড়ে দিয়ে উপায় নাই।

'মার্গারেটের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল পুরুষদের অদ্ভুত পোষাক দেখে। কারও পোশাক শরীরের উপর কসে জড়ানো। পেশীর রেখাগুলো ফুটে উঠেছে তার ভিতর দিয়ে। কেউ বা লম্বা ঢল্‌ঢলে শার্টের উপর চড়িয়েছে ওয়েস্ট কোট, কারও পোশাক আঁটসাঁট, কারও-বা ঢিলেঢালা। দাড়িতে চুলেতে দৈত্যের মতো এক্কেকটা মানুষ। কানে ঝিকমিক করছে দামী পাথর, মাথায় পাতলা মসলিনের পাগ। কারও কারও মাথা একেবারে চেঁচে কামানো। কারও বা ন্যাড়া মাথায় এক গোছা লম্বা টিকি। কারও ডান কানের উপরে কাঁটা দিয়ে আটকানো একটা ঝুঁটি, আবার কারও ঝাঁকড়া চুল গুচ্ছে গুচ্ছে এসে পড়েছে কাঁধের উপর। কাস্টম-হাউসের দুয়ার দিয়ে যাত্রীরা একে-একে পার হচ্ছে। কাছেই তালপাতার ছাতার নীচে এক সাধু নিশ্চল হয়ে ধ্যান করছে,—মাথায় জটা, সর্ব শরীরে লাল-সাদা ডোরাকাটা, দেখতে লাগছে যেন এক ব্রোঞ্জের মূর্তি। সুগন্ধি ধুনো পুড়ছে তার পাশে।' একশো পঁচিশ বছরেরও বেশি আগের কলকাতার এক নিখুঁত বর্ণনা।

কলকাতায় আসার পর মার্গারেটের প্রথম বাসস্থান স্বামীজি ঠিক করলেন পার্ক স্ট্রিটে। ৪৯ পার্ক স্ট্রিট—এই ঠিকানার বাড়িতে মার্গারেটকে নিয়ে এলেন স্বামীজি। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন বিদেশি ভক্ত এবং অনুরাগী তখন ওই বাড়িটিতে থাকতেন। ঠিক হল, মার্গারেটও আপাতত তাঁদের সঙ্গে সেখানেই থাকবেন। মার্গারেটের এই প্রথম বাসস্থানটি কেমন ছিল? কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শ্রীমতী হ্যামন্ডকে একটি চিঠিতে বাড়িটির বর্ণনা দিয়েছেন মার্গারেট। লিখেছেন, 'The postman delivers his letters at my bedroom door, and my servant (I have a man of my own, my Dear!) leaves my visitors standing on the doorstep, till I go to them.

'My bedroom has 8 doors though it is quite a small room, and my bathroom, still smaller, has 4,–2 which open into the bath itself. [(the bath = a kerb stone of concrete on a concrete floor)– here in the wall, there is a tap, and on the floor stands a zinc footbath– beside

which you take your stand on a piece of wood and pour water all over yourself with a tin can or sponge.]

'So you may imagine that one feels as if one were bathing on the highway of nations where 4 roads meet. I wish I had a camera to send home photographs of eveything. A row of native shops is the funniest thing you can imagine. But I feel very much at home at present, and will try to put all my small surprise into my geography letter.'

মার্গারেটের এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা পার্ক স্ট্রিটের এই বাড়িটিতে প্রায় অপ্রতুলই ছিল। প্রথম প্রথম মার্গারেটকে তা বিস্মিতও করেছিল। কিন্তু এ নিয়ে মার্গারেট কোনোরকম ক্ষোভ কোনোদিনই প্রকাশ করেননি। বরং পাশ্চাত্যের অভ্যাসগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করে প্রাচ্যের জীবনযাত্রার সঙ্গে ক্রমেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। যে কারণে যখন তিনি তাঁর মেয়েদের স্কুলটি চালু করেন, তখন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নানাবিধ অসুবিধার ভিতর তিনি অনায়াসেই থাকতে পেরেছিলেন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, মার্গারেট কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর প্রথমদিন চৌরঙ্গি অঞ্চলের একটি হোটেলে ছিলেন। মার্গারেটের চিঠিতে অবশ্য বাড়িটিকে হোটেল বলে উল্লেখ করা নেই। কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর কদিন শহরটাকে ঘুরে দেখেছিলেন মার্গারেট। তাঁর কয়েকজন ব্রিটিশ বন্ধু মি. ম্যাকডোনাল্ড, মি. আরবাথনট প্রমুখের সঙ্গে এই সময়ে তিনি বটানিকাল গার্ডেন, জাদুঘর, ফোর্ট উইলিয়াম, মিউজিয়াম প্রভৃতি জায়গাগুলি ঘুরে দেখেন। একদিন ক্যাথিড্রাল চার্চে গিয়ে উপাসনাও করে আসেন।

একশো বছরেরও বেশি আগের সেই সময়ে কলকাতার চৌরঙ্গি অঞ্চল ছিল জনবিরল ও সুসজ্জিত। মূলত সাহেবরাই এই অঞ্চলে বাস করত। সাধারণ এদেশিরা সাধারণত চৌরঙ্গি অঞ্চলে যেত না। শুধু সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী বাঙালিরাই সাহেব-সুবোদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলে চৌরঙ্গি অঞ্চলে যেতেন। তেমনই, সাহেবরাও ওই চৌরঙ্গি এলাকার বাইরের শহরের অন্যান্য অঞ্চলে খুব বেশি একটা যাতায়াত করত না। আসলে প্রাচ্য জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করার তাগিদও তাদের একেবারেই ছিল না। মার্গারেট কিন্তু কলকাতায় পা রেখে বুঝতে পারলেন, চৌরঙ্গির এই সাহেবি অঞ্চলে শুধুমাত্র নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না; এদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হবে। তাদের জীবনযাত্রা তাঁকে জানতে এবং বুঝতে হবে। কেননা, তিনি তাদের মাঝেই কাজ করতে এসেছেন। তাদের না জানলে এবং না বুঝলে তিনি যে কাজ করবেন বলে এসেছেন তা কখনোই করতে পারবেন না; কাজেই 'নেটিভ' পল্লীগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা তাঁর একান্ত দরকার। ফলে,

ব্রিটিশ বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিনি যেমন কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেছিলেন, তেমনিই মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে কলকাতার অন্য প্রান্তগুলিতেও ঘুরতে যেতেন। সেটা যেতেন একা একাই। এদেশের সাধারণ মানুষ কীভাবে থাকে, কেমন তাদের জীবনযাত্রা— সে সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করার চেষ্টা করতেন।

মার্গারেট কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর স্বামীজি তাঁর জন্য বাংলা শেখার ব্যবস্থা করেন। স্বামীজি বুঝেছিলেন মার্গারেট যদি বাংলা শিখতে না পারেন—তাহলে এখানে তাঁর পক্ষে কাজ করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। যে কারণে মার্গারেটকে যত দ্রুত সম্ভব বাংলা শেখাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বামীজি। মার্গারেট কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পরদিনই স্বামীজি এক ব্রহ্মচারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে বাংলা শেখাতে। রেমঁ তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন, 'আসার পরদিনই একজন সন্ন্যাসী মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে পাঠিয়েছেন বাংলা শেখানোর জন্য। তাঁর পরণে ব্রহ্মচারীর সাদা কাপড়, কামানো মাথায় এক গোছা শিখা শুধু। ভদ্রলোকের ধরনটা জড়সড়, একটা ছেলেমানুষী নিরীহ ভাব। দুয়ারের বাইরে চটি খুলে খালি পায়ে অপেক্ষা করছেন ছাত্রী কতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে আসে।' প্রথমদিন বাংলা শিখতে গিয়ে নিজের অজ্ঞতার জন্য কতটা অস্বস্তিতে যে পড়তে হয়েছিল তাঁকে তা-ও শ্রীমতী হ্যামন্ডকে চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি (এই চিঠিটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তবু আরও একবার করা হল), 'The gentleman who was sent to teach me Bengali yesterday began by laying down two little books— "Containing our Lord's saying in Bengali – which you shall translate as soon as you are able." I think it says world for the unsectarian character of the Swami that my reply was— "Our Lord? – But which?- Krishna?" Fortunately he misunderstood my difficulty and said, 'Yes, Our Lord, Sri Ramakrisha"— and then I knew.'

এই সময়টায় স্বামীজি ব্যস্ত বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কাজে। ঐ নিয়ে খুব ছোটাছুটি করছেন তখন তিনি। একবার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি, একবার বেলুড়। যত দ্রুত সম্ভব বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্থায়ী ঠিকানা দিতে চাইছেন। চাইছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের একটি স্থায়ী মাথা গোঁজার জায়গা হোক। বেলুড়ে গঙ্গার তীরে পনের একর জমি কিনে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছে তখন। ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে স্বামী সারদানন্দ ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। সারদানন্দের সঙ্গে এলেন স্বামীজির দুই বিদেশি অনুরাগিণী শ্রীমতী সারা বুল এবং শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। সারা বুল ছিলেন নরওয়ের বিখ্যাত যন্ত্রসংগীত শিল্পী ওলি বুলের বিধবা পত্নী। আমেরিকার বস্টনে সারা বুলের

বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি। এই বয়স্কা মহিলা স্বামীজিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্বামীজি তাঁকে 'ধীরা মা' বলে ডাকতেন। শ্রীমতী বুল আজীবন স্বামীজির অনুরাগিণী ছিলেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে মার্গারেটের লন্ডনে পরিচয় হয়েছিল। ১৮৯৬ সনে স্বামীজি যখন দ্বিতীয় বারের জন্য লন্ডনে যান, সেই সময়ই জোসেফিনের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় হয়। দুজনের কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও হয় তখন।

স্বামীজির এই দুই বিদেশি ভক্ত কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর একটি হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হল। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই আলমবাজার মঠ স্থানান্তরিত হয়ে চলে এল বেলুড়ে। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে। এই বাগানবাড়ির পাশের জমি ও পুরনো বাড়ি কিনে নিয়ে তখন মঠ করার তোড়জোড় চলছে। এই সময়েই একদিন স্বামীজি শ্রীমতী বুল, শ্রীমতী ম্যাকলিয়ড এবং মার্গারেটকে জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এলেন। বেলুড় ঘুরে আসার পর ১৮৯৮-র ১০ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এরিক আর তাঁর স্ত্রী নিল হ্যামন্ডকে মার্গারেট লিখলেন, 'The Rev. Mother (শ্রীমতী বুল) arrived on Monday morning last. On Tuesday we saw the Swami. Yesterday we picniced as his guests on a lovely bit of the river bank that Miss Muller is buying for him to build a Monastery on. (It was just like a bit of Wimbledon Common–until you looked at the plants in detail. Then you found yourself under not silver birches and nuts and oaks, but under acacias and mangoes in full blossom with here and there a palm in front of you– and magnificent blossoming creepers and cable–like stems instead of bracken and blue bells, underneath).'

ওই চিঠিতে তিনি আরো লিখলেন, 'Now as to the work here. The Swami's great care now is the establishment of a monastic college for the training of young men for the work of education– not only in India but also in the west. This is the point that I think we have always missed. I am sure you agree with me as to the value of the light the Vedanta throws on all religious life; what one does not realise is that this light has been in the conscious possession of one caste here for atleast 3000 years–and that instead of giving and spreading it, they have jealously excluded not only gentiles but even the low castes of their own race! This is the reform the Swami is preaching– and this is why we in England must form a source of material supplies...'

আলমবাজার থেকে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে আসার পর এবং পাশের জমিতে মঠের নিজের বাড়ি তৈরির প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় এই সময় স্বামীজিও যথেষ্ট উৎফুল্ল ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায়

১৮৯৮ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে। ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'নূতন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে পরিমাণে বিশুদ্ধ ও ঠান্ডা হাওয়া উপভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকটা হয়রান হইয়া পড়িতেছে। সারদা দিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছে...হরিরও একটু হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ইহাতে তাহাদের অনেকটা মাংস ঝরিবে। ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি, হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ), সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) ও স্বয়ং আমাকে ওয়ালট্‌জ্‌ (Waltz) নৃত্য করিতে দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে।

'শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাসমতো কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে— ভাবো দেখি, সেই পুরানো মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড় উন্নতি। আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 'ক্লীঁ-ফট্‌', ঝাঁজ ও ঘন্টার যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে তুমি মূর্ছা যাইবে। জন্মতিথি পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে।'

এর পরপরই মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যানে সর্বসাধারণের জন্য একটি সভার পর আর একটি চিঠিতে রামকৃষ্ণানন্দকে মার্গারেটের কথা লিখছেন স্বামীজি, 'মিস নোব্‌লের মত মেয়ে সত্যি দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মীতায় সে শীঘ্রই মিসেস বেস্যান্টকে (অ্যানি বেসান্ত) ছাড়াইয়া যাইবে।' মার্গারেট কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর স্বামীজি যেমন তাঁর বাংলা পড়া এবং ক্রমশ এখানকার রীতিনীতি, প্রথাসমূহ সম্পর্কে মার্গারেটকে ওয়াকিবহাল করে তুলছিলেন ধীরে ধীরে, তেমনই মার্গারেটের সঙ্গে প্রত্যহ একটি যোগাযোগও তিনি রক্ষা করে চলেছিলেন। নানাবিধ বিষয়ে মার্গারেটের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে একটি সূত্র বাঁধতে চাইছিলেন। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই মার্গারেটকে এগিয়ে দিতে চাইছিলেন স্বামীজি।

বেলুড়ে যে বাড়িতে তখন মঠ ছিল—তার পাশেই একটি বাড়িকে তখন অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহার করা হত। সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়ে ওই বাড়িতে এসেই বসবাস শুরু করেন। মঠের কাজকর্ম যাতে আরও ভালোভাবে দেখাশোনা করা যায়, তার জন্যই তাঁরা ওই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। ওই বাড়িটির বর্ণনা রেমঁর লেখায় পাওয়া যায়। রেমঁ লিখেছেন, 'ছোট বাড়িটি নেহাৎ সাদাসিধা একখানা বাংলোগোছের। আসবাবপত্রের বালাই বড় নাই। পর পর কতগুলি ঘর আছে মাত্র। জানালাগুলিতে শার্সি নাই। পাল্লা দিয়ে খিল আটকাতে হয়। চওড়া বারান্দায় খড়ের ছাউনি, তাতে রোদের তেজটা মৃদু হেয়ে ঢোকে।'

ফেব্রুয়ারি মাসেই সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এখানে থাকার জন্য চলে এসেছিলেন। স্বামীজি যখন আমেরিকায় যান, তখন এঁরা দুজনেই তাঁর সঙ্গে ভারতে এসে এই দেশটাকে দেখতে চেয়েছিলেন। স্বামীজি তখন তাঁদের আসতে দেননি। বলেছিলেন, 'যদি দারিদ্র্য, দৈন্যদশা আর নোংরামি দেখতে চাও, কিভাবে শুধু দেবতার মুখ চেয়ে তারা বেঁচে আছে দেখতে চাও, তাহলে হাজারবার এদেশে এসো। এছাড়া আর কিছু যদি চাও তাহলে এসো না। আর একটা টিপ্পনিও শুনতে চাই না কারও মুখে, ওসব ঢের শুনেছি।'

এদেশে এসে পৌঁছানোর পর জোসেফিন ম্যাকলিয়ড স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' স্বামীজি বলেছিলেন, 'ভারতকে ভালোবাসো।' মিশনের কাজের ক্ষেত্রে প্রচন্ড অর্থাভাবের কথা জানতে পেরে জোসেফিন সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজিকে তিনশো ডলার দিয়েছিলেন। সেই অর্থ দিয়েই স্বামীজি এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকার খরচ চালিয়েছিলেন। জোসেফিন স্বামীজির দীক্ষিত শিষ্যা ছিলেন না; কিন্তু আজীবন স্বামীজির শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ ছিলেন। স্বামীজির মৃত্যুর পর তিনি বহুদিন বেলুড়ে বাস করেছিলেন। নীরবে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে নানাভাবে সাহায্য করে গেছেন।

সারা বুল এবং জোসেফিন যখন বেলুড় এসে বসবাস শুরু করলেন, তখন স্বামীজি রোজ সকালে ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন এবং বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করে সময় কাটাতেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল মার্গারেটও ওঁদের সঙ্গে এসে বেলুড়ে বসবাস করুন। কেননা বেলুড়ে এসে থাকলে মার্গারেটের পক্ষে আরও সহজে মঠ-মিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়া সম্ভব হবে বলেই মনে করেছিলেন স্বামীজি। সারা বুল এবং জোসেফিনকে তাঁর সেই ইচ্ছার কথা জানালেন স্বামীজি। মার্গারেটকে জোসেফিন আগে থেকেই চিনতেন। অতএব মার্গারেটের বেলুড়ে আসার ব্যাপারে ওঁরা সম্মতিই দিলেন।

ওই সময়ে স্বামীজির ছ'জন বিদেশি শিষ্য-শিষ্যা ভারতে এসেছিলেন। এঁরা হলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, শ্রীমতী সেভিয়ার, আঁরিয়েতা মুলার, সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং মার্গারেট। তাঁর এই বিদেশি শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে মঠ-মিশনের গোঁড়া সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের কোনো দূরত্ব যাতে না থাকে সে বিষয়েও সচেষ্ট ছিলেন স্বামীজি। স্বামীজি জানতেন, জাতি-ধর্ম বা বর্ণগত কোনো দূরত্ব যদি থেকে যায় তাহলে মঠ-মিশনের কাজে তিনি যে সহায়তা আশা করছেন তাঁর পাশ্চাত্যের শিষ্যদের কাছে, তা আসবে না। তার চেয়েও বড় কথা, এইসব সংকীর্ণতার জালে একবার যদি বাঁধা পড়ে যায় রামকৃষ্ণ মিশন, তাহলে আর-পাঁচটি ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে তার তফাৎ থাকবে না। এই কারণেই তাঁর গোঁড়া সন্ন্যাসীভ্রাতা এবং ব্রহ্মচারীদের তিনি বিদেশি

শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে একত্রে পংক্তি ভোজনে বসাতেন, এমন সব আলোচনার অবতারণ করতেন— যাতে উভয় পক্ষের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ফলে, বিদেশি শিষ্য-শিষ্যাদের কেন্দ্র করে প্রাথমিক যে সঙ্কোচটুকু মিশনের অনেকেরই ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়।

সারা বুল এবং জোসেফিনের সঙ্গে একত্রে তাঁর বেলুড়ে থাকার কথা ১৮৯৮-র মে মাসের একটি চিঠিতে বান্ধবী নেল হ্যামন্ডকে জানিয়েছিলেন মার্গারেট। এই সময়ে আর-একটি বিষয় সম্পর্কেও মার্গারেট সতর্ক হয়েছিলেন। স্বামীজি যে নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন তাকে যেন কেউ আর একটা নতুন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বলে মনে না করে— সেটি প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মার্গারেট। ১৮৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এরিক হ্যামন্ড এবং তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মার্গারেট তাই লিখেছিলেন, 'To begin with the bogey of ours— sectarianism. You have always said– in full agreement with Mrs. Jonson– "do let us avoid making a new sect"– and so I have felt–I hate being labelled or labellable. But I have now had time to consider the case quietly alone and I have come to the conclusion that a sect is a group of people carefuly enclosed and guarded from contact with other equal groups. It is the antagonism to others that constitutes a sect–not union. Therefore if members of various sects without abandoning their own existing associations choose to form a group for the special study of a certain subject or the special support of a given creed or movement it is surely no more a new religious sect than the Folk Lore Society, or the Society for the protection of Hospital patients or the NSPCC.

'At the same time the clear definition of such a group enables it to conserve the co-operative powers of the members instead of dissipating it, gives them area for appeal, and so on. Don't you agree?

'Now that I have got the bearing of the thing like this, the word 'sect' seems to me a mere bogey– and terror of a new one just as great weakness as any other fear, say of Russian or scarlet fever.'

লিজেল রেঁম লিখেছেন, ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ এই দুটি মাস স্বামীজি প্রত্যহ এসে শ্রীমতী বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং মার্গারেটের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। আলোচনার সিংহভাগ জুড়েই থাকত প্রাচ্যের ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভাবনা। সঙ্গে বেদান্ত ব্যাখ্যাও। রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি ঠিক কোন পথে পরিচালিত করতে চান, মঠের ভবিষ্যৎ রূপটি কী হবে—তা নিয়ে এই তিনজনের সঙ্গে আলোচনা করতেন তিনি। কোনো কোনো দিন স্বামীজি একাই আসতেন। কোনো কোনো দিন

তাঁর সঙ্গে কোনো সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী আসতেন। স্বামীজি যে শিক্ষা দিতেন এই তিনজনকে তা কোনো চিরাচরিত ধর্মশিক্ষা নয়। বরং রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে মানব সেবার কথাই বলতেন স্বামীজি। ১৮৯৭ সালের ১০ অক্টোবর মরি থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া। 'স ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ'—তবে 'প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে'—এই স্থলে এই বলা উচিত, —'সঃ প্রত্যক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপঃ'—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু। বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান্ দয়া-প্রেমের পুজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেও না। অভীঃ অভীঃ। লোক না পোক। হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণভাব তাই শিখাইবে।' এই ধর্মভাবনাই স্বামীজি ওই তিন বিদেশিনী রমণীকেও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

অতিরিক্ত কাজের চাপে স্বামীজি নিজে যেদিন আসতে পারতেন না—সেদিন মঠের অন্য কোনো সন্ন্যাসীকে পাঠিয়ে দিতেন। অন্য কেউ এলেই এই তিন বিদেশিনী তাঁর কাছ থেকে স্বামীজির সন্ন্যাস জীবনের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। এইভাবেই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্য, কাশীপুর উদ্যানবাটির দিনগুলি সবই জেনে নিয়েছিলেন তাঁরা।

রেঁম লিখেছেন— এই সময়ে মার্গারেট মাঝে মাঝেই অধৈর্য্য হয়ে উঠতেন। ভাবতেন, যে স্ত্রীশিক্ষার কাজের জন্য এদেশে আমি এসেছি, সে সম্পর্কে স্বামীজি কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন না কেন? সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাচ্ছে—স্বামীজি এই বিষয়ে নির্বিকার রয়েছেন কেন? মাঝে মাঝে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের কাছে নালিশও জানাতেন মার্গারেট। বলতেন, 'এতদিন এখানে বসে কী করছি আমরা? স্বামীজি কেন কোনো কাজের কথা বলছেন না?'

আসলে, বিবেকানন্দ কোনো ব্যস্ততা দেখাতে চাইছিলেন না। তিনি চাইছিলেন মার্গারেট প্রাচ্যের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো একটু অবহিত হোন। আরো একাত্মবোধ করতে শিখুন—তারপরেই তাঁকে কাজের ভার দেবেন। কাজের ভার দেওয়ার আগে মার্গারেটকে মানসিকভাবে আরো একটু প্রস্তুত করে নিতে চাইছিলেন স্বামীজি। একাজ করতে গিয়ে তাঁকে কখনো কখনো কঠোর আচরণও করতে হয়েছে। স্বামীজির সে আচরণকে মার্গারেট তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবহেলা ভেবেও ভুল করেছেন। রেমঁ লিখেছেন, 'প্রথম প্রথম বিরুদ্ধভাবের ক্ষুব্ধতায় মার্গারেট যেন কোন্ গহনে আপনাকে হারিয়ে ফেলতেন, বারবার চাইতেন লন্ডনের সেই স্বামীজির স্মৃতিকে

ফিরিয়ে আনতে। সেই গম্ভীর স্নিগ্ধস্বভাব পুরুষের সঙ্গে এঁর কত না তফাৎ। এখানে ওঁকে কারবার করতে হচ্ছে এক কর্তৃত্ব-কঠোর গুরুর সঙ্গে, তাঁর জীবনের পটভূমিকা মার্গারেটের দৃষ্টির বাইরে। অথচ এমন একটা লীলাচ্ছলতা তাঁর মাঝে আছে যে বুদ্ধি দিয়ে তাকে বোঝা ভার। যা-কিছু মার্গারেটের কাছে কঠিন বা জুগুপ্সিত, তাকেও যে ওঁর খাতিরে এতটুকু সহজ করে দেননি তিনি, তার জন্য মার্গারেট তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আচার্য যদি সত্যকে বিকৃত করেন কারও মুখ চেয়ে, কেমন আচার্য তিনি!'

হাওড়ায় নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার ঘটনাটির উল্লেখও রেমঁর লেখায় আছে। রেমঁ লিখেছেন, 'একদিন স্বামীজিকে মার্গারেট এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখলেন। সে দৃশ্য ভোলবার নয়, দেখে আত্মহারা হতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন নবগোপালবাবু, তাঁর নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বাড়ির সামনের ঘটনা। ফেব্রুয়ারি মাসের এক পূর্ণিমা রাত্রি সেদিন।

'তিনখানা বড় নৌকায় মশাল জ্বালিয়ে গঙ্গা বেয়ে সন্ন্যাসীরা এসেছেন। তীরে লোকের ভিড়। তাঁরা নামতেই মহা কলরবে শোভাযাত্রা শুরু হল, কাঁসর-খোল-করতাল বাজতে লাগল। মার্গারেট দেখলেন, স্বামীজি ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত, একেবারে আত্মহারা হয়ে পাগলের মত উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন। গলায় একরাশ ফুলের মালার সঙ্গে একটি খোল ঝুলছে, গান ধরেছেন, 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে এসেছে আলো করে, কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরদ্বারে।' সঙ্গে সবাই যোগ দিয়েছে। দর্শকদেরও যেন একটা উদ্দামতার ছোঁয়া লেগেছে। বাজি ফুটছে নানারকম। নৃত্যের তালে তালে খোল বাজছে। শোভাযাত্রা নবগোপালবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই তুমুল শঙ্খধ্বনিতে রাতের জ্যোৎস্না যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। স্বামীজির মাথায় বিভূতিলেপা, ধূলায় লুটিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে 'প্রণাম' করলেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপনা করলেন যথামন্ত্রে।

'মার্গারেট নিজেকে শুধান, এ কী উদ্দাম আনন্দ! এ কি পাগলামি, না ভক্তের দৈন্য, না ঈশ্বর প্রেম— কী এ?'

রেমঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, এই সময়ে মার্গারেটের একান্ত ইচ্ছা ছিল অনেকটা সময়ই স্বামীজির সঙ্গে কাটান। কিন্তু তা কখনোই সম্ভব ছিল না। স্বামীজি দিনের অনেকটা সময়ই ব্যয় করতেন মঠ-মিশনের কাজে। দিনের অনেকটা সময়ই কাটত সন্ন্যাসী- ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে। মার্গারেট তখন মঠবাসিনী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে চেপে রয়েছেন। মার্গারেটের ইচ্ছা, মঠবাসিনী হয়ে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের মতো তিনিও অনেকটা সময় কাটাবেন স্বামীজির পাশে।

যে ব্রহ্মচারী মার্গারেটকে বাংলা শেখাতে আসতেন—তাঁকেও মার্গারেট লক্ষ্য করতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নানা প্রশ্ন করে তাঁকে মঠ-জীবন সম্পর্কে জানতে চাইতেন।

জানতে চাইতেন সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে। ব্রহ্মচারী মার্গারেটকে একাগ্র হতে বলেন। বলেন, মনকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত করতে নেই। সামনে যে কাজটি পড়েছে সেটি একাগ্রভাবে করে যেতে হবে। পরে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'ব্রহ্মচারিণী আর আচার্যদেবের মাঝে ভাবের যে বিনিময় চলত, আমি পড়েছিলাম ঠিক তার মাঝখানে। মনে হয়, এই জন্য তখনকার পরিবেশে যেসব ভাবনার বিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে যেত অহর্নিশ, তার খানিকটা পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।'

রেমঁ লিখছেন, 'একদিন সকালে স্বামীজি বলেছিলেন গুরুর স্বাতন্ত্র্যের কথা। শিষ্যকে বর্জন বা গ্রহণ করা তাঁর ইচ্ছা। তাদের অন্তরে যে বাসনা বীজ হয়ে আছে তারও তিনি খবর রাখেন।...

'মার্গারেট দুহাতে মুখ ঢাকলেন, বলবার কিছু নাই তাঁর। এই যে মনোরম সত্তার একটা নিটোল অনুভূতি তাঁর, এই কি ছদ্মবেশী অহং তাহলে? সে-অহং বিসর্জন দিতে কি প্রস্তুত তিনি? অকর্তার ভাবকে তাহলে স্বচ্ছন্দ করতে হবে। ব্যক্তিত্ব আহুতি দিতে হবে নির্বাক আত্মদানের যজ্ঞে? এই ব্রহ্মচারীরা... মাঠে রোদে রোদে ছোট ছেলেদের মত হুড়োহুড়ি করে আবার পরক্ষণেই ডুবে যায় ধ্যানের নৈঃশব্দ্যে। কী অক্ষুব্ধ ওদের মুক্ত জীবন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মার্গারেটও কি কোনোদিন অমন জীবনের স্বাদ পাবেন না?'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেছেন, '১৮৯৮-র ২৮শে জানুয়ারী হইতে ১২ইমে পর্যন্ত মার্গারেটের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়—২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে যোগদান, ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে প্রথম বক্তৃতা দান, ১৭ই মার্চ সংঘজননী শ্রী শ্রী সারদা দেবীকে দর্শন এবং ২৫শে মার্চ ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষালাভ।'

সে বছর রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথিটি পড়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে। জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে সর্বসাধারণের জন্য যে উৎসব তার তারিখ ধার্য হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। সাধারণ উৎসবের জন্য বেলুড়ে পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র বাগানবাড়িটি নির্ধারিত করা হয়। স্বামীজি তাঁর বিদেশি ভক্ত-শিষ্যদেরও এই উৎসবে যোগ দিতে বলেন। আঁরিয়েতা মুলার এবং মার্গারেট ঠিক করেন সাধারণ উৎসবে যোগ দেওয়ার আগে তাঁরা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির এবং সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ঘরটিতে থাকতেন—সেটি দেখবেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে তাঁরা দুজন শুধুই শুনেছেন—কাজেই তাঁর সাধনস্থলটি দেখার প্রচণ্ড একটা ইচ্ছা মার্গারেট এবং মুলার দুজনের ভিতরই ছিল। সাধারণ উৎসবের দিন সকালে বেলুড় থেকে নৌকা ভাড়া করে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন একজন বাঙালি ভদ্রলোক—'রাখালবাবু।' মার্গারেট এবং মুলারের খুব ইচ্ছা ছিল দক্ষিণেশ্বরে কালী

মন্দিরটি ঘুরে দেখেন। কিন্তু তাঁদের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হল না। কেননা, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তখন 'বিধর্মী'-দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাঁরা এসে গঙ্গার পাড়ে পঞ্চবটি তলায় বসলেন। শ্রীমতী মুলার সেদিন হিন্দু নারীদের অনুকরণে শাড়ি পরেছিলেন। পঞ্চবটিতে এসে বসার পর, দেখতে দেখতে তাঁদের ঘিরে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। উপস্থিত জনতা মার্গারেট এবং মুলারের সঙ্গী বাঙালি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, এই বিদেশিনীরা কোন অধিকারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছেন? এ নিয়ে উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুরু হল। ওই বাঙালি ভদ্রলোক উপস্থিত জনতাকে অনেক কষ্টে বোঝালেন—এই দুই বিদেশিনী প্রকৃতই ভক্ত। অনেক কষ্টে বোঝানোর পর মার্গারেট এবং মুলারকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে ঘরটিতে থাকতেন—সেই ঘরটি দেখার অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু মূল মন্দিরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল না।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে তাঁরা গেলেন পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র বাগান বাড়িতে—যেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পথেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হল সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের। তাঁরাও সাধারণ উৎসবে যোগ দিতে চলেছেন। সকলে একসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র বাগান বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এই সাধারণ উৎসবের একটি চিত্র পাওয়া যায় রেমঁ-র লেখায়। রেমঁ লিখেছেন, 'বাঁশ আর তালপাতা দিয়ে অস্থায়ী মণ্ডপ তোলা হয়েছে গায়েনদের জন্য। তারা সকাল থেকে সারাদিন গানের সঙ্গে ঢোল তবলা নিয়ে সঙ্গত করছে। সাধুরা সেই কীর্তনে যোগ দেওয়ার জন্য সাধারণকে ঠেলে দিচ্ছে বারবার। চারদিক-খোলা এক দেউল উঠেছে। তার মাঝে ঝালর দেওয়া নেটের পর্দা, ফুল-পাতা, মালা আর আলো দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পরমহংসদেবের একখানি ছবি। তার সামনে পূজার উপচার—নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন, ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, শাক-সবজি। সন্ন্যাসীরা সেসব আবার রান্না-ঘরে নিয়ে তুলছেন। বাতাসে ধূপ-ধুনার গন্ধ আর ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনি 'শ্রীগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি-হরিবোল।'

'...সেদিন গঙ্গাস্নান করে প্রায় পঞ্চাশজন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে এসে প্রণাম করল। তাদের উপনয়ন হল। তারপর তারা গ্রহণ করল সনাতন গায়ত্রী মন্ত্র ঃ তৎ সাধতুর্বরেন্ত্রং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

রেমঁ লিখেছেন, উৎসব প্রাঙ্গণে বহু মানুষের সমাগম। সবাই আনন্দে মাতোয়ারা। তারই ভিতর কোনোমতে ভিড় ঠেলে মার্গারেট, জোসেফিন,মুলার আর সারা বুল এগিয়ে চললেন স্বামীজি যেখানে বসে আছেন সেই দিকে। এই উৎসবেই স্বামীজির এই বিদেশী অনুগামী এবং শিষ্যদের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল গোপালের মা-র। গোপালের মা-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার লেখা 'দ্য লাইফ অফ জোসেফিন ম্যাকলিয়ড—ফ্রেন্ড অব স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ে। এই বইটির বিবরণ থেকে জানা যায়—ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার সময়ে গোপালের মা-কে প্রথম নজর করেন জোসেফিন, প্রথম নজরেই জোসেফিনের মনে হয়েছিল এই বৃদ্ধা যেন প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদেরই প্রতীক। গোপালের মা-র প্রকৃত নাম অঘোরমণি দেবী। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তার আগে স্বামীর সঙ্গে বাস করার সৌভাগ্যই তাঁর হয়নি। সেই সময়ের কট্টর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের বধূ হিসাবে বিধবা হওয়ার পর তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল কঠোর দুঃখের জীবন মেনে নিতে। মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে যুগের বিধবা রমণীদের মতো সম্পূর্ণ উপোস দিতে হত। শুতে হত মাটিতে। ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বরাদ্দ ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল আত্মীয়ও-পরিজনদের গঞ্জনা। গোপালের মা-র সঙ্গী বলতে ছিল গোপাল ঠাকুরের একটি মূর্তি। নিঃসন্তান নিঃসঙ্গ এই বিধবা এই মূর্তিকেই পুজো করতেন—একেই নিজ সন্তানের মতো মনে করতেন। এই গোপালকে নিয়েই সারাটা দিন কাটত তাঁর। তাঁর 'গোপালের মা' নামকরণটি হয়েছিল এই কারণেই।

দক্ষিণেশ্বরের কাছে কামারহাটিতে থাকতেন গোপালের মা। সেখানে গঙ্গার ধারে একটি মন্দিরের পূজারি ছিলেন তাঁর ভাই। গোপালের মা-র বয়স তখন তিরিশ, তখন তিনি এই মন্দিরের পাশেই একটি ঘরে থাকতে শুরু করেন। এই ঘরে, গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে সারাদিন জপতপ করেই তাঁর দিন কাটত। তাঁর বয়স যখন ষাট তখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তখনই প্রথম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখেন তিনি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চট করে কারোর দেওয়া কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করতেন না। কিন্তু গোপালের মা যখন দ্বিতীয় দিন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন রামকৃষ্ণদেব তাঁকে দেখে বলে ওঠেন, 'ওহ্, তুমি এসেছ। দাও, আমাকে একটু খেতে দাও।' এর পর থেকেই গোপালের মা-র সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি হৃদ্যতা এবং ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁকে 'মা' সম্বোধন করতেন। শোনা যায়, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গোপালের মা-র একটি অত্যাশ্চর্য অনুভূতি হয়। তিনি যখন জপ-ধ্যানে বসেছিলেন তখন তাঁর হঠাৎ মনে হয়, গোপাল এসে যেন তাঁর কোলে বসেছে। তারপর হঠাৎ করেই তাঁর মনে হয়, গোপাল যেন ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের রূপ ধারণ করছে। পরদিন সকালেই তিনি তাঁর গোপালের মূর্তিখানি সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন, তখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দিব্যভাবে তন্ময়। তখন এ-ও তাঁর উপলব্ধি হয় যে, গোপালই যেন এখনও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের রূপে তাঁর কাছে ধরা দিচ্ছেন। তারপর থেকেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একান্ত অনুগামী হয়ে পড়েন তিনি। বাকি জীবনটা রামকৃষ্ণগতপ্রাণা হয়েই কাটিয়েছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী সারদা দেবীরও

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন গোপালের মা। বলতে গেলে, সারদাদেবীর নিত্য সঙ্গিনীই হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা লিখেছেন, স্বামীজির চার বিদেশিনী শিষ্যা ও অনুগামী ভিড় ঠেলে গোপালের মা-র কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। গোপালের মা ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু সস্নেহে স্বামীজির এই চার বিদেশিনী অনুগামীকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁদের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। তারপর তাঁদের বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে এলেন।

এক্ষেত্রে একটু সংশয় থেকে যায়, কেননা এর পরবর্তী সময়ে নিবেদিতার সারদা দেবীর বাগবাজারের বাড়িতে থাকার বিষয়ে গোপালের মা-র যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কাজেই সেদিন তিনি চার বিদেশিনীকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পরে নিবেদিতা এ-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'No language was necessary to express the readiness of these Eastern women to meet love lovingly and trustfully half-way. Only, I fancy, in some such fashion as this, can the real genius of the Indian people be gauged.

'Let the occasion be religious, and all barriers be broken down. High and low, men and women, kindred and alien, all are one, because all realise so intensely, like Gopal's Mother, the common devotion that had drawn them together.'

পরবর্তীকালে মার্গারেট যখন নিবেদিতায় রূপান্তরিত হন, তখনো এই গোপালের মা তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র বাড়িতে গোপালের মা-কে দেখার কিছুদিন পরেই এক রাতে বেলুড় থেকে নৌকা ভাড়া করে মার্গারেট, জোসেফিন এবং সারা বুল কামারহাটি গিয়েছিলেন গোপালের মা-কে দেখতে। প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার বিবরণ থেকে জানা যায়, সেদিন ছিল জ্যোৎস্না। বেলুড় থেকে কামারহাটি নৌকায় যেতে তাঁদের সময় লেগেছিল আধঘন্টা। তাঁরা পৌছোনো মাত্রই গোপালের মা তাঁদের চিবুক স্পর্শ করে আদর করেছিলেন। বসতে দিয়েছিলেন নিজের বিছানায়। পরে একথা শুনে স্বামীজি তাঁদের বলেছিলেন, 'তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ। যে ভারত চোখের জল আর ভক্তিতে পরিপূর্ণ।' নিবেদিতা তাঁর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'গোপালের মা-র ছোট ঘরটিতে আসবাবপত্রের কোনও বালাই নাই। ঘরের পাথরের মেঝেই তাঁহার শয্যা। অতিথিদের বসিতে দিবার জন্য যে মাদুর পাতিয়া দিলেন, তাহা তাকের উপর গুটানো ছিল। শিকায় ঝুলানো মাটির পাত্র হইতে মুড়ি ও বাতাসা পাড়িয়া খাইতে দিলেন। অতিথিদের সংবর্ধনা করিতে উহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। কিন্তু জায়গাটি নিঁখুতভাবে পরিষ্কার। তিনি নিজেই কষ্ট করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া সর্বদা ধুইয়া রাখেন। হাতের কাছে কুলুঙ্গিতে একখানি অতি পুরানো রামায়ণ, তাহার বৃহৎ জীর্ণ চশমা ও হরিনামের ঝুলি। এই

' মালা জপ করিয়াই গোপালের মা সিদ্ধিলাভ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন তিনি দিবারাত্র ঐ মালা জপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। '

গোপালের মা-কে এই দেখতে যাওয়ার কথা দু-দুবার নিবেদিতার দুটি চিঠিতে স্থান পেয়েছে। ১৯০০ সনের ১৮ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Do you remember the christmas night at Dakshineswar? Or your expedition–for I was not there, yet feel as if I had been to Gopaler Ma.'

আর একটি চিঠিতে ১৯০৬ সালের ১৮ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকেই লিখেছেন, 'Do you remember the night you and S.Sara went in the moonlight to visit Gopaler Ma by the banks of the Ganges? She died on Sunday morning, the 8th, at dawn, and today we are holding festival for her release.'

তবে, নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'-এর ওই অংশবিশেষ এবং এই চিঠি দুটি পড়লে একটু সংশয় জাগে। চিঠি দুটি পড়লে মনে হয়, ওই রাতে গোপালের মা-কে দেখতে জোসেফিন এবং সারার সঙ্গে মার্গারেট যাননি। হয়তো তিনি পরে গিয়েছিলেন গোপালের মা-র কাছে। যদিও নিবেদিতার অধিকাংশ জীবনীকারই দাবি করেছেন, জোসেফিন এবং সারার সঙ্গে মার্গারেটও সে রাতে গোপালের মা-র কাছে গিয়েছিলেন।

'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা গোপালের মা-র স্মৃতিচারণা করেছেন। লিখেছেন, 'শ্রী শ্রী মাতাঠাকুরানীর গৃহে (সারদাদেবী) এই সময়ে প্রায় সর্বদা যে সকল মহিলা বাস করিতেন—গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা সকলেই বিধবা। গোপালের মা এবং লক্ষ্মীদিদি আবার বালবিধবা ছিলেন; ইঁহারা সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা—যে সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে বাস করিতেন—সেই সময়ের। ...গোপালের মা ছিলেন অতি বৃদ্ধা। পনের-কুড়ি বৎসর পূর্বে যখন তিনি তাঁহার কামারহাটির গঙ্গাতীরে অবস্থিত কুটির হইতে একদিন মধ্যাহ্নে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিতে আসেন, তখনই তিনি বার্ধক্যে উপনীত। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কক্ষের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন—যেন তিনি তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপালের মা বালগোপাল মূর্তির উপাসনা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপবর্তী হইবামাত্র তাঁহার মধ্যে তিনি নিজের ইষ্টমূর্তি দর্শন করেন। এই বিষয়ে সর্বদা, তাঁহার কি অপরিসীম নিষ্ঠাই ছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং ইহার পর গোপালের

মা তাঁহার জীবিতকালে কদাপি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর (সারদা দেবী) উল্লেখকালে 'বউমা' ছাড়া তাঁহাকে অপর শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনি নাই।...শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার স্ত্রীভক্তগণের সঙ্গে আমি যে কয়মাস অতিবাহিত করি, তাহার মধ্যে গোপালের মা কখনও কলিকাতায় অবস্থান করিতেন, কখনও বা কয়েক সপ্তাহ কামারহাটিতেই কাটাইতেন। এক পূর্ণিমা রজনীতে আমরা কয়েক জন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই।'

১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে মার্গারেট (ততদিনে তাঁর স্বামীজির কাছে ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা নেওয়া হয়েছে) বেলুড় মঠ থেকে কলকাতায় আসেন। উদ্দেশ্য, কলকাতায় মেয়েদের স্কুল চালু করা। পরবর্তীকালে নিবেদিতা লিখেছেন, 'এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমি নভেম্বর মাসে প্রথমে একাকী কলকাতায় পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে শহরের উত্তর প্রান্তে রাস্তা চিনিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। যাঁহারা দ্বীপে বাস করেন, তাঁহারা স্বভাবতই কতকটা সামাজিক কঠোরতার পক্ষপাতী। বোধহয় সেই কারণেই আমি মহিলাগণের সহিত একত্রে বাস করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। ঘটনাক্রমে, স্বামীজি সেই সময় কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই মাধ্যমে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী 'সারদাদেবী' অথবা ভক্তগণের পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানী স্ত্রীভক্তগণসহ নিকটে বাস করিতেন। সেই দিনেই আমি তাঁহার নিকট একটি কক্ষে বাস করিবার অনুমতি লাভ করি।'

কিন্তু নিবেদিতার সারদা মায়ের বাড়িতে থাকার ব্যাপারে গোপালের মা-র প্রাথমিক আপত্তি ছিল। নিবেদিতাই লিখেছেন,'কলিকাতার বাড়িতে একজন ইউরোপীয় মহিলার অবস্থানে সম্ভবতঃ অপরের অপেক্ষা গোপালের মা-র আশী বৎসরের সংস্কারে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু একবার ঐ ভাবটিকে জয় করিবার পর তিনি যেন উদারতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। রক্ষণশীল তিনি বরাবরই ছিলেন, কিন্তু কখনও জেদ করিয়া কুসংস্কার ধরিয়া থাকিতেন না। আমাদের প্রতিদিন যেভাবে কাটিত, তাহাতে গঙ্গা তীরে অবস্থিত তাঁহার আশ্রম আর মাতাঠাকুরানীর গৃহে পূজা অর্চনা প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য তিনি বোধ করিতেন না।'

বাগবাজারে সারদা দেবীর বাড়িতে তাঁর মহিলা ভক্তদের সঙ্গে এক বিদেশিনীর থাকায় গোপালের মা-র যে প্রাথমিক আপত্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। প্রায় দেড়শো বছর আগে, সেই সময়ে গোপালের মা ছিলেন আজন্ম সংস্কারে লালিতা এক রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা। তাঁর দিক থেকে যে আপত্তি ওঠা সেই সময়ে স্বাভাবিক ছিল—সেইটিই উঠেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সারদা দেবী ছিলেন সবরকম প্রাচীন সংস্কার মুক্ত অত্যন্ত আধুনিকমনস্ক এক প্রগতিশীল মহিলা। এর আগেই

তিনি মার্গারেট সহ স্বামীজির বিদেশি শিষ্যাদের একান্তভাবে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর কোনো সংস্কার ছিল না। নিবেদিতার যখন কলকাতায় সারদা মা-র বাসগৃহেই থাকার ব্যবস্থা হল—তখনও তাঁর পূর্ণ সম্মতি ছিল বলেই মনে হয়। কেননা, সারদা মা-র সম্মতি না থাকলে স্বামীজির পক্ষেও নিবেদিতাকে কলকাতায় সারদা মা-র বাড়িতে রাখা সম্ভব হত না। এক্ষেত্রে এটুকু আন্দাজ করাই যায় যে, সারদা মা-র সম্মতি থাকার কারণেই গোপালের মা-র আপত্তি আর খুব বেশি দূর এগোয়নি। বরং পরবর্তীকালে গোপালের মা-র সংস্কারও অনেক কমে এসেছিল। আর জীবনের শেষ প্রান্তে এই গোপালের মা-ও সব সংস্কার মুক্ত হয়ে নিবেদিতার আশ্রয়েই ছিলেন। নিবেদিতার সেবাযত্নেই জীবনের শেষ কটি দিন কাটিয়ে গেছেন।

নিবেদিতা গোপালের মা-র কামারহাটির বাড়িতে শুধু একবার নয়, বেশ কয়েকবারই গিয়েছেন। স্বামীজির প্রয়াণের বছরখানেক পর গোপালের মা যখন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন স্বামী সারদানন্দ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। বাগবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। নিবেদিতা এই সংবাদ শোনার পর ঠিক করেন বাগবাজারে তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে গোপালের মা-কে নিয়ে আসবেন। সেখানেই গোপালের মা-কে রেখে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্বও তিনি নেবেন। সারদানন্দকে সেকথা জানানও নিবেদিতা। সেই মতো ১৯০৩ সালের ১০ ডিসেম্বর গোপালের মা-কে নিয়ে আসা হয় নিবেদিতার বাড়িতে। এর ঠিক আগের দিন, ৯ ডিসেম্বর, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Gopaler-Ma is coming to us tomorrow. She is ill— dying– probably diabetes has appeared– and we are to have her. I feel thrilled and the words of Elizabeth sounds on my ears– 'whence is this to me– that the mother of my Lord should visit me?' For I beleive that in GopalerMa is sainthood as great as that of a Paramahansa. I feel that if I can only worship her enough, blessings will descend on all whom I love through her .

For in her was such motherhood that the Heart of Ramakrishna became a child to her. Could more be said?'

এরপর ১৫ তারিখে আবার জোসেফিনকে তিনি লিখছেন, 'Gopaler-Ma came–and is here. Swami Saradananda says she will stay for life. She is our dearest treasure– and I feel that in her Sri R. K. and Swamiji have taken up their abode with us.?'

১৭ ডিসেম্বের, ১৯০৩ তারিখের একটি চিঠিতে সারা বুলকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Last time I was prevented writing by the advent of Gopaler Ma, who has now been here for a week. Can you imagine how grand I feel? Swami Saradananda thinks she will stay with us for life. Our dear little old grandmother.'

নিবেদিতার এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, গোপালের মা-কে বাড়িতে এনে রাখায় এবং সেবাশুশ্রূষা করায় কতখানি ঐকান্তিকতা, শ্রদ্ধা এবং উচ্ছ্বাস তাঁর তরফে ছিল। শেষ জীবনে নিবেদিতার সান্নিধ্যে থেকে, নিবেদিতার সুশ্রূষায় গোপালের মা-ও তাঁর আজন্ম-লালিত যাবতীয় সংস্কার দূর করে নিবেদিতাকে আপন করে নিয়েছিলেন। নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে টানা আড়াই বছর ছিলেন গোপালের মা। কুসুম নামে এক হিন্দু বিধবাকে গোপালের মা-র দেখাশোনা করার জন্য রেখেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিবেদিতা গোপালের মা-র সেবাশুশ্রূষার দিকে নজর রাখতেন। ১৯০৬-এর জুলাই মাসের ৬ তারিখ গোপালের মা-র অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিলেন, তাঁর শেষ সময় আসন্ন। সেই সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণদের রীতি অনুযায়ী তাঁকে সেদিন সন্ধের সময় গঙ্গার ঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। গঙ্গার ঘাটের একটি ঘরে শুইয়ে রাখা হল মৃত্যুপথযাত্রী গোপালের মা-কে যাতে তাঁর 'সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা' হয়। নিবেদিতা তাঁর পাশে বসে রইলেন। ৮ তারিখ গোপালের মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন করে তবেই নিবেদিতা বাড়ি ফেরেন।

এর দশদিন পর নিবেদিতা গোপালের মা-র স্মৃতি তর্পণের জন্য বোসপাড়া লেনের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। রামকৃষ্ণদেব এবং গোপালের মা-র ছবি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। কীর্তন পরিবেশিত হয়। যাঁরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। নিবেদিতার সঙ্গে গোপালের মা-র এই সম্পর্কটি প্রকৃত অর্থেই যেন ছিল প্রাচ্য আর প্রাশ্চাত্যের মিলন।

বারো

১৮৯৮ সালে কলকাতায় আসার পর সারা বুল আর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে বেলুড়ে থাকার স্মৃতি নিবেদিতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর 'দ্য মাস্টার আই স হিম' গ্রন্থে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'কিন্তু বেলুড়ে আমরা কেবল স্বামীজিকেই দেখি নাই, সারা মঠই আমাদের অতিথি মনে করিতেন। সেইজন্য অতিথিপরায়ণ সাধুগণ কখনও আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ, কখনও বা সেবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতেন। যে গাভীটি আমাদের দুধ দিত তাহাকে তাঁহারাই দোহন করিতেন। যে ভৃত্যের উপর রাত্রে ঐ দুধ পৌঁছিয়া দিবার ভার ছিল, সে যখন একদিন পথে গোখুরা সাপ দেখিয়া ভয় পায় ও যাইতে অস্বীকার করে, তখন সাধুদের মধ্যেই একজন ঐ কার্যের ভার গ্রহণ করেন। ভারতীয় গৃহস্থালীর আমাদের অজানা সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত হইতেন। একজনের উপর ভার ছিল বাংলা শিখাইবার। সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ প্রায়ই সৌজন্যবশতঃ এবং অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আর যখন স্বামীজি কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র যাইতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ-না-কেহ অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করিয়া প্রাতঃকালের চায়ের টেবিলে নিয়মিতভাবে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন। এইরূপ সহস্র উপায়ে আমরা সেইসব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—যাঁহাদের কথাবার্তার মধ্যে স্মৃতির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিত। ঐ স্মৃতিই ছিল 'টানা' যাহার উপর 'পড়েনে'র মত এইসব ত্যাগীর জীবন বোনা হইয়াছিল।'

এই সময়েই স্বামী সদানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় ঘটে। স্বামীজির শিষ্য এই সন্ন্যাসী পরে নিবেদিতার সর্বক্ষণের অনুগামী হয়ে উঠেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, '...পর্যটনকালে স্বামীজি তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম ছিল সদানন্দ। সদানন্দের ভাঙা-ভাঙা অথচ বলিষ্ঠ ইংরেজীতে প্রদত্ত বিবরণ

হইতে এইকালে স্বামীজি মঠে কীরূপ জীবনযাপন করিতেন, তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করি। পূর্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য সদানন্দকে দুই-তিন মাস রেলে চাকরি করিতে হয়। মঠে পৌঁছিয়া দেখিলেন, স্বামীজি পুনরায় বাহির হইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার জন্য তিনি যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং সেই সন্ধ্যায় যে যাত্রারম্ভের কথা ছিল, এক বৎসর পূর্বে তাহা আর ঘটিয়া ওঠে নাই। এইকালের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজির প্রথম শিষ্য গর্বের সহিত বলিতেন, স্বামীজির জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ আমাকে নিয়ে।'

এই সময়ের আরো বর্ণনা দিয়েছেন নিবেদিতা, 'এই বৎসর স্বামীজি "একদমে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতেন। তাঁর এত কাজ ছিল যে, প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।" অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে তিনি গাত্রোত্থান করিতেন, এবং 'জাগো জাগো সকলে, অমৃতের অধিকারী', এই গানটি গাহিতে গাহিতে সকলকে উঠাইয়া দিতেন। তারপর সকলে একত্রে ধ্যানে বসিতেন। অতঃপর যেন অজ্ঞাতসারেই ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে উপনীত হইতেন এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বা তাহারও পরে উহা চলিত। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে ক্রমে ইতিহাস-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত। কখনও ইগ্নেশিয়াস লায়েলার গল্প, কখনও জোয়ান অব আর্ক অথবা ঝান্সীর রানীর গল্প হইত। আবার কখনও স্বামীজি কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' হইতে দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি করিতেন, এবং সকলে যেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দুলিতে দুলিতে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন, 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক।' অথবা তাঁহারা সেন্ট ফ্র্যান্সিস অব আসিসির কথায় তন্ময় হইয়া যাইতেন।...বেলা একটা-দুইটার সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—যিনি ছিলেন একাধারে সঙ্ঘের পাচক, গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক ও পূজারী—তাঁহাদের বকুনি দিয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন।' নিবেদিতার বর্ণনার এই অংশটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, বিদেশি শাসন মুক্ত হওয়ার তাগিদ এবং আকাঙ্খা, পাশাপাশি ভারতকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে দেখার যে একটি সুপ্ত ইচ্ছা স্বামীজির মনে ছিল, তা কিন্তু ফরাসি বিপ্লব নিয়ে ওই আলোচনার মধ্যেই পরিষ্কার। অর্থাৎ, বিপ্লবের সুপ্ত বাসনা যে স্বামীজির ভিতরও ছিল না—একথা বলা যাবে না। পরবর্তীকালে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেলেও, নিবেদিতা যে স্বামীজির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, একথাও বলা যাবে না। কারণ, এই বিপ্লবের পথটিও স্বামীজিই তাঁকে পরোক্ষে চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৯৮ সালে ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সভা আহ্বান করা হল। বিবেকানন্দ স্থির করলেন, ওই সভাতেই মার্গারেটের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত এবং সভ্যবৃন্দের ও কলকাতার বিশিষ্টজনদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। এককথায়

মার্গারেটকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করার একটি পরিকল্পনা করে ফেললেন বিবেকানন্দ। ওই সভায় স্বামীজি নিজে সভাপতিত্ব করলেন। মার্গারেটকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তব্য রাখতে বললেন। সভায় মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিলেন এইভাবে—'শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত এবং শ্রীমতী মুলারের পর ইংল্যান্ড আমাদের আরও একটি উপহার দিয়েছে—মার্গারেট নোব্‌ল।' ওই সভায় মার্গারেট যে বক্তৃতা দেন, সেটি পরে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা থেকে জানা যায়, মার্গারেট বলেছিলেন,'I am here to tell you something definite about the work done in England about a year and a half agc in spreading your spiritual thoughts among us. I am not here to give you details that newspapers have given you. I am not here to lavish personal praise upon one who is present with us here on this platform. But I am here to try in a few words to tell you something of the significance to us in England of the message you sent to us through him.'

মার্গারেট তাঁর বক্তব্যে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদকে তুলে ধরেন। যে উদার মানবধর্মের ব্যাখ্যা বিবেকানন্দ করে এসেছিলেন পাশ্চাত্যে, তাকেই আরও সবিস্তারে, যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করে মার্গারেট তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন এইভাবে, 'Yours is the conservatism of a people who have through that long period been able to preserve the greatest spiritual treasures for the world, and it is for this that I have come to India to serve her with our burning passion for service. Sri Sri Ramakrishna Jayati.'

মার্গারেটের এই বক্তৃতার পরপরই মার্চ মাসেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লেখেন, 'মিস নোব্‌লের মতো মেয়ে সত্যিই দুর্লভ। আমার বিশ্বাস বাগ্মীতায় সে শীঘ্রই মিসেস বেস্যান্টকে (অ্যানি বেসান্ত) ছাড়াইয়া যাইবে।' বোঝাই যায়, মার্গারেটের বক্তৃতা স্বামীজিকে মুগ্ধ করেছিল। স্টার থিয়েটারে ওই বক্তৃতাই ছিল ভারতে নিবেদিতার প্রথম বক্তৃতা। ওই সভাতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ সালাজার। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করে মার্গারেট যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তা তাঁর পছন্দ হয়নি। ফলে, বক্তৃতার পর এ নিয়ে তিনি মার্গারেটকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। মার্গারেট তার উত্তরও দিয়েছিলেন, যে উত্তরগুলি স্বামীজির বেশ মনোমতো হয়। স্বামীজির ঘনিষ্ঠজনেদের রচনা থেকেই জানা যায়, মার্গারেটের বক্তৃতায় রীতিমত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি তাঁর গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যদের বলেছিলেন, 'এরপর দেখবি ওর (মার্গারেটের) কার্যকরী শক্তি। ওর প্রাণ অতি মহৎ। তার ভিতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র। জানবি, এর কথা শুনে সবার তাক লেগে যাবে। ও প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে

আসেনি।' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আরো লিখেছিলেন স্বামীজি, 'কলকাতায় জনসাধারণের জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল— একটি মিস নোব্‌লের এবং অপরটি আমাদের শরতের (স্বামী সারদানন্দ)। তাহারা দুজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।'

১৮৯৮-র ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে বেলুড়ে যে বাড়িতে সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন মার্গারেট, সেই বাড়িটির একটি বিবরণও তিনি পরবর্তীকালে দিয়ে গিয়েছেন। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে বাড়িটির বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমাদের বাড়িটি ছিল কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নিম্ন সমতলভূমির উপর নির্মিত। জোয়ারের সময় পানসির ন্যায় ছোট ছোট নৌকাগুলি (গঙ্গাতীরে যাহারা বাস করে, এই নৌকাগুলি তাহাদের যানবাহনের কাজ করে) একেবারে সিঁড়ির নীচে আসিয়া লাগিত। আমাদের ও অপর পারের গ্রামের মধ্যে নদীটির বিস্তার ছিল অর্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল। নদীর পূর্বতীরে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত। মন্দির সংলগ্ন এই উদ্যানেই স্বামীজি ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বাস করিতেন। যে বাড়িটি তখন মঠরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের কুটির হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত ছিল। মঠবাড়ি ও আমাদের কুটিরের মধ্যে অনেকগুলি বাগানবাড়ি এবং অন্ততঃ একটি নালা ছিল। তালগাছের গুঁড়ি চিড়িয়া তাহার অর্ধাংশ দ্বারা নির্মিত একটি পুলের উপর দিয়া নালাটি পার হইতে হইতে; পুলটি দেখিলে সন্দেহ হইত ভার সহিতে পারিবে কিনা। আমাদের এই বাড়িতেই স্বামীজি প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী অথবা কয়েকজন গুরুভ্রাতা সহ আসিতেন।'

এই বাড়িতে অবস্থানকালেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনাগরিক ধর্মপালের সঙ্গে পরিচয় হয় মার্গারেটের। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে গিয়ে ধর্মপালের সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়। ক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অনুরাগীও হয়ে ওঠেন। ১৮৯৪ সালে ১৯ মার্চ চিকোগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলেন স্বামীজি, তাতে ধর্মপালের উল্লেখ করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'ধর্মপাল ছোকরা বেশ,... ভাল মানুষ। তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল।' পরে কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মপাল। পরে অবশ্য বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে ধর্মপালের সঙ্গে নিবেদিতার বিরোধ সৃষ্টি হয়।

ধর্মপালকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি যেদিন মার্গারেট, জোসেফিন এবং সারা বুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছিলেন, সেই সময়ের একটি মজার ঘটনা স্বমীজির

সঙ্গী সন্ন্যাসীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। তাঁরা জানিয়েছেন, ওইদিন বিকেলে স্বামীজি ধর্মপালকে সঙ্গে নিয়ে যখন তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাদের সঙ্গে আলাপ করাতে আসেন, তার একটু পরেই তুমুল বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি ক্রমে বেড়েই চলে, বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত, স্বামীজি তাঁর সঙ্গী প্রিয়নাথ সিংহ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের বলেন, জুতো খুলে এই কাদার মধ্যে নেমে পড়েই বৃষ্টি ভিজে ভিজে মঠে চলে যেতে। শুধু বলা নয়, নিজেও তাই করেন। বৃষ্টির মধ্যে মাঠে নেমে স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাচ্চার মতো কাদায় গড়াগড়ি করেন। ধর্মপালকে স্বামীজি এই কাদার ভিতর নামতে না করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার জুতো নষ্ট হয়ে যাবে।' ধর্মপাল অবশ্য স্বামীজির কথা শোনেননি। তিনিও কাদায় নেমে পড়েছিলেন। মঠে পৌঁছনোর পর স্বামীজি একটি জলের পাত্র এনে ধর্মপালের পা ধুইয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি আমার অতিথি, এটা আমার কর্তব্য।' কিন্তু প্রিয়নাথ স্বামীজির হাত থেকে ঐ জলের পাত্রটি কেড়ে নেন। বলেন, 'আমরা আপনার শিষ্য। এ কাজটা আমার করার কথা।'

আর-একটি বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যার কথা জানা যায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতা—দুজনেরই স্মতিচারণায়। সেইদিন প্রচণ্ড বর্ষণের ফলে, স্বামীজি মঠে ফিরে যেতে পারছিলেন না। জোসেফিন তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'One night there came one of those deluges of rain, like sheets of water. He paced up and down our outside dining room varandah, talking of Krishna and and the power that love was in the world.'

নিবেদিতা এই দিনটির কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন, 'A storm came suddenly as they were sitting under the tree. They quickly moved to the varandah as the opposite bank of the Ganga became obscured in the blackness and the rain started down in torrents with thunder and lightning. Swamiji paced back and forth across the varandah dramatically describing to them the love of the soul for God with a passion with which the storm could not compete. He said, "shall many waters quench love or the floods overwhelm it?" And before he left them he blessed them as the knelt at his feet.' নিবেদিতার ওই বিবরণটি পড়লে বোঝা যায়, সেদিন কতখানি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন স্বামীজি।

ওই বছরের ১৭ মার্চ তারিখটি মার্গারেটের জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওইদিনই সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। মার্গারেট, সারা বুল এবং জোসেফিন যখন কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন, তখন সারদা দেবী কলকাতায় অবস্থান করছিলেন না।

তিনি তখন ছিলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি জয়রামবাটিতে। ১৭ মার্চের দিন কয়েক আগে সারদা দেবী কলকাতায় ফিরে আসার পরই স্বামীজি স্থির করেন তাঁর তিন বিদেশিনী শিষ্যাকে তিনি গুরুপত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। সেই মতোই ১৭ তারিখ সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং মার্গারেটকে নিয়ে বাগবাজারে যান তিনি। এই দিনটি আবার ছিল সেন্ট প্যাট্রিকস ডে। মার্গারেট ওইদিন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'Day of Days.'এই দিনটি সত্যিই তাঁর জীবনের সেরা দিন হয়ে উঠেছিল। স্বামীজির এই বিদেশিনী অনুরাগীরা এর আগে সারদা দেবীর কথা শুধু বিভিন্ন সন্ন্যাসীর মুখেই শুনেছেন, তাঁকে চোখে দেখেননি। ফলে, তাঁদের একটু কৌতূহল ছিলই। তদুপরি, মার্গারেট কলকাতায় সাহেব পাড়ার বাইরেও শহরটার অন্য চেহারা একটু-আধটু দেখলেও, সারা বুল এবং জোসেফিনের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে, বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলির ভিতর সারদা মায়ের বাসস্থান দেখার একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতাও ছিল এই তিনজনের কাছে।

সারদা দেবীর সঙ্গে ওই তিন বিদেশিনী মহিলাকে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভ্রাতাদের মনে একটি সংশয় ছিল। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না, আদৌ উদারমনে সারদা দেবী ওই তিন বিদেশিনীকে গ্রহণ করবেন, নাকি প্রাচীন সংস্কারবশত তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখবেন। যে কারণে, ওই তিনজন যখন সারদাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাগবাজারের বাড়িতে ঢোকেন তখন বিবেকানন্দ বা তাঁর কোনো গুরু ভাই সারদা দেবীর ঘর পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গ দেননি। বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরু ভাইরা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তবে, স্বামীজির যাবতীয় সংশয়কে অমূলক বলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সারদা দেবী নিজেই। তিনি যে শুধু সাদরে এই তিন বিদেশিনীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তা-ই নয়, যাবতীয় সংস্কার দূর সরিয়ে রেখে ওইদিন থেকে তিনি তাঁদের আপন করে নিয়েছিলেন। আসলে, সারদা দেবী এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই বিদেশিনীরা স্বামীজির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নিয়ে এদেশে এসেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের কাজে এঁরা সাহায্য করতে চান স্বামীজিকে। সেক্ষেত্রে এঁদের সঙ্গে কোনো দূরত্ব রচনা করা বা কোনো আচরণে এঁদের ব্যথিত করা উচিত হবে না। এই বোধ থেকেই প্রথম থেকে সমস্তরকম ব্যবধান দূর করে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সারদা দেবী স্বয়ং।

প্রথম সাক্ষাৎকারটি কেমন ছিল! রেমঁ সেই দিনটির বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, 'সারদা দেবীর সঙ্গে তিন বিদেশিনীর দেখা করতে আসার পরে পাড়ায় একটা সাড়া পড়ে গেল। তিনিও একটু বিচলিত হলেন বইকি! এ যে অভিনব কাণ্ড! গাড়ি থেকে নামতেই পাড়ার ছেলের দল তিনজনকে ঘিরে ফেলল। সারদা দেবীর বাড়ির দরজা আধ-খোলা। ভিতর থেকে একটা গুনগুনানি আর চাপা হাসি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল, এক ঝলক চড়া রোদের তেজ অন্ধকার বাড়িটায় ছড়িয়ে

পড়ল। সব চুপচাপ। দালানের মেঝেয় জল-ভরা বড়-বড় জালা বসানো, এটা নিবেদিতার নজরে পড়ল।

'নিবেদিতা আর তাঁর দুই বান্ধবী ততক্ষণে ভারী ঘাবড়ে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে এই সব বাজে জিনিষ—ছাতা, স্কার্ফ, হ্যান্ডব্যাগ—এ বোঝা এখন রাখেন কোথায়? আসবাবপত্রের চিহ্ন নাই কোথাও। স্বামী যোগানন্দ একবার শুধু বললেন জুতা ছেড়ে রেখে যেতে, তারপর স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তিনি সরে পড়লেন। এঁরা চললেন দোতলায়।

'উপরে একখানা মোটে ঘর, দরজা খোলা। ঢুকেই নিবেদিতার চোখে পড়ল, প্রায় জনা দশেক মহিলা মাটিতে বসে আছেন। ঘরের মাঝখানে সারদা দেবী, তাঁর মুখখানি এখন ঘোমটায় ঢাকা নয়। এঁরা ঢুকতেই শান্ত দৃষ্টিতে যেন স্বাগত জানালেন! ঘরে আর যে মেয়েরা রয়েছেন, প্রায় তাঁদের মুখোমুখি একখানা চেটাই এর উপর বসে আছেন। পরনে সাদা শাড়ি, তারই আঁচল মাথায় তুলে দেওয়া। লক্ষ্য করলেন পাতলা মলমলের নীচে তাঁর অনাবৃত কাঁধ আর পিঠে ছড়ানো দীর্ঘ কালো কেশের আভাস চোখে পড়ে। খালি পা দুখানি আলতায় টুকটুক করেছে।

'বিদেশিনীরা নত হয়ে প্রণাম জানাতেই উনি দুটি হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতিনমস্কার করলেন। ঘরের মেঝেয় খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে আর একটি মেয়ে এগিয়ে এল। সারদা দেবীর সামনে তিনখানা কাজ করা ছোট ছোট মাদুর সযত্নে পেতে ইশারায় এঁদের বসতে বলে মেয়েটি সরে গেল। ঘরের নিস্তব্ধতা যেন ভারী হয়ে উঠেছে। কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। চারদিক থেকে সবাই তাঁর দিকেই চেয়ে আছে বুঝতে পেরে নিবেদিতার আর চোখ তুলে তাকাতে সাহস হয় না; কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুক ঢিপ ঢিপ করছে দ্বিগুণ। ওরই মধ্যে শুনতে পেলেন কে একজন হাই তুলল, নোনা-ধরা দেয়ালে একটা টিকটিকি গুটি-গুটি পায়ে চলেছে।

'হঠাৎ নিবেদিতা শোনেন মেয়েরা কি যেন ফিসফিস করছে। সবারই চোখে একটা কৌতূহল। ব্যাপার কি? এবার এক মহিলা এঁদের তিনজনের সামনে পিতলের রেকাবিতে কাটা ফল, মিষ্টি আর সেই সঙ্গে চা ধরে দিচ্ছেন। সারদা দেবীর জন্য চিনামাটির পাত্রে ঐ একই জলযোগের উপকরণ আনা হয়েছিল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরম নিষ্ঠাবতী শ্রীশ্রীমা তাঁর সাগরপারের এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে একত্র বসে খেতে লাগলেন।

'তাঁর মুখে ও কিসের আলো? মৌন ভেঙে নিবেদিতা হঠাৎ উঁচু গলায় বলে উঠলেন, 'কী যে অপরূপ দেখতে।' পঁয়তাল্লিশ বছর প্রৌঢ়ার মুখে কী পবিত্র আর নির্মল সৌম্য প্রসন্নতার ভাব। আত্মার মণিদ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ছে তাঁর মুখে। নিবেদিতা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন।

'সারদা দেবী হাসলেন। ইংরেজী-জানা একটি মেয়ের মারফত দিব্যি আলাপ জমে উঠল। তাঁর এই খৃষ্টান মেয়েদের সব খবর শ্রীমা জানতে চান। 'তোমরা বাড়িতে কিভাবে ঠাকুর-পূজা কর? কি ধরনের প্রার্থনা কর তাঁর কাছে? তোমাদের বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন?' অবরোধ বাসিনী হলেও বাইরের জগতের খবর রাখতেন সারদা দেবী, ওতে তাঁর আনন্দ ছিল। কত বিচিত্র রূপেই না এ বিশ্বে দেবতার প্রকাশ।

'কথায়-বার্তায় এমন একটা অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে উঠল যে নিবেদিতা ভাবতে লাগলেন, 'এমন বিমল আনন্দের ভাগ নিতে স্বামীজি আসছেন না কেন?' উনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, মনে ধারণা স্বামীজি বোধহয় দরজার বাইরে কোথাও আছেন। শেষে তাঁর কথা জিজ্ঞাসাই করে বসলেন। নিবেদিতার প্রশ্নে মেয়েরা যেন একটা আমোদ পেয়েছেন মনে হল। সেইসঙ্গে এতক্ষণের একটানা আলাপেও একটা ছেদ পড়ল।... এর মানে কি? কিছু বুঝতে না পেরে নিবেদিতা উঠি উঠি করছেন। ইচ্ছাটা, নিজেই স্বামীজিকে ডেকে আনবেন। এমন সময় হঠাৎ দ্রুত পায়ে দালান পার হয়ে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন মনে হল। সবারই চোখ দরজার দিকে।

'কিন্তু স্বামীজি ঘরে ঢোকবার আগেই নিবেদিতা তাঁর অসঙ্গত প্রত্যাশার ভুল বুঝতে পেরেছেন। এর মধ্যেই খস্‌খস্‌ শব্দে সবার শাড়ির আঁচল উঠে এসেছে মাথায়, মুখ ঢাকা পড়েছে। প্রত্যেকটি মেয়েকে মনে হচ্ছে অনবয়ব অবোধ্য নিঃসাড় শুভ্র একটা বস্ত্রপিণ্ড।

'নিবেদিতার চোখের সামনেই বিবেকানন্দ এগিয়ে এসে মাটিতে মাতা ঠেকিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন সারদা দেবীকে। শ্রীমা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ না করা অবধি ভক্তিভরে স্থির হয়ে মাটিতে মাথা রেখে পড়ে রইলেন। তারপর একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে যাবার আগে এঁদের তিনজনকে মায়ের কাছে থেকে বিদায় নিতে নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তিনি চলে যেতেই সারদা দেবী মাথার ঘোমটা খুলে এঁদের আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ নিবেদিতার দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"তুমি আসায় ভারী খুশি হয়েছি মা।"

"মায়ের এই সম্ভাষণটুকু নিয়ে পাড়ায় জোর আলোচনা হতে লাগল। বাগবাজারের মেয়েরা গঙ্গাস্নানে গিয়ে পরস্পর বলাবলি করত, জান, শ্রীমা আমাদের মতই সেই মেয়েটিকেও মা বলে ডেকেছেন।'

সারদা দেবী সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির কথা মার্গারেট বান্ধবী শ্রীমতী হ্যামন্ডকে ১৮৯৮ সালের ২২ মে একটি চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। ওই চিঠিতে মার্গারেট লিখেছেন, 'I have often thought that I ought to tell you about the lady who was the Wife of Sri Ramakrishna, Sarada as her name is. To begin with, she is dressed in a white cotton cloth like any other Hindu widow

under 50. This cloth goes round the waist and forms a skirt, then it passes round the body and over the head like a nuns veil. When a man speaks to her, he stands behind her, and she pulls this white veil very far forward over her face. Nor does she answer him directly. She speaks to another and older woman in almost a whisper, and this women repeat her words to the man. In this way it comes about that the Master [Vivekananda] has never seen the face of Sarada! Added to this, you must try to imagine her always seated on the floor, on a small piece of bamboo matting. All this not sound very sensible perhaps, yet this woman, when you know her well, is said to be the very soul of practicality and common-sense, as she certainly gives every token of being, to those who know her slightly. Sri Ramakrishna always consulted her before understanding anything and her advice is always acted upon by his disciples. She is the very soul of sweetness– so gentle and loving and as merry as a girl. You should have heard her laugh the other day when I insisted that the Swami must come up and see us at once, or we would go home. The monk who had brought the meassage that the Master would delay seeing us was quiet alarmed at my moving towords my shoes, and departed past haste to bring him up, and then you should have heard Sarada's laughter. It just pealed out. And she is so tender – "My daughter" she calls me. She has always been terribly orthodox, but all this melted away the instant she saw the first two westerns -Mrs. Bull and miss Macleod, and she tasted food with them! Fruit is always presented to us immediately, and this was naturally offered to her, and she to the surprise of everyone accepted. This gave us all a dignity and made any future work possible in a way nothing else could possibly have done. Isn't it funny? The best proof I can give you of her real greatness is that she is always attended when in Calcutta by 14 or 15 high caste ladies, who would be rebellious and qurrelsome and give infinite trouble to everyone if she by her wonderful tact and winsomeness did not keep perpetual peace. There is no foundation for this statement in the character of these ladies. It is only my inference about women in general.

'Then you should see the chivalrous feeling that the monks have for her. They always call her "Mother" and speak of her as "The Holy Mother"– and she is literally their first thought in every emergency. There are one or two in attendance on her, and whatever her wish is, it is their command. It is a wonderful relationship to watch. I should

love to give her a message from you, if you care to send her one. A monk read the Magnificant in Bengali to her one day for me, and you should have seen how she enjoyed it. She really is, under the simplest, most unassuming guise, one of the strongest and greatest of women.'

মার্গারেট তাঁর বান্ধবীকে এই চিঠিটি যখন লিখেছেন, তখন সারদা দেবীকে আরো কয়েকবার বেশ কাছ থেকেই তিনি দেখেছেন। সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর একটু ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়েছে ততদিনে। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে সারদা দেবী সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। কোন প্রশ্ন যত নূতন বা জটিল হউক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করিয়া দিতে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁহার সকল অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস। তথাপি তিনি সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তাঁহার পরিবারের কেহ যদি দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে পীড়ন করে, তবে তাঁহার মধ্যে এক অদ্ভুত শান্ত ও প্রগাঢ়ভাব প্রকাশ পায়। তাঁহার বুদ্ধির অতীত কোন নূতন সমাজিক ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত জটিল চক্রে আবির্তত অথবা উৎপীড়িত হইয়া কেহ যদি তাঁহার নিকট আসে, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশ্নকর্তাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করেন। যদি কোন কারণে কঠোর হইবার প্রয়োজন হয়, অর্থহীন ভাবপ্রবণতার দ্বারা তিনি কদাপি বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ করিবেন না। কোন ব্রহ্মচারীকে মাধুকরী করিয়া এত বৎসর কাটাইতে হইবে বলিয়া আদেশ দিলে, তাহাকে এক ঘন্টার মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি তাঁহার সামনে শ্লীলতার ও মর্যাদার সীমা অতিক্রম করিলে আর কখনও তাঁহাকে মুখ দেখাইতে পারিবে না। এই ধরনের অপরাধ করিয়াছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "দেখতে পাচ্ছ না, তুমি ওর নারীত্বকে আঘাত করছ? এরূপ করা মহা অনর্থকর।"

'তথাপি তাঁহার জনৈক শিষ্যা সঙ্গীতে তাঁহার সহজাত ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃতি সেইরূপ "সঙ্গীতে ভরপুর", কোমলতা ও কৌতুকে পূর্ণ। আর তাঁহার পূজার কক্ষটি সত্যিই মাধুর্যে পূর্ণ।

'শ্রীশ্রীমা পড়িতে জানেন, এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় রামায়ণপাঠে অতিবাহিত হয়। তিনি লিখিতে পারেন না। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, তিনি অশিক্ষিত স্ত্রীলোক

মাত্র। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি শুধু সংসার পরিচালনা এবং ধর্মজগৎ সম্পর্কে কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা নহে; ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত প্রধান তীর্থগুলি দর্শন করিয়াছেন। আর মনে রাখিতে হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনীরূপে বক্তিগত চরিত্রে যতখানি উৎকর্ষলাভ সম্ভব, তিনি তাহার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন নূতন ধর্মীয়ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্ত মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার ক্ষমতার মধ্যেই ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।

'কয়েক বৎসর পূর্বে একবার ঈস্টারের দিন অপরাহ্নে তিনি যখন আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মধ্যে এই শক্তির প্রথম পরিচয় পাই। ইতিপূর্বে যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, জীবনে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় একান্তভাবে তন্ময় থাকিতাম। বিপরীত অবস্থায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার কথা ভাবি নাই। যাহা হউক, ঐদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ আমাদের সমস্ত বাড়িটি ঘুরিয়া দেখিবার পরে ঠাকুরঘরে গিয়া বসিবার এবং খ্রীষ্টানদের এই উৎসবের অর্থ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর আমাদের ক্ষুদ্র ফরাসী অর্গ্যান সহযোগে ঈস্টার দিনের গান-বাজনা হইল। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কীয় স্তোত্রগুলি বিদেশী এবং শ্রীশ্রীমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, তথাপি উহাদের সূক্ষ্ম মর্মগ্রহণ ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম ধর্মজগতে শ্রীসারদাদেবীর অসাধারণ উন্নতিলাভের এক অতীব হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাইলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভে ধন্য শ্রীশ্রীমার স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে কিছু পরিমাণে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার শক্তির মধ্যে যে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা আছে, তাহা কেবল উচ্চদরের সুগভীর পাণ্ডিত্যেই দেখা যায়।

'আর এক সন্ধ্যায় তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্ত পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে ইউরোপের বিবাহ-অনুষ্ঠান বর্ণনা করিতে বলেন। যথেষ্ট হাস্য ও কৌতুকের সহিত তাঁহার নির্দেশমতো আমরা একবার পুরোহিতের, পরক্ষণে বরকন্যার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। কিন্তু বিবাহের শপথবাক্য শ্রবণে মাতাঠাকুরানীর চিত্তে যে ভাবের উদয় হইল, তাহার জন্য আমরা কেহ প্রস্তুত ছিলাম না।

'সম্পদে-বিপদে, ঐশ্বর্যে-দারিদ্র্যে, রোগে-স্বাস্থ্যে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে—এই কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার মতো অপর কেহই ঐ কথাগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন

নাই। বারংবার তিনি ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করাইলেন এবং বলিলেন, আহা, কি অপূর্ব ধর্মভাবের কথা। কি ন্যায়পূর্ণ কথা!'

মার্গারেট, পরবর্তীকালের নিবেদিতার সঙ্গে সারদা দেবীর যে মধুর এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—তা স্বামীজির অন্য বিদেশি শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে হয়নি। আক্ষরিক অর্থেই মা ও মেয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সারদা মা আদর করে নিবেদিতাকে সম্বোধন করতেন 'খুকি'। নিবেদিতাও বরাবর তাঁর গুরুপত্নীকে মাতৃজ্ঞানেই শ্রদ্ধা করে এসেছেন। সারদা দেবীর প্রথম ফটোগ্রাফটি নিবেদিতাই উদ্যোগ নিয়ে তোলেন। সেই ছবিটি এখন বহুল প্রচারিত। শুধু তা-ই নয়, নিবেদিতার স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে সারদা দেবীর ছিল নিরন্তর উৎসাহ। এই কাজে নিবেদিতাকে বরাবরই তিনি সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। নিবেদিতার মেয়েদের স্কুলটি তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন। ওই স্কুলে বেশ কয়েকবার পদার্পণও করেছিলেন সারদা দেবী। 'খুকির স্কুলে' মেয়েদের পড়তে পাঠনোর উপদেশও দিতেন ভক্তদের। তাঁর অনেক গোঁড়া স্ত্রীভক্তের আপত্তি কার্যত অগ্রাহ্য করে নিবেদিতাকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন বাগবাজারে তাঁর বাড়ির অন্দরমহলে। সমস্ত সংকীর্ণতা দূরে সরিয়ে রেখে ভারতের কল্যাণে আসা এই ইউরোপীয় রমণীকে নিজের বুকে আগলে রেখেছিলেন সারদা দেবী। আর বিদেশ-বিভুঁইয়ে এই হিন্দু রমণীর ভিতরই মার্গারেট খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আর এক মা-কে। ভারতে নিবেদিতার জীবনে এক বিশেষ অংশ জুড়েই ছিলেন সারদা দেবী।

সারদা দেবীর প্রতি নিবেদিতার প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায় একটি চিঠিতে। ১৯১০ সনের ১১ ডিসেম্বর কেম্ব্রিজ থেকে নিবেদিতা এই চিঠিটি লিখেছিলেন সারদা দেবীকে। চিঠিটি এইরকমঃ

'আদরিণী মা,

সারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ খুব ভোরে আমি গির্জায় গিয়েছিলাম। সবাই যেখানে যীশুজননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা চাহনি, পরনে সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা— সবই যেন তখন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠলো। আমার মনে হল, তোমার এই ভাব-সত্তাই যেন বেচারী এস্ সারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম জানো মা? ভাবছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কি নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই যে যথেষ্ট! মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের জগতের ভালবাসার মতো উত্তেজনা ও উগ্রতা!

তোমার ভালবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ ও যেন বিলাস-বিচিত্র একটি স্বর্ণদীপ্তি। কয়েক মাস আগেকার সেই রবিবারটা কী আশিসই না বয়ে এনেছিল। গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার পাশে গেলাম। তোমার ঘরখানির স্বাগত পরিবেশে তুমি সেদিন আমায় যে আশীর্বাদ করলে, তা আমায় দিয়েছিল একটি অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ী মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমার উদ্দেশে লিখে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তাতেও মনে হয়, বড় বেশি শব্দ করা হবে। সেটা শোনাবে কোলাহলের মত! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম-সুধা-ধারণের পাত্র!—এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর প্রতীক; আর আমাদের উচিত তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকা—অবশ্য, কখনো কখনো একটু মজা করবার সময় ছাড়া। বাস্তবিকই ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই হচ্ছে অতি শান্ত। ধীর পদক্ষেপে অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে—যেমন বাতাস, সূর্যের আলো, যেমন বাগানের সৌন্দর্য্য সুবাস, গঙ্গার স্নিগ্ধতা। এইসব শান্ত নীরব জিনিসই তোমার তুলনা।

বেচারী এস্ সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিয়ে দিও। রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না?

বড় সোহাগের মা আমার—

তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী,
নিবেদিতা'

তেরো

সারদা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কিছুদিন পর (২৫ মার্চ, ১৮৯৮) মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেন স্বামী বিবেকানন্দ। সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেলুড়ে ফেরার পথেই স্বামীজি মার্গারেটকে জানিয়েছিলেন, তিনি অল্প কিছুদিনের ভিতরই তাঁকে দীক্ষা দেবেন। অবশেষে ২৫ মার্চ সেই দীক্ষার দিন স্থির হয়। নিবেদিতার দুই জীবনীকার লিজেল রেমঁ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে সেই দিনটির কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৯৮ সনের ২৫ মার্চ ছিল শুক্রবার। অন্যান্য দিনের মতো স্বামীজি সেদিনও সকালে তিন বিদেশিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে নিয়েই আসেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে। মঠ তখনও ওই বাড়িতেই ছিল। ওখানেই এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্বামীজি দীক্ষা দেন মার্গারেটকে। তাঁর নতুন নামকরণ হয় নিবেদিতা। এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিলেন সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। দীক্ষাদানের আগে স্বামীজি নিবেদিতাকে দিয়ে সংক্ষেপে শিবপূজা করিয়ে নেন। ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলিও দেওয়ান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয় ঠাকুরঘরে। দীক্ষাদানের পর স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেন, 'যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের আগে পাঁচশোবার অন্যের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই বুদ্ধকে স্মরণ করো।' দীক্ষাদান সমাপ্ত হওয়ার পর স্বামীজি সবাইকে নিয়ে উপরতলায় গেলেন। এই দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শিবের মতো সেজেছিলেন স্বামীজি। সর্বাঙ্গে বিভূতি, হাড়ের কুণ্ডল, মাথায় জটা। তারপর এক ঘণ্টা উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনিয়েছিলেন তাঁর অনুগামী ও সঙ্গীদের। পরে এই দিনটির কথা ফিরে এসেছে নিবেদিতার একটি চিঠিতে। ১৯০৪ সালের ১৭ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা, '6 years ago this very day–and on a Thursday too–I saw the Holy mother for the first time and went home with you to the cottage. Do you remember? "Come on this journey",

said Swamiji, "and I will make you into 20 Mrs. Besants!" It was that day that he first called me by my name– 'Margaret'. My lecture at the Star Theatre must have been given on Friday night March, the 11th.

'In the cycle of the years, we have come round to the same days again. Friday next, March 25 th. will be my birthday, when I was first called 'Nivedita'. We are, then, entering on the seventh year. May it be blessed to His service! I wish it might be unflawed– perfect– but this seems too much to ask.'

এই চিঠিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হল, স্বামীজি প্রথম কোন দিনটিতে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন তা-ও মনে রেখেছেন নিবেদিতা। এটি পড়ে আন্দাজ করা যায়—এর আগে স্বামীজি তাঁকে 'মিস নোব্‌ল' বলেই সম্বোধন করতেন। মনে রাখতে হবে, জোসেফিনকে নিবেদিতা এই চিঠিটি লিখেছিলেন স্বামীজির প্রয়াণেরও দু বছর পর।

নিবেদিতাকে যেদিন দীক্ষা দেন স্বামীজি, ওইদিন স্বামীজি নিবেদিতা, সারা বুল এবং জোসেফিনকে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর গুরুর নির্দেশিত কাজ তিনি ঠিকমতো করে যেতে পারবেন কিনা—সে নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। নিবেদিতার সম্পর্কে ওইদিনই শ্রীমতী বুল এবং জোসেফিনের কাছে তিনি তাঁর উচ্চাশা ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, এদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজে তিনি নিবেদিতাকে নিয়োগ করতে চান। তাঁর আশা, নিবেদিতা এই কাজে সফল হবেন। তবে তার আগে যাঁদের ভিতর কাজ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্পর্কে নিবেদিতাকে আরও অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে—এও বলেছিলেন স্বামীজি।

নিবেদিতা দীক্ষিত হওয়ার চারদিন পরেই স্বামী স্বরূপানন্দকে সন্ন্যাস দেন স্বামীজি। স্বরূপানন্দ সামান্য কদিন ব্রহ্মচারী রূপে থেকে স্বামীজির কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা পান। এরপর মার্চ মাসের ৩০ তারিখে স্বামীজি অসুস্থতাবশত বিশ্রামের কারণে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এর কদিন পরে শ্রীমতী অঁরিয়েতা মুলারও দার্জিলিং যাত্রা করেন। শ্রীমতী মুলার নিবেদিতাকেও দার্জিলিংয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজি নিবেদিতার দার্জিলিং যাওয়ায় আপত্তি করেন। ফলে, নিবেদিতার দার্জিলিং যাওয়া হয়নি।

স্বামীজির দার্জিলিং যাত্রার পর মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী এবং স্বামীজির গুরুভ্রাতারা নিবেদিতা এবং জোসেফিনের দেখাশোনার ভার নেন। স্বামীজির গুরুভ্রাতারা যে তাঁদের সবিশেষ যত্ন করতেন—সে কথাও নিবেদিতা লিখে গিয়েছেন 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম গ্রন্থে'। নিবেদিতা লিখেছেন, 'যখন স্বামীজি স্বয়ং কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র

যাইতেন, তখন তাঁহাদের (স্বামীজির গুরুভ্রাতা) মধ্যে কেহ-না-কেহ অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করিয়া প্রাতঃকালে চায়ের টেবিলে নিয়মিতভাবে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন।'এভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামীজির অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নিবেদিতার একটি হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ওই সময়ে স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে ইস্টার সানডের দিন অখণ্ডানন্দকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Why do you say, you take undue advantage of my kindness? I have never done anything but accept things from you, and cannot think what you mean. I mean to accept more things, too–for I am sure that you will do more of the practical work of our Educational schemes than anyone else, and you shall be very very hard worked Swamiji!I think I am so stupid about Bengali, I ought to be talking it by now!'

স্বামীজির দার্জিলিং অবস্থানকালেই নিবেদিতা মহাকালী পাঠশালায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওইখানে তিনি বক্তব্য রাখেন। স্বামী শিবানন্দ ও অখণ্ডানন্দও ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ওই সময়ে রিষড়ার একটি সভায় উপস্থিত হয়ে স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতাও যে শোনেন নিবেদিতা সে কথা অখণ্ডানন্দকে ওই চিঠিতেই তিনি লিখে গেছেন। স্বামীজির দার্জিলিংয়ে অবস্থানকালেই মঠের নিজস্ব বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়। এই সময়, ১৮৯৮ সালের ৭ এপ্রিল নৌকাযোগে সারদা দেবীকে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবিতে পুজো করেন ও ভোগ নিবেদন করেন। পরে মঠের জমি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে নিবেদিতা, শ্রীমতী বুল এবং জোসেফিন সারদা দেবীকে সব ঘুরিয়ে দেখান। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'দিনগুলি প্রকৃতই আনন্দে কাটিতে লাগিল। কোনদিন নৌকায় করিয়া রাত্রির চন্দ্রালোকে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন। কোন কোন দিন তিনজনে একত্রে মঠের ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেন।'

স্বামীজির দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন শ্রীমতী মূলার যে নিবেদিতাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৎপর হয়েছিলেন এবং তাতে স্বামীজির বিশেষ আপত্তি ছিল, তা দার্জিলিং থেকে স্বামীজির লেখা দুটি চিঠিতেই প্রমাণ হয়। ১৮৯৮-এর ৪ এপ্রিল সারা বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'মিস মূলার এখানে একটি বাঙলো নিয়েছেন এবং বুধবার আসছেন। মিস নোব্‌ল তাঁর সঙ্গে আসছেন কিনা জানি না। আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁর (মিস নোব্‌লের) কাশ্মীরে আপনার সঙ্গে থাকাই শ্রেয়ঃ!' ১৮ তারিখ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'মার্গারেটের সম্বন্ধে

এখনও মিস মুলারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারিনি; কিন্তু আজ তাঁকে পত্র লেখার ইচ্ছা আছে। মার্গারেট এখানে আসবে বলে তিনি সব আয়োজন করেছেন। তাঁদের বাংলা শেখাবার জন্য মিঃ গুপ্তকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। মিস মুলার বোধহয় এখন মার্গারেটের জন্য কিছু করবেন; তবু আমি তাঁকে লিখব।

'এদেশে থাকা কালে মার্গারেট যে- কোন সময় কাশ্মীর দেখতে যেতে পারে; মিস—যদি রাজি না হন, তাহলেই আবার একটা প্রচণ্ড গোলযোগ বাধবে, আর তাতে তাঁর ও মার্গারেট দুজনেরই ক্ষতি হবে।'

আসলে এদেশে এসে নিবেদিতা শ্রীমতী মুলারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন বা সব কাজে শ্রীমতী মুলারের উপর নির্ভরশীল হন—এটা স্বামীজি কখনোই চাননি। কারণ, শ্রীমতী মুলারের উন্নাসিক এবং দাম্ভিক আচরণ মঠের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই মনে করতেন স্বামীজি। স্বামীজি এ-ও মনে করতেন যে, নিবেদিতা শ্রীমতী মুলারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ভারতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না। স্বামীজি চাইতেন সারা বুল এবং জোসেফিনের সঙ্গেই নিবেদিতা থাকুন, যে কারণে, বেলুড়ে সারা বুল এবং জোসেফিনের সঙ্গে একই বাড়িতে নিবেদিতাকে রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। শ্রীমতী মুলারের ওপর নিবেদিতা যেন নির্ভরশীল না হন—সে কথা নিবেদিতাকেও চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতা লন্ডন ত্যাগ করে ভারতে রওনা হবার পূর্বে স্বামীজি তাঁকে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন (২৯ জুলাই ১৯৯৭) তাতেও শ্রীমতী মুলারের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার কথাই বলেছিলেন। এই চিঠির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ওই চিঠিতে স্বামীজি পরিষ্কারই লিখেছিলেন,'... দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে যে তাঁর (শ্রীমতী মুলার) সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব।'

ইতিমধ্যে কলকাতায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। স্বামীজির কাছেও সে খবর পৌঁছল। প্লেগের খবর পৌঁছনো মাত্র স্বামীজি স্থির করলেন অতি দ্রুত কলকাতায় ফিরে আসবেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবাকার্যে লাগাবেন। ২৯ এপ্রিল ১৮৯৮ তারিখে দার্জিলিং থেকে এক চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে স্বামীজি লিখলেন, 'আমি যে শহরে জন্মেছি সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকার কল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি; আর জগতে যত জ্যোতিষ্ক আজ পর্যন্ত আলো দিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার চেয়ে এ উপায়টা আমার নির্বাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।' অর্থাৎ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকার পরিবর্তে আর্তজনের সেবা যে তাঁর কাছে অনেক জরুরি—সেটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

৩ মে বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে এলেন। এসেই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লেগ-আক্রান্তদের সেবায়। প্লেগ ছড়িয়ে পড়ায় তখন কলকাতাবাসী আতঙ্কে দিশাহারা।

অনেকেই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজি কলকাতায় ফিরেই প্লেগ আক্রান্তদের সাহায্যের জন্য একটি খসড়াপত্র রচনার ভার দিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতাও স্বামীজির সঙ্গে জোরকদমে প্লেগ দূরীকরণের কাজে নেমে পড়লেন। প্লেগ আক্রান্তদের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশনকে পুরোদমে নামিয়ে দিলেন স্বামীজি। ওই সময়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য, শিক্ষিত, তথাকথিত প্রগতিশীল নাগরিকরাও প্লেগের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। পালাননি একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর অনুগামীবৃন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা। বস্তুত সেদিন প্লেগ রোগীদের ত্রাণকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন না নামলে বিপর্যয়টি আরো বড় আকার ধারণ করত।

ওই সময়ে ত্রাণকার্যে অর্থের অভাব দেখা দিলে স্বামীজি এ-ও স্থির করেছিলেন, মঠের জমি-বাড়ি বেচে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাবেন। তাঁর গুরুভ্রাতাদের একথা বলেওছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর গুরুভ্রাতারা এতে প্রবল আপত্তি জানান। তাঁদের অসম্মতির কথা সংঘজননী সারদা দেবীর কানেও তাঁরা তোলেন। স্বামীজির এই প্রস্তাবে সারদা দেবীরও সায় ছিল না। অতএব মঠের জমি-বাড়ি বেচার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন স্বামীজি। অবশ্য তার দরকারও আর পড়েনি। কারণ, স্বামীজির আবেদনে সাড়া দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য এসেছিলেন। তবে, এই ঘটনায় নিবেদিতা তাঁর গুরুর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন। তা হল, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু তাত্ত্বিক দার্শনিক বিচার করে কালক্ষেপ করেন না। বরং মহৎ মানবসেবাই তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্ব পায়। এবং শুধু তা-ই নয়, তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেন, তা কার্যকর করতে দ্বিধা করেন না। স্বামীজির এই রূপটিই চিরকাল নিবেদিতা শ্রদ্ধা করেছেন। যে কারণে পরবর্তী কালে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এবং লেখায় স্বামীজির কর্মযোগকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

ওই সময়ে কলকাতার বর্ণনা দিয়ে নিবেদিতা একটি লেখা লিখেছিলেন। ওই লেখায় প্লেগ-আক্রান্ত কলকাতার একটি চিত্র পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Day after day last week, from the terrace of our little villa on the Ganges, we watched crowds of tiny boats come up from Calcutta and speed past us to the West. They were laden with the families and household effects of Hindus and Musalmans flying in terror from a city in which– not the plague was likely to find foothold, but where – the Segregation Act might presently be in full sway. Fear and disaffection were in the air and even we in our green retreat up here, with the palms waving overhead, and lizards playing about our feet, could see the general restlesness, in the attitude of our own servants.

'On Saturday matters rushed a crisis in the city. It was known that the plague had been declared, but that the Government had not yet determined on its plan of action, and amidst the exodus of the richer inhabitants it was rumoured that they had colluded with the

authorities, signed their approval of the Acts, and fled, leaving the people to their fate.

'The latter were nearly frantic with anxiety. Not a thought was given to the disease itself, but every nerve strained to breaking-point lest measure should be put in force affecting the privacy of their homes and honour, according to their standards, of their wives and mothers...'

নিবেদিতার দীর্ঘ লেখার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল। এই লেখাটি নিবেদিতার ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মনে হয় লেখাটি কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রের জন্যই তিনি লিখেছিলেন। প্লেগকে কেন্দ্র করে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল শহরে এবং সরকারের ভূমিকায় সেদিন যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল কলকাতার বাসিন্দারা— তা লিপিবিদ্ধ করে গিয়েছিলেন নিবেদিতা।

তবে, প্লেগের মোকাবিলায় নিবেদিতা নিজেও কিন্তু রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার নিবেদিতা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে লিখেছিলেন, '১৮৯৮ সালে প্লেগের সময় কলিকাতায় সে কি আতঙ্ক। এই মহামারীর সহিত শহরবাসীর কোনো পরিচয় ছিল না। কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদাল হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জা বোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতা; স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে লণ্ডন হইতে আনিয়াছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়।'

১৮৯৮ সালে প্লেগে সেবাকার্যের ভিতর দিয়েই নিবেদিতা এদেশে তাঁর প্রথম কর্ম শুরু করেন। প্লেগের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে নিবেদিতা সেদিন যেমন তাঁর নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছিলেন, তেমনই সেদিন থেকেই বাঙালির আপনার জনও হয়ে উঠেছিলেন।

এর ঠিক একবছর পর, ১৮৯৯ সালে, আবার কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময়েও স্বামীজির নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন দ্রুত ত্রাণকার্যে নেমে পড়েছিল। স্বামীজির নির্দেশে সেবার সেই ত্রাণকার্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং নিবেদিতা। ওই সময়ে স্বামীজি যথেষ্ট অসুস্থ ছিলেন। স্বামীজি অসুস্থ বুঝতে পেয়ে নিবেদিতাও চাইছিলেন স্বামীজি আমেরিকায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের বাড়িতে বেশ কিছুদিন থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে আসুন। চিকিৎসকরাও সেইরকম পরামর্শ দিচ্ছিলেন স্বামীজিকে। স্বামীজিও চেয়েছিলেন, ওই বছর গ্রীষ্মকালে কিছুদিন আমেরিকায় কাটিয়ে

আসতে। মেরি হেলকে ১৮৯৯-এর ১৩ মার্চ একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, '...গ্রীষ্মে জো-র (জোসেফিন ম্যাকলিয়ড) সঙ্গে আমেরিকায় যাবার খুব ইচ্ছা। কিন্তু মানুষ সংকল্প করে, এবং কে বিধান করেন?— সব সময়ে নিশ্চয়ই ভগবান্ করেন না।'

কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও স্বামীজির আমেরিকায় যাওয়া হল না। কলকাতায় আবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব হল। আমেরিকা যাওয়ার কথা ভুলে স্বামীজি নিজেকে নিয়োজিত করলেন প্লেগের ত্রাণকার্যে। এবারও এই কাজে তাঁর প্রধান সহায় হলেন নিবেদিতা। স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি প্লেগ কমিটি গঠন করলেন। নিবেদিতা সেই কমিটির সেক্রেটারি হলেন। কমিটির সুপারভাইজার হলেন স্বামী সদানন্দ। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ এবং স্বামী আত্মানন্দ হলেন কমিটির সদস্য। নিবেদিতার নেতৃত্বে পূর্ণ উদ্যোগে সেবাকার্যে নেমে পড়লেন তাঁরা। মার্চ মাসের ৩১ তারিখ থেকে নিবেদিতার নেতৃত্বে মিশনের এই কমিটি ত্রাণ ও সেবাকার্যে নেমে পড়লেন। স্বামী সদানন্দ বাগবাজার, শ্যামবাজার এবং আশেপাশের এলাকায় বস্তি অঞ্চলগুলি সাফ করার দায়িত্ব নিলেন। নিবেদিতা নিজে নেমে পড়লেন বাগবাজার অঞ্চলকে পরিষ্কার রাখতে। এর আগের বছর প্লেগের সেবাকার্যে নিবেদিতাকে নেমে পড়তে দেখে বাগবাজারের অঞ্চলের অনেক তরুণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরাও এবার নিবেদিতার সঙ্গে সেবাকার্যে যোগ দিলেন।

৫ এপ্রিল, ১৮৯৯—নিবেদিতা 'দ্য স্টেটসম্যান' এবং 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের কাছে ত্রাণকার্যে চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ওই দিনই ব্রিটিশ সরকারের হেলথ অফিসার ডা. মিল কুক নিবেদিতার সেবাকার্য পরিদর্শন করতে এলেন। চার্টার্ড ব্যাংকও নিবেদিতার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে তাঁর ত্রাণকার্যে পঞ্চাশ টাকা দান করল। ব্রিটিশ সরকারের প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান মি. ব্রাইটও নিবেদিতার কাজকর্ম পরিদর্শন করে গেলেন। এই ত্রাণকার্যে সরকারের সহায়তা পাওয়া গেছে দেখে নিবেদিতাও খুশি হলেন।

এই সময় নিবেদিতার সেবাকার্যের বর্ণনা করতে গিয়ে লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'বোসপাড়া লেনের আশেপাশের যেসব রাস্তা, সেগুলোর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবার দায়টা নিবেদিতার উপরই পড়েছিল। মেয়েদের কয়েকটা ঝুড়ি দিয়ে বলেছেন, সব আবর্জনা এতে ফেলবে। নর্দমা অবধি রাস্তার ধার-পাশ তারা পরিষ্কার করে রেখেছে কিনা খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে নিবেদিতা বাইরে যেতেন। এই নিয়মটুকু ওদের মানাতে কি কম কষ্ট করতে হয়েছে! কতবার মেয়েদের বুঝিয়েছেন এসব ব্যবস্থার সঙ্গে রোগের কি সম্বন্ধ, তা তারা ধরতে পারে না। হাসতে হাসতে ওঁর কথা শুনে গেছে— ঐ পর্য্যন্তই। নিবেদিতা দুদিন ধরে তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে হাল ছেড়ে

দিলেন। তিন দিনের দিন খুব ভোরে ঝাড়ু নিয়ে নিজেই রাস্তায় ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেন। মেয়েদের যারা এ দৃশ্য দেখল তারা লজ্জায় বাড়ির মধ্যে লুক'ল। বিকালের দিকে পাড়ায় পাড়ায় এ-খবর ছড়িয়ে পড়ল। 'আমরা যদি রাস্তা ঝাঁটপাট না দিই, সিস্টার নিজে দেবেন।' ব্যস্, সব ঠিক হয়ে গেল।'

প্লেগের ত্রাণ এবং সেবাকার্যে ছাত্রসমাজকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন স্বামীজি। এ কাজে ছাত্র সমাজকে যুক্ত করার জন্য নিবেদিতাকে উদ্যোগী হতে বলেছিলেন তিনি। ছাত্র সমাজকে যুক্ত করতে কতটা আগ্রহী ছিলেন স্বামীজি তার একটি বর্ণনা নিবেদিতার চিঠিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালের ৮ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা ওই চিঠিতে নিবেদিতা জানাচ্ছেন, 'Yesterday morning, 8 O'clock, I busy with my weans when enter a yellow robed herald with "Sister Nivedita, Swami is here!" I looked up, incredulous, just in time to welcome the king radiant in health and spirits. We retired and sat down– he on the study— verandah, I on the school steps. Sometimes in his might he rose and paced about the yard...He was like a whirlwind. "We want work–activity–we're going to have a lecture this week– you'll give it and I'll take the chair– all the Calcutta students– they shall come out and clean the city– all of it– with their own hands– I want them to have 'death fever'– do you know what that is? I have been talking to my own boys all yesterday and they are just like leashed hounds." Then he ordered the posters–amid tremendous excitement.'

এর কিছুদিন পরে, এপ্রিল মাসের ২১ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে একটি সভার আয়োজন করা হল। সভার বিষয়বস্তু ছিল 'প্লেগ ও ছাত্রসমাজের কর্তব্য'। ওই সভায় মূল বক্তা ছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজিও ওই সভায় বক্তব্য রাখেন। এই সভার পর ছাত্রসমাজের ভিতর যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা যায়। এবং সেবাকার্যেও যথেষ্ট গতি আসে। প্লেগ রোগীদের সেবা ও ত্রাণকার্যে নিবেদিতা কতটা আন্তরিক ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ডা. রাধাগোবিন্দ কর। ডা. কর তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, '১৮৯৯ সালে শহরে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করল। এর আগের বছর প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার পর শহরের লোক যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এবং শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিল, এবার গভর্নর স্যার জন উডবার্ন ঘোষণা করলেন—কোনও প্লেগ রোগীকে বলপূর্বক বাড়ি থেকে উৎখাত করা হবে না।... এই সময়, চৈত্র মাসের এক দুপুরে, আমি রোগী দেখে বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমার বাড়ির সদর দরজার সামনে একটি ধূলি ধূসরিত চেয়ারে জনৈকা ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তিনিই সিস্টার নিবেদিতা। নিবেদিতা অনেকক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওই দিন সকালে বাগবাজারে আমি প্লেগ আক্রান্ত একটি শিশুকে দেখতে গিয়েছিলাম। ওই শিশুটির

জন্য প্রয়োজনীয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা জানতেই নিবেদিতা আমার কাছে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে ওই শিশুটির সেবাযত্নের ভারও নিবেদিতাই গ্রহণ করেছেন। আমি নিবেদিতাকে জানালাম, শিশুটির অবস্থা সংকটজনক। গরিব মানুষদের বাসস্থান বস্তিগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হল তাঁর সঙ্গে। সেই সঙ্গে আমি নিবেদিতাকে এ-ও বললাম—প্লেগের ত্রাণকার্য চালানোর সময় উনি যেন নিজের জন্য কিছু প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নিয়ে নেন। ওইদিনই সন্ধ্যেবেলা আমি যখন আবার ওই শিশুটিকে দেখতে গেলাম, দেখলাম ওই নোংরা অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে একটি ঘরে নিবেদিতা শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তার শুশ্রূষা করছেন। পর পর দুদিন রাত জেগে শিশুটিকে শুশ্রূষা করেছিলেন নিবেদিতা। বস্তির ওই ঘরটি যেদিন জীবাণুমুক্ত করতে লোক এল, সেদিন নিবেদিতা একটি মই জোগাড় করে নিজেই ঘরটি চুনকাম করেছিলেন। নিবেদিতা যেন মৃত্যুভয়টুকুও জয় করেছিলেন তখন। দুদিন পরে, নিবেদিতার কোলেই ওই হতভাগ্য শিশুটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।'

এই লেখাটি পড়লেই বোঝা যায়, মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করেও নিবেদিতা সেদিন কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্লেগ আক্রান্তদের সেবাকার্যে। বোঝা যায়, সেই কাজে তাঁর কতটা ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা ছিল। অবশ্য, নিবেদিতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এটাই ছিল যে, তিনি যখনই যে কাজটি করেছেন, আবেগবশতই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, সে কাজে সম্পূর্ণ একাত্ম করে তুলেছেন নিজেকে। সে কাজের সামনে তখন আর সবকিছু তুচ্ছ মনে হয়েছে তাঁর। ভারতে আসার আগে ইংল্যান্ডে আইরিশ বিপ্লবীদের সমর্থনে কর্মকাণ্ডেও নিবেদিতার এই একাগ্রতা দেখা গিয়েছে। এই একাগ্রতাই দেখা গিয়েছে প্লেগ রোগীদের ত্রাণকর্মে এবং এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে। আবার এই একাগ্রতা নিয়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নিজেকে যুক্ত করেছেন নিবেদিতা। সে একাগ্রতা এমনই যে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও দ্বিধা করেননি।

প্লেগের ত্রাণকার্যে এই ঐকান্তিকতার পাশাপাশি ছিল তাঁর আত্মত্যাগ। সে কথাও বলে গিয়েছেন ডা. কর। বলেছেন, 'ওই প্লেগের দিনগুলিতে বাগবাজার এলাকার সব বস্তিগুলিতে ঘুরে ঘুরে নিবেদিতাকে ত্রাণ এবং সেবাকার্য করতে দেখা যেত। নিজের কথা না ভেবে অনেককেই উনি ওই সময় অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। নিবেদিতা রোজ সামান্য একটু দুধ আর ফল খেতেন। একটা সময় তো এমন এল—এক প্লেগ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার খরচ চালানোর জন্য নিবেদিতা দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।' দুঃস্থ, আর্তের ত্রাণকার্যে নেমে এই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত শুধু সেই সময়ে নয়, এখনও বিরল।

এই সময়ে প্রতি রবিবার বিকালে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে প্লেগের ত্রাণকার্য নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক বসত। ত্রাণকার্য কেমন চলছে তার একটি সাপ্তাহিক রিপোর্ট ওই বৈঠকগুলিতে পেশ করতেন নিবেদিতা। পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ওই বৈঠকেই স্থির হত। ওই সময়েই নিবেদিতা মহিলাদের জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল গড়ে তোলার চিন্তা করেন। কিন্তু কিছু বাস্তব অসুবিধার কারণে তাঁকে সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ —পরপর দুছর প্লেগের ত্রাণকার্যে নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকা সকলের নজর কেড়েছিল। বলতে গেলে, প্লেগের সময় এই সেবাকার্যই পাকাপাকিভাবে কলকাতাবাসীর হৃদয়ে আসন করে দিয়েছিল নিবেদিতার। তিনি যে নিজেকে দান করতেই ভারতে এসেছেন— তা ওই সেবাকার্যের ভিতর দিয়েই প্রমাণ করেছিলেন তিনি। বিবেকানন্দের দেওয়া 'নিবেদিতা' নাম সেদিনই সার্থক হয়ে উঠেছিল।

আবার ফিরে যাওয়া যাক ১৮৯৮ সালে। কলকাতা শহরে প্লেগের প্রকোপ কমে এলে স্বামীজি স্থির করলেন আলমোড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সেই সময় ক্যাপ্টেন জন হেনরি সেভিয়ার এবং শ্রীমতী শার্লট সেভিয়ার আলমোড়ায় বসবাস করছিলেন। তাঁরা স্বামীজিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আলমোড়ায় এসে কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। সেইমতো ১৮৯৮ সালের ১১ মে আলমোড়ার উদ্দেশে রওনা দিলেন স্বামীজি। স্বামীজির সঙ্গী হলেন স্বামী তুরিয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ এবং চার বিদেশিনী। এই চার বিদেশিনী হলেন সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, মার্কিন কনসাল জেনারেলের স্ত্রী শ্রীমতী প্যাটারসন এবং নিবেদিতা। নিবেদিতা তাঁর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে স্বামীজির এই উত্তর ভারত ভ্রমণের এক বিস্তারিত চিত্র এঁকে গিয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি। আর প্রত্যেক নতুন স্থানে আসিবামাত্র কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত স্বামীজি সেখানকার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন। শিক্ষিত পাশ্চাত্যগণের ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা এত অধিক যে, উহাকে প্রায় মূর্খতা বলা চলে; অবশ্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে কতকটা জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন, তাঁহদের কথা স্বতন্ত্র। সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষার আরম্ভ হইল পাটনা বা প্রাচীন পাটলিপুত্র হইতে। রেলপথে পূর্বদিক হইতে প্রবেশ করিবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম। স্বামীজি সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে ভুলিলেন না। লক্ষ্ণৌ শহরে প্রস্তুত শিল্প ও বিলাস দ্রব্যগুলির নাম ও গুণবর্ণনা বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল।... কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি আমাদের দরজার মাথায় ঝোলানো গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া

দিতেন। উহা দ্বারা গৃহগুলি হিন্দু পরিবারের বলিয়া বোঝা যাইত। আবার ভারতবাসীরা 'সুন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই 'কাঁচা সোনার বর্ণ' তিনি দেখাইয়া দিতেন।'

আলমোড়া যাওয়ার পথে স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রথমে এসে পৌছলেন নৈনিতালে। নৈনিতালে খেতরির মহারাজের একটি বাড়ি ছিল। খেতরির মহারাজা নৈনিতালে স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীরা খেতরির মহারাজার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। নৈনিতালে অবস্থানকালে দুটি ঘটনার বিবরণ লিজেল রেমঁ-র লেখা থেকে জানা যায়। রেমঁ লিখেছেন, 'বছরে একসময় যাত্রীরা এই মন্দিরে ভিড় করে। নিবেদিতা যেদিন মন্দিরে গেলেন সেদিন কিন্তু কৌতূহলী স্থানীয় লোকেরাই শুধু ছিল। রাজবাড়ির গাড়িতে তাঁরা এসেছেন, পিছু পিছু ওরাও এসে জমেছে। নৈনিতাল হ্রদের ঠাণ্ডা জলে হাত ডোবালেন তাঁরা, মন্দির প্রাঙ্গণে ছোট ছোট দেউলগুলি দেখে বেড়ালেন। সন্ন্যাসীরা সঙ্গে না থাকলে কিন্তু পুরোহিতরা এসব করতে দিতেন না। মন্দিরের দরজা খোলা ছিল, তাঁরা বাইরে থেকে গর্ভগৃহের দেবীপ্রতিমা দেখবার চেষ্টা করলেন। মূর্তিটি যাতে ভালো করে দেখা যায় তার জন্য পুরোহিত একটি প্রদীপ তুলে ধরলেন। সূর্যের আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে রয়েছে, তাই প্রদীপের চঞ্চল শিখা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না তাঁরা। বার-দুই আলো তুলে ধরা হল, তবুও না। সবাই খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছেন, এমন সময় হঠাৎ কি মনে করে নিবেদিতা ফিরে দাঁড়ালেন। পিছনে অনেক লোক জমেছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারা লক্ষ্য করছে। একটা হিমশীতল দুর্ভেদ্য পরিবেশ।

'নিবেদিতা হিন্দিতে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলেন। ফলে জনতার মাঝে বিরূপতার ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনেই ঝলমলে শাড়ী পরা দুটি সুশ্রী তরুণী দাঁড়িয়েছিল। কেবল যা সাড়া পাওয়া গেল তাদের কাছ থেকে, তারা আমোদ পেয়ে হেসে উঠল।...বিদেশিনীদের যেমন, তাদেরও তেমনি সকৌতূহলে দেখছে সবাই। দেখে নিবেদিতার আশ্চর্য লাগল।

'...গাড়ীতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাসায় এসে নামতে গিয়ে নিবেদিতা আরও অবাক হয়ে গেলেন বাড়ির সামনে সেই লোকগুলো আর মেয়ে দুটিকে দেখে। তাদের দেখে তিনি হাসলেন। সাহস পেয়ে মেয়ে দুটি কথা কইল। বলল, 'আমরা স্বামীজির সঙ্গে দেখা করব, তাঁর আশীর্বাদ চাই।' উত্তরে জনতা গর্জে উঠল, 'দূর হ নষ্টা কোথাকার।'

'কিছুক্ষণ যায় অস্বস্তি আর কি করা যায় এই চিন্তায়। নিবেদিতার মনে পড়ে বাইবেলের কথা। একটি পতিতা মেয়েকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল জনতা, প্রভু যিশু তাতে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে প্রথম কে পাথর ছুঁড়বে? কে সেই নিষ্পাপ?'

'সঙ্গের সন্ন্যাসীরা মেয়ে দুটিকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারা স্বামীজির সামনে এসে প্রণাম করে কতগুলো মোহর প্রণামী দিল তাঁর পায়ে। তাঁর কাজে যেন এগুলি লাগে। কোনও তিরস্কার করলেন না স্বামীজি, ব্যবহারে একটুও অবহেলা বা অবজ্ঞার ভাব দেখা গেল না। আশীর্বাদ জানিয়ে দু-একটি মিষ্টি কথা বলে তিনি তাদের বিদায় দিলেন। তাদের মাঝেও যে মায়ের প্রকাশ। সতীর মাঝে তাঁর এক রূপ, অসতীর মাঝেও তাঁরই এক প্রকাশ। চোখ থাকলেই তা দেখা যায়।'

এই ঘটনার বহুবছর পূর্বেই বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমাজে অচ্ছুৎ, বারবণিতারূপে চিহ্নিত বাংলা রঙ্গমঞ্চের সে যুগের অভিনেত্রীদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে টেনে নিতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁদের ফিরিয়ে না দিয়ে তাঁদের প্রতিও কৃপাবর্ষণ করেছিলেন। গুরুর সেই আদর্শই যে বিবেকানন্দও বহন করে চলেছিলেন এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

নৈনিতালেরই আর একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় রেমঁ-র লেখায়। রেমঁ লিখেছেন, 'সেদিনই শেষবেলায় আর একটি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দেখলেন নিবেদিতা। প্রাসাদ-উদ্যানে মহারাজের উপস্থিতিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন স্বামীজি। আবেগ-ভরা কণ্ঠে হিন্দু-মুসলমান উভয়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'সময় হয়েছে। এবার আমাদের শক্তির সাধনায় এক হতে হবে। নিদারুণ আলস্যে আমরা জড় হয়ে গেছি। সে আলস্য ঝেড়ে ফেলতে হবে। আজ আমরা শক্তিহীন গোলামের জাত। আমাদের স্বাধীনতা নাই, প্রাণ নাই। বুঝি সেসব পাওয়ার ইচ্ছাও নাই।

'...বিবেকানন্দের এই প্রাণস্পর্শী আবেদনের প্রভাব ঠেকিয়ে রাখবে কে? দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করল। একটি যুবক উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠল, 'আমি টাকা যোগাড় করে দেব, অনেক টাকা। সেই টাকায় এদেশের ভাল-ভাল ছেলেকে ইংল্যান্ড পাঠান যাবে। তারা সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে ভারতের সেবা করবে।'

'বিবেকানন্দ বললেন—এ কোন কথাই নয় ভাই! নিশ্চয় জেনো, এসব লোকের বেশীর ভাগই ভাবে-চিন্তায় বিদেশী হয়ে যাবে, ওরা হবে দো -আঁশলা। সম্পূর্ণ স্বার্থপর হয়ে উঠবে, নিজের দেশের কথা ভুলে বেশ-ভূষা, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই ইউরোপের নকল করবে শুধু। না, আমরা এদেশের ধাতুতে গড়া একদল শক্ত-সমর্থ লোক চাই। ভারতের আত্মাকে জানবে তারা, জাতীয় আদর্শকে জীবন্ত করে তোলাই হবে তাদের জীবন-ব্রত।'

আন্দাজ করাই যায়, স্বামীজির এই কথাগুলি জাতীয়তাবাদী, আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল বিরোধী নিবেদিতার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং নিবেদিতাকে আরও বেশি বিবেকানন্দ-অনুগামী করে তুলেছিল। সে কথা রেমঁও লিখেছেন, 'কথাগুলো নিবেদিতার মনে লাগল। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ভারতবর্ষ তাহলে কি? দাদু হ্যামিলটন যেমন দরদ দিয়ে শ্রদ্ধা

নিয়ে আয়ারল্যান্ডের কথা বলতেন, স্বামীজি ঠিক তেমনি করেই ভারতের কথা বলছেন। ভারতবর্ষ কি স্বতন্ত্র একটা নেশন?' এই বক্তব্য যে স্বামীজি শুধু নৈনিতালেই রেখেছিলেন—এমন নয়। বরং, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে স্বামীজি এই বক্তব্য রাখতেন। এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারতের স্বপ্ন যে তিনি দেখতেন তা তাঁর এইসব কথাবার্তা থেকেই বোঝা যেত।

ফলত, ব্রিটিশ পুলিশের নজরদারি যে স্বামীজির ওপর ছিল না—এমন ভাবাও ঠিক নয়। বরং, স্বামীজিও যে ব্রিটিশ পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন, তা-ও বলা যায় নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে। উত্তরভারত ভ্রমণকালেই বান্ধবী নেল হ্যামন্ডকে ২২ মে ১৮৯৮ তারিখে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'One of the monks has had a warning this morning that the police are watching Swami, thro' spies–of course we know this— in a general way– but this brings it pretty close, and I can not help attaching some importance to it, tho' the Swami laughs. The Government must be mad – or at least will prove so if he is interfered with. That would be the torch to carry fire through the country – and I the most loyal Englishwoman that ever breathed in this country (I could not have suspected the depth of my own loyality till I got here), will be the first to light up.'

ব্রিটিশ পুলিশের নজর যে তাঁর ওপর রয়েছে এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দও যে সম্পূর্ণই অবহিত ছিলেন— তা-ও নিবেদিতার লেখা এই চিঠিটি পড়লে জানা যায়।

নৈনিতাল থেকে আলমোড়া যাওয়ার পথেরও একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় রের্মঁ-র লেখায়। রের্মঁ লিখেছেন, 'সন্ধ্যা নেমে এল। চলার বেগ মন্দা হয়ে আসছে। লাঠি আর মশাল নিয়ে আগে-আগে চলেছে একজন লোক, পথের ঝোপ-ঝাড় পিটিয়ে বাঘ-ভালুক তাড়ানোর উদ্দেশ্যে। তারপর কুলিরা, মাথার সঙ্গে চামড়ার পেটি দিয়ে টানা রয়েছে পিঠের মাল। ভিস্তিওয়ালাদের পিঠে রয়েছে ছাগলের চামড়ার কালো মশক। সামনে দিশারীরা একতালে হাতের বাতি দুলিয়ে নিঃশব্দে চলেছে, তাতে সমস্ত বাহিনীটাকে দূর থেকে মনে হয় চলন্ত আলোর টানকরা একটা ফিতা।... চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় দিশারী জানাল, দূরে আলমোড়ার পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে।' আলমোড়া যে কতখানি মুগ্ধ করেছিল নিবেদিতাকে, তা নেল হ্যামন্ডকে লেখা ২২ তারিখের ওই চিঠি থেকেই জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I can not tell you how real this idea of meditation has grown to me now. One can't talk about it I suppose, but one can see it and feel it here– and the very air of these mountains especially in the starlight is heavy with a mystery of peace that I can not describe to you.

'There is a kind of pine, called deodar (pro. dhe-odhar) very like a larch and very like a cedar, huge, magnificent, and fragrant with the blackberry–odour of English autumns. Up here the dheodhar grows all round us–and adds like everything else to this unutterable depth–so do the snows– the great white range like a Presence that can not be set aside– towards over there above the lower purple mountains in front and we sit in a rose bowered verandah and look. The caves would be the right place.'

আলমোড়া থেকে ১৮৯৮ সালের ২০ মে স্বামীজি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা থেকেও জানা যায় আলমোড়ায় সেভিয়ার দম্পতির বাংলোটি তাঁরও বিশেষ পছন্দ হয়েছিল। ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'এবারে আলমোড়ার জল হাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে সেভিয়ার যে বাংলো লইয়াছে, তাহা আলমোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওপারে এনি বেস্যান্ট চক্রবর্তীর সহিত একটি ছোট বাংলায় আছে। চক্রবর্তী এখন গগনের (গাজীপুরের) জামাই। আমি একদিন দেখা করতে গিয়াছিলাম। এনি বেস্যান্ট আমাকে অনুনয় করে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে ইত্যাদি। আজ বেস্যান্ট চা খাইতে এখানে আসিবে। আমাদের মেয়েরা নিকটে একটি ছোট বাংলায় আছে এবং বেশ আছে। কেবল আজ মিস ম্যাকলাউড একটু অসুস্থ। হ্যারি সেভিয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে ।'

আলমোড়ায় পৌঁছে স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গী সন্ন্যাসীরা আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সেভিয়ার দম্পতির বাড়িতে। সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতার জন্য পাশেই একটি ছোট বাংলো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বেলুড়ের অতিথি-নিবাসের মতোই জীবন শুরু হল এখানেও।

চৌদ্দ

'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'ব্যক্তিগত ঘটনা বা অনুভূতি সম্পর্কে স্বামীজি ছিলেন অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির। অবশ্য পৃথিবীর বহু স্থানে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিজ নিজ দোষ উত্থাপন করিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুর পদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কেহই বোধহয় তাঁহার মত ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করে নাই। এমনকি, কোন ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া নহে, অথচ নিজ ব্যক্তিগত অনুভূতির ঘনিষ্ঠ প্রকাশ ব্যতীত যাহার উত্তর দেওয়া চলে না, এমন সব প্রশ্নে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিত— এবং অন্তরের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। লন্ডনের ক্লাসগুলিতে কখনও কখনও দেখিয়াছি, কতকগুলি প্রশ্ন জোর করিয়া তাঁহার উপর চাপানো হইয়াছে—বুঝিতে পারিতেন যে, ঐরূপ ধরনের প্রশ্নের পরিবর্তে বরং অসাবধানতাবশতঃ তাঁহার কোনও অনাবৃত স্নায়ু জোরে চাপিয়ে ধরিলে উহা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল।'

আসলে, বিবেকানন্দ বরাবরই তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা অনুভূতি কোনোটাকেই প্রাধান্য দিতে চাননি। তিনি বুঝতেন, যে কাজের দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন—ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ভালোলাগা সেই কাজের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। একথা তিনি নিজেও বারংবার উল্লেখ করেছেন। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে লন্ডনে একরকম দেখেছিলেন। লন্ডনে যে বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন নিবেদিতা, সে বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে। সে বিবেকানন্দ তখনও নিবেদিতাকে গঠন করার কাজে হাত দেননি। নিবেদিতা ভারতে আসার আগে বিবেকানন্দ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—কর্মে সাফল্য আসুক বা না আসুক, এমনকী নিবেদিতা যদি মাঝপথে কর্ম পরিত্যাগ করে চলে যেতেও চান— তাহলেও তিনি তাঁকে ত্যাগ করবেন না। ফলত, নিবেদিতা বিবেকানন্দের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও আকর্ষণে ভারতে এলেও, বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর তখনো সম্পূর্ণ

ধারণা গড়ে ওঠেনি। নিবেদিতা ভেবেছিলেন, আলমোড়ায় তাঁর গুরুর সান্নিধ্য আরো ভালোভাবে লাভ করবেন তিনি। গুরুও অন্য অনেকের তুলনায় তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই তাঁকে গড়ে তুলবেন। এককথায় গুরুর বিশেষ মনোযোগ তাঁর কাম্য ছিল। স্বামীজির প্রতি একটি একান্ত দাবি তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু আলমোড়ায় আসার পর অন্য এক বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করলেন তিনি। এই বিবেকানন্দ নিরন্তর আঘাতে আঘাতে তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। আলমোড়ায় পৌঁছানোর পর স্বামীজি তাঁর এই শিষ্যাটির প্রতি বিশেষ কোনো দৃষ্টি তো দিলেনই না, বরং উপেক্ষাই করতে শুরু করলেন। পাশাপাশি স্বামীজির কঠোর ভর্ৎসনার মুখোমুখিও হতে হল নিবেদিতাকে। স্বামীজির এই ব্যবহারের জন্য নিবেদিতা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে এত দূরদেশে এসে এইরকম অবজ্ঞা এবং ভর্ৎসনার মুখে পড়বেন—এ ভাবতেই পারেননি নিবেদিতা।

কিন্তু আলমোড়ায় পৌঁছনোর পর স্বামীজি নিবেদিতার প্রতি ওই নির্মম নিরাসক্ত আচরণ করেছিলেন কেন? এ সম্পর্কে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বিশেষত তিনি (বিবেকানন্দ) বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতার যে দৃঢ় অনুরাগ তাহা একান্তই তাঁহার প্রতি। এই ব্যক্তিগত বন্ধন নির্মমভাবে ছিন্ন করিবার জন্য তিনি দৃঢ় নিশ্চয়ই ছিলেন। ফলে নিবেদিতার সমগ্র অন্তর শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার এই বিশ্লেষণ কিন্তু ভুল নয়। কারণ নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজির বেশ কিছু চিঠিপত্রই প্রমাণ করেছে—এই ব্যক্তিগত বন্ধন বরাবরই স্বামীজি ছিন্ন করতে চেয়েছেন। নিবেদিতা লন্ডন ত্যাগ করার পূর্বেই ১৮৯৭ সালে ৩ নভেম্বর একটি চিঠিতে স্বামীজি তাঁকে লিখেছিলেন, '...অত্যাধিক ভাবপ্রবণতা কাজে বিঘ্ন করে; 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'— এই হবে মূল মন্ত্র।'

১৮৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর একটি চিঠিতে স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখেছেন, '...আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে জগতের কিছু যায় আসে না। শুধু অপরে যাতে সংক্রামিত না হয়, তা দেখতে হবে। কর্ম কৌশল তো ঐখানেই।' আর এরও অনেক আগে ১৮৯৭ সালের ৩ জুন একটি চিঠিতে খোলাখুলিই তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, 'জগৎ আপন ধারায় চলুক ও কর্মের গতি অপ্রতিরোধ্য হোক। এ জগতে আমার আর কোন বন্ধন নেই।'

ভারতকে না জানা সত্ত্বেও এবং প্রত্যেক ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা তখনো না থাকা সত্ত্বেও, ইংল্যান্ডে নিজের প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে নিবেদিতা যেভাবে এদেশে চলে এসেছিলেন—তা বিশ্লেষণ করলে সকলেই স্বীকার করবেন—স্বামীজির প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ এবং অনুরাগের ফলে এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। আলমোড়ায় নিবেদিতার প্রতি এই কঠোর ব্যবহারের কারণ এটিই হতে পারে

যে—স্বামীজি বুঝতে পারছিলেন—এই ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে নিবেদিতা নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। নিবেদিতা পারছেন না বুঝেই, স্বামীজিকেই কঠোর হতে হয়েছিল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা আরো লিখেছেন, 'স্বামীজি যদি কোমলভাবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ নিবেদিতার নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে হয়তো হৃদয়ের আবেগবশতঃ নিবেদিতা কতকটা নত হইতেন। ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্রের নিকট স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার বহু সময়ে ঘটিয়া থাকে—কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু স্বামীজি সে ধার দিয়াও যান নাই। তাঁহার অভিধানে আপস বলিয়া কোনও শব্দ ছিল না।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার এই বিশ্লেষণও সঠিক। নিবেদিতা ভারতে আসার আগেই স্বামীজি চেয়েছিলেন আবেগবশত নিবেদিতা যেন কোনো সিদ্ধান্ত না নেন। আবেগবশত নেওয়া সিদ্ধান্ত যে অনেক সময়ই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বরং আবেগ অন্তর্হিত হলে তা-ও অন্তর্হিত হয়—তদুপরি এভাবে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তে যে বৃহৎ কোনো কর্ম সম্পাদন করা যায় না—তা বিবেকানন্দ বুঝতেন। যে কারণে নিবেদিতা এদেশের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে ১৮৯৭ সালের ২৯ জুলাই তাঁকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'কাজে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো...।' ওই বছরেরই ৩ নভেম্বরের চিঠিটি তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিবেদিতা যে স্বামীজির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ ছিন্ন করতে পারেননি, স্বামীজির ওপর তাঁর একান্ত দাবিটিও পরিত্যাগ করতে পারেননি তা অবশ্য বোঝা যায় 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থ পাঠ করলেই। ওই গ্রন্থের এক অংশে তিনি লিখেছেন, '১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র একদিন আধঘন্টার জন্য তিনি আমাকে তাঁহার সহিত একাকী ভ্রমণ করিতে আহ্বান করেন।' এই কথাটির ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রচ্ছন্ন অভিমানটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ওই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'বিবেকানন্দের ধরণ-ধারণ একেবারে নৈর্ব্যক্তিক। অন্য মেয়েদের চাইতে একটুও বেশি মনোযোগ দেন না ওঁর (নিবেদিতা) দিকে। এখানেও বেলুড়ের মতো সকালে ক্লাস হয়। মাপা কথাবার্তার বাইরে একটা কথাও কখনও নিবেদিতাকে বলেন না স্বামীজি। তিনি অবিচল, সঙ্কল্পে অটল। নিবেদিতাকে কখনও তিরস্কার করেন, মনটা জ্বালা করে তাঁর। এমনিতর সংঘর্ষ চলতে থাকে।' রেমঁর লেখা পড়লে বোঝা যায় উপেক্ষা করে নিবেদিতাকে তখন একেবারেই দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীজি।

রেমঁ লিখেছেন, 'মনের মধ্যে অবুঝ বিক্ষোভ চলে। নিজের উপর নিজেরই বিরক্তি ধরে। নিবেদিতা যা-কিছু করছেন, যা-কিছু বলছেন স্বামীজির উদ্দেশ্যে, মনে হয় তিনি যেন তার সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নন। একদিন বলে বসলেন, 'মেয়ে যখন

বাপের বাড়িতে থাকে তখন তার এমনভাবে চলা উচিত নয় যাতে লোকের মনে হবে বাড়িতে ঝি-চাকরের অভাব আছে।' কথাটায় মন দমে যায়। নিবেদিতা বুঝতে পারেন, দিন দিন মনের মাঝে তিক্ততার ভাব বেড়ে উঠেছে। মনের গতিক দেখে তিনি আশ্চর্য হন, কিন্তু তার উপরে তো তাঁর কোনও কর্তৃত্ব নাই। নিজেকে যতই তিরস্কার করেন, বাইরের গুরু-শিষ্যার সম্পর্কে ততই টান পড়ে।'

বিবেকানন্দের এই উপেক্ষায় মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন নিবেদিতা। একা হয়ে গিয়েছিলেন। গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের মাঝেও একটি শীতলতা এসে গিয়েছিল। এই সময় স্বামী স্বরূপানন্দ নিবেদিতার একান্ত সুহৃদ হয়ে ওঠেন। স্বরূপানন্দ তাঁকে ধ্যান শেখান, শাস্ত্রও পাঠ করান—এক ধরনের মানসিক শান্তি লাভ করতে তাঁকে সাহায্য করেন স্বরূপানন্দ। স্বরূপানন্দ সম্পর্কে 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন—'আমি মঠের ঠাকুর ঘরে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ করিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে আশ্রয়লাভ করেন। কিন্তু অল্প কয়েক সপ্তাহ ব্রহ্মচারী রূপে অবস্থান করিবার পরই তিনি স্বামীজির নিকট গৈরিক বস্ত্র লাভ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তাঁহার মনের বিকাশ লাভের কাহিনী আমার নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল...বহু বৎসর পরে আলমোড়ায় তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়নকালে ভগবৎ প্রেমকে আকুল তৃষ্ণার সহিত কেন তুলনা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি।

'স্বামী স্বরূপানন্দের শিক্ষাধীনে আমি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার নিকট এই সহায়তা না পাইলে সেই অমূল্য অবসর আমার জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইত।' এরপরই স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সেই সময়ের শীতল সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'গুরুর সহিত এইকালে আমার সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ পূর্ণ। এখন আমি বুঝিতে পারি, শিখিবার বিষয় অনেক ছিল, কিন্তু সময় ছিল কত অল্প। শিক্ষার্থীর অহংনাশই ছিল শিক্ষার প্রথম সোপান। কিন্তু এই সময়ে আমার সযত্নপ্রোষিত সংস্কারগুলির উপর যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বর্ষণ হইত, তাহার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। দুঃখভোগের কারণ অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক অনুকূল ভাবাপন্ন প্রিয় আচার্যলাভের স্বপ্ন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া তাহার পরিবর্তে উদাসীন এবং হয়তো বা মনে মনে বিরূপ এইরূপ এক ব্যক্তির চিত্র কল্পনা করিয়া আমি তখন যে পরিমাণে দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম, এখন তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নির্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।'

গুরু ও শিষ্যার ভিতর দূরত্ব এবং দ্বন্দ্ব এতটাই বেড়ে উঠল যে তা সারা বুলের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি গুরু-শিষ্যার মধ্যে একটা আপসরফার চেষ্টা করলেন। এই দ্বন্দ্ব

কীভাবে মিটল তাঁর বর্ণনাও নিবেদিতা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'সৌভাগ্যবশতঃ সেবাকার্যে যোগদান করিব বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যাহার করিবার কথা মুহূর্তের জন্যও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম, এই সেবাকার্যে কোনও ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক থাকিবে না। অবশেষে এমন সময় আসিল, যখন এই তীব্র যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিতে পারে এই কথা চিন্তা করিয়া আমাদের দলের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, অনুগ্রহপূর্বক স্বামীজির নিকট এই বিষয়ে উল্লেখ করিলেন। স্বামীজি নীরবে সব শুনিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিনি আবার আসিলেন। আমাদের বারান্দায় একত্র দেখিয়া তিনি তাঁহার দিকে তাকাইয়া বালকের ন্যায় সরলভাবে বলিলেন, 'তোমার কথাই ঠিক। এ অবস্থার পরিবর্তন একান্তই দরকার। আমি একাকী জঙ্গলে যাচ্ছি, নির্জনবাসের ইচ্ছা। আর যখন ফিরব শান্তি নিয়ে আসব।' তারপর স্বামীজি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মাথার উপর নবীন চন্দ্রের শোভা। সহসা দিব্যভাবে তাঁহার কণ্ঠ আবিষ্ট হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'দেখ, মুসলমানেরা দ্বিতীয়ার চাঁদকে সমারোহের চোখে দেখে। এস, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি।' কথাগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত তুলিলেন, এবং নীরবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিদ্রোহী শিষ্যাকে (স্বয়ং নিবেদিতা) হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আশীর্বাদ করিলেন। ইতোমধ্যে শিষ্যা তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়াছেন। অপূর্ব মাধুর্যে সেই মুহূর্তটি নিশ্চিত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।'

নিবেদিতা লিখেছেন, 'তথাপি, এই মুহূর্তে ক্ষত আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু যে মোহস্বপ্ন ভাঙিয়া শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না। এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিবার কারণ, যাহাতে পরের ঘটনাটি বিবৃত করিতে পারি। বহু বহু বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এমনদিন আসিবে, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয় 'নরেন্দ্রে'র স্পর্শমাত্রে জ্ঞানবান করিবার যে শক্তি জন্মগত, তাহা বিকাশলাভ করিবে। আলমোড়ায় সেই সন্ধ্যাকালে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। কারণ, একাকী ধ্যানে বসিয়া আমি অনুভব করিলাম, আমি এক অনন্ত মঙ্গলময় সত্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছি, সেই গভীর সত্তার স্বরূপ অহংপূর্ণ বিচারের দ্বারা কখনও জানিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত, আমি একথাও হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, হিন্দু ধর্মের যোগশাস্ত্রে যে অনুভূতির উল্লেখ আছে, তাহা ঐ জড়ভূমিতে সহজভাবে নিত্য প্রত্যক্ষ। আর এই সর্বপ্রথম আমি জানিলাম যে, শ্রেষ্ঠ আচার্য এইরূপেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান করেন, উহার পরিবর্তে নিরাকার দর্শনলাভ হইবে বলিয়া।' নিবেদিতার এই লেখাটি পড়লে সেই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কিছুটা আন্দাজ করা যায়। সেই সঙ্গে এটিও বোঝা যায় যে, আলমোড়ায় ওই ঘটনার পর নিবেদিতা

উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিন্তা করা অলীক চিন্তারই নামান্তর। বিবেকানন্দের এই শিক্ষা যে নিবেদিতার মানসিক জগতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন তখন আনতে পেরেছিল, তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্তকে কিছুটা হলেও শান্ত করতে পেরেছিল, তা আলমোড়া থেকে ১৮৯৮ র ৫ জুন নেল হ্যামন্ডকে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায়।

নেল হ্যামন্ডকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'I am learning a great deal... that there is a certain definite quality which may be called spirituality; that is worth having; that the soul may long for GOD as the heart of human love; that nothing that I have ever called nobility or unselfishness was anything but the feeblest and most sordid of qualities compared to the fierce white light of real selflessness. It is strange that it has taken so long to make me see these elementary truths clearly– is not it? And at present I see no more. I cannot yet throw any of my past experience of human life and human relationships overboard. Yet I can see that the saints fight hard to do so; can they be altogether wrong ? At present, it is of course just groping in the dark–asking an opinion here and there, and sifting evidence. Some day I hope to have first- hand knowledge and to give it to others with full security of truth.'

এই সময়ই স্বামীজি একটি চিঠি লিখেছিলেন নিবেদিতাকে। লিখেছিলেন, '...কর্তব্যের শেষ নাই, আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর। তুমি দুঃখ করো না; 'ন হি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—(কল্যাণকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না)। ইতি সতত তোমাদের বিবেকানন্দ।' চিঠিটির তারিখ ২০ মে, ১৮৯৮। স্বামীজির এই চিঠিটি থেকে মনে হয়, তাঁর উপেক্ষার কারণে মানসিক অবস্থা লক্ষ করে স্বামীজি নিবেদিতাকে কিছুটা শান্ত করতে চেয়েছিলেন। সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন।

নিবেদিতার ভিতর সযত্ন লালিত পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাগুলিও আলমোড়াতেই ভেঙে দিয়েছিলেন স্বামীজি। এজন্য মাঝে মাঝে নিবেদিতার প্রতি আক্রমণাত্মকও হতে হত তাঁকে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'একদিন স্বামীজি নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, 'বাস্তবিক তোমার যেরকম স্বজাতিপ্রেম, ও তো পাপ। আমি চাই তুমি এইটুকু ধারণা কর যে, অধিকাংশ লোকই স্বার্থের প্ররোচনায় কাজ করে। কিন্তু তুমি ক্রমাগত এই সত্যটিকে উল্টে দিয়ে প্রমাণ করতে চাও, একটি জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্ঞতাকে এরকম আগ্রহের সঙ্গে ধরে থাকা মন্দবুদ্ধির পরিচয়।'

'স্বামীজি ছিলেন প্রকৃত আচার্য। তাঁহার দৃষ্টিতে নিবেদিতার অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করিবার জন্য য়ুরোপীয় সমাজের তীব্র আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহার এই

প্রচেষ্টার মধ্যে কোন মত বা ধারণাকে বলপূর্বক পরের উপর চাপাইয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি ছিল না; ছিল শুধু একদেশদর্শিতা হইতে সর্বদা দূরে রাখিবার ঐকান্তিক আগ্রহ।' একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে স্বামীজি বুঝেছিলেন যে, নিবেদিতার ভিতর এই আজন্মলালিত পাশ্চাত্য ধারণাগুলি ভেঙে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, এই ধারণা ভেঙে দিতে না পারলে নিবেদিতা ভারতকে আপন করতে পারবেন না। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতেও তাঁর অসুবিধাই হবে। আর তা না হতে পারলে, যে কাজের জন্য তাঁকে ভারতে এনেছিলেন স্বামীজি—তা-ও সম্ভব হবে না। স্বামীজির ওই সময়ের সিদ্ধান্ত যে কতখানি সঠিক ছিল তা বোঝা যায়, ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতির সঙ্গে নিবেদিতার একাত্মতায়।

রমাঁ রলাঁ তাঁর 'দ্য লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সেন্ট ক্লারার সহিত সেন্ট ফ্রান্সিসের নাম যেমন জড়িত আছে, তেমনি তাঁহার দীক্ষাকালীন গৃহীত ভগিনী নিবেদিতা নামটি তাঁহার প্রিয় গুরুদেবের সহিত চিরদিন জড়িত থাকিবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, জবরদস্ত বিবেকানন্দের মধ্যে পাভেরেলোর সেই দীনতা ছিল না। কাহাকেও গ্রহণ করিবার পূর্বে বিবেকানন্দ তাঁহাকে কঠিন অন্তঃপরীক্ষার সম্মুখীন করিতেন। কিন্তু নিবেদিতার ভালোলাগা এত গভীর ছিল যে, যে রূঢ়তা একদিন তাঁহাকে পীড়িত করিয়া ভয়াবহ নৈরাজ্যরূপে দেখা গিয়েছিল, তাহার কোনও স্মৃতিই তিনি রাখেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে গুরুর মধুর স্মৃতিই কেবল বিদ্যমান ছিল। মিস ম্যাকলয়েড আমাদিগকে বলেন, "আমি নিবেদিতাকে বলিলাম, স্বামীজি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি।" নিবেদিতা উত্তরে বলিলেন, "তিনি ছিলেন মূর্তিমান স্নেহ।" কিন্তু আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "আমি কখনও তা অনুভব করিনি।" "তার কারণ, তোমার কাছে তিনি কখনও সেটা প্রকাশ করেননি।" প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি এবং যে পথে সে ঈশ্বরলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেই অনুযায়ী স্বামীজি তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন।' একথা সত্য যে, আলমোড়ায় তাঁর গুরুর কাছে থেকে ওইরকম উপেক্ষা পাওয়ার পর, সেই সময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও, নিবেদিতা পরে কিন্তু কখনোই সে সংক্রান্ত কোনো ক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা মনে পুষে রাখেননি। বরং বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতা ছিলেন বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। এবং বিবেকানন্দের প্রতি অনুরাগও তাঁর বিন্দুমাত্র কমেনি। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র বসু, ওকাকুরা বা রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে গড়ে উঠলেও বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার এই অনুরাগ, এই শ্রদ্ধা শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

তাঁর তিন বিদেশিনী অনুগামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীজি যেদিন নির্জনবাসে চলে যান—সেই দিনটি ছিল বুধবার। ফিরে আসেন শনিবার। সেদিন সেভিয়ার দম্পতির বাংলোর বাগানে বসে তিনজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগাছা করেন।

৩০ মে ১৮৯৮, সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে স্বামীজি বেরিয়ে পড়লেন হিমালয়ের বুকে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত জায়গা দেখতে। এরকম একটি জায়গা দেখার জন্য এর আগেই তিনি তাঁর বন্ধু লালা বদ্রি শাহকে চিঠি লিখে (৫ আগস্ট ১৮৯৬ এবং ২১ নভেম্বর ১৮৯৬) অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বদ্রি শাহ সেইরকম কিছু জায়গা দেখেও রেখেছিলেন। এই জায়গার খোঁজে বেরিয়ে মায়াবতীর পাহাড় পছন্দ হয় স্বামীজি এবং সেভিয়ার দম্পতির। পরে এই মায়াবতীতেই স্থাপিত হয় অদ্বৈত আশ্রম। সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে স্বামীজি মঠের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে চলে গেলেও সারা বুল, জোসেফিন এবং নিবেদিতা আলমোড়াতেই থেকে গেলেন। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন, ওই সময়টায় তিন বিদেশিনীর বই পড়ে, ছবি এঁকে এবং বাগান করে সময় কাটত।

জুন মাসের ৫ তারিখ মঠের জন্য জমি দেখা শেষ করে স্বামীজি এবং সেভিয়ার দম্পতি ফিরে এলেন আলমোড়ায়। বাইরে থাকাকালীনই গাজিপুরের সন্ন্যাসী পওহারি বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন স্বামীজি। পওহারি বাবাকে স্বামীজি সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু স্বামীজি আলমোড়ার বাইরে থাকার সময়ই তাঁর একান্ত অনুগামী, বিলেতে তাঁর সেক্রেটারি, যোশুয়া গুডউইনের প্রয়াণ হয়। গুডউইন বিলেতে স্বামীজির সেক্রেটারির কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর একান্ত অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিলেতে স্বামীজির সব বক্তৃতার নোট রাখতেন গুডউইন। গুডউইন ১৮৯৭ সালে স্বামীজির সঙ্গেই বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। গুডউইনও এদেশে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বামীজিও পুত্রবৎ স্নেহ করতেন তাঁর এই শিষ্যকে। ভারতে আসার পর দক্ষিণ ভারতে মিশনের কাজে তাঁর এই শিষ্যকে নিযুক্ত করেছিলেন স্বামীজি। স্বামীজি আলমোড়ার বাইরে থাকার সময়ই উটকামণ্ডে গুডউইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বামীজি যেদিন ফিরে আসেন আলমোড়ায়, সেভিয়ার দম্পতির বাংলোয়, সেদিন তাঁকে অবশ্য গুডউইনের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়নি। পরে এই সংবাদ শুনে বজ্রাহতের মতো স্বামীজি বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন 'He (Swamiji) looked for a long time out upon the snowcapped Himalayas without speaking and presently he said, 'My last public utterance is over.' Then he bitterly exclaimed, 'As if it would not be one's right and duty to fight such a God and slay Him for killing Goodwin! And Goodwin, if he had lived, could have done so much.'

পরে গুডউইনের আত্মার শান্তি কামনা করে নিবেদিতা একটি কবিতা লেখেন (Requiescat in Pace)। কবিতাটি স্বামীজি কিছুটা সংশোধন এবং সংযোজন করে

দেন। সেটি পরে গুডউইনের মা-র কাছে শোকবার্তা হিসাবে পাঠানো হয়। ওই কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন:

'The bonds are broke, they quest in bliss is found,
And one with that which comes as Death and Life,
Thou helpful one, unselfish e'er on earth,
Ahead, still help with love this world of strife!'

আলমোড়ায় ফিরে আসার পর স্বামীজি ঠিক করলেন, এবার কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। কাশ্মীরে যাত্রা করার একটি কারণও ছিল। কাশ্মীরে মঠ এবং মঠ-সংলগ্ন একটি শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন স্বামীজি। স্বামীজির এই পরিকল্পনার কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা চিঠিতে জানা যায়। ১৮৯৮ সালের ১৭ জুলাই শ্রীনগর থেকে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'কাশ্মীরের জমি এখনও পাওয়া যায় নাই, শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা।' এরপর ১ আগস্ট আবার ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন, 'কাশ্মীরের রাজা জমি দিতে রাজী। জমি দেখেও এসেছি। এখন দু-চার দিনের মধ্যে হয়ে যাবে প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়। এখানে একটি ছোট বাড়ি করে যাব এইবারেই। যাবার সময় leave it in the charge of Justice Mukherjee (বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে যাব)। আর তুমি না হয় এখানে এসে শীত কাটিয়ে যাও with somebody else (আর কাকেও সঙ্গে নিয়ে); শরীরও সেরে যাবে, এবং কাজও হবে।'

ঠিক হল, ১১ জুন স্বামীজি কাশ্মীরের দিকে রওনা হবেন। তাঁর সঙ্গী হবেন সেভিয়ার দম্পতি, সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতা। কিন্তু যাত্রার আগে খবর এসে পৌঁছল 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক বি আর রাজন আইয়ার প্রয়াত হয়েছেন। কাজেই, স্বামীজি প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে। ঠিক হল, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এই পত্রিকার দায়িত্ব নেবেন। এবং পত্রিকাটি আলমোড়া থেকে বেরবে। ফলে, সেভিয়ার দম্পতির আর কাশ্মীর যাওয়া হল না। পত্রিকা প্রকাশনার কাজে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে সাহায্য করার জন্য স্বামী স্বরূপানন্দও থেকে গেলেন আলমোড়ায়। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, কাশ্মীর রওনা হওয়ার আগের দিন, অর্থাৎ ১০ ই জুন, স্বামীজি সারা বুল, জোসেফিন এবং নিবেদিতাকে একটি চা চক্রে আপ্যায়িত করেছিলেন সেভিয়ার দম্পতি।

১৪ জুন স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাঞ্জাবে এসে পৌঁছলেন। পাঞ্জাব থেকে রওয়ালপিন্ডি হয়ে তাঁরা মুরিতে পৌঁছন। মুরিতে তিনদিন থাকেন স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীরা। ২০ শে জুন এসে পৌঁছন বারমুলায়। সেখান থেকে শ্রীনগর। বারমুলা থেকে হাউসবোটে তাঁরা শ্রীনগরের দিকে রওনা দেন। বারমুলা থেকে শ্রীনগরে যাওয়ার

পথে নিবেদিতা একটি চিঠি লিখেছিলেন বান্ধবী নেল হ্যামন্ডকে। সেই চিঠিতে এই যাত্রাপথের বর্ণনা জানিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'We are on our way down to Srinagar, and I have a boat to myself– for the counsel's wife has just left us to join her husband. Over there is Swami's boat, and just behind Mrs.bull and Miss Macleod's where we have been lunching (our first meal we have about 6–lunch about 12–and our last at 5 or 6). The river is like glass, and a slight breeze meets us in our leiserly progress. It is just like heaven. A few weeks hence all this will be over, and my consolation will be that I gave thanks for every moment of it while it lasted.

স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চার মাস কাশ্মীরে অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ের বর্ণনা জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতার বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়। জোসেফিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'We stayed in Kashmir four months, first three in these simple little boats until after September, when it is so cold, we took an ordinary houseboat with five places and there enjoyed the warmth of a real house... Swami would get up about half past five in the morning, and seeing him smoking and talking with the boatmen, we would go up too. Then there would be long walks for a couple of hours until the Sun came up warm; Swami talking about India, what its purpose in life was, what Mohammedanism had done and what it had not done. He talked, immersed in the history of India and in the architecture and in the habits of the people, and we walked on through fields of forget-me-nots, bursting into blue blossoms, way above our heads.

'Barmulla is something like Venice. So many of the streets are canals. We had our little private boat in which we went to and from the mainland. But the merchants would come in small crafts all about our boats. We did most of our shopping over the rails of the boat. Each of our boats cost thirty rupees a month, which included the boatmen, who fed themselves. The boatmen cosisted of father, mother, son, daughter and tiny children. They had their own little place at the end of the boat, and many a time we begged them for a taste of their food, the aroma being so delicious...As a chicken is not considered clean food by the orthodox Hindus, we never told the people we intended to eat the chickens we bought. But when we went up the river, the lower part of the boat held half a dozen clucking chickens.

The Pandits who would come to visit Swami would hear them and look around for them. Swami, who knew they were hidden underneath, had a twinkle in his eyes, but he would never give us away. Then the pandits would say, "But Swami, why do you have anything to do with these ladies? They are mlechchhas! They are untouchables." Then the Westerners [the local Europeans] would come to us and say, "But don't you see? Swami is not treating you with respect. He meets you without his turban." So we had great fun laughing at the idiosyncrasies of each other's civilization.'

কাশ্মীরে অবস্থানকালীন একটি মজার ঘটনা জানা যায় নিবেদিতার স্মৃতিচারণ থেকে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'One of the servants came to cook and said, "I want honey, but the mems [European ladies] have eaten from this jar, so I can not take it." But Swami already understood enough Kashmiri to make out the drift of the intention , and... paying them out in their own coin with some laughable story of a Jin under a tree, frightened them as much as if it had been true.'

স্বামীজির কাশ্মীর আগমনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মঠ ও একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করা। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। স্বামীজি কাশ্মীরে এসে এজন্য তিনটি স্থান নির্বাচন করেন। সারা বুল, জোসেফিন এবং নিবেদিতাও ঠিক করেছিলেন —কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজিকে জমি দান করলে, তাঁরা সেখানে তাঁবু খাটিয়ে একটি স্ত্রী মঠ স্থাপন করবেন। কিন্তু মহারাজা আগ্রহী থাকলেও ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার অ্যালবার্ট ট্যালবট দু-দুবারই ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে স্বামীজি মঠ ও এবং শিক্ষায়তন স্থাপনের জমি পাননি। এতে প্রাথমিকভাবে স্বামীজি কিছুটা বিচলিত এবং হতাশ হয়েও পড়েছিলেন। সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, নিবেদিতা এবং তৎকালীন ভারতস্থিত মার্কিন কনসালের স্ত্রী শ্রীমতী প্যাটারসন—এঁরাও চেষ্টা করেছিলেন মঠ স্থাপনের জন্য স্বামীজি যেন জমিটি পান। এ ব্যাপারে স্বামীজিকে না জানিয়েই ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে দরবার করার জন্যও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা। ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেল হ্যামন্ডকে লিখেছিলেন, 'We are camping here on a piece of ground that the Maharajah wants to give Swami for Sanskrit school well, the Missionaries have been stirring up such attacks on the king that it is very very doubtful that the Resident will consent to the disposal of the land– and it is just possible if this happens that I may go for a private interview with the Residet– without Swami's knowledge. I have at least as much right to speak for the Master to the representative of our Government as any

missionary against him. As a worker I think it would be good for the movement to be opposed officially, but as an English woman how could one bear England to do the mean thing?'

নিবেদিতার এই পত্রটি পড়লে বোঝা যায় খ্রিস্টান মিশনারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্বামীজিকে জমি দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবে, এই ঘটনা নিবেদিতাকে আর একটি বিষয় উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। তা হল— ব্রিটিশ শাসকরা এদেশীয় প্রজাদের কী চোখে দেখে। কাশ্মীরের এই ঘটনা ব্রিটিশ শাসকদের সম্পর্কে নিবেদিতাকে আরো বিরূপ, আরো বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। তবুও নিবেদিতা চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যদি কারো মাধ্যমে কোনোভাবে ব্রিটিশ সরকারের ওপর প্রভাব খাটিয়ে মঠ এবং শিক্ষায়তনের জন্য কাশ্মীরে একখণ্ড জমি স্বামীজিকে পাইয়ে দেওয়া যায়। ২সেপ্টেম্বর নেল হ্যামন্ডকে যে চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছিলেন, তাতেও তাঁর এই প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Swami has one warm friend, a fine littleman, lieutenant Governor of the states. He came last night when I happened to be alone, and he was delighted with my plan, and has promised to think it over carefully. I burn for the honour of England which suffers a moral betrayal on all sides. ... when I meet Mrs. Besant in Almorah, she told me that she had no hope of influencing the English now in India.' ফলে নিবেদিতা অনেক চেষ্টা করলেও সব চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত বিফলে গিয়েছিল। কাশ্মীরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্বামীজিকে জমি দেননি।

কাশ্মীরে অবস্থানকালেই স্বামীজি প্রায়শই তাঁর বিদেশিনী অনুরাগী এবং শিষ্যাদের সঙ্গী করে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দর্শন করতে যেতেন। ২৬ জুন তাঁরা যান ক্ষীরভবানী দর্শন করতে। নিবেদিতা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাশ্মীরে দুটি স্থান অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। একটি ক্ষীরভবানী নামক প্রস্রবণ, যেখানে জগন্মাতার পূজা হইয়া থাকে; অপরটি অমরনাথ পর্বতগুহা, তুষারময় শিবলিঙ্গ যেখানে বিরাজমান।' ওই সময়ই তাঁর দুই মার্কিন অনুরাগীকে আনন্দ দেওয়ার জন্য স্বামীজি নিবেদিতার সঙ্গে একটি পরিকল্পনা করেন। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বামীজি এবং নিবেদিতা হাউস বোটগুলি আমেরিকার পতাকা দিয়ে সাজান। সারা বুল এবং জোসেফিন এসব দেখে যথেষ্ট চমৎকৃত হন। স্বামীজি এই উপলক্ষে একটি কবিতাও লেখেন (To the Fourth of July). সেদিন প্রাতরাশের সময় সেই কবিতাটি পাঠ করা হয়। কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এইরকম:

'More on, O Lord, in thy restless path,
Till thy high noon o'erspread the world,

Till every land reflects thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken and know
In springing joy their life renewed!'

জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের জীবনীকার প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা লিখছেন, ওইদিন সন্ধ্যায় স্বামীজি লক্ষ করেন, নিবেদিতা কয়েকটি পাথর নিয়ে কিশোরীর মতো একটি খেলা খেলছেন। খেলাটি আর কিছুই নয়— একটি করে পাথর হাতে নিচ্ছেন, আর বলছেন—বিয়ে হবে কি হবে না। এটি ইউরোপীয় মেয়েদের ভিতর একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল তখন। স্বামীজি নিবেদিতাকে এই ধরনের একটি খেলা খেলতে দেখে বলেন, 'সিংহাসনে বসে নিস্পৃহ হতে জানতে হবে। অর্থ-যশ-সংসার—সব প্রলোভন ত্যাগ করতে হবে। এ ক'জন পারে?' এই ঘটনার কোনো সমর্থন অবশ্য নিবেদিতার কোনো জীবনীতে পাওয়া যায় না।

এই সময়ই সারা বুল এবং জোসেফিন কিছু ব্যক্তিগত কাজে কয়েকদিনের জন্য গুলমার্গ যান। তাঁরা ফিরে এলে, স্বামীজি সবাইকে নিয়ে ইসলামাবাদ যান। পন্দ্ধরনাথ এবং অবন্তীপুরের বিভিন্ন মন্দির দর্শন করে তাঁরা ২৪ জুলাই ভেরিনাগ ফিরে আসেন। ওই দিনই স্বামীজি নিবেদিতাকে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদে কথা বলেন। নিবেদিতার ওপর কতটা ভরসা করেন সে কথাও বলেন স্বামীজি। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন, 'July 24th. The darkness of night and the forest, a great pine fire under the trees, two or three tents standing out white in the blackness, the forms and voices of many servants at their fires in the distance, and the Master with three disciples, such is the next picture... the crown of the day came in the hours after dinner, when we were, at long last, alone, and the constant file of visitors and worshippers, with their gifts, had ceased.

'Suddenly the Master turned to one member of the party and said, "you never mention your school now, do you sometimes forget it? You see," he went on, "I have much to think of. One day I turn to Madras, and think of the work there. Another day I give all my attention to America or England or Ceylon or Calcutta. Now I am thinking about yours."

'At that moment the Master was called away to dine, and not till he came back could the confidence he had invited, be given.

'He listened to it all, the deliberate wish for a tentative plan, for smallness of beginnings, and the final inclination to turn away from the idea of inclusiveness and breadth, and to base the whole of an

educational effort on the religious life, and on the worship of Sri Ramakrishna.

'Because you must be sectarian to get the enthusiasm, must you not?' he said, 'You will make a sect in order to rise above all sects. Yes, I understand.'

'There would be obvious difficulties. The thing sounded, on the scale, almost impossible, for many reasons.But for the moment the only care need to will rightly, and if the plan was sound, ways and means would be found to hand, that was sure.

'He waited a little when he heard it all, and then he said, 'You ask me to criticise, but that I can not do, for I regard you as inspired, quite as much inspired as I am. You know that's the difference between other religions and us. Other people believe their founder was inspired, and so do we. But so am I, also, just as much so as he, and you as I, and after you, your girls and their disciples will be. So I shall help you to do what you think best.

'Then he turned to Dhira Mata (Mrs.Bull) and Jaya (Josephine), and spoke of the greatness of the trust he would leave in the hands of that disciple who should represent the interest of women, when he should go West, of how it would exceed the responsibility of work for men. And he added, turning to the worker of the party, "Yes, you have faith, but you have not the burning enthusiasm, that you need. You want to be consumed with energy. Shiva! Shiva!"– and so invoking the blessinngs of Mahadeva, he said good night and left us.'

নিবেদিতা নিজেই পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেছেন, ওইদিন স্বামীজির ওই আশীর্বাদ তাঁর কর্মে আত্মনিয়োগ করার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে দিয়েছিল। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, স্বামীজি কতটা নির্ভর করতে চাইছেন তাঁর ওপর। আর উত্তর ভারতে যাত্রা শুরুর আগেই প্লেগের ত্রাণ এবং সেবাকর্মে নিবেদিতার ভূমিকা দেখেই বুঝেছিলেন—কী বিশাল সম্ভাবনা তাঁর ভিতর লুকিয়ে রয়েছে।

সেদিনই স্বামীজি নিবেদিতাকে জানালেন, তিনি অমরনাথ যাবার পরিকল্পনা করেছেন। অমরনাথ যাত্রায় তিনি সঙ্গী করতে চান নিবেদিতাকে। স্বামীজির এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। ঠিক হল, পহেলগাঁও অবধি জোসেফিন এবং সারা বুল তাঁদের সঙ্গে যাবেন। পহেলগাঁও থেকে স্বামীজি এবং নিবেদিতা যাত্রা শুরু করবেন অমরনাথের দিকে। শ্রীমতী বুল এবং জোসেফিন পহেলগাঁওয়ে অপেক্ষা করবেন স্বামীজি ও নিবেদিতা না ফেরা পর্যন্ত।

অমরনাথ যাত্রাপথের কিছু বর্ণনা লিজেল রেমঁ-র লেখায় পাওয়া যায়। রেমঁ লিখছেন, 'বিদেশী মেয়েরা সঙ্গে থাকায় যাত্রীদের মধ্যে আপত্তির গুঞ্জন উঠেছে। কয়েকজন সাধু তো সরাসরি স্বামীজির কাছে অভিযোগই করলেন, 'মহারাজ এঁদের যাত্রীদলে স্থান দেবার ক্ষমতা আপনার আছে ঠিকই, কিন্তু সে ক্ষমতা কি প্রয়োগ করা উচিত?' আপত্তির ভাবটা হালকা করে দিতে স্বামীজি প্রথম সুযোগেই নিবেদিতাকে তাঁবুতে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা দেওয়ালেন। যাঁরা তাঁর দান গ্রহণ করলেন, তাঁদের দিয়ে আশীর্বাদ করালেন নিবেদিতাকে। স্বামীজির সামনে সবচেয়ে বিরুদ্ধবাদী যারা তারাও শান্ত হয়ে রইল। মেয়েরা কিন্তু নিবেদিতাকে কোনরকম বিদ্বেষের চোখে দেখত না। তিনিও তো তাদেরই মত শিবের পূজা করতে চলেছেন। তিনি যে তাদের 'বহিন'। এদের মধ্যে তাঁরই মত যারা পাল্কিতে চলেছে, তাদের নিবেদিতা চিনতেন। তাঁদের মধ্যে একটু সলজ্জ হাসির আদান-প্রদান হত।'

সারা বুল এবং জোসেফিনকে পহেলগাঁওয়ে রেখে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন অমরনাথের দিকে। পহেলগাঁওয়ের পরে থামলেন চন্দনওয়াড়িতে। এখান থেকে রাস্তা যথেষ্ট দুর্গম। রেমঁ লিখেছেন, বিবেকানন্দ চাইলেন এখান থেকে নিবেদিতাও পায়ে হেঁটে অমরনাথের দিকে চলুন। নিবেদিতা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অবশেষে প্রকৃত পথের শেষ হইয়া গেল এবং আমরা পাকদণ্ডী (অত্যন্ত উঁচুনীচু সরু পথ) দিয়া অতি কষ্টে খাড়া খাড়া পাহাড় চড়াই-উৎরাই করিতে লাগিলাম... আসিবার পথে স্বামীজি তীর্থযাত্রার প্রত্যেকটি বিধি নিয়ম পালন-করিয়াছেন। মালা-জপ, উপবাস এবং যাত্রার দ্বিতীয়দিনে কঙ্করময় নদীগর্ভগুলি অতিক্রমকালে পরপর পাঁচটি স্রোতস্বিনীর (পঞ্চতরণী) বরফ গলা জলে স্নান—সবই তিনি যথাবিধি করিয়াছেন। এইবারে যখন তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল মহাদেব যেন সশরীরে তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন। কোলাহল করিয়া অসংখ্য যাত্রী গুহায় প্রবেশ করিতেছে, মাথার উপর পারাবতকূল ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িতেছে। তাহারই মধ্যে স্বামীজি অপরের অলক্ষে দু-তিনবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তারপর পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এই ভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ও দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরে বলিয়াছিলেন, ঐ সংক্ষিপ্ত কয়েক মুহূর্ত তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করেন।'

স্বামীজির ইচ্ছা ছিল চন্দনওয়াড়ি থেকে বাকি যাত্রাপথটুকু নিবেদিতা পায়ে হেঁটেই চলুন। তাই যাচ্ছিলেনও নিবেদিতা। কিন্তু অসম্ভব ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়লে, শেষ পর্যন্ত স্বামীজি তাঁর জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন।

২আগস্ট স্বামীজি এবং নিবেদিতা অমরনাথ পৌছলেন। সেদিন ছিল রাখি পূর্ণিমা। স্বামীজির অমরনাথ দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন লিজেল রেমঁ। রেমঁ লিখছেন, 'অমরনাথে

জীবনের এক পরম মুহূর্ত এল বিবেকানন্দের। যাত্রীরা যাতে তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, এইভাবে চলতে লাগলেন। সমস্ত শরীর কাঁপছে। নাড়ীতন্ত্র উত্তেজনার চরমে পৌঁছেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। আবেগ বিহ্বল হয়ে অর্ধনগ্ন শরীরে সেই বিরাট গুহায় ঢুকে মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে তিনবার প্রণাম করলেন। দেবাদিদেবের কাছে একটিমাত্র নৈবেদ্য এনেছেন তিনি—নিবেদিতার জীবন। আত্মহারা আনন্দে অনুভব করলেন দেবতার সাক্ষাৎ প্রসাদ, অলখের অনির্বচনীয় প্রকাশ। ভাবাবেশে আচ্ছন্ন আড়ষ্ট দেহ-মন নিয়ে মূর্চ্ছাহতের মত টলতে টলতে বাহিরে এলেন।

'তাঁর পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নিবেদিতার কী যন্ত্রণা। এ কী কালরাত্রি তাঁর। যাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে এসেছেন—কই সে দেবতা? একে উৎকণ্ঠা, তার ওপর ওখানকার কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তাঁর সর্বশরীর যেন কে অবশ করে আনতে লাগল। গুরুর উদ্দেশে এদিক-ওদিক তাকান। কোথায় তিনি হারিয়ে গেছেন তার ঠিক নাই। দিশেহারা নিবেদিতাকে সবাই বুঝি ছেড়ে গেছে। ভিতরটা রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়তে চায়। স্বামীজির রহস্যময় হাবভাব অসহ্য মনে হয়। কেন, কেন তিনি যা পেয়েছেন তাঁর ভাগ দিলেন না তাঁকে?

'স্তব্ধ হয়ে স্বামীজিকে দেখছেন নিবেদিতা। শিবসুন্দরের দাক্ষিণ্যে ধন্য তিনি, স্খলিত কণ্ঠে জপ করছেন, 'শিব! শিব।' চোখের উপর হাত আড়াল দেওয়া, যেন প্রখর আলোয় ধাঁধা লেগেছে। দিব্যাস্বাদের অসহ্য পুলকে মন্থর চরণে চলেছেন স্বামীজি।'

নিবেদিতা তাঁর 'মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও শুভ্রতা তাঁহাকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করিয়াছিল। গুহাটি তাঁহার নিকট কৈলাসের রহস্য উদ্ঘাটন করে। কীভাবে তিনি একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন, তাহার স্মৃতি তিনি সারাজীবন হৃদয়ে পোষণ করিতেন।'

তাঁর এই অমরনাথের অভিজ্ঞতার কথা ৭ আগস্ট ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে নেল হ্যামন্ডকে লিখে জানিয়েছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'For him it was a wonderfully solemn moment. He was utterly absorbed though he was only there two minutes, and then he fled lest emotion should get the upper hand. He was utterly exhausted too–for we had a long and dangerous climb on foot– and his heart is weak. But I wish you could see his faith and courage and joy ever since. He says Siva gave him Amar (immortality) and now he can not die till he himself wishes it. I am so glad to have been there with him. That must be a memory for ever, must not it?– and he did dedicate me to Siva too–though

it's not the Hindu way to let one share in the dedication– and since he told me so I have grown Hindu in taste with alarming rapidity.

'I am so deeply and intensely glad of this revelation that he has had. But oh Nell dear– it is such terrible pain to come face to face with something which is all inwardness to someone you worship, and for yourself to be able to get little further than externals. Swami could have made it live– but he was lost.

'Even now I can searcely look back on those hours without dropping one more into their abyss of anguish and disappointment, but I know that I am wrong–for I see that I am utterly forgiven by the King and that in some strange way I am nearer to him and to GOD for the pilgrimage. But oh for the bitterness of a last chance–that can never never come again. For I was angry with him and would not listen to him when he was going to talk.

'I have a feeling dear Nell that you will have some strong, quiet piece of comfort in your brave heart– but if only I had not been a discordant note in it all for him! If I had made myself part of it, by a little patience and sympathy! And that can never be undone. The only comfort is that it was my own loss–but such a loss!

'You see I told him that if he would not put more reality into the word Master he would have to remember that we were nothing more to each other than an ordinary man and woman, and so I snubbed him and shut myself up in a hard shell.

'He was so exquisite about it. Not a big angry–only caring for little comforts for me. I suppose he thought I was tired— only he couldn't tell me about himself anymore! And the next morning as we came home he said 'Margat, I haven't the power to these things for you–I am not Ramakrishna Paramahansa.' The most perfect because the most unconscious humility you ever saw.'

এই চিঠিতে যেমন, তেমনিই পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়েও নিবেদিতা লিখেছেন—অমরনাথে পৌঁছনোর পর স্বামীজির আচরণ তাঁকে কিছুটা ক্ষুব্ধ এবং হতাশই করেছিল। নিবেদিতা ভেবেছিলেন, তাঁর গুরু যখন তাঁকে সঙ্গে করে তীর্থদর্শনে এসেছেন, তখন অনুভূতিটুকুও তিনি শিষ্যার সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। তা না করে, স্বামীজি নিজের ভাবেই তন্ময় হয়ে ছিলেন দেখে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতা। এর বর্ণনা রয়েছে রেমঁর লেখায়। রেমঁ লিখেছেন, 'গুরুকে দেখতে পেয়ে তিক্তকণ্ঠে তিরস্কার করলেন তাঁকে। বিষণ্ণ

দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন নিবেদিতার পানে। বলতে চেয়েছিলেন, 'শান্ত হও। নিজেকে উজাড় করে দিতে না জানলে আনন্দ মেলে না।'...

'কিন্তু হতাশায় নিবেদিতার মন ভরা, কোনও কথা শোনবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না।

'স্বামীজি সস্নেহে নিবেদিতার হাত ধরলেন, শান্ত বালকের মত অতি কোমল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর নিবেদিতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, ওঁকে একটু চা খাওয়ালেন। দুঃখে-অবসাদে ক্লান্ত হয়ে নিবেদিতা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওঁকে চোখে চোখে রাখলেন।

'পরদিন সকালে আবার বরফের উপর দিয়ে পথ চলা। যাত্রীর দল 'শিবমহিম্ন' স্তব গেয়ে চলেছে। ভারাক্রান্ত মনে নিবেদিতা চলেছেন যন্ত্রের মত। অস্ফুটস্বরে কেবল বলছেন, 'কেন...কেন? আমি কিছুই বুঝলাম না।' স্বামীজি এবার আর ওঁর কাছছাড়া হলেন না। একটা গভীর অনুশোচনায় ওঁরই মত কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনিও, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। দশ ঘণ্টা পথ হেঁটেছেন, তখনও জলভরা চোখে নিবেদিতা সমানে প্রশ্ন করে চলেছেন, 'কেন? কেন আমি পেলাম না কিছু?'...

'শেষে স্বামীজি বললেন,'মার্গট, তুমি যা চাইছ তা দেবার শক্তি আমার নাই। এখন কিছুই বুঝতে পারছ না। কিন্তু তীর্থকৃত্য শেষ করেছ তুমি, ওর কাজ ভিতরে-ভিতরে হবেই। কারণ ঘটলে কার্য দেখা দেবেই। পরে সব বুঝতে পারবে। এর ফল ফলবেই...'

স্বামীজির সঙ্গে অমরনাথ যাত্রা যে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত—তা পরে বারবারেই বলেছেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দের সঙ্গে অমরনাথ যাত্রা যে তাঁকে মানসিকভাবে আরো ঋজু করেছিল—তাও নিবেদিতা স্বীকার করেছেন পরে। অমরনাথ যাত্রা শেষ করে স্বামীজি এবং নিবেদিতা পহেলগাঁও ফিরে এলেন। সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এখানে আবার তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পহেলগাঁও থেকে স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শ্রীনগরে ফিরে এলেন ৮ আগস্ট।

পনেরো

অমরনাথ থেকে শ্রীনগরে ফিরে আসার পর স্বামীজি সব সময়ই এক দিব্যভাবে বিভোর থাকতেন। শ্রীনগরে স্বামীজি তাঁর হাউসবোটটি একটি নির্জন খাঁড়িতে বাঁধবার নির্দেশ দিলেন। তাঁর ইচ্ছা—এখানে নির্জনে তিনি সাধনা করবেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'ক্রমে স্বামীজির মধ্যে তন্ময় ভাব গাঢ় হইল। ক্ষোভের সহিত তিনি অভিযোগ করিলেন, চিন্তারূপ ব্যাধির দ্বারা তিনি পীড়িত—যে চিন্তা মানুষকে দগ্ধ করে, নিদ্রা বা বিশ্রামের অবসর দেয় না এবং বহু সময় ঠিক যেন মানুষের কণ্ঠস্বরের ন্যায় প্ররোচিত করিতে থাকে। তিনি সর্বদা আমাদের নিকট সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত হইবার আদর্শটি বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিতেন— যে ধারণায় হিন্দুর পাপবোধ সমস্যার সমাধান বিহিত। কিন্তু বর্তমানে মনে হইল, তিনি যেন জগতের মধ্যে যাহা কিছু ঘোররূপ, যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বোধ্য, তাহারই উপর সমগ্র মন আরোপ করিয়াছেন! ঐ পথ অবলম্বনে এই জগৎপ্রপঞ্চের পশ্চাতে অবস্থিত অদ্বয় ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প দেখা গেল। কাশ্মীর যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় ভীষণের পূজাই এখন তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। রোগ ও যন্ত্রণা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিত, 'যেখানে বেদনা অনুভূত হইতেছে, সে স্থানে তিনি, তিনিই যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাদাতা।'

'কালী! কালী! কালী!'

এই সময়ই স্বামীজি তাঁর বিখ্যাত 'Kali the Mother' কবিতাখানি লেখেন। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে এই কবিতাটি লেখার ইতিহাসও জানিয়ে গিয়েছেন নিবেদিতা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'একদিন তিনি বলেন, তাঁহার মাথায় কতকগুলি চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাকে লেখনীর সাহায্যে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাঁহার অব্যাহতি নাই। সেই সন্ধ্যায় কোন স্থানে ভ্রমণের পর বজরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, স্বামীজি অসিয়াছিলেন এবং আমাদের জন্য স্বহস্তে লিখিত 'Kali the

Mother' কবিতাটি রাখিয়া গিয়াছেন। পরে শুনিলাম, দিব্যভাবের তীব্র উন্মাদনায় কবিতাটি লেখা শেষ হইবামাত্র তিনি মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন।'

'Kali the Mother' কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা দরকার:

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring, whirlwing wind
Are the souls of a million lunatics
Just losed from the prison-house,
Wrenching trees by roots,
Sweeping all from the path.

The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky.
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of death begrimed and black–
Scattering plagues and sorrows
Dancing mad with joy,
Come, Mother, come!

For Terror is Thy name,
Death to Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world fore'er
Thou 'Time', the All-Destroyer!
Come, O Mother, come!

Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.

স্বামীজির এই মাতৃভাবে তন্ময় হয়ে থাকার কথা নিবেদিতা সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে (সম্ভবত অ্যাভেনজার কুক, যদিও পত্রের সম্ভাষণে কারও নাম পাওয়া যায় না) লিখেছেন। লিখেছেন, 'Ever since the day he wrote 'Kali the Mother',

he has been growing more and more absorbed, and at last he went off quietly without anyone knowing, from the place where he was living to a sacred spring called khir Bhowanie. There he stayed eight days, which seem almost too holy to write about. He must have had awful experiences spiritually and physically, for he came back one afternoon, with his face all radiant– talking of the Mother and saying he was going to Calcutta at once.'

'Kali the Mother' কবিতাটি লেখার কিছুদিন পরে স্বামীজি একাই ক্ষীরভবানীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি দপ্তর থেকে খবর এল, কাশ্মীরে স্বামীজিকে মঠ এবং শিক্ষায়তন করার জন্য কোনো ভাবেই জমি দেওয়া হবে না।

ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে নিবেদিতার বারবার দরবার করা, বা সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের আমেরিকান কনসালের কাছে আবেদন করা — কোনোটাই কোনো কাজে এল না। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের এই আচরণে নিবেদিতা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, একটি চিঠিতে বন্ধু অ্যাভেনজার কুককে লেখেন, 'As for the attitude of the English to the native–oh, you would blush as I do if you could see it all.'

এই ঘটনায় স্বামীজিও প্রাথমিকভাবে একটু হতাশই হয়ে পড়েছিলেন। তখনই তিনি ঠিক করেন, কয়েকদিন একা ক্ষীরভবানীতে গিয়ে কাটিয়ে আসবেন। সেই মতো ৩০ সেপ্টেম্বর ক্ষীরভবানীর দিকে তিনি যাত্রা করলেন। কেউ যেন তাঁর সঙ্গে না আসে— সে নির্দেশ দিয়ে গেলেন। এক সপ্তাহ পরে ফিরে এলেন স্বামীজি। নিবেদিতার ভাষায়, তিনি তখন এক দিব্যোন্মাদ পুরুষ। নিবেদিতা তাঁর বন্ধুকে ১৮৯৮ সনের ১৩ অক্টোবর লিখেছেন, 'He simply talks, like a child, of 'The Mother'– but his soul and his voice are those of a GOD. The mingled solemnity and exhilaration of his presence have made me retire to the farthest corner, and just worship in silence all the time. " We have seen the birth of stars, we have learnt one of the meanings."

'It has just been the nearness of one who had seen GOD, and whose eyes even now are full of the vision.

'To him at this moment 'doing good' seems horrible. 'Only the Mother' does anything. 'Patriotism is a mistake. Everything is a mistake'– he said when he came home. 'It is all Mother...All men are good. Only we can not reach all...I am never going to teach any more. Who am I, that I shd. teach anyone?'

'...Can I tell you more? The last words I heard him say were 'Swamji is dead and gone' and again 'there is bliss in torture'. He

has no harsh word for anyone. In such vastness of mood Christ was crucified.

'Again he said, he had had go through every word of his poem 'Kali the Mother' in his experience, – and yesterday he made me repeat bits of it to him.'

ক্ষীরভবানী যাওয়ার আগে কয়েকদিন স্বামীজি মাঝেমাঝেই সকলের থেকে দূরে থাকতেন। সে কথা নিবেদিতা স্বামীজি সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণে লিপিবদ্ধও করে গেছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে স্বামীজি তাঁহার নৌকা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লন। একজন তরুণ ব্রাহ্ম ডাক্তার ঐ গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনিই কেবল জানিতেন, স্বামীজি কোথায় আছেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও খোঁজ খবর লইতে পারিতেন। স্বামীজির প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রশংসার অতীত। পরদিন প্রতিদিনের মতো ডাক্তারবাবু স্বামীজির নিকট গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া আসেন।'

স্বামীজি ক্ষীরভবানী থেকে যেদিন ফিরে আসেন সেদিনের বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন নিবেদিতা। তিনি লিখেছেন, 'ঐ দিন অপরাহ্নে দেখিলাম, তিনি নৌকায় ফিরিয়া আসিতেছেন, নৌকা স্রোতের উজানে চলিতেছে। তিনি এক হাতে নৌকায় ছাদের বাঁশের খুঁটি ধরিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। অপর হাতে একছড়া গাঁদাফুলের মালা। তাঁহার আকৃতি যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বজরায় প্রবেশ করিয়া তিনি নীরবে মালাছড়াটি এক এক করিয়া সকলের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। অবশেষে মালাটি একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এটি আমি মা-কে নিবেদন করেছিলাম।' তারপর তিনি উপবেশন করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আর হরি ওঁ নয়, এবার মা-মা।'

'আমরা নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলাম। কথা বলিবার চেষ্টা করিলেও পারিলাম না। এমন কিছুতে স্থানটি এরূপ ভরপুর হইয়া গিয়াছে যে, চিন্তাস্রোতও যেন থামিয়া গিয়াছে। তিনি আবার বলিলেন, 'আমার সব স্বদেশপ্রেম ভেসে গেছে। আমার সব গেছে। এখন কেবল মা-মা।'

'ক্ষণকাল নীরবতার পর তিনি কেবল বলিলেন, 'আমার খুব অন্যায় হয়েছে। মা আমাকে বলিলেন,' যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কী? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?' সুতরাং আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছুই নেই। আমি যে ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।'

কাশ্মীরে থাকতে থাকতেই স্বামীজি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর্থিক সংকটও হয়। ওই সময় স্বামীজির

লেখা কিছু চিঠিতেই এই ঘটনার কথা জানা যায়। খেতড়ির মহারাজকে ওই সময়ে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'এখানে আমি দু-সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার কিছু টাকার টান পড়েছে। যদিও আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্যের জন্য তাঁদের সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন; কিন্তু সব সময় এই তাঁদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ হয়, বিশেষতঃ অসুখ করলে খরচের বহর অনেক বেড়ে যায়। এই জগতে শুধু একজনের কাছে আমার কিছু চাইতে লজ্জা হয় না এবং তিনি হলেন আপনি। আপনি দিলেন কি না দিলেন—আমার কাছে দুই সমান। যদি সম্ভব হয় অনুগ্রহ করে কিছু টাকা পাঠাবেন।' [১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮]

শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখেছেন, 'আমার এখানকার খরচপত্র উক্ত আমেরিকান বন্ধুরা দেন এবং করাচি পর্যন্ত ভাড়া প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতেই লইব। তবে যদি তোমার সুবিধে হয়, ৫০ টাকা টেলিগ্রাম করিয়া C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ জজ, কাশ্মীর স্টেট, শ্রীনগর— এঁর নামে পাঠাইলে অনেক উপকার হইবে। কারণ, সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে, এবং সর্বদা বিদেশী শিষ্যদের নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে লজ্জা করে।' [১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮]

ক্ষীরভবানী ঘুরে আসার পরই স্বামীজি কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যে কাজের জন্য তিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন তা না হওয়ায় আর তাঁর কাশ্মীরে থাকার ইচ্ছা ছিল না। তাছাড়া, চার মাস মঠের বাইরে রয়েছেন। অতএব, মঠে ফেরার একটা তাগিদও তাঁর ভিতর ছিল। ইতিমধ্যে, স্বামীজির আহ্বানে স্বামী সারদানন্দও কাশ্মীরে চলে এসেছিলেন। ঠিক হল, স্বামীজি কাশ্মীর থেকে সরাসরি চলে যাবেন কলকাতায়। সারা বুল, জোসেফিন এবং নিবেদিতা সারদানন্দের সঙ্গে লাহোর, দিল্লি, আগ্রা এবং অন্যান্য কয়েকটি জায়গা ঘুরে কয়েকদিন পরে কলকাতা পৌঁছবেন। সেই মতো স্বামীজি একটু আগে রওয়ানা হয়ে কলকাতা পৌঁছলেন ১৮ অক্টোবর।

তবে, কাশ্মীরে থাকার সময়েই নিবেদিতা পরিকল্পনা করেছিলেন কীভাবে কলকাতায় মেয়েদের স্কুল চালু করা যায়। স্কুল চালু করার ব্যাপারে নিবেদিতা আর কোনো কালক্ষেপ করতে চাইছিলেন না। বিশেষ করে, স্বামীজি স্বয়ং তাঁকে কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর নিবেদিতা যে স্কুল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন, তা জানা যায় নেল হ্যামন্ডকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'When I reach Calcutta I am to stay with Sarada– till I find a house. The latter must be modest –for I have just 800 rupees to carry the school through the first year (£ 53.6.8–my dower we say). I want to take the children at 1 rupee a month– but at that rate I should want 100 – I see to renew the income – and that would not support the larger. home which

100 pupils would require. So at the end of the first six months I shall probably be in a position to write a report for publiction by Mr. Sturdy to be circulated in England and India and through that I shall hope to put the thing on the basis of subscription.'

সময় নষ্ট করতে চাইছিলেন না বলেই নিবেদিতা জোসেফিন এবং সারা বুলের সঙ্গে বেশিদিন ঘোরেননি। বারাণসী থেকে তিনি একাই ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। সে তারিখটা ছিল ১ নভেম্বর, ১৮৯৮।

নিবেদিতা লিখেছেন, 'প্রথম হইতেই স্থির ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব সুবিধামত, আমি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দিব। স্বামীজীর কার্যপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কার্য আরম্ভ করিবার জন্য কোনোরূপ তাড়া না দিয়া ভ্রমণ এবং মানসিক প্রস্তুতির জন্য তিনি আমাকে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিলেন। আমি বেশ জানিতাম, বিদ্যালয়টি খোলা হইলে উহা প্রথমে সাময়িক ও পরীক্ষামূলক হইবে।...যেহেতু আমার কোনো ইচ্ছাতে তিনি (স্বামীজী) কখনও বাধা দিতেন না, এখানেও তাহাই হইল। অতঃপর তিনি যেন আমার শিষ্য এবং আমি তাঁহার শিক্ষক হইলাম। কেবল একটি বিষয়ে তিনি দৃঢ় রহিলেন। ভারতীয় নারীগণের যে শিক্ষাকার্যে তাঁহার নাম জড়িত থাকিবে, আমি ইচ্ছামত তাহা সাম্প্রদায়িক করিতে পারি—আমার উক্তির এই অংশের বাহিরে তিনি কেবল বলিলেন, 'একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তুমি সকল সম্প্রদায়ের বাহিরে যেতে চাও।' একজন মহিলা আমার কার্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করিবামাত্র তিনি সে নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে যে অল্প কয়েকজনের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহাদের সহায়তা লইবার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই সমর্থন করিলেন না। ভারতীয় চরিত্রের সমুদ্রতুল্য গভীরতা মাপ করিবার কোনও যন্ত্র তখনও পর্যন্ত আমার নিকট ছিল না। সুতরাং প্রথম হইতে ভুল করা অপেক্ষা কাহারও সাহায্য না লইয়া অগ্রসর হওয়া তাঁহার মতে শতগুণ নিরাপদ।'

বারাণসী থেকে নিবেদিতা যখন কলকাতায় এসে পৌছলেন, তখন স্বামীজি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করছেন। স্টেশন থেকে নিবেদিতা সোজা গিয়ে উঠলেন সেখানে। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা জানিয়েছেন, তিনি বাগবাজারে সারদা দেবীর বাড়িতেই থাকার জেদ ধরেন। কিন্তু সারদা দেবীর বাড়িতে অন্য যে হিন্দু মহিলারা থাকতেন— তাঁরা এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। হিন্দু বাড়িতে একজন ইউরোপীয় মহিলা থাকবেন— এ তাঁদের একেবারেই পছন্দের ছিল না। গোপালের-মাও এ নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান। অবশেষে অনেক চেষ্টা করে স্বামীজির মধ্যস্থতায় ওই বাড়ির একটি ঘর খালি করা হয়। ঠিক হয় নিবেদিতা ওখানেই থাকবেন। সারদা দেবীর বাড়িতে আট-দশদিন কাটিয়েছিলেন নিবেদিতা। সেই বাড়ির স্মৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইলাম, তাহা এক অদ্ভুত ধরনের। একতলায় প্রবেশ পথে দুই দিকে দুটি ঘর ছিল। একটি ঘরে এক সাধু (স্বামী যোগানন্দ) বাস করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কঠিন তপস্যার ফলে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পূর্ণ যৌবনেই তিনি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত। বাংলা শিখিবার জন্য আমি তাঁহার ঘরে যাইতাম। পিছনের রন্ধন কক্ষে তাঁহার এক শিষ্য এবং এক ব্রাহ্মণ কাজকর্ম করিতেন। ছাদ ও বারান্দা সমেত সমস্ত উপরতলা আমাদের—মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অদূরেই গঙ্গা— উপরতলা হইতে গঙ্গাদর্শন হইত।'

'...শ্রীশ্রীমা পড়িতে জানেন এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় রামায়ণ পাঠে অতিবাহিত হয়। তিনি লিখিতে পারেন না। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন তিনি অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি শুধু সংসার পরিচালনা এবং ধর্মজগৎ সম্পর্কে কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা নহে; ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সমস্ত প্রধান তীর্থগুলি দর্শন করিয়াছেন।...শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরানির গৃহে এই সময় প্রায় সর্বদা যে সকল মহিলা বাস করিতেন— গোপালের মা, যোগিন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা সকলেই বিধবা, গোপালের মা এবং লক্ষ্মীদিদি আবার বালবিধবা ছিলেন; ইঁহারা সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা— যে সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে বাস করিতেন—সেই সময়ের। লক্ষ্মাদিদি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতই তিনি বিশেষ গুণসম্পন্না, এবং কথাবার্তার দ্বারা অপরকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কখনও তিনি কোন যাত্রার পালা হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধর্মভাবপূর্ণ কথোপকথন আবৃত্তি করেন, কখনও বা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নকল করিয়া নীরব কক্ষ হাস্য মুখরিত করিয়া তোলেন। একবার হয়তো কালীমূর্তি ধারণ করিলেন, পরক্ষণেই সরস্বতীর মূর্তি, কখনও বা জগদ্ধাত্রী, আবার হয়তো বা কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি —এবং নাটকীয় উপাদানের স্বল্পতা সত্ত্বেও ঐ সকলের দ্বারা বেশ আসর জমাইয়া তুলিতেন।'

'...শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরে পূজায় বসিতেন। অল্পবয়স্কা মেয়েরা দীপ জ্বালা, ধূপধুনা দেওয়া, গঙ্গাজল আনা, এবং পুষ্প, নৈবেদ্য সাজানো প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এমনকি, গোপালের মা পর্যন্ত এই সময় ফলমূল ও তরকারি কাটিয়া সাহায্য করিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অপরাহ্নে বিশ্রাম। তারপর সন্ধ্যা হইবামাত্র ঝি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গল্পগুজব থামিয়া যাইত। সকলেই উঠিয়া পড়িতেন, এবং দেবমূর্তি অথবা পটের সামনে প্রণাম করিয়া গোপালের মা ও শ্রীশ্রীমা-র পাদবন্দনা করিতেন। অথবা ছাদে যেখানে তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া

হইয়াছে, সেখানে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে যাইতেন। আর যিনি কন্যার ন্যায় শ্রীশ্রীমার সন্ধ্যাধ্যানকালে পার্শ্বে বসিবার অনুমতি লাভ করিয়া তাঁহার গুরুপ্রণাম শ্রবণ করিতেন, তিনি সত্যিই পরম ভাগ্যবতী। শ্রীশ্রীমার প্রতি পূজার প্রথমে ও অন্তে এই গুরু প্রণাম থাকিত।

'....আমাকেও তিনি মধুর সঙ্গীত গাহিতে শিখিয়াছিলেন; সত্য বটে, ক্ষীণ ও বন্দিতকণ্ঠে—তথাপি এই মহান সঙ্গীতের অপরাপর গায়কগণের সহিত কতকটা একসুরে। গহিতে গাহিতে ঐ সঙ্গীতের সঙ্গে আমি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিতে শিখিলাম, কেমন করিয়া একটি জাতির আদর্শ ও রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।'

নিবেদিতার এই বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায়—একেবারে আটপৌরে একটি হিন্দু বাড়ির মতোই ছিল সারদা দেবীর বাগবাজারের বাসস্থানটি। নিবেদিতার এই বাড়িতে থাকার ব্যাপারে প্রথমদিকে গোপালের মা এবং অন্য মহিলাদের আপত্তি থাকলেও, পরে অবশ্য সারদা দেবীর প্রচেষ্টাতেই তা দূর হয়ে যায়। বলা ভালো, সারদা দেবী নিবেদিতাকে কাছে টেনে নিয়েই সবার সব আপত্তি ঘুচিয়ে দেন। তবে, নিবেদিতা পরে স্বীকার করেছেন— তাঁর এভাবে বাগবাজারের বাড়িতে থাকায় সারদা দেবী এবং তাঁর সঙ্গিনী ওই বাড়ির মাহিলাদের তৎকালীন হিন্দু সমাজে নানারকম অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'This is one of the occasions on which people look back, feeling that their courage was providentially determined by their ignorance. It is difficult to see how else a necessary solution could have been found. Yet had I deeply understood, at the time, the degree of social embarassment which my rashness might have brought, not only upon my innocent hostess, but also on her kindred in their distant village, I could not have acted as I did.'

সারদা দেবীর বাড়িতে আট-দশদিনের মতো ছিলেন নিবেদিতা। এরই মধ্যে এই বাড়ির কাছেই বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার জন্য একটি পৃথক বাসস্থান দেখা হল। বাড়ির ঠিকানা: ১৬ বোসপাড়া লেন। তবে, ওই আট-দশদিন সারদা দেবীর বাড়িতে অবস্থানের সময়েই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার একটি অটুট আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতা চলে যাওয়ার পরও সারদা দেবীর নির্দেশে গ্রীষ্মকালে তাঁর বাড়িতে এসে নিবেদিতাকে বিশ্রাম নিতে হত। কারণ, ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িটি ছিল অত্যন্ত গরম। সারদা দেবী বুঝতে পেরেছিলেন, গ্রীষ্মকালে ওই বাড়িটিতে থাকতে নিবেদিতার যথেষ্ট কষ্ট হবে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'আট-দশদিনের মধ্যেই অতি নিকটে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি প্রতি অপরাহ্ন শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরানীর ঘরেই কাটাইতাম। গ্রীষ্মকাল

আসিলে তাঁহার বিশেষ আদেশে বিশ্রামের জন্য তাঁহার গৃহেই আসিতাম। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা ছিল। আমার জন্য পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল না, অপর সকলের সহিত শীতল ও সাদাসিধা ঘরটিতেই শয়ন করিতাম। পালিশ করা লাল মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তাহর উপর এক একটি বালিশ ও মশারি।' নিবেদিতার লেখার এই অংশটি পড়লেই বোঝা যায়, কীভাবে ধীরে ধীরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিবেদিতার দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন সারদাদেবী।

১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে যে বাড়িটি নিবেদিতার বসবাসের জন্য ঠিক হল, সেটি একেবারেই সাদামাটা বাড়ি। স্বয়ং স্বামীজি কথাবার্তা বলে বাড়িটি ঠিক করলেন। গোপালের মা-র সঙ্গে নিবেদিতাও গিয়ে দেখে এলেন সেই বাড়ি। এই বাড়িটি সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমার বাসাটি আমার চোখে —চমৎকার! সেকেলে ধাঁচের হিন্দু বাড়ি যেমন হয়, এ বাড়িটি তারই একটি বেয়াড়া নমুনা। বাড়ির মধ্যে মস্ত উঠান— দিনে ঠাণ্ডা, রাত্রে দিব্যি হাওয়া খেলে। দোতলায় বেশি ঘর নাই। ছাদ নেমে এসেছে পাঁচ থাকে— বড় মজার দেখতে। আর অমন একখানা আঙিনা। এ বাড়ি পছন্দ না করবে কে? সন্ধ্যায় সকালে জোছনারাত্রে মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে আমি একেবারে একা। গলিটা পরিষ্কার আছে, আর আপন খুশিতে এঁকে বেঁকে গেছে, এখানে -ওখানে কেবল মোড় ভেঙেছে, বাঁক নিয়েছে। ছোট্ট এক চৌমাথার মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, সেখান দিয়ে চলা শক্ত। আশেপাশে বাড়িগুলো ঠেসাঠেসি হয়ে মাথা তুলেছে, নীচু খড়ের চালা ঢালু হয়ে এসেছে রাস্তার 'পরে। সকালের আলোয় ছোট ছোট বাচ্চারা খুশির হাসি হাসছে, রোদে মেলে দেওয়া সদ্য-ধোওয়া কাপড় উড়ছে পতপত করে, দু-একটা গরু চরে বেড়াচ্ছে। গরমের দিনে গলিটা যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, দেওয়ালগুলো তেতে আগুন হয়ে ওঠে। চুনবালি থেকে যে-ভাপ উঠছে, অস্ত-সূর্যের রক্ত-রশ্মিতে তা শুষে যাচ্ছে। টিকটিকিরা বাসা বাঁধছে মহানন্দে।'

বোসপাড়া লেনের এই বাড়িটিকে ঘিরে নিবেদিতার যে আবেগ—তাও ধরা পড়েছে তাঁর এই লেখায়। রেমঁ লিখেছেন, সাদামাটা এই বাড়িটায় পড়ার ঘর সাজানো হল সাদা কাঠের দুটি প্রকাণ্ড টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা টুল দিয়ে। দেওয়ালের গায়ে একটা তাক। সেখানে শাস্ত্রগ্রন্থের পাশাপাশি নিবেদিতা সাজিয়ে রাখলেন বাইবেল, বাওডেনের বুদ্ধচর্চা, রেনাঁর রচনাসংগ্রহ, এমার্সন, সেন্ট লুই, পেরিক্লিস এবং সালাদিনের জীবনী। দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে নিবেদিতার হাতির দাঁতের ক্রস আর একটি মাত্র ছবি। ফুলের অর্ঘ্য নিয়ে বিবশা মেরি এলিয়ে পড়েছেন দেবদূতের বার্তা শুনে।

বাড়ি পাওয়া গেলেও, পরিচারিকা পাওয়া কিন্তু সহজ হল না। একজন ইউরোপীয় মহিলার বাড়িতে কোনো হিন্দু পরিচারিকা কাজ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে

অনেক কষ্টে একজন পরিচারিকা জুটল। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা পরে লিখেছেন, 'অবশেষে একজন পরিচারিকা পাওয়া গেল। স্ত্রীলোকটি বেশ বৃদ্ধা। সে আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত, আর আমার বয়স তাহার অর্ধেক হইলেও আমি তাহকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিতাম, অর্থাৎ সে আমার 'মেয়ে' ('ঝি' শব্দটি কন্যা অর্থে ব্যবহার করেছেন নিবেদিতা। শব্দটির প্রকৃত অর্থও তাই)।' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতার এই সকল কাজ করিবার জন্য ঝি-এর একটি শর্ত ছিল। শর্তটি এই যে, নিবেদিতা কখনও তাহার রন্ধনকক্ষে প্রবেশ করিবেন না, অথবা তাহার উনুন ও জল স্পর্শ করিবেন না'

এখানে একটি বিষয়ে লক্ষণীয়। নিবেদিতা এই দেশীয় সমাজের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা চালালেও, তখনও পর্যন্ত প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দু সমাজের কছে তিনি গ্রহণীয় হননি। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজ তখনও কী চোখে দেখত নিবেদিতার মতো একজন ইয়োরোপীয় মহিলাকে, তার আভাস পাওয়া যায় প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখার একটি ঘটনায়। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতা একদিন অপরাহ্নে নিজের বাড়িতে চা-এর ব্যবস্থা করিলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা 'কন্যা' অর্থাৎ ঝি বারান্দায় আসিয়া বসিল, কী অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য। নিবেদিতা চা ঢালিয়া লইয়া পাত্রটি তাহার দিকে আগাইয়া ধরিয়া আরও গরম জল চাহিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, তখন ঝি একটা গভীর অসন্তোষসূচক শব্দের সহিত ভিতরের উঠানে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার আপাদমস্তক ভিজা। নিবেদিতার চায়ের পাত্রটি স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহার স্নান করিবার প্রয়োজন ছিল বৈকি। অবশ্য পরে নিবেদিতার স্পৃষ্ট পাত্রগুলি ঝি ধুইয়া দিত; কিন্তু অন্য মেমসাহেব আসিলে এসব কাজ তাঁহাকেই করিতে হইত।' নিবেদিতার লেখাতেও এই ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

শুধু যে এই নিরক্ষর পরিচারিকা এইরকম ছুঁৎমার্গে আক্রান্ত ছিলেন তা নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিতরও এই মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। এমনকী, এই মানসিকতা বিদ্যমান ছিল স্বামীজির অনেক শিষ্য এবং গুরুভ্রাতাদের মধ্যেও। এই গোঁড়ামিকে স্বামীজি প্রথম থেকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন। স্বামীজি বুঝেছিলেন— এই গোঁড়ামি দূর করে নিবেদিতাকে যদি হিন্দুসমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা না যায়, তাহলে তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। নিবেদিতা মিশনেরও একান্ত আপনার জন হয়ে উঠতে পারবেন না। সে কারণেই, নিবেদিতা এদেশে আসার পর স্বামীজি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর গুরুভাই ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিবেদিতার একত্র আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও নানাভাবে স্বামীজি এই দূরত্ব ঘোচাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নিবেদিতার বাড়িতে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত জনদের চা-পানের আমন্ত্রণ

জানাতেন। তবুও, সবাই যে তাঁদের ছুঁৎমার্গ ছাড়তে পেরেছিলেন এমন নয়। এক্ষেত্রে একটি ঘটনার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামীজি একদিন স্বামী যোগানন্দ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামীজির শিষ্য, 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থের প্রণেতা) এবং নিবেদিতাকে নিয়ে বেলুড়ে পশুশালা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। পশুশালা পরিদর্শনের পর কর্মাধ্যক্ষ তাঁদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন নিষ্ঠাবান গোঁড়া ব্রাহ্মণ। নিবেদিতার সঙ্গে এক টেবিলে বসে জলপানে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। স্বামীজি বারবার অনুরোধ করে শরচ্চন্দ্রকে একটু মিষ্টি খাওয়ালেন। কিন্তু জলপানে প্রবল আপত্তি ছিল শরচ্চন্দ্রের। অবশেষে স্বামীজি নিজে একটু জলপান করে তা শরচ্চন্দ্রকে পান করতে বলেন। পরে, স্বামীজি ওই দিন সন্ধ্যায় সবাইকে ঠাট্টা করে বলেন 'আর এক কথা শুনেছেন? আজ এই ভট্‌চাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত যায় আসে না, কিন্তু তাঁর ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?' শুধু তা-ই নয়, তাঁর পরিচিত জনদের তামাক সেজে দেওয়ার জন্যও নিবেদিতাকে বলতেন স্বামীজি।

নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর গুরুভ্রাতা এবং ভক্ত শিষ্যদের দূরত্ব ঘোচাতে স্বামীজিকে আরও নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায়, স্বামীজি অসুস্থ থাকাকালীন একবার নিবেদিতাকে পথ্য তৈরি করে পাঠাতে বলেন। নিবেদিতা তা পাঠিয়েছিলেন। স্বামীজি সেই পথ্য নিজে সবটুকু না খেয়ে তাঁর গুরুভ্রাতা এবং ভক্তশিষ্যদের মধ্যেও ভাগ করে দিয়েছিলেন। এতে প্রথমে নিবেদিতা একটু অভিমানী ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য স্বামীজির উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেয়েছিলেন। স্বামীজি মাঝেমধ্যেই নিবেদিতাকে দিয়ে নানারকম রান্না করিয়ে অন্যকে খাওয়াতেন। বেলুড় মঠে প্রায়ই নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানাতেন স্বামীজি। তখন, নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আহার করতেন। এভাবেই ছুঁৎমার্গের বেড়াটা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি। পরে নিবেদিতাও লিখেছেন, 'কী গভীর চিন্তা ও অনুকম্পার সহিত তিনি (বিবেকানন্দ) এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া স্বয়ং শ্রীমাও সর্বদা আমাকে হিন্দু সমাজে (আমি তো একজন বিদেশী) আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা অনুধাবন করিতে আমার অনেক মাস লাগিয়াছিল।'

নিবেদিতা তাঁর স্কুলের কাজে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন মহিলার সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী লেডি অবলা বসু। নিবেদিতার মনে হয়েছিল—স্ত্রীশিক্ষার কাজে ব্রাহ্মসমাজের এই আলোকপ্রাপ্ত মহিলারা, বিশেষ করে অবলা বসু, তাঁর বিশেষ সহায় হতে পারবেন। কিন্তু নিবেদিতার এই প্রস্তাব স্বামীজি নাকচ করে দেন। স্বামীজি প্রথমাবধিই চাইছিলেন না ব্রাহ্মসমাজের সহায়তায় নিবেদিতা কাজ শুরু করুন। কারণ, স্বামীজি জানতেন তা করতে গেলে

সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বেই। স্বামীজির আপত্তির ফলে নিবেদিতাও আর এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

নিবেদিতা বাগবাজারে নিজের বাড়িতে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন স্বামীজি। এ উপলক্ষে ১২ নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে মিশনের একটি সাধারণ সভা ডাকা হল। ওইদিনই সকালে মঠের জমিতে সারদা দেবী স্বহস্তে ঠাকুরের পুজো করেন; পরে, বিকেলে স্বামীজি স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসেন স্কুল প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ ঠিক করতে মিশনের ডাকা সভায়। কলকাতার কোথায় এই সভাটি হয়েছিল তা জানা যায় না; তবে আন্দাজ করা যায় সভাটি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতেই হয়েছিল; কেননা, সেই সময় মিশনের সব সভাই বলরাম বসুর বাড়িতে হত। সেরকম ইঙ্গিতই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাতে জানা যাচ্ছে। 'উদ্বোধন'-এ লেখা হয়েছে, 'একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে সব গৃহভক্তদের একটি সভা গোছের, ঘরোয়া জলসা হলঘরে হলো। যাতে গৃহস্থেরা মেয়ে দেন ঐ স্কুলে,—এই আবেদন। সকলে বসে আছেন। এমন সময়ে অতর্কিতভাবে স্বামীজি সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। মাষ্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামীজি কয়েকজনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন,"ওঠ্, ওঠ্। ওঠ্ না। শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতীয়ভাবে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকে করতে হবে। উঠে বল্; আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল্—হ্যাঁ। আমরা রাজী আছি। আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।" কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজি হরমোহনবাবুকে জিদ করে চাপা গলায় বললেন—তোকে দিতেই হবে। তাঁর হয়ে স্বামীজি নিজে তখন বললেন,—Well, Miss Noble, this gentleman offers his girl to you. নিবেদিতা প্রথম দেখতে পাননি যে ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামীজী আছেন। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা খুব বেশী রকমের খুশী হলেন। হাততালি দিতে লাগলেন। এবং শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন। ঠিক যেন একটি ছোট বালিকা।'

উদ্বোধনের এই লেখাটির ভিতর দিয়েও একটি বিষয় যেন পরিষ্কার বোঝা যায়। নিবেদিতার স্কুলে কন্যা সন্তানকে পড়তে পাঠানোর বিষয়েও হিন্দু সমাজে দ্বিধা ছিল। এমনকী সে দ্বিধায় ভুগেছিলেন স্বামীজির ঘনিষ্ঠজনেরাও। সে দ্বিধা দূর করতে ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীজিকে জোর খাটাতেও হয়েছিল।

এই সভার পরদিন ১৩ নভেম্বর ছিল কালীপূজা। ওই দিন ১৬ বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে মেয়েদের স্কুলের পত্তন হল। সারদা দেবী বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে এসে পুজো করে স্কুলের পত্তন করলেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামীজি,

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং সারদা দেবীর কয়েকজন মহিলা ভক্ত। পুজোর শেষে সকলের উদ্দেশে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন সারদা দেবী। গোলাপ মা তা উচ্চস্বরে বলে সবাইকে শোনালেন। পরে নিবেদিতা ওই দিনটির কথা স্মরণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'I can not imagine a grander omen than her blessing, spoken over the educated Hindu womenhood of the future,'

এর পরদিন ১৪ নভেম্বর পাকাপাকিভাবে স্কুল শুরু হয়। আশপাশের বাড়ি থেকে কয়েকটি ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হল নিবেদিতার স্কুল। স্বামীজির প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁরাই প্রথমদিকে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতার পরিচারিকা গিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসত।

বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সব কাজে সহায়তা করার জন্য স্বামীজি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন শিষ্য স্বামী সদানন্দকে নিযুক্ত করেন। তখন থেকেই সদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার গভীর সখ্য গড়ে ওঠে, যা নিবেদিতার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অটুট ছিল। ১৮৯৯ -এর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি, স্কুল চালু হওয়ার কিছুদিন পর, সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড কলকাতা ফিরে এলেন। কলকাতায় ফিরে কিছুদিন তাঁরা বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ই সারদা দেবীর সেই অতি পরিচিত ফটোগ্রাফটি তোলানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ছবিটি তোলা হয়েছিল সারা বুলের উৎসাহে। সারা বুল বায়না করেছিলেন— সারদা দেবীর একটি ছবি তিনি আমেরিকায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু ছবি তোলার ব্যাপারে সারদা দেবীর বিশেষ আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা সারদা দেবীকে রাজি করান। নিবেদিতাই উদ্যোগ নিয়ে একজন সাহেব ফটোগ্রাফারকে নিয়ে আসেন সারদা দেবীর ছবি তুলতে। ওই ফটোগ্রাফার তিনটি ছবি তুলেছিলেন সারদা দেবীর। প্রথম ছবিটা তোলার সময় সারদা দেবী দৃষ্টি নত করেছিলেন। দ্বিতীয় ছবিটি তোলার সময় সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসেছিলেন। আর তৃতীয় ছবিটি সারদা দেবী এবং নিবেদিতা মুখোমুখি বসে তুলেছিলেন। এইগুলিই সারদা দেবীর প্রথম ফটোগ্রাফ।

বাগবাজার অঞ্চলের সাধারণ হিন্দু অধিবাসীদের ভিতর প্রথম দিকে নিবেদিতা সম্পর্কে ছুঁৎমার্গ থাকলেও, ক্রমে ক্রমে তা দূর হয়ে গিয়েছিল নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের জন্য। বাগবাজার অঞ্চলের পল্লীবাসীরাও নিবেদিতাকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। ১৮৯৮ সালে প্লেগের সময় নিবেদিতা যেভাবে ত্রাণ এবং সেবাকার্য চালিয়েছিলেন, তা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ওই এলাকার তরুণরা। পরের বছর, ১৮৯৯-এও দ্বিতীয়বার শহরে প্লেগের প্রকোপের সময় নিবেদিতার সেবাকার্য মুগ্ধ করেছিল বাগবাজারের পল্লীবাসীদের। এই সেবাকার্যই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের যাবতীয় দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিল। এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবেদিতা কীভাবে

একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তা জানা যায় তাঁর লেখা থেকেই। বাগবাজারের বাড়িতে এক রাতে তিনি যখন রাতের খাবার তৈরি করছিলেন, তখন এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কান্নার রোল শুনে নিবেদিতা ছুটে যান। দেখেন, প্রতিবেশীর শিশু কন্যাটি তখন মৃত্যুপথযাত্রী। এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে ওই বছর জুলাই মাসে এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I was able to talk to them a little in my broken way you know – and it was full of comfort. I know what a comfort it was to me to feel just one with them at such a moment, no bar and no difference in ideals or faith or anywhere. They wanted just the same assurances that we all want about such things–that the girl was at peace in the love of the mother– all gladness and all rest and so on– and then I sang the names of Kali and Sri Ramakrishna softly for an hour or more. I noticed that his name was even closer than Kali's. Of course we had spells of crying, but I know it was worthwhile. I just told a little of my feeling to Swami next morning,– and my gratitude that I could talk their language, and of the proof it had been to me of the truth of what I had been preaching. And he said "That was wh. Ramakrishna Paramhansa came into the world to teach–and He was the only man who ever did–that we were to talk to everybody in his own language.'

নিবেদিতা লিখেছেন, 'Filled with a sudden pity, not so much for the bereaved woman as for those to whom the use of some particular language of the Infinite is a question of morality, I leaved forward. 'Hush mother', I said. 'Your child is with the Great Mother. She is with Kali.' And then, for a moment, with memory stilled, we were enfolded together, Eastern and Western, in the unfathomed depths of consolation of the World-Heart.'

নিবেদিতা কিছু ভুল লেখেননি। এভাবে আর্তের সেবার মধ্য দিয়েই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নিবেদিতাও তাঁর ছাত্রীদের পুঁথিগত শিক্ষার ওপরই যে শুধু জোর দিয়েছিলেন তা কিন্তু নয়; বরং তাদের প্রতিভার যথাযথ স্ফূরণ ঘটানোর জন্য পুঁথির পড়ার পাশাপাশি অন্য সব বিষয়েও তাদের আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে যে নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তিনি, তাকেই এ দেশের মতো করে প্রচলন করার চেষ্টা বাগবাজারে মেয়েদের স্কুলে করেছিলেন। এ কাজে তাঁর ছাত্রীদের কাছ থেকেও যে সাড়া তিনি পেয়েছিলেন, তা-ও নিবেদিতার লেখা থেকেই জানা যায়। ১৮৯৯ সালের ৩১ মে সারা বুলকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I find children here have as

much artistic power as any I ever saw, their brushwork is wonderfully good considering their chances and their colour is excellent. And how they love sewing and manual occupation, you just can not imagine.'

১৮৯৮ সালে কাশ্মীর ভ্রমণকালেই স্বামীজি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধিও পায়। নিবেদিতার স্কুলের কাজকর্ম শুরু হওয়ার পর স্বামীজি বিশ্রামের জন্য ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বৈদ্যনাথধামে যান। ফিরে আসেন জানুয়ারির শেষে। ১৮৯৯-এর ২ জানুয়ারি মঠ নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ি থেকে বেলুড়ে নবনির্মিত বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

নিবেদিতার স্কুল কেমন ভাবে চলত, তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় লিজেল রেমঁর লেখায়। রেমঁর লেখা অনুসরণ করে জানা যায় নিবেদিতার প্রথম সহকর্মিণী হল সন্তোষিণী নামে একটি মেয়ে। মেয়েটি অন্যদের থেকে বয়সে একটু বড়। সন্তোষিণী ছিল গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়ে। তার বাবা বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে শুরু করলে সন্তোষিণী জানিয়ে দিয়েছিল—সে বিয়ে করবে না; চিরকুমারী থেকে নিবেদিতার কাজে সহায়তা করবে। স্বামী সদানন্দ প্রস্তাব দিয়েছিলেন— সন্তোষিণীকেও মিশনের একজন করে নেওয়া হোক। প্রথমে সন্তোষিণী তাতে আপত্তি জানালেও পরে সম্মতি দিয়েছিল। ফলে, নিবেদিতার বাড়িতেই জায়গা হয়ে গেল সন্তোষিণীর। ছোট ছোট মেয়েদের দেখাশোনার ভার সন্তোষিণীই নিয়েছিল।

সারদা দেবীও স্কুলটির বিষয়ে নিয়মিত খবরাখবর নিতেন। ছাত্রী বা তাদের মায়েদের নিয়ে কোনোরকম গোলমাল বাধলে তিনি মিটিয়ে দিতেন। এইসব ছোটখাটো গোলমাল সামলাতে স্বামী সদানন্দও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন নিবেদিতাকে। সে কথা নিবেদিতা নিজেও স্বীকার করেছেন। ১৮৯৯ সালের ১৫ মে সারা বুলকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Sadananda with endless sweetness and dignity and a patience that I can but envy, has tonight brought Santoshini here to sleep. By tomorrow morning I trust my first boarder will thus be fully installed, and then ice really broken. All this last month she has eaten bread and milk with me at midday–and I have been enable by Mr. Mohini's generosity to pay her mother to provide her two principal meals at home–but sleeping here seemed impossible. It is only to be only 3 nights a week to begin with.

'Endless concessions have to be made— and if it were not for Sadananda who is the greatest strength in this matter, I should lose all by some sudden fit of inlflexibility in the wrong place.'

ওই বছরই রামকৃষ্ণ পরমহংসের তিথিপূজার দিন সারদা দেবী নিবেদিতার বোসপাড়ার বাড়িতে এসে পরমহংসের ছবিতে বিশেষ পুজো করেন। নিবেদিতা এবং

তাঁর তিরিশজন ছাত্রীকে প্রসাদ বিতরণ করেন সারদা দেবী। সেদিনই বিকেলে সাতটি ঘোড়ার গাড়িতে সারদা দেবী ও তাঁর সঙ্গিনীরা, নিবেদিতা এবং স্কুলের তিরিশজন ছাত্রী এক রামকৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী বুলকে লেখা চিঠিতে তা-ও উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা, 'It was Sri R.k's [Rama Krishna's] real birthday on Monday last, and the mother came and made a special puja before His image in the prayer room. And then her ladies made the fruits ready, and 30 children and myself sat there and ate the Prasad. I wish you had seen their lovely little prostrations before eating, and heard the chatter! It was a lovely little Holy Encharist with something of the Xmas Feast about it too. In the afternoon the Mother, the ladies, the children and I drove in 7 gharis to see the orchids in Chatterji's Nurseries– where it was a Zenana day. And you must not think that all this meant wild extravagance. It was 2 treats for 40 persons each time you know, and altogether cost less then 12 rupees! Isn't it wonderful what one can do here?'

রেমঁ লিখছেন, 'কিন্তু মিতব্যয়ী হয়েও নিবেদিতা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পান না। স্কুলের খরচ চালানো শক্ত হয়ে উঠেছে। বাজেটে যে এক টাকা করে মাসিক বেতন ধরা হয়েছিল, একটি মেয়েও তা দেয় না। উলটে অনেককেই পরবার সূতী শাড়িখানাও যোগান নিবেদিতা। অনেকগুলি মেয়ের চিকিৎসা করতে হয়। তার মধ্যে একজনের কুষ্ঠ, কবিরাজ বলেছেন ওকে ভাল করে দেবেন। আর স্বামী সদানন্দ যেসব মেয়ে টুঁড়ে নিয়ে আসেন, তাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যতটুকু দারিদ্র্য তার চাইতে বেশী। যখন দেখেন টাকা-পয়সার অনটন নিয়ে নিবেদিতা মাথা ঘামাচ্ছেন, সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'ভয় পাবেন না। সত্যকার দারিদ্র্য যাকে বলে তা তো এখনও উঁকিই দেয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদেহী হওয়ার পর বরানগরের পুরানো মঠবাড়িতে দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করেছি বটে। গায়ে দেবার এক টুকরো কাপড় ছিল না, ভিক্ষা করে পেট ভরাতে হত। বিকালবেলা স্বামীজি অল্পবয়সী ব্রহ্মচারিদের চেতিয়ে রাখবার জন্য মন্দিরা বাজিয়ে গান করিতেন। তাঁর ভজন শুনতে শুনতে আমরা গানের আনন্দে ধ্যানে ডুবে পেটের খিদে ভুলে যেতাম।'

এই স্কুলটিকে যে দীর্ঘদিন আর্থিক সংকটের ভিতর দিয়েই নিবেদিতাকে চালাতে হয়েছিল— তা বোঝা যায় স্বামীজির লেখা একটি চিঠিতে। ১৯০০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটি চিঠিতে স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, 'ভয় করো না— তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান।'

স্কুলের শুরুতেই এই অর্থিক সংকটের সময় নিবেদিতা তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশাও করেছিলেন। ১৮৯৯-এর গোড়ায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুল আমেরিকায় ফিরে গেলেন। ফিরে যাওয়ার আগে বেশ কিছুটা আর্থিক সাহায্যও করে গিয়েছিলেন। অঁরিয়েতা মুলারও কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা তা প্রত্যাখ্যান করেন। মুলারের সঙ্গে ততদিনে স্বামীজি, মিশন এবং নিবেদিতা সকলেরই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। অঁরিয়েতা মুলার তখন রামকৃষ্ণ আন্দোলনের পরিবর্তে আবার চার্চের দিকে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এর একটি বড় কারণ — স্বামীজি নিছক ধর্মচর্চা না করে নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে মিশনকে জড়িত করে ফেলেছিলেন— যা মুলারের পছন্দ হচ্ছিল না। মুলার চেয়েছিলেন— খ্রিস্টান মিশনারিদের মতো স্বামীজিও ধর্মীয় ভাব প্রচারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখুন। তদুপরি, মিশনের কষ্টসাধ্য অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াতেও কষ্ট হচ্ছিল শ্রীমতী মুলারের। এছাড়া, প্রাচ্যের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি —এসব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি শ্রীমতি মুলার।

অঁরিয়েতা মুলারের এই পরিবর্তন সম্পর্কে ১৮৯৮ সালের ৭ ডিসেম্বর নিবেদিতা জোসেফিনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'She has thrown everything overboard, Shri R.K.—Swami–Meditation–University of Religions– everything, She does not hesitate to say that Hinduism is Eroticism to the core, and that is turths have been 'kept from her.' By whom? 'Oh-names are useless'- she answers, All, meditation included, is 'dirty'.

'She is now a Bible Christian of a virulant type, and tending towards millennialism.

'...I spoke of Swami– 'Oh you won't love him long!' She answered gaily— Divine Master!...'

শ্রীমতী মুলারের পাশাপাশি এডওয়ার্ড স্টার্ডির সঙ্গেও এই সময় স্বামীজি এবং মিশনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। স্টার্ডি যদিও এর আগে ভারতে এসেছিলেন, স্বামীজির গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, এমনকী ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের কাজে স্বামীজিকে সহায়তাও করেছিলেন, তবু শ্রীমতী মুলারের মতোই ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্ম স্টার্ডিও হতে পারেননি। বরং ইয়োরোপিয় উন্নাসিকতা স্টার্ডির ভিতরও বরাবরই ছিল। স্বামীজি যে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তা নয়। শ্রীমতি মুলার সম্পর্কে তিনি যেমন নিবেদিতাকে আগেই সতর্ক করেছিলেন, তেমনই স্টার্ডি সম্পর্কেও যে তিনি সন্দিহান ছিলেন, তা বোঝা যায় নিবেদিতাকে লেখা একটি চিঠিতে। নিবেদিতা ভারতে আসার আগে ১৮৯৭ সালের ২৯ জুলাই একটি চিঠিতে স্বামীজি তাঁকে লিখেছিলেন, 'মিসেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ; এত ভাল,

এত স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার-দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না; এমনকি স্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি।' এদেশীয়দের প্রতি স্টার্ডির মনোভাব যে খুব অনুকূল ছিল না, তা স্বামীজির এই চিঠিটি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আসলে, আঁরিয়েতা মুলারের মতোই স্টার্ডিরও প্রথমদিকে মনে হয়েছিল, বিবেকানন্দ অন্য-পাঁচজন ধর্মগুরুর মতোই ঈশ্বর চিন্তায় কালাতিপাত করবেন। স্টার্ডি যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি যে ধর্মগুরু এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁরা চিরাচরিত প্রথামাফিকই ধর্মাচরণে আবদ্ধ থাকতেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন একদম ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমী চরিত্রকে স্টার্ডি এবং মুলার— কারো পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বামীজি হয়তো বুঝেছিলেন, স্টার্ডি এবং মুলার বেশিদিন তাঁর সঙ্গে থাকবেন না। সে কারণেই নিবেদিতার কাছে এই দুজন সম্পর্কে তিনি সংশয় ও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

আঁরিয়েতা মুলার এবং এডওয়ার্ড স্টার্ডি দুজনেই চেয়েছিলেন— স্বামীজি তাঁর সমাজকল্যাণমূলক কাজের বদলে অন্তর্মুখী হোন— ঈশ্বর সাধনাতেই নিমজ্জিত থাকুন। মুলার এবং স্টার্ডি তা চাইলেও স্বামীজির পক্ষে তা কখনোই সম্ভবপর ছিল না। কেননা, স্বামীজি যে ধর্মমত প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার মূল সুরই ছিল মানবসেবা। তদুপরি, আঁরিয়েতা মুলার স্বামীজি সম্পর্কে কতগুলি হাস্যকর অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল— স্বামীজি কেমন সাধু — যিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভোগেন। অর্থাৎ, স্বামীজির কাছে অলৌকিকতা আশা করেছিলেন মুলার। মুলারের আরো অভিযোগ ছিল— স্বামীজি অত্যধিক ধূমপান করেন এবং মাঝে মাঝেই মেজাজ গরম করে ফেলেন। রামকৃষ্ণ মিশন লিঙ্গপূজা করে— এ অভিযোগও ছিল মুলারের।

১৮৯৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর স্টার্ডিকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'মিসেস জনসনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মুলারও আমায় ছেড়ে গেছেন—ঐ রোগের জন্য। হয়তো তাঁরাই ঠিক। তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি যা আমি তা-ই। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক তো আজও দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয়, তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

'আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যান্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করত। তারপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হল— তা না হলে তারা আমায় ছোঁবেই না। তারা আমায় যা খেতে দিত, তা না খেলে আমায় অদ্ভুত মনে করত। এমনি সব।...

'অবশ্য সবই আমার কর্মফল, আর এতে আমি খুশীই আছি। কারণ এতে যদিও সেই সময়ের মতো যন্ত্রণা হয়, তবু এতে জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা হয় এবং তা এ জীবনেই হোক বা পরজীবনেই হোক, কাজে লাগবে।...

'...আমার দিক থেকে আমি আমার স্বভাব ও নীতিকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকি— একবার যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, সে সর্বদাই আমার বন্ধু। তাছাড়া ভারতীয় রীতি অনুসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্য অন্তরেই দৃষ্টিপাত করি; আমি জানি যে, আমার উপর এত বিদ্বেষ ও ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে, তার জন্য দায়ী আমি এবং শুধু আমিই। এমনটি না হয়ে অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়।'

স্বামীজির এই চিঠিতে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, অঁরিয়েতা মুলারের মতো সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ইয়োরোপিয় মহিলারাও 'ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়' এইরকম অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয়ত, স্বামীজির জীবনযাত্রা সম্পর্কে মুলার নানাবিধ অভিযোগ তুললেও স্বামীজি তাঁর পত্রে মুলার বা অন্য কারো সম্পর্কে একটিও কটু কথা বলেননি।

অবশ্য শুধু মুলার নয়, ১৮৯৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীজিকে লেখা একটি চিঠিতে স্টার্ডি নিজেই বলে বসলেন— খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাস মতে কোনো ধার্মিক ব্যক্তির শরীর কখনও অসুস্থ হতে পারে না। অথচ স্বামীজি অসুস্থ। এটাই প্রমাণ করছে স্বামীজি ততটা ধার্মিক নন। উপরন্তু স্টার্ডি লিখলেন, 'এসব তথাকথিত সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণ করার জন্য যা ব্যয় হয়েছে, তা একজন কঠোর পরিশ্রমী গির্জা-কর্মীকে অথবা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীকে অথবা এই ভীষণ গরীব দেশের একজন ডাক্তারকে ভরণপোষণ করার ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ এঁরা কেউ কিন্তু সন্ন্যাসের ভান করেন না।'

স্বামীজিকে আঘাত করার জন্য স্টার্ডি আরো লিখেছিলেন, 'যদি সম্মানের আদর্শকে সম্মান করে এবং উৎসাহ দেখিয়ে এদেশে সন্ন্যাসীদের আনা হয় এবং যদি এঁদের মধ্যে কোনও সন্ন্যাস (ত্যাগ), সন্তুষ্টি, প্রশান্তি, পারিপার্শ্বিক সহজ, সরল জীবনযাত্রা এবং সব কিছুতেই একটা সহজ সরল ভাব না থাকে এবং তাঁরা যদি পৃথিবীর অপর লোকদের কাছ থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি প্রত্যাশা করেন, তাঁরা যদি দামি ধূমপান, বাজারের সেরা ফল, বস্ত্র-পোশাকাদি এবং আরও অনেক কিছুই দাবি করেন, তাহলে তাঁরা কী ধরনের লোক? আর তাঁরা কী

প্রকারেই বা শিক্ষা দেবেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি শুধু একথাই বলতে পারি যে, তাঁরা কখনোই আমার ধারণায় সন্ন্যাসীর আদর্শ নন।'

স্টার্ডি যা যা অভিযোগ করেছিলেন মুলারও সেই একই অভিযোগ করেছিলেন। তবে স্টার্ডির মতো সরাসরি স্বামীজিকে পত্র লিখে তিনি এইসব অভিযোগ করেননি।

এই ধরনের অভিযোগ যে স্বামীজিকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত করেছিল তা না বললেও চলে। স্টার্ডির এই সব অভিযোগের উত্তরে স্বামীজির দুটি চিঠি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে স্টার্ডিকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'হতে পারে তোমার সমালোচনার অনেকখানি অংশ সঙ্গত ও সত্য, আবার এ-ও সম্ভব যে, কোনো একদিন তুমি দেখবে, এ সকলই কতকগুলি লোকের প্রতি তোমার বিরাগ থেকে প্রসূত, আর আমি হয়েছি অপরের কৃত অপরাধের ফলভোগী।

'যা হোক, এসব নিয়ে তিক্ততার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি যা নই, তার ভান কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না। আর তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার ধূমপান, খারাপ মেজাজ—ইত্যাদি ব্যাপার আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটালে যে কেউ সহজে জানতে পারে। 'মিলন মাত্রেই বিচ্ছেদ আছে'—এই হল প্রকৃতির নিয়ম। তার জন্য কোন নৈরাশ্যের ভাব আমার মধ্যে জাগে না।...

'...হিসেবপত্র পূর্বে পেশ করা হয়নি। কারণ কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেলে তোমার কাছে সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করব, ভেবেছিলাম। টাকার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার ফলে কাজ মাত্র গত বছর শুরু হতে পেরেছে এবং আমার নীতি হল, টাকার জন্য হাত না পেতে স্বেচ্ছায় দানের জন্য অপেক্ষা করা।

'আমার সমস্ত কাজে এই একই নীতি মেনে চলি, কারণ আমার স্বভাব যে অনেকের কাছে অপ্রীতিকর, সে সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন এবং যতক্ষণ না কেউ আমাকে চায়, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে থাকি। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যও প্রস্তুত থাকি। আর এ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার কখনও মন খারাপ হয় না। কিংবা সে সম্বন্ধে কোনো কিছু চিন্তা করি না। কারণ আমার নিত্য ভ্রাম্যমান জীবনে এ জিনিস আমাকে সব সময়ই করতে হবে।...'

১৮৯৯-র নভেম্বর মাসে স্বামীজি আর-একটি চিঠি লিখেছিলেন স্টার্ডিকে। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'বিলাসিতা, বিলাসিতা—গত কয় মাস থেকে কথাটি বড় বেশি শুনতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্যবাসীরা নাকি তার উপকরণ যুগিয়েছে, আর সর্বক্ষণ ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে ভণ্ড আমি নাকি নিজে সেই বিলাসিতা ভোগ করে আসছি। এই বিলাস-ব্যসনই নাকি আমার কাজের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তত: ইংলণ্ডে।...

'ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা বাদ দিলে ইংলণ্ড থেকে আমি রুমালের মতো একখণ্ড বস্ত্র পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ অপর পক্ষে ইংলণ্ডে আমার

শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের চাপের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তোমরা— ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ অমানুষিক খাটিয়ে। এখন আবার বিলাস-ব্যসন নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছে!!! তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটা কোট দিয়েছ, বলতে পারো? কেউ একটা সিগার? এক টুকরো মাছ বা মাংস? তোমাদের মধ্যে একথা বলবার দুঃসাহস কার আছে যে, তোমাদের কাছে আমি খাবার পানীয়, সিগার, পোশাক বা টাকা চেয়েছি? জিজ্ঞেস কর...ঈশ্বরের নামে বলছি, জিজ্ঞেস কর, তোমাদের বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর এবং সবচেয়ে আগে জিজ্ঞেস কর তোমার নিজের অন্তর্যামী ভগবানকে— 'যিনি কখনও ঘুমান না।'

'আমার কাজের জন্য তোমরা যে টাকা দিয়েছ, তার প্রতিটি পেনি সেখানেই আছে। তোমাদের চোখের সামনে আমার ভাইকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে সম্ভবত: মৃত্যুর প্রতীক্ষায়; কিন্তু তাকে আমি একটি কানাকড়িও দিইনি, কারণ তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না।...

'মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিঃ ও মিসেস লেগেট সম্বন্ধে তোমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার জন্য তাঁদের ভালবাসা ও সহৃদয়তার কথা তোমার জানা আছে; মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড আমাদের দেশে গিয়েছেন এবং জীবনের সাধারণ সুখ সুবিধাগুলি ত্যাগ করে আমাদের মধ্যে এমনভাবে বসবাস ও চলাফেরা করছেন, যা কোন বিদেশী কখনও করেনি এবং তাঁরা তো আমার বা আমার বিলাসিতার মুণ্ডপাত করেন না, এবং আমাকে ভাল খাওয়াতে পারলে বা আমি চাইলে দামী সিগার খাইয়ে তাঁরা আনন্দ পান। আর যখন তোমাদের জন্য প্রাণপাত করছিলাম এবং নোংরা গর্তে অনাহারের মধ্যে রেখে যখন তোমরা আমার গায়ের মাংস তুলে নিচ্ছিলে এবং সঞ্চয় করে রেখেছিলে বিলাসিতার এই অপবাদ, সেদিনও এই লেগেট এহং বুলদের দেওয়া রুটিই আমি খেয়েছি, তাঁদের দেওয়া কাপড়ই আমি পরেছি, তাঁদের টাকাতেই আমি ধূমপান করেছি এবং বহুবার বাড়ি ভাড়াটা পর্যন্ত মিটিয়েছেন তাঁরাই।...

'তবে দেখ..., যাঁরা সাহায্য করেছেন বা এখনও করছেন তাঁদের কাছ থেকে কোন বিরূপ সমালোচনা বা নিন্দা নেই। যারা কিছুই করে না এবং শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজে, তারাই কেবল নিন্দা ও সমালোচনা করে।...

'বিলাসিতার কথা বলছ! এইসব সমালোচকদের এক এক করে ধর—দেখবে প্রত্যেকেরই মন পড়ে আছে দেহে, আত্মার উপলব্ধি কারও একবিন্দু নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আগেই হোক, পরেই হোক তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে।...

'আমার গুরুভ্রাতাদের উপর আমি যে কাজ চাপাই, তা-ই তারা করে। যদি তারা কখনও স্বার্থপরতা দেখিয়ে থাকে, তা আমার আদেশেই করেছে, নিজেদের খুশিমত

করেনি। ...লণ্ডনে আমাকে যেমন অন্ধকার গর্তটির ভিতর রেখেছিলে এবং সর্বক্ষণ পরিশ্রম ও অনাহারের মধ্যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিলে, তোমার সন্তানের বেলায় তা করতে পার কি? মিসেস— কি তা করতে চাইবেন?...তারা সন্ন্যাসী, তার অর্থ এই— কোন সন্ন্যাসী অকারণে শরীর ত্যাগ বা অপ্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা করবে না। পাশ্চাত্য দেশে এই সকল কঠোরতা করতে গিয়ে আমরা সন্ন্যাসের নিয়মই ভঙ্গ করছি। তারা আমার ভাই , আমার সন্তান। আমার জন্য তারা গর্তের মধ্যে মারা যাক, এ অমি চাই না। সত্য ও মঙ্গলকর সমস্ত শক্তির বলে আমি চাই না—তারা তাদের এত কষ্টের বদলে অনাহারে বা খেটে মরুক , কিংবা অভিশপ্ত হোক।

'আরও একটি কথা। যদি তুমি দেখাতে পারো — কোথায় আমি দেহের উপর নির্যাতনের কথা প্রচার করেছি, তা হলে খুশি হবো। শাস্ত্রের কথা তুললে আমি বলি, সন্ন্যাসী ও পরমহংসদের জীবনযাপনের যে নিয়ম সেখানে লিপিবিদ্ধ আছে, তা আমরা পালন করিনি, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াতে কোন (শাস্ত্রী) পণ্ডিত যদি সাহস করেন, (তাঁর সম্মুখীন হতে) আমি খুবই খুশি হবো।...

'প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছিলে। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে...এখনও সে মরেনি, আজও সেই জীবন্ত ভারত নির্ভীকভাবে ধনীর অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে তার নিজস্ব বাণী প্রচার করার মনোবল রাখে; কারও মতামতের পরোয়া সে করে না, এদেশে— যেখানে তার পায়ে শিকল আঁটা কিংবা শিকলের প্রান্তভাগ যারা ধরে আছে, সেই শাসনকর্তাদের মুখের সামনেও করে না।'

ইংল্যান্ডে স্টার্ডি এবং মুলারের বাড়িতে থাকার সময় কী ব্যবহার পেয়েছিলেন, সে কথা স্বামীজিই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, '...এসব বিলাসব্যসনের কথায়...স্মৃতিতে জেগে উঠেছে অন্য এক দৃশ্য।...তোমার রিডিং-এর বাড়িতে আমার থাকার কথা বেশ মনে আছে। সেখানে আমাকে খেতে দেওয়া হত সিদ্ধ বাঁধাকপি ও আলু এবং ভাত ও ডালসিদ্ধ—তিনবেলাই —যদি মশলার সস নিতাম তাহলে তোমার স্ত্রী বেশ বিরক্তি প্রকাশ করত। আমার মনে পড়ে না ধূমপানের জন্য তুমি আমাকে কোনও শিলিং মূল্যের বা পেনি মূল্যের কোনও চুরুট কখনও দিয়েছ। আমার মনে পড়ে না যে আমি কখনও এ জাতীয় খাবারের ব্যাপারে বা তোমার স্ত্রীর অনবরত ঘ্যানঘ্যানানি ও বিরক্তি প্রকাশের জন্য কখনও অভিযোগ করেছি। আমি কিন্তু সব সময়ই ভয়ে ভয়ে চোরের মত কাঁপতে কাঁপতে তোমার বাড়িতে থেকেছি এবং প্রতিদিন তোমার জন্যই কাজ করে গিয়েছি।

'তারপর মনে আছে সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে থাকার কথা। ওই বাড়ির কর্তা ও পরিচালক ছিলে তুমি এবং মিস মুলার। সে বাড়িতে আমার ভাই বেচারি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সে অবস্থায় মিস মুলার তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।...

'তারপর গেলাম মিস মুলারের বাড়িতে।...তার বাড়িতে আমাকে বাদাম আর ফলমূল খেয়েই থাকতে হয়েছিল। তারপর এলাম লণ্ডনের 'অন্ধকূপে' (১৪গ্রে কোর্ট গার্ডেন্স)। এখানে আমাকে প্রায় দিনরাতভোর কাজ করতে হত। সময় সময় ৫-৬ জনের জন্য রান্নাও করতে হত এবং এখানেও বেশীরভাগ রাতেই শুধু পাউরুটি আর মাখন খেয়ে থাকতে হত।

'মিসেস জনসন যে আমাকে একরাত্রে আহার করিয়েছিলেন এবং রাত্রিবাসের আতিথ্য দিয়েছিলেন, সে কথাও আমার মনে আছে। কিন্তু এর পরদিনই তিনি আমার বিরূপ সমালোচনা করে বলেছিলেন যে আমি হচ্ছি কালো বর্বর আদমি এবং নোংরা, কারণ আমি তাঁর বাড়ির সর্বত্রই ধূমপান করেছি।'

স্বামীজির এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় স্টার্ডির এইসব অভিযোগে তিনি কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এ-ও বোঝা যায়, স্টার্ডি এবং মুলার প্রাথমিকভাবে যতই বেদান্ত প্রচারে আগ্রহ দেখান না কেন— ভারতীয়দের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিদেশি প্রভুসুলভই ছিল। নিবেদিতার ঘনিষ্ঠজনদের বক্তব্য অনুযায়ী, শ্রীমতী মুলারের বিবেকানন্দ-বিদ্বেষের কথা শুনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতার জননী। তিনি বলেছিলেন, তাঁর প্রভূত অর্থ থাকলে বিবেকানন্দকে লন্ডনে শ্রীমতী মুলারের টাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হত না। অবাক করার মতো বিষয় যে স্বামীজির প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই স্টার্ডিই বলেছিলেন, 'I will close this by remarking that, although if we were enlightened we should see Deity in every manifestation, nevertheless it is a great boon when we can perceive it as patent in noble and holy men. One of such was the Swami Vivekananda.'

স্বামীজির বিরুদ্ধে অঁরিয়েতা মুলার এবং এডওয়ার্ড স্টার্ডি এইসব অভিযোগ তোলার পরে এটাই স্বাভাবিক যে, গুরুর প্রতি একাগ্র নিবেদিতা তাঁদের কোনো সাহায্য গ্রহণ করতে চাইবেন না। তা চানওনি নিবেদিতা। স্কুল চালানোর ব্যাপারে শ্রীমতী মুলার তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে রাজি থাকলেও, নিবেদিতা সেই সাহায্য নেননি।

ষোলো

উদ্যমী হয়ে নিবেদিতা তাঁর স্কুল চালু করলেও অর্থ সংকটের হাত থেকে তাঁর মুক্তি ঘটল না। এক-এক করে তাঁর স্কুলছাত্রী সংখ্যা দাঁড়াল তিরিশ। তখনকার দিনে একজন ইয়োরোপিয় মহিলার পরিচালিত স্কুলে এই ছাত্রীসংখ্যাটা নিতান্তই হেলাফেলা করবার নয়। নিবেদিতা প্রথমে ভেবেছিলেন, ইংল্যাণ্ডে তাঁর এক বান্ধবীকে অনুরোধ করবেন, এখানে এসে তাঁর সঙ্গে মেয়ে স্কুলের কাজে জড়িত হতে। পরে অবশ্য নিবেদিতা সে পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। হয়তো অর্থসংকটের কারণেই এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন নিবেদিতা। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, উৎসাহভরে স্কুলের কাজ শুরু করলেও অর্থের অভাব নিবেদিতাকে কিছুটা হতাশ করে তুলেছিল। তার ওপর বাগবাজারের সংকীর্ণ গলির ভিতর ১৭ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে গরমের সময় স্কুল চালানো সত্যিই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। গরমকালে সকালে এবং বিকালে স্কুল বসত। ওই গরমে নিবেদিতার কষ্ট দেখে সারদা দেবী তাঁকে বলেছিলেন দুপুরের সময়টুকু বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে এসে বিশ্রাম নিতে। তা-ই করতেন নিবেদিতা; দুপুরবেলা সারদা দেবীর বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। পরে নিবেদিতাও লিখেছিলেন, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি যে, ভারতবর্ষের নৈরাশ্যমূলক মনোভাবের জন্য তার জলবায়ু অনেকাংশে দায়ী।'

তবে স্কুলের কাজ নয়, নিবেদিতার বাগ্মীতার কথা এই সময় কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বামীজি যেমন তাঁকে মঠের নবদীক্ষিতদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তেমনই পাশাপাশি প্রতি বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিতেন নিবেদিতা। মঠে নিবেদিতার শিক্ষাদানের সূচি ছিল এইরকম— প্রতি বুধবার উদ্ভিদবিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যা ও প্রতি শুক্রবার শারীরবিদ্যা এবং সূচীশিল্প। ব্রাহ্মসমাজে তিনি যে বক্তৃতা দিতেন সেখানে বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারের যে মহিলারা

উপস্থিত থাকতেন তাঁরা হলেন' কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুনীতি দেবী এবং সুচারু দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ঘোষাল, জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রমুখ। শিক্ষিত ব্রাহ্ম মহিলাদের জন্য প্রতি শনিবার 'শিক্ষক শিক্ষণ' ক্লাসও আরম্ভ করেছিলেন নিবেদিতা। এক আমেরিকান মিশনারি স্কুলেও তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ঘন্টা করে ক্লাস নিতেন।

কলকাতার শিক্ষিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম থেকেই একটি সুন্দর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষিত, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের কদর দিতে জানত। নিবেদিতা এ দেশে আসার পর তার বাগ্মীতার সংবাদ বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারগুলিও পেয়েছিল। ফলে, সহজেই তাঁরা নিবেদিতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অপরদি.ক নিবেদিতাও শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতিগতভাবে অনেকটাই নৈকট্য অনুভব করেছিলেন। ফলে, দু-তরফের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে বিশেষ সময় লাগেনি। স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ দূরত্ব রেখে চললেও, নিবেদিতার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কলকাতায় এসে ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর নিবেদিতার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার এবং মিশনের অন্যান্য সামাজিক কাজে যদি ব্রাহ্ম পরিবারগুলিকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা যায়, তাহলে অনেকটাই লাভবান হওয়া যাবে। ব্রাহ্ম সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার বিষয়ে তিনি স্বামীজির কাছেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে, ব্রাহ্ম সমাজকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে চলার বিষয়ে স্বামীজির ততটা আগ্রহ ছিল না। বরং আপত্তিই ছিল। যে কারণে, তাঁর স্কুল চালুর সময়ে 'এক ব্রাহ্ম মহিলার' (অবলা বসু) সাহায্য নিতে চাইলে স্বামীজি আপত্তি করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে স্বামীজির এই অনিচ্ছার কারণ ছিল— স্বামীজি মনে করতেন ব্রাহ্মরা, বিশেষত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, যে সংস্কৃতির ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসছে, তা বাঙালির দৃঢ় চরিত্র গঠনের পরিপন্থী হবে। এই ধারণার কথা তিনি নিবেদিতার কাছে বহুবার ব্যক্ত করেছিলেন। এছাড়াও, আর একটি কারণও আছে বলে মনে হয়। তাঁর শিকাগো বক্তৃতার পর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতো ব্রাহ্ম নেতারা যেরকম কদর্য ভাষায় কুৎসা রটিয়েছিলেন, বা, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন শুরু হওয়ার পরও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিশিষ্ট ব্রাহ্মজনেরা স্বামীজি সম্পর্কে যেরকম কটূক্তি করেছিলেন, তা-ও স্বামীজিকে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিরূপ করে তুলেছিল। তবু, নিবেদিতা কলকাতা আসার আগেই ঠাকুর পরিবারের কোনো কোনো সদস্য যে স্বামীজির সঙ্গে একটি যোগসূত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং স্বামীজিও যে তাঁদের একেবারে উপেক্ষা করেননি তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

১৮৯৭ সালের ৬ এপ্রিল সরলা ঘোষালের একটি চিঠির প্রত্যুত্তরে স্বামীজি লিখেছেন, 'মহাশয়ার প্রেরিত 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

'এ জীবনসংগ্রামে নবীনভাবের সমুদ্গাতার সমর্থক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা তো দূরে থাকুক, বিশেষত: আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদূষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

'প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।'

বলা দরকার, এই চিঠি যখন বিবেকানন্দ লিখেছেন, তখন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক সরলা ঘোষাল এবং ওই পত্রিকার অন্যতম লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরলা ঘোষালকে লেখা স্বামীজির এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, 'ভারতী' পত্রিকা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার জন্য ঠাকুর পরিবারের ওই সদস্য কতখানি উদগ্রীব ছিলেন। এবং এ-ও বোঝা যায় যে ঠাকুর পরিবারের সদস্যের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে স্বামীজিও কোনো কার্পণ্য করেননি। এই চিঠির কিছুদিন পরেই সরলা দেবীর আর একটি চিঠির প্রত্যুত্তরে (২৪ এপ্রিল, ১৮৯৭) দীর্ঘ একটি পত্র পাঠান স্বামীজি। সেই পত্রে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ওই চিঠিতেও নারীর সমাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরলা দেবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন স্বামীজি। লিখেছেন, '...যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তিকা কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশহাজার নরনারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক রমাবাই অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতে ঋষিমুখাগত ধর্মপ্রচার করিলে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।'

এই চিঠি পড়েও বোঝা যাচ্ছে, ঠাকুর বাড়ির এই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে স্বামীজির পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি সম্পর্ক ছিল। এরপরেও স্বামীজির সঙ্গে সরলা দেবীর নিয়মিত পত্র যোগাযোগ ছিল। সরলা দেবী এবং ঠাকুর বাড়ির আর-এক সদস্য, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামীজির জীবদ্দশাতেই বেলুড় মঠেও গিয়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে সরলাদেবী এবং সুরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

অবশ্য, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মসমাজ এবং ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে একটি যোগসূত্রও তৈরি হয়েছিল তখনকার নরেন্দ্রনাথ দত্তের। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে যাওয়ার আগে নরেন্দ্রনাথ ছুটে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মশাই, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু ওই তরুণ নরেন্দ্রনাথকে মনে রেখেছিলেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ যখন পরে দেখা করতে যান বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, তখন এই প্রসঙ্গটি ঘুরে এসেছিল। ওই সময় নরেন্দ্রনাথের শুধু ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত ছিল তা-ই নয়, ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের লেখা গানও পরিবেশন করতেন সুকণ্ঠের অধিকারী নরেন্দ্রনাথ। রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতী দেবীর লেখা থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে এক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে লীলাবতী দেবীর বিবাহ হয়। ওই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে লীলাবতী দেবী লিখেছেন, 'নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন রায়ের জীবনীকার), সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) মহাশয়গণ সংগীত করিয়াছিলেন... শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়— দুই হৃদয়ের নদী (সাহানা-ঝাঁপতাল); জগতের পুরোহিত তুমি (খাম্বাজ -একতাল), শুভদিনে এসেছে দোঁহে (বেহাগ-তেতাল) প্রভৃতি সংগীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।' অর্থাৎ, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত হওয়ার আগেই বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র-গানের প্রতি প্রীতির পরিচয়ও এই সময় পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি যে রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করতেন তা-ই নয়, গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও রবীন্দ্রগান শুনিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন স্বামীজির গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসও। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একবারই রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে তার বর্ণনাও আছে। কথামৃতে আছে পরমহংসদেব সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, 'দেবেন্দ্রর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি (সমাধিস্থ) হল। সেই অবস্থটি হলে কে কীরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী করে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিত তৃণজ্ঞান হয়! যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেকবৈরাগ্য নাই, তখন খড়কুটোর মতো বোধ হয়। তখন দেখি যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠেছে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। দেখলাম, যোগ-ভোগ দুই-ই আছে; অনেক ছেলেপুলে, ছোটো ছোটো; ডাক্তার এসেছে; তবেই হল; অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে

মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও। তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বললে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মতো, আর জীব হয়েছে—এক একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐরকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রর কথার সঙ্গে মিলল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড়ো লোক।'

নিবেদিতার মেয়েদের স্কুলে অবলা বসুকে নেওয়ার ব্যাপারে বা মিশনের কাজকর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মদের বেশি জড়ানোর ব্যাপারে স্বামীজির আপত্তি থাকলেও, নিবেদিতার কথায় কিছুটা রাজি হয়েছিলেন তিনি। হয়তো নিবেদিতার যুক্তি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। হয়তো, স্বামীজিরও মনে হয়েছিল— ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে পারলে ভালোই হয়। কাজেই, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি যোগাযোগ গড়ে তোলার বিষয়ে নিবেদিতাকে অগ্রসর হতে সম্মতি দিয়েছিলেন স্বামীজি। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই যোগসূত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন নিবেদিতা তা হচ্ছে, তাঁর বাগবাজারে বাড়িতে একটি চা চক্রের আয়োজন করা। এই চা-চক্রের আয়োজন করার পিছনেও স্বামীজির সম্মতি ছিল এটা অনুমান করাই যায়। ওই চা চক্রে উপস্থিত ছিলেন স্বামীজি স্বয়ং, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ নীলরতন সরকার, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা রায় এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বোঝাই যায়, স্বামীজির সম্মতি না থাকলে ব্রাহ্মসমাজের এই বিশিষ্টদের নিবেদিতা চা-চক্রে আমন্ত্রণ জানতে পারতেন না। স্বামীজিও ওই চা-চক্রে যোগদান করতেন না। ১৮৯৯ সালের ২৭ জানুয়ারি বাগবাজারে তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এই চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন নিবেদিতা। ওই চা-চক্রের তিনদিন পরে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিটি থেকে এর বিবরণ পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, '...On Saturday also I had a sort of unarranged party. Mrs. P.k. Ray and young Mr.Mukherjee, Mr. Mohini and the Poet – and presently Swami with Dr. Sirkar. It was quiet a brilliant little gathering, for Mr. Tagore sang 3 of his own composition in a lovely tenor– and Swami was lovely. Only there was some cloud– I could not tell what. Then he sent for me to dine with him—and I heard ...Oh yum– when is one to be all right in choosing! I love this woman! Well, he [Swamiji] spoke beautifully about it, and said he was only making a suggestion on behalf of the school. As far as I was concerned I was safe anywhere. He hadn't a fear. But he could not bear anything unholy to come near my home. Of course I said. Monday should end it, but for Monday both were my invited guests...'

৭ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা আর একটি চিঠিতে নিবেদিতা এই চা চক্রের কথা উল্লেখ করেছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I told you of my tea party I think and how they all came in magnificient raiment and drank tea in the Courtyard, and we had to wait for the milk and there would never have been any tea if Mrs. P. K. Ray had not taken Gee and the tea pot too, in hand, and dismissed me to talk. And how afterwards we all came in here and Swami talked magnificiently by candlelight.'

তবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিবেদিতা তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে এই চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন, তা খুব সফল যে হয়নি তা জোসেফিনকে লেখা প্রথম চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। শিক্ষা প্রসারের কাজে ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা পেলে অনেক লাভ হবে, এটা যেমন নিবেদিতা বুঝেছিলেন, তেমনই তিনি এ-ও উপলব্ধি করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় যে বিশ্বজনীন ধর্মের কথা বলেছিলেন বা ব্রাহ্মরা যে ধর্মাচরণ করতেন তার সঙ্গে স্বামীজির অদ্বৈত ভাবনার কোনো অমিল ছিল না। কেবল যা ছিল, তা হচ্ছে দু পক্ষের ভিতর একটি সেতুবন্ধনের অভাব। এই সেতুটি গড়ে তুলতে পারলেই ব্রাহ্মসমাজ এবং মিশনের ভিতর সম্পর্কটি স্বাভাবিক হয়—নিবেদিতার সেরকমই উপলব্ধি হয়েছিল। অন্যদিকে, তাঁর আধুনিক, সংস্কারমুক্ত চিন্তা ভাবনার ফলে তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ক্রমে অনেক বেশি গ্রহণীয় হয়ে উঠছেন, তা বুঝতেও নিবেদিতার দেরি হয়নি। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯) লিখেছেন, 'The Brahmos pay me great attention– I wish they would n't, for I feel that I am a fish out of water. I go in simple white amongst their gorgeous silk and finery– and it is absurd. At Mrs.P.L Ray's on Sunday a large party was invited to tea "to meet Miss N." It felt so silly to me.'

স্বামীজি এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে ব্রাহ্মরা পৌত্তলিক এবং হিন্দুত্ববাদী বলে মনে করে তাঁদের সম্পর্কে ছুঁৎমার্গ প্রদর্শন করলেও, নিবেদিতাকে ব্রাহ্মরা কখনোই ওই দলে ফেলেনি। বরং, ব্রাহ্মরা নিবেদিতাকে তাদের অনেক কাছের বলেই মনে করত। ব্রাহ্মদের এই মনোভাব আঁচ করেই নিবেদিতা এই সেতুবন্ধনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন।

নিবেদিতার সঙ্গে কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজের পরিচয় মূলত জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুলের মাধ্যমে। জোসেফিন এবং সারা বুল কলকাতায় থাকাকালীনই নিবেদিতার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও ওই সময়েই পরিচয় হয়েছিল নিবেদিতার। রবীন্দ্রনাথের

ব্যক্তিত্বে নিবেদিতা যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতার বাগ্মীতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তায়। তা পরেও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন—শুধু ব্রাহ্ম সমাজ নয়, কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজের ওপর এই পরিবারের প্রভাব অসীম। কাজেই, এই পরিবারের সহায়তা এবং সমর্থন বিশেষভাবে কাম্য। আর এই পরিবারের সহায়তা পেতে গেলে এঁদের একজনকে পাশে পাওয়া সবিশেষ জরুরি। এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ভাবনা থেকেও তাঁর চা চক্রে স্বামীজি ও রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই উপস্থিত করিয়েছিলেন নিবেদিতা।

কিন্তু সেই চা চক্রের অভিজ্ঞতা যে খুব মধুর হয়নি তা জোসেফিনকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতেই বোঝা যায়। যদিও সেই চা চক্রে যে 'কালো মেঘ' দেখা গিয়েছিল— সে সম্পর্কে বিশদ কিছু নিবেদিতা জানাতে চাননি। অবশ্য, বিভিন্ন জনের সূত্রে পরে জানা যায়— ওই চা চক্রে স্বামীজি এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি সহজ হতে পারেননি। বরং, দুজনেই দুজনের প্রতি এক ধরনের শীতলতা প্রদর্শন করেছিলেন।

বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের এই শৈত্য অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিবেকানন্দের জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখায় স্বামীজির কোনো প্রসঙ্গ আসেনি। তেমনই যে নরেন্দ্রনাথ একমসয় ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করতেন, তিনিই কিন্তু বিবেকানন্দ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ছিলেন একেবারে নীরব। বরং, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতায় কখনও কখনও বিরক্তই হয়েছেন স্বামীজি। যতদিন বিবেকানন্দ বেঁচেছিলেন, ততদিন এই দুই ব্যক্তিত্ব পরস্পরের কাছে আসার বা পরস্পরকে জানার চেষ্টা করেননি। বরং দুজনের সম্পর্কের মাঝে একটি বরফের প্রাচীর তুলে রেখেছিলেন।

অথচ, বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্বামীজি সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্যই করেছিলেন। এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠ করলে বোঝা যায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে বিবেকানন্দের ভূমিকা দেরিতে হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর ১৯০২ সালের জুলাই মাসে স্বামীজির স্মরণে একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। 'দ্য বেঙ্গল' পত্রিকা ওই সভার বিবরণ দিয়ে লিখেছিল, 'On Saturday last [12 July], the Excelsior Union of Bhowanipur, Calcutta, held a meeting to do honour to the memory of the late Swami Vivekananda. There was a large gathering of the students of the locality in the spacious Hall of the South Suberban School, and Babu Rabindranath Tagore presided.'

জানা যায়, স্বামীজির এই স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেছিলেন নিবেদিতারই অনুরোধে। তবে, যে ঔদাসীন্য বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন, স্বামীজির প্রয়াণের পর ততখানি উদাসীন কিন্তু থাকতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রেও মনে হয়, নিবেদিতারই অনেকখানি অবদান আছে। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন নিবেদিতা। একত্রে বুদ্ধগয়া ভ্রমণেও গিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া, নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। নানা বিষয়ে দুজনের ভিতর আলোচনা হত। এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজির দর্শনও যে কখনো আসেনি তা ভাবা ভুল হবে। অনুমান করা যায়— এইসব আলোচনাই বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে অন্যরকম ভাবতে শিখিয়েছিল।

স্বামীজি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, তার নমুনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখায়। ১৯০৮ সনে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে, পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আজ ভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহা সম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র না করিয়া তুলি। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষীগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন...'

'পথ ও পাথেয়'-তে কবি লিখেছেন, 'রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনেকের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।'

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চরকা কাটার বাড়াবাড়িকে সমালোচনা করে লিখতে গিয়েও স্বামীজির ভাবনাকেই সমর্থন জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৮ সনের ৯ এপ্রিল

সরসীলাল সরকারকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়—কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।'

তবে যে ছুঁৎমার্গ স্বামীজির রামকৃষ্ণ অনুরাগ সম্পর্কে ছিল ব্রাহ্মসমাজের, স্বামীজির প্রয়াণের পর সেই ছুঁৎমার্গ থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হয়েও স্বামীজির উদার মানবধর্মের মূল কথা যে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে পেরেছিলেন, তার সবথেকে বড় উদাহরণ ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অশোকানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি। ওই পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ' কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি; বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েচে, — তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সেই অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেচে ।' অর্থাৎ, যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস নিবেদিতা করেছিলেন, সেই সেতুবন্ধন পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর। স্বামীজির রামকৃষ্ণ-অনুরাগের বিষয়টি বাদ দিয়ে অন্য কিছু প্রসঙ্গে কাছাকাছি এসেছিলেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

যাই হোক, সেই সময়ে তাঁর বাগবাজারের বাড়ির ওই চা-চক্রটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও নিবেদিতা কিন্তু হাল ছাড়েননি। চা-চক্রে স্বামীজি এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি শীতল থাকলেও, নিবেদিতা চেষ্টা চালিয়েই গিয়েছিলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারকে স্বামীজির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করে তুলতে। চা-চক্রের কিছুদিন পর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে, নিবেদিতা এক সঙ্গিনীকে নিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। দেবেন্দ্রনাথ সমাদরের সঙ্গেই নিবেদিতাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বেশ অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলেন। ওই আলাপচারিতার সময় দেবেন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেছিলেন—তরুণ নরেন্দ্রনাথ (তখনো বিবেকানন্দ হননি) তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। স্বামীজি আর-একবার তাঁর কাছে আসেন—নিবেদিতার কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

নিবেদিতাও স্বামীজির পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পরদিন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'Yesterday morning I went early to be blessed by the old Devendra Nath Tagore— Miss Padshah and I together. Swami sent word round early that he was particularly pleased— and I told the old man this and said I felt that I was making Swami's pranams as well as my own... He was quite touched. Said he had met Swami once when wandering round in a boat and would greatly like him to come to him once more.

'I told Swami last night – and he was wonderfully moved. "Did he really said that?" he said, "Of course I will go—and you can go with me–and fix a day as soon as you please!" It seems that as a boy he clambered up into Mr. T's (Tagore) boat and put anxious question about Adwaitism–and the old man paused and said gently at last "the Lord has only shown me Dualism"—and then he patted him—and said he had the Yogis eyes– and loved him much. But Swami little thought that he remembered. I have asked for early next Sunday morning...'

নিবেদিতার এই চিঠিটি থেকেই জানা যাচ্ছে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন শুনে স্বামীজি বেশ খুশিই হয়েছিলেন। এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সাক্ষাৎকারের একটি দিনক্ষণ ঠিক করতেও নিবেদিতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর সঙ্গে নিবেদিতাকে যেতেও বলেছিলেন তিনি। সেই মতো ২০ ফেব্রুয়ারি, রবিবার স্বামীজির সঙ্গে নিবেদিতা উপস্থিত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকারের এই বিবরণ জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুল দুজনকেই জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। তবে, সারা বুলকে লেখা চিঠিতে [২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯] বিবরণটি বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'It was last Sunday morning. The carriage came very early, and we got there before 8. Old Mr.T.[Tagore] no longer lives in Park St. He has withdrawn into the family home up here, feeling that it is right to die where he was born. Here he occupies a lovely plain little room on a sunny roof.

'We were shown up, one or two of the family accompanying. Swami went forward and said 'Pranam,' and I made it, offering a couple of roses. The old man gave me his little belessing first and then he told Swami to sit down, and for about 10 minutes he went on making a kind of charge to him in Bengali. Then he paused and waited– and

Swamiji very humbly asked for his blessing. It was given, and with the same salutation as before we came downstairs. Then Swami would have gone at once– but that was not our plan. And he came into the drawing room where Miss Tagore came to see him and the family assembled by degrees– rather the men of it. He refused tea,but suggested its being brought to me. Then he accepted a pipe—and all these little things prolonged the talk till 10 O'clock Mr. Mohini (Mohun chatterjee) came at 9.

'Of course Symbolism, especially Kali-Symbolism was the subject.

'At the beginning of the talk Swami referred to Ram Mohun Ray, who in his opinion was the greatest man modern India had produced—and his opinion about Symbols. Afterward when Vamachrya was brought up, I thought for a minute he was going of fight—for he quoted R.M.R (Ram Mohun Roy) in favour of orgies, and everyone looked unable to contradict but very unhappy. Then my faithful ally—Surendra Nath—took the odium on himself and became target,—and it all went well. Finally Swami was exceedingly conciliatory and said their position was the true Hindu doctrine, but they ought to add the other to it, at least as far as acknowledging the relationship of Symbolism to it went—and so on.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় স্বামীজিকেও দেবেন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজিও দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজির মনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলে আসার পরিকল্পনা থাকলেও নিবেদিতা এবং ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের অনুরোধে তিনি কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে স্বামীজি ধৈর্য হারাননি। বরং তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। এমনকী রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবেও উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজি। আসলে, স্বামীজি চাইছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর বক্তব্য শুনুক এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করুক। সারা বুলকে লেখা এই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন— দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগের দিন স্বামীজিকে তিনি বলেছিলেন— ব্রাহ্ম সমাজের অভিযোগ, স্বামীজিকে জানার বা বোঝার কোনো সুযোগ তাদের সামনে নেই। একথা শুনে স্বামীজি বলেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের যে কারও সঙ্গে যে কোনো সময়ে দেখা করার জন্য প্রস্তুত আছেন। আরো বলেছিলেন— দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এক্ষেত্রে

অনেকটাই কাজ করবে। বোঝাই যায়, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের বিষয়ে স্বামীজিও যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন।

নিবেদিতার এই চিঠিতে আরো একটি বিষয়ও সবিশেষ লক্ষণীয়; তা হল, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে দেখা করতে যান স্বামীজি, সেদিন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। নিবেদিতার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশিষ্ট জন যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে নিবেদিতার পত্রে অবশ্যই তাঁর উল্লেখ থাকত। দ্বিতীয়ত, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজির সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ আগেই স্থির করে রেখেছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজির জোড়াসাঁকোয় আসার সংবাদ যে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের ভিতরে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল তা বোঝাই যায়। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছানোর পর ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা স্বামীজিকে আপ্যায়ন করে দেবেন্দ্রনাথ সমীপে নিয়ে যান এবং পরে তাঁরা স্বামীজির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। প্রায় দু ঘণ্টা স্বামীজি সেদিন ঠাকুর বাড়িতে অতিবাহিত করেন। স্বামীজির জোড়াসাঁকোয় আসার সংবাদ ঠাকুর বাড়ির অন্য সদস্যরা অবগত হলেন, শুধু রবীন্দ্রনাথ হলেন না, বা, স্বামীজি দু ঘণ্টা ঠাকুর বাড়িতে অতিবাহিত করলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে সে খবর পৌঁছল না— এটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কাজেই, এইটুকু অনুমান করা যেতেই পারে যে, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই ওইদিন স্বামীজিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তবে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজির দূরত্ব থাকলেও ঠাকুর পরিবারের দুই সদস্য দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর সন্তান সরলা ঘোষাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজির একটি যোগসূত্র, এমনকী ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়েছিল। সরলা ঘোষালের স্বদেশপ্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। মুম্বইতে থাকাকালীন তিনি মারাঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। সে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতায় ফিরে তিনি বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীনই স্বামীজির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সম্পর্কেও সরলা ঘোষালের ছিল অসীম উৎসাহ। বিবেকানন্দও মনে করতেন সরলা ঘোষালের মতো নারীরা পাশ্চাত্যে ঝড় তুলে দিয়ে আসতে পারেন। বস্তুত, সরলা ঘোষালকে যে চিঠি লিখেছিলেন স্বামীজি, তাতে এ কথা লিখেওছিলেন তিনি।

নিবেদিতা কলকাতা আসার পর এবং সরলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বুঝতে পেরেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সরলার একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে। এবং সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজকর্মের প্রতিও সরলার আগ্রহ রয়েছে। কেবল আদর্শগত একটি ব্যবধানই সরলাকে স্বামীজির কাজে পূর্ণোদ্যমে যোগ দিতে

দিচ্ছে না। এই ব্যবধানটি দূর করতে নিবেদিতা সরলাকে স্বামীজির কাছে নিয়ে যেতেন। সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যেতেন। সরলা এবং সুরেন্দ্রনাথ দুজনেই নিবেদিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এই মেলামেশার ফলেই। এমনকী, স্বামীজি ১৮৯৯ সালে যখন বিদেশে গেলেন, তখন সরলাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। স্বামীজি চেয়েছিলেন, সরলা বিদেশে গিয়ে প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শন ব্যাখ্যা করুন। কিন্তু স্বামীজি চাইলেও বাধা এসেছিল ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকেই। সরলা ঘোষাল এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমার সঙ্গে দেখা হবার পূর্বে যে পত্রাবলী আমাকে লিখেছিলেন, তার একখানিতে তাঁর এ বিষয়ের কল্পনা জ্বলন্ত ভাষায় ফুটে উঠেছিল। এমন অমূল্য সুযোগ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হল না। আমার নিজের মনের অপ্রস্তুততা, সঙ্কোচ এবং অভিভাবকদের অমত এই দুই-ই প্রবলভাবে বাধা দিলে। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি চলে গেলেন, সে-ই তাঁর বাণী বাহিনী হল।' বোঝাই যায়, তাঁর মানসিক ইচ্ছা থাকলেও কিছু সঙ্কোচ এবং পরিবারগত আপত্তিই স্বামীজির কাজে যোগদানের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর তিনবছর পর সরলা ঘোষাল নিবেদিতার মাধ্যমে একটি 'ব্যক্তিগত' পত্র পাঠিয়েছিলেন স্বামীজিকে। ওই চিঠিতে তিনি কী লিখেছিলেন বা স্বামীজি এ পত্রের কী উত্তর দিয়েছিলেন—তা অবশ্য জানা যায় না। তবে, এটুকু অনুমান করাই যায় যে, ঠাকুর পরিবারের হাজার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই সরলা তাঁর ওই চিঠিতে স্বামীজির কাজের প্রতি সমর্থনই জানিয়েছিলেন। তবে, এ চিঠি সরলা যখন লেখেন, তখন স্বামীজি অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁর আয়ুও ফুরিয়ে আসছে।

মজার ব্যাপার হল, স্বামীজির সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের, বিশেষত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পাকাপাকি বিচ্ছেদ পর্বটি সমাধা হওয়ার সময়েও সরলাই উপলক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ২২ মার্চ নিবেদিতার আমন্ত্রণে সরলা ঘোষাল এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেলুড় মঠে আসেন। স্বামীজি তাঁদের যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ করলেন। স্বামীজি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং নিবেদিতা সরলা ও সুরেন্দ্রনাথকে মঠ ঘুরিয়ে দেখালেন। ওইদিন বিকেলে বেলুড় থেকে নৌকাযোগে স্বামীজি এবং নিবেদিতা সরলা ও সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেলেন। স্বামীজি নৌকায় অপেক্ষা করলেন। আর, নিবেদিতা সরলা এবং সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ব্যবহৃত ঘরখানি দেখে এলেন। সরলা এবং সুরেন্দ্রনাথ ফিরে যাওয়ার পর স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'সরলা একটি খাঁটি রত্ন।' এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় ২৩ মার্চ তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে।

নিবেদিতা লিখেছেন, 'Yesterday–Wednesday–Sarola and Suren Tagore were coming with me to Dukineswar—and Sadananda and I

went early to the Math to the Swami about the Plague...How beautiful Dukineswar was! Last time I went – it was X'mas night with you and Mohini. How I wished you were there again! We sat under the tree– Sarola Suren and I–and as we rose to go–Sorola pointed out the spaces of moonlight on the steps of the seat, all outlined by the leaves and branches it had fallen through. On the other side of the river were the light of lamps and two great blazing corpes fires, and the great bcats were going up the stream with sails full set.

'Then we went into the Room (of Rama Krishna)–and the others were taken through into the courtyard to see the temple. Kali was shut up but these two hopeful young Brahma returned full of pleasure in the architectural magnificence of the court.

'And the King waited for us all the time on the boat and went back to the Math with us. It is with Sarola that he takes now when we are all together. And she is begining to love him as we do. He says 'she is a jewel of a girl and will do great things.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বিশেষত সেই মন্দিরের স্থাপত্য দেখে ঠাকুর পরিবারের এই দুই তরুণ সদস্য বেশ আনন্দিত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সরলা ঘোষাল সম্পর্কেও স্বামীজি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তবে, ঠাকুর বাড়ির এই দুই সদস্যের সঙ্গে স্বামীজি দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে প্রবেশ করেননি। কারণ, স্বামীজি বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর, 'ম্লেচ্ছদের দেশে গিয়েছেন'— এই অভিযোগে তাঁর দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। এমনকী খেতড়ির রাজাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলেও তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে দেননি কর্তৃপক্ষ। নিবেদিতাকেও কখনো মূল মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মন্দির চত্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘরখানি দেখেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল, যার জন্য স্বামীজি এবং নিবেদিতা কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। সরলা এবং সুরেন্দ্রনাথ বেলুড় ঘুরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই [সম্ভবত ১৮৯৯-এর এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে] স্বামীজি সরলার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। ওই চিঠিতে বেলুড় মঠে স্বামীজির আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সরলা লিখলেন, ঠাকুর বাড়ির সহযোগিতা পেতে হলে স্বামীজিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত ত্যাগ করতে হবে। বলাই বাহুল্য, ঠাকুর বাড়ির তরফ থেকে স্বামীজির কাছে এই প্রস্তাব ছিল যথেষ্ট অপমানজনক। স্বাভাবিক ভাবেই এই চিঠি পেয়ে স্বামীজি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। নিবেদিতাও বুঝলেন, এরপর আর কোনোভাবেই স্বামীজির সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির মৈত্রী সম্ভব নয়। ১৮৯৯ সালের ৮ এপ্রিল একটি চিঠিতে

নিবেদিতা লিখছেন, 'Then he told me of a letter from Sarola saying that she and Suren regarded these things in the right light but if he would only sweep away the worship of Ramakrishna all the others would join him too–for they loved their county and would be glad to help us all.'

সরলা ঘোষালের এই চিঠি পাওয়ার পর স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণকে ত্যাগ করলে যদি দেশের মানুষের সামান্যতম উন্নতি হত— তাহলে তিনি নির্দ্বিধায় তা-ই করতেন। আর তা যদি না হয়— তাহলে রামকৃষ্ণকে ত্যাগ করার ওপরই এত জোর দেওয়া কেন। এই চিঠির পর যে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনারই আর কোনো প্রয়োজন নেই, তা-ও নিবেদিতাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীজি, নিবেদিতা লিখেছেন, '...From his answer I should say that there MIGHT be further negotiations. He filled his reply with light raillery–

1. If he were convinced that any great good to Humanity would be the result he would sweep away that worship without hesitation. To my look and surprise he added– 'of course, Just as if any good to humanity would be the result I would commit any crime that would take me to the Christian hell, without hesitation.'

2. He was astonished however to hear of this burning patriotism being so successfully impeded by this little Ramakrishna worship. Perhaps his idea of patriotism was different. He thought of the mad torrent of the Ganges sweeping over evey little hillock and sand bank. They were nothing to it.

3. It was nevertheless true that if the worshippers of Ramakrishna had a right to be considered, no less should Sarola's friends' objections be listened to. And then apparently he ended– I thought it a master stroke.'

সরলা ঘোষালের এই চিঠির প্রত্যুত্তরে স্বামীজিও একটি চিঠি দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই চিঠিতে (১৬ এপ্রিল, ১৮৯৯) স্বামীজি লিখেছিলেন 'যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন তো কাহাকেও দেখি নাই, সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু-একজন আমাদের hobby-র (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন, এই পর্যন্ত।... তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার এতটুকু খুঁত

আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি —আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?...বলি, ওরকম দেশহিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্ন বিচার, এত নাক সিটকানো? কে জানে কার কি মতি গতি। আমার যেন মনে হয়, ওসব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় ওরা যত পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।'

সরলা ঘোষালের ওই পত্রটি যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল না, বরং ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকেই সরলাকে দিয়ে এই ধরনের চিঠিটি লেখানো হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী কালে যখন সরলা স্বীকার করেছিলেন—স্বামীজির সঙ্গে পাশ্চাত্যে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর থাকলেও পরিবারের চাপেই তিনি সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এছাড়া, ঠাকুর পরিবারের প্রধান ব্যক্তিবর্গের অনুমতি ছাড়াই সরলা এরকম একটি প্রস্তাব স্বামীজিকে দিয়ে বসবেন— এমন ভাবনাচিন্তা বোধহয় ঠিক হবে না। তবে, এমন একটি প্রস্তাব দেওয়ার পরও, ঠাকুর বাড়ির আর-এক তরুণ সদস্য সুরেন্দ্রনাথ যে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তা-ও জানা যায় নিবেদিতার লেখায়। ৮ এপ্রিলের চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'Meanwhile Suren Tagore had written me to take his (Swamiji) case to a certain doctor– and let him know fees ! Is'nt it lovely of people?'

তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে স্বামীজি বরাবরই সন্দিগ্ধ ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতির ধারাটিও তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে নিবেদিতা যোগসূত্র গড়ে তুলতে চাইলেও, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার মেলামেশার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতার বাড়ির চা-চক্র এবং তারপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসার পরই স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'তুমি যতদিন ওই পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা চালিয়ে যাবে, ততদিন আমাকে বারবার সাবধান করে যেতেই হবে। ওই পরিবার বাংলাদেশকে শৃঙ্গার রসে কলুষিত করেছে।' জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, '...as long as you go on mixing with that (Tagore) family Margot I must go on sounding this gong. Remember that that family has poured a flood of erotic venom over Bengal.'

এরপরে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের কয়েকটি কবিতার (রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধারণা করলে ভুল হবে না) ভাব ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমার জীবনের উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের সঞ্চার। রামকৃষ্ণ বা বেদান্তের ভাবাদর্শ প্রচার শুধু নয়।' নিবেদিতা

লিখেছেন, 'Then he described some of their poetry. "But a man who left his own mother could not be tempted like that–and just you remember— if you long for the flesh pots of Egypt– my mission is not Ramakrishna's nor Vedantas– nor anything but simply to bring MANHOOD to this people.' 'I will help you Swami' I said. 'I know it' he said– 'And so I beat the alarm.'

ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতি সম্পর্কে কতখানি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন স্বামীজি তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে। ওই গ্রন্থের এক অংশে স্বামীজি লিখেছেন, 'ঐ যে একদল দেশে উঠেচে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন হোসেন' করেন।' স্বামীজির এই কটূক্তি যে ঠাকুর পরিবারের প্রতি তা বলে দিতে হয় না। আরো পরিষ্কার করে বললে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই তাঁর এই তীব্র কটূক্তির লক্ষ্য ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে নিবেদিতাকে একটি যোগাযোগ গড়ে তোলার অনুমতি দিলেও, রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতি কোনোরকম অবজ্ঞা এবং অসম্মান যে তিনি বরদাস্ত করবেন না— তা-ও নিবেদিতাকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীজি। এর প্রমাণও নিবেদিতার লেখাতেই আছে। ১৮৯৯ সনের ১ জানুয়ারি জোসেফিনকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা জানাচ্ছেন, 'He was quite fired up when I told him of criticism on Sri R.K. [Sri Ramakrishna] and said I was quite right to loose my temper. At this point he was very good to see.'

ব্রাহ্মদের মুখে রামকৃষ্ণদেবের সমালোচনায় নিবেদিতা যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হতেন এবং মেজাজ হারাতেন, তার প্রমাণও নিবেদিতারই আর একটি চিঠিতে রয়েছে। ১৮৯৯ সালের ৯ জানুয়ারি জোসেফিনকে তিনি লিখেছেন,' Yesterday I took tea and dined with the Roys and was disgracefully short tempered under criticism of Sri R.K. [Sri Ramakrishna] and his movement. I am so sorry–for as Swami says fighting does no good– but I pity the man who has much to do with the genuine Brahmo.' নিবেদিতার এই চিঠিতে যে রায় পরিবারের কথা উল্লেখ আছে, তাঁরা হলেন প্রসন্নকুমার রায় এবং তাঁর স্ত্রী সরলা রায়। সহজেই আন্দাজ করা যায় এর আগেও অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটেছিল। অথবা প্রসন্নকুমার রায়ের বাড়ির ঘটনাটাই সম্ভবত আরো একবার পরে জোসেফিনকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা উল্লেখ করেছিলেন। তবে, রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে ব্রাহ্মদের কটূক্তির কথা নিবেদিতার মুখে শুনেও স্বামীজি একটি চা-চক্রের আয়োজন নিবেদিতাকে করতে বলেছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে নিবেদিতার বাগবাজারের

বাড়িতে ওই চা চক্রের আয়োজন। ১ জানুয়ারির চিঠিতে জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Anyway he told me to get up a tea party and invite all my Brahmo friends and he would come and talk!!! You can guess whether I'm going or not. I am going to ask the Boses –Roys– (the other Roys also, because they are in the the set, though it was that little man who was so horribly familier the other evening) Mr. Mukherji– Mr. Mohini– Mr Tagore and Sarola Ghosal and her mother, I feel quite excited at being a hostess once more– with such a very big lion on show.'

নিবেদিতার চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে স্বামীজির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগসূত্র গড়ে তোলার সেই চা চক্রটিতে তিনি তারকা সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের সঙ্গে নিবেদিতার এই যোগসূত্র গড়ে তোলায় স্বামীজির কি মানসিক সম্মতি ছিল, নাকি নিবেদিতার বারংবার অনুরোধ এবং কিছুটা ঝোঁকের মাথায় স্বামীজি এই সম্মতি দিয়েছিলেন, তা-ও ভাবার বিষয়। কেননা এ নিয়ে স্বয়ং নিবেদিতার মনেই সংশয় ছিল। ১ জানুয়ারির চিঠিতে সে সংশয় তিনি প্রকাশও করেছেন। নিবেদিতা লিখছেন, ' Make inroads into the Brahmos. Was this just a passing spirit? The result of my Brahmo encounters, which interested him greatly? I can not tell.'

তবে, নিবেদিতা যে ব্রাহ্ম সমাজ এবং ঠাকুর পরিবারের কাছে যথেষ্ট গ্রহণীয় ছিলেন, তা স্বামীজি জানতেন। সেক্ষেত্রে নিছক ঝোঁকের মাথায় স্বামীজি ব্রাহ্মদের ভিতর অনুপ্রবেশ করতে বলেছিলেন নিবেদিতাকে এমনটিও বোধহয় ঠিক নয়। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজনকে প্ররোচিত করে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের দিকে টেনে আনার জন্য নিবেদিতাকে অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করতে চাইতে পারেন স্বামীজি। সেক্ষেত্রে, এটি স্বামীজির একটি কৌশল মনে করলেও ভুল হবে না।

সরলা ঘোষালের কাছ থেকে ওই অপমানজনক প্রস্তাবটি স্বামীজির কাছে আসার পর নিবেদিতা বুঝেছিলেন তাঁর যাবতীয় প্রয়াস কার্যত ব্যর্থই হয়েছে। শুধু ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়, এই ধরনের প্রয়াস যে আর ভবিষ্যতে কখনো নেওয়া যাবে না— তা-ও উপলব্ধি করেছিলেন নিবেদিতা। সেই সঙ্গে এইরকম একটি চিঠি ঠাকুরপরিবার সম্পর্কে একটি তিক্ততারও জন্ম দিয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ১মে জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখছেন,'Sarola came yesterday. She was sweet –but she has a curious nature and this worship of her own family is very irritating. If she could only once go to England and see how big the world is she would realise how very common even quite distinguished gentlemen are in certain social circles, and cease to worship her uncle and cousin in this agressive way. She's always telling me that her cousin Suren is

a grater man, if I only knew it, than Dr. Bose!!! And she insinuates or declares that her uncle is the leader of young Bengal. But why, if so, she is so anxious to make an alliance between this group two does not appear. She seriously contemplates our entering into a treaty regarding Ramakrishna worship in order to get them!!! I asked her why they couldn't help us as we are. And she said their family credit would be lost. So we are to give up a custom deep in the hearts of all who knew Him, in order 'to save the honour of the Tagores.' After all, who are the Tagores.'

নিবেদিতার এই চিঠি থেকেই আন্দাজ করা যায়, সরলা ঘোষালের প্রস্তাবটি প্রকৃত পক্ষে ঠাকুর পরিবারের নেতৃস্থানীয়দের মস্তিষ্কপ্রসূত, যে কারণে সরলা তাঁদের পরিবারের 'গ্রহণযোগ্যতা'র (credit) কথা বলেছেন। আর ঠাকুর পরিবারের প্রতি নিবেদিতার উষ্মাও পরিমাপ করা যাচ্ছে একটি পঙ্‌ক্তিতে: 'After all, who are the Tagores'

ঠাকুর পরিবারের সম্পর্কে তাঁর মনে এই তিক্ততা সৃষ্টি হলেও নিবেদিতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ হননি বা রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথও নিবেদিতার প্রতি যথেষ্টই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। স্বামীজির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য থাকলেও নিবেদিতা কিন্তু এর পরও ঠাকুর পরিবার এবং ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন করেননি। আসলে, রুচিশীল, বাগ্মী, প্রগতিমনস্কা নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে, স্বামীজি ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ব্রাহ্মদের এই বিরোধটা ছিল আদর্শগত। সেই বিরোধকে আদর্শগত লড়াইয়ের জায়গাতেই তিনি রাখতে চেয়েছিলেন। তাকে কখনো ব্যক্তিগত বিরোধের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চাননি। আর চাননি বলেই এই ঘটনার পরও ওই বছর মে মাসে, স্বামীজির বিদেশযাত্রার পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে ছুটি কাটিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ৮ মে ১৮৯৯ তারিখের এক চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে এই বাসনার কথা জানিয়ে নিবেদিতা লিখছেন,' They say the King goes in a fortnight. If so I shall probably take 10 days up the river with Robindra Nath Tagores immediately after. I will not go before...'এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, স্বামীজির কলকাতার বাইরে থাকার সময়টিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়ার ঠিকঠাক সময় বলে মনে করেছিলেন। মনে হয়, ঠাকুর পরিবারের ওই ব্যবহারের পরে তিনি স্বামীজির সাক্ষাতে এমন কিছু করতে চাননি, যাতে স্বামীজি ব্যথিত হন। তবে, নিবেদিতার অবশ্য সেবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়া

হয়নি। স্বামীজির সঙ্গে সেবার তাঁকেও বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহে সেবার বিদেশে পাড়ি দিতে হয়েছিল নিবেদিতাকেও।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের রসায়নটি ছিল অদ্ভুত। দুজনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও দুজনের মতের কখনো মিল হয়নি। বরং দুজনের ভিতর একটি তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বরাবরই অব্যাহত ছিল। রাজনীতির সঙ্গে নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ায় পর কবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাঁর এবং নিবেদিতার চলার পথ যে এক নয়, তা রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটা তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্ততঃ আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে। সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয়ের দিনক্ষণটি ঠিক জানা না গেলেও এটুকু জানা যায়, ১৮৯৮-এর প্রথমভাগে নিবেদিতা কলকাতা আসার পরই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণায় বলা যায়, ১৮৯৮-র প্লেগে নিবেদিতার ত্রাণকার্যে রবীন্দ্রনাথ সহায়তা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সেইসময় কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করেছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্সপেকশনে গেছেন।' ১৮৯৮র প্লেগের সময় ঠাকুর পরিবারের ভূমিকার প্রশংসা নিবেদিতাও করেছেন। Calcutta notes-এ নিবেদিতা লিখেছেন, 'A few great Hindu families, notably the Tagores, stood firm, in the hope of allaying the agitation.'

বলা দরকার, ১৮৯৮ সনে কলকাতায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে জোর করে প্লেগের টিকা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিক্ষোভ প্রশমিত করতে ঠাকুর বাড়ির সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসাই করেছিলেন নিবেদিতা। তবে,

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়টি আরো দৃঢ় হয়েছিল ১৮৯৮-এর শেষভাগ থেকে। ১৮৯৮-এর শেষভাগে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সারা বুল এবং নিবেদিতা উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসার পর আমেরিকান কনসাল জেনারেলের অতিথ্য গ্রহণ করেন কিছুদিনের জন্য। সেই সময় আমেরিকান কনসাল জেনারেলের স্ত্রীর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্ম সমাজের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে নিবেদিতাও যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৯ সালের ১৬ জুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, '...I am really not at all happy to be going away from India– even for a little while– and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I could not help hoping you should be my friend too!

'But I hope that the greater ends may be better served by my going than by my staying– and if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.'

এই চিঠিতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করতে আগ্রহী ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, কবির সৌজন্যবোধ, কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিত্ব, সুদর্শন চেহারা— এসবই প্রথম আলাপের পর রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অপর দিকে প্রথম আলাপে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেননি। অন্য আর-পাঁচজন মিশনারির মতোই নিবেদিতাকে ঠাহর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত: ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।'

এই ভুল ধারণা থেকেই নিজের কন্যাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের প্রস্তাব নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং নিবেদিতাও প্রথম সাক্ষাতেই সেই প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ' সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি

বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেইটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো মনে হয় না।

'মোটের উপর তাঁহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতে পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই, আমরা প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটারকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়— তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিন্তাবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

'যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কিনা, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালী মতোই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করিতে চাহি না। বোধ করি, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনারির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।'

নিবেদিতা যে আর-পাঁচজন মিশনারির মতো বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এই দেশে আসেননি, এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই হয়েছিল। কেননা, ওই লেখাতেই তিনি লিখেছেন, 'অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই— তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধায়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

'কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষকে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।...বস্তুত: তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যেমনি হোক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব, তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত অলোচনা করি, তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।'

কিন্তু নিবেদিতার মৃত্যুর পর ভূয়সী প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি নিয়ে সংশয় আছে। সংশয়টি এই যে, রবীন্দ্রনাথ কি নিবেদিতার মৃত্যুর পর স্বত:প্রণোদিত হয়ে এই লেখাটি লিখেছিলেন, অথবা, কারও পরামর্শে কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখাটি লিখেছিলেন তিনি? এই ধরনের সংশয় উদ্রেকের কিছু কারণও আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের পর নিবেদিতা কবির ব্যক্তিত্বে, সংস্কৃতিমনস্কতায় এবং সৌজন্যবোধে মুগ্ধ হলেও, পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে কবির প্রতি কিছুটা ক্ষোভও তাঁর ভিতর জন্ম নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিপ্লববাদের প্রতি অনাস্থা দেখে নিবেদিতা কবির দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। অপরদিকে নিবেদিতার কর্মকাণ্ড রবীন্দ্রনাথেরও না-পসন্দ্ ছিল। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিলেন। ১৯১১-র অক্টোবরে নিবেদিতার প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমদিকে আশ্চর্যভাবে নীরব ছিলেন। নিবেদিতা প্রয়াত হন ১৯১১-র ১৩ অক্টোবর। ১৭ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় রাখিবন্ধন এবং অরন্ধন উৎসব পালন করেছেন। তারপর ২১ অক্টোবর শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। ২৩ অক্টোবর কলকাতায় এসে দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে ভাইফোঁটা নিয়েছেন। এতসব কিছুর মাঝে নিবেদিতা সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করছেন না। অথচ, নিবেদিতার প্রয়াণের পর বাংলার শিক্ষিত সমাজে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। বিশিষ্ট জনেরা শোকপ্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিবেদিতা সম্পর্কে নানাবিধ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্যরকম নির্লিপ্তি সত্যিই রহস্যজনক।

স্বত:প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং, অন্যদের অনুরোধেই যে নিবেদিতা সম্পর্কে কবি এই লেখাটি লিখেছিলেন, তার একটি প্রমাণও রয়েছে। নিবেদিতার মৃত্যুর দু বছর পর, ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর এডওয়ার্ড জন টমসনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'I did not like her... She was so violent... she had

a great hatred for me and my work, especiallly here, and did all she could against me. She was so confident that I was unpatriotic and trucking to modern thought.'

এই যদি নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব হয়, তাহলে নিবেদিতাকে উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা জানিয়ে অমন একটি লেখা লিখেছিলেন কেন? সে কি বিভিন্ন জনের অনুরোধে কোনো পরিস্থিতির চাপে? টমসন একথাও জানতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। এবং এর উত্তরেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন বিভিন্ন জনের অনুরোধে, পরিস্থিতির চাপেই তিনি ওই লেখাটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ টমসনকে বলেছিলেন, 'Well, she was simply full of love for my country and I have seen her many a time working amid the most dreradful privations, especially for a woman brought up as she was. And she was always so bright and cheerful. So I felt about I couldn't refuse to write about her when they asked me.'

উল্লেখ্য, বন্ধু জগদীশচন্দ্রের অনুরোধেই নিবেদিতাকে নিয়ে এই লেখাটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। পরিস্থিতির চাপে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অপছন্দের ব্যক্তিদের সম্পর্কেও সুখ্যাতি করতেন— সে উদাহরণ অবশ্য আরো আছে। চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অতি তিক্ত। চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট রুচিবহির্ভূতভাবে আক্রমণ করা হত। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণের পর, ১৯২৫ সালে ১৮ জুন, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চল্‌চে। যেমন আশুবাবুর মৃত্যুঘটনায় দেশের লোকের সঙ্গে আমাকে যোগ দিতে হয়েছিল এক্ষেত্রেও আমার তাই করা কর্তব্য কিনা ভালো করে ভেবে দেখিস। বিশেষত চিত্তর সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল—একথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূলভাব আছে। আর কিছু নয় কলকাতায় গিয়ে ওদের বাড়িতে একবার দেখা করে আসা উচিত হবে বলে বোধ হচ্ছে। নিতান্ত যদি সভাসমিতিতে টানাটানি করে তাহলেও দু-চার কথা বলতে হবে।'

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, নিজের ভাবমূর্তিকে গ্রহণযোগ্য এবং উজ্জ্বল করার তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ শোকপ্রকাশে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। নিবেদিতাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে ওই লেখাটিও রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াস—এমন ভাবলেও বোধকরি ভুল হবে না। অথচ, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার মানসিক ঐক্য যে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। জানতেন বলেই, রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন, 'অন্ততঃ আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর

বাধা অনুভব করিতাম।' নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এই আপাতবিরোধ সম্পর্কে লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও রবি ঠাকুরের কাছে নিবেদিতার চরিত্র জটিল বলে মনে হত। অনেক আপাত বিরোধ তাঁর স্বভাবে। নিবেদিতার কল্পনার ঔদার্যে কবি মুগ্ধ হয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁর স্বভাবের রোখ আর মাত্রা ছাড়া উৎসাহ তাঁর ভাল লাগত না।' তবে বন্ধুর একান্ত অনুরোধেও যদি লিখে থাকেন, তবু স্বীকার করতেই হবে, নিবেদিতা সম্পর্কে এত সুন্দর মূল্যায়ন এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি কম ভারতবাসীই দিতে পেরেছেন, যা রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন।

আরো একটি বিষয়েও বোধহয় কবি নিবেদিতার প্রতি বিরক্তি বোধ করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা প্রগতিশীল নিবেদিতাকে ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম থেকেই পছন্দ করত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের যথেষ্ট পছন্দের পাত্রী ছিলেন নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সংস্পর্শ ছেড়ে নিবেদিতা ব্রাহ্মদের দিকে ঝুঁকুন —এইরকম একটা আকাঙ্ক্ষা হয়তো ছিল ঠাকুর পরিবারের, এমনকী রবীন্দ্রনাথেরও। ১৯২১ সনের ২৪ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়াছেন।' এই একটি পঙ্‌ক্তিতে বোঝা যায়, নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হওয়ায় কী পরিমাণ হতাশ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধিও হয়তো হয়েছিল যে, বিবেকানন্দকে পরিত্যাগ করে নিবেদিতা কোনোদিনই ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ হবেন না। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'অধ্যাত্মজীবনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিবেদিতা নুইয়ে দিয়েছেন গুরুর কাছে, অথচ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ এবং শাণিত বিচারবুদ্ধি। এটাই রবি ঠাকুরের আশ্চর্য লাগত। একদিন সকালে দুজনে একটা জটিল দর্শনের বই নিয়ে আলোচনা করছেন— বইটা বাংলায়। এমন সময় বেলুড় থেকে খবর এল স্বামীজি নিবেদিতাকে ডাকছেন। নিবেদিতা অমনি থেমে গেলেন, তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। বুদ্ধি যেন আর কাজ করছে না, আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রাহ্ম বন্ধুর কাছে এসব গোপন করবার চেষ্টাও করলেন না। বলে উঠলেন, 'স্বামীজির আশীর্বাদ অনুক্ষণ আমায় ঘিরে আছে। এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে।' হতবাক বিস্ময়ে রবি ঠাকুর দেখলেন, তাঁর প্রখর বুদ্ধিমতী বান্ধবী হঠাৎ গুরুগতপ্রাণা সেবিকা হয়ে গেছেন। অস্ফুটে বললেন, 'নিবেদিতা অন্তরের ভক্তি নিবেদন করবার মানুষ পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নাই।' এখানে একটি কথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে, বিবেকানন্দের প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের যতই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করুন না কেন, স্বামীজির রামকৃষ্ণ-অনুরাগ বরাবরই কবির কাছে 'বিরক্তি'র এবং 'অপছন্দ'-এর বিষয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার মতান্তর এবং মনান্তরের ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছিল, যার মধ্যে একটি হচ্ছে বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব শৈব উপাসক মোহন্তর

হাতে থাকবে, নাকি বৌদ্ধদের হাতে তা অর্পিত হবে। আর একটি, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণকালে 'গোরা' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে দুজনের মতান্তর। এই দুটি ঘটনাই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। বস্তুত, ১৯০৪ সালে শিলাইদহে কবির সঙ্গে মতান্তর হওয়ার পর আর সেভাবে দুজনের ভিতর বন্ধুত্বের সেতু কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি। বরং, এরপর যে সাতবছর নিবেদিতা জীবিত ছিলেন, নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসম্ভব নির্লিপ্তই ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও নির্লিপ্ত থেকেছেন নিবেদিতার বিষয়ে।

বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথের বিরোধের সূত্রপাতটির মূল কারণ ছিল, তাঁদের আদর্শগত পার্থক্য। এর আগে বুদ্ধগয়ার মন্দির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরেই পালন করে আসছিলেন শিব উপাসক মহন্তরা। বস্তুত, এইরকম একটি ধারণা তাঁদের ভিতর ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি রূপান্তর। হিন্দুধর্মই নানাবিধ সংস্কার এবং আচার বিচারের বন্ধন মুক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্মের রূপ লাভ করেছে। বস্তুত, স্বামী বিবেকানন্দও এই মতাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামীজির এই মতবাদ জানাতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি (বিবেকানন্দ) বলিলেন,'কখনো ভেবো না যে, ভারতে কোনকালে বৌদ্ধধর্ম বলে কোন পৃথক ধর্ম ছিল, আর তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিত প্রভৃতি ছিল। একেবারেই নয়। বৌদ্ধধর্ম চিরকাল ছিল হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেবল এক সময় বুদ্ধের প্রভাব অত্যধিক হয়ে উঠে, এবং তার ফলে সমগ্র জাতি সন্ন্যাসপথ অবলম্বন করে।' আমার বিশ্বাস, বহু সময় এবং অধ্যয়নের দ্বারাই কেবল এই মতবাদের সত্যতা পণ্ডিতগণের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রতিপন্ন হইবে।' নিবেদিতার লেখার এই অংশটি থেকে এ-ও বোঝা যাচ্ছে, স্বামীজির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কারপ্রাপ্ত রূপ।

বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত স্বামীজির জীবিতাবস্থাতেই। পরে এই বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে ১৯০৪ সালে। অনাগরিক ধর্মপাল চেয়েছিলেন বুদ্ধগয়ায় শৈব মহন্তদের সরিয়ে সেখানে বৌদ্ধধর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। আরো সোজা কথায় বললে, বুদ্ধগয়ার অধিকার বৌদ্ধদের হাতে চেয়েছিলেন তিনি। এ নিয়ে অনাগরিক ধর্মপাল বিভিন্ন মহলের দ্বারস্থ হন; মামলা-মোকদ্দমাও করেন। ফলে, বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের একটি বিরোধ দেখা দেয়। এই বিতর্কে ব্রিটিশ সরকার অবশ্য সরাসরি অংশ নেয়নি; তবে, পরোক্ষে ব্রিটিশ সরকার অনাগরিক ধর্মপাল এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিদেরই সাহায্য করেছিল। বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল তার হদিশ পাওয়া যায় লিজেল

রেমঁর লেখায়। রেমঁ লিখেছেন, 'আকাশ-বাতাস তখন ঝড়ের সূচনায় থমথমে। রুশ-জাপানে যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ বৌদ্ধদের জোর দাবি এড়ানো প্রায় অসম্ভব। ব্যাপারটা ধর্ম সংক্রান্ত হলেও বৈদেশিক প্রভাবের প্রশ্ন কিন্তু এড়ানো গেল না। লণ্ডন আর টোকিও সরকারের পাঠানো উপদেষ্টারা যে-যার স্বার্থ বুঝে কাজ করতে লাগলেন, গণ্ডগোল তাতে বেড়েই চলল। বুদ্ধগয়ার ব্যাপারের সঙ্গে সব হিন্দুই নিজেদের জড়িত মনে করতে লাগলেন।'

এইরকমই একটি অশান্ত পরিস্থিতিতে ১৯০৪ সালে লখনউ যাওয়ার পথে নিবেদিতা এসে পৌঁছলেন বুদ্ধগয়ায়। তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বামী সদানন্দ এবং স্বামী শঙ্করানন্দ। বুদ্ধগয়ায় এসে শৈব মহন্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন তাঁরা। বুদ্ধগয়ায় অবস্থান কালেই নিবেদিতা মহন্তের কাছে শোনেন, ব্রিটিশ সরকার কেমন চক্রান্ত করে তাঁকে উৎখাত করে বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব অনাগরিক ধর্মপালের হাতে সমর্পণ করতে চাইছে। স্বভাবতই মহন্তের কাছে পাওয়া এই সংবাদে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন নিবেদিতা। মহন্ত তাঁকে এ-ও জানান, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে একটি 'উপাধি' দান করে প্রভাবিত করতে চাইছে। কিন্তু সে উপাধি গ্রহণে মহন্ত নারাজ। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ তারিখের এক চিঠিতে সারা বুলকে সে কথা জানিয়েছেনও নিবেদিতা। লিখেছেন, 'The Govermnent is struggling with the Mahunt to make him 'accept a title'. But he says 'What can a government give to me? Surely this is no title greater than Mahunt!' The fact is, he tells us, those who have accepted their lands etc. from Government have had to sign a declaration that they had no right of their own. This he will not do. It is the old tussle of Church with the state, and as this time the Church is the people and the State is foreign, we MUST pray for the clergy and the Faith.' নিবেদিতার চিঠির অংশবিশেষ পড়লে ব্রিটিশ সরকারের রাজনীতিটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই বিতর্কে নিবেদিতা কিন্তু খোলাখুলি মহন্তের পক্ষ নিলেন। বুদ্ধগয়ায় হিন্দু অধিকার চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। লিজেল রেমঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিবেদিতা এবং শৈব মহন্তর বৈঠকের বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার খুব ভালো চোখ নেয়নি। সরকারের গোয়েন্দারা এ সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছিল।

এরই ভিতর বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত লর্ড কার্জনের একটি গোপন নোট নিবেদিতার হাতে এসে পড়ে। ওই নোটে কার্জন বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের অধিকারের পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন। নোটে কার্জন লিখেছিলেন, 'That Bodh-Gaya is a Buddhist shrine, built by Buddhists in commemoration of the most sacred

incidents of the life of their master, intended for the accomodation of Buddhist Images and Buddhist worship and treated as the object of Buddhist pilgrimage from all parts of eastern world, with only occasional interruptions for a period of two thousand years, does not admit the dispute. That no question of Hindu worship was even created till 1727 A.D, when the grant of the neighbouring village was for the first time made by the Mogul sovereign to the then Mahanth, is also indisputable...'

কার্জনের এই নোটটি আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে নিবেদিতাকে। বুদ্ধগয়ায় হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সপক্ষে বক্তব্য রেখে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লেখেন, 'The Bodh-Gaya temple was nor built by Asoka as ignorantly supposed. Its' date was fairly well-established by Rajendralal Mitra, at some time in the 1st century A. D. In Asoka's time only the great rail was placed round the great court which enclosed the Tree.

'...At any rate, no one denies and the order of Bodh-Gaya maintains that to Sankaracharya (788-820 AD) passed the charge of the Shrine of Bodh-Gaya, and that he committed its keeping into the hands of Giri order of his spiritual descendants (we of Ramakrishna are Puris).

'...As Buddha is the glory of Hinduism, even so in Bodh-Gaya the glory of India, and there are few things of which the Indian people have such a right to be proud as the history in relation to it, of Sankaracharya and his Giri Monks.'

র‍্যাটক্লিফকে লেখা এই চিঠিতেই অনাগরিক ধর্মপালকেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'All this trouble stirred up by that wretched fanatic Dahrmapala out of misguided idea of glorifying Buddha! At bottom, ignorance of history and limitation of religious ideas. As if 'hard-shell Baptists' tried to take exclusive possession of Westminister Abbey.'

বুদ্ধগয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে এক জনমত গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা। ওই বছরই মার্চ মাসে আবার তিনি সারা বুলকে সঙ্গী করে বুদ্ধগয়ায় এলেন। মোহন্তর সঙ্গে আলোচনা করলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজের বক্তব্যের সমর্থনে লেখালিখিও শুরু করলেন। বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে তাঁর এই প্রচার অভিযানকে নিবেদিতা ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত

করে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে, বুদ্ধগয়া নিয়ে নিবেদিতার এই আন্দোলন তখন দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছিল।

বুদ্ধগয়া নিয়ে তাঁর এই আন্দোলনে নিবেদিতা সেই সময় সমর্থন লাভ করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের। যদিও তার অনেক আগেই, ১৯০২ সালে, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল— তবু এ কাজে নিবেদিতাকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ। রেমঁ লিখেছেন, 'নিজের কার্যকলাপের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানাতে তিনি সস্নেহে হাসলেন একটু। বেশী কথা বলেন না ব্রহ্মানন্দ। আলাপ-আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ মা, খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা-একা নিবেদিতা যেভাবে কাজ করে চলেছেন, দেখে সন্ন্যাসীর চমক লাগে। এ রুদ্রবীর্য কি চিরদিন সমান থাকবে?' ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে এ প্রস্তাবও দেন যে, নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করুন, সেখানে ইতিহাসের পাঠ দেওয়া হবে। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে (৩ মার্চ, ১৯০৪) ব্রহ্মানন্দের এই প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'Swami Brahmananda is now empowering me to start a History School at Bodh -Gaya–with a group of young men. This I hope to make into a sort of College–Post University Extension. Here I hope to work out my thought. Elsewhere, I look forward to carrying out schemes. But it remains to be seen where the money will come from.'

বুদ্ধগয়াকে নিয়ে নিবেদিতার এই আন্দোলনকে ইংরেজি কাগজগুলো খুবই সমালোচনা করেছিল। নিবেদিতা অবশ্য তাতে কর্ণপাত করেননি।

এই সময়ই নিবেদিতা ঠিক করেন, বুদ্ধগয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সমাজের বিশিষ্টজনদের পাশে পাওয়া দরকার। সেই ভাবনা মাথায় রেখেই তিনি কলকাতা থেকে কয়েকজনকে বুদ্ধগয়ায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। কাদের বুদ্ধগয়া নিয়ে যাবেন তার একটিতালিকাও তৈরি করেন ফেলেন নিবেদিতা। এই তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯০৪-এর ১৫ অক্টোবর জোসেফিনকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা জানাচ্ছেন, 'We have been a party of 20 spending 4 days at Bodh Gaya– in the Guest House – and I think it has been an event in all our lives. The Boses were there– and 2 children, 4 in all. The Poet [Rabindra Nath Tagore] was there with his son and a friend– a prince with his tutor. 3 of my boys, a distinguished scholar and another friend, and Swami Sadananda and his nephew. also Christine.' নিবেদিতার পত্রে যদুনাথ সরকারের উল্লেখ নেই। তার কারণ মনে হয়, যদুনাথ কলকাতা থেকে

এই দলের সঙ্গী হননি। তিনি পাটনা থেকে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে, এই দলে আর কারা কারা ছিলেন তা নিয়ে প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা আরো কয়েকজনের নাম জনিয়েছেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা জনিয়েছেন, 'স্টেটসম্যান' কাগজের সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের স্ত্রীও এই দলে ছিলেন। আত্মপ্রাণার তালিকায় আছে মথুরানাথ সিংহের নাম। সবার তালিকা মিলিয়ে মোটামুটি আঠার-উনিশ জনের নাম পাওয়া যায়। তবে, বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিতাই প্রথমে আমন্ত্রণ জানান কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সংশয়ের কারণ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডায়েরি। ডায়েরিতে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'Miss Noble বুদ্ধগয়ায় যাবার জন্য একটা Party করেছেন। বাবাকে জগদীশবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাদেরও নিয়ে যেতে বলেছেন।' রথীন্দ্রনাথের ডায়েরির এই অংশটি পড়লে এমনই ধারণা হয় যে, জগদীশচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধগয়া যাত্রার সঙ্গী করেন।

তবে, নিবেদিতা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এঁদের বুদ্ধগয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই লক্ষ্যে এঁরা অনেকেই, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্রের মতো দুই ব্যক্তিত্ব যে সহায়ক হবেন না— তা নিবেদিতার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। নিবেদিতা তা বোঝেননি। অনুমান করা যায়, আবেগের বশবর্তী হয়েই নিবেদিতা তখন সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করে ফেলেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বরাবরই স্বামীজির মতাদর্শের প্রবল বিরোধী ছিলেন। স্বামীজির ধর্মমতের ব্যাখ্যা মানতে নারাজ ছিলেন জগদীশচন্দ্র। স্বামীজি সম্পর্কে বহু কটু বাক্য এর আগেই তিনি নিবেদিতার সামনে উচ্চারণ করেছিলেন। নিবেদিতার বোঝা উচিত ছিল, স্বামীজির ব্যাখ্যা অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কারগত রূপ—এ তত্ত্ব কখনোই জগদীশচন্দ্র মেনে নেবেন না। বরং, তিনি বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব শৈব মহন্তদের হাতে অর্পণ করার বিরোধিতাই করবেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধব জগদীশচন্দ্রকে বুঝতে সেদিন ভুলই করেছিলেন নিবেদিতা।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অনাগরিক ধর্মপালের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধর্মপাল মাঝেমাঝেই জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল ধর্মপালের। ধর্মপালের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি সম্পন্নও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তদুপরি, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথও স্বামীজির ধর্মচিন্তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি কোনোদিনও। নিবেদিতার এক্ষেত্রে বোঝা উচিত ছিল— বুদ্ধগয়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও কোনো সমর্থন তিনি পাবেন না। রবীন্দ্রনাথ এর অনেক আগেই বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব থেকে মহন্তকে সরানোর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পালামৌ জেলার তদানীন্তন ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন, 'ইতিমধ্যে মোহন্ত বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সে বলে গবর্মেন্টের অনুমতি ব্যতীত সে জমি দিতে পারে না। তুমি তাকে একটু বিশেষ রকম তাগিদ দিতে পার না?' এইরকম বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মানুষদের নিয়ে বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য কখনোই সফল হতে পারে না। হলও না। অবশ্য বুদ্ধগয়ার সমস্যা শেষ পর্যন্ত মিটে গিয়েছিল। হিন্দু মহন্তের হাতেই দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল বুদ্ধগয়ার।

অবশ্য বিবেকানন্দগতপ্রাণা নিবেদিতার সঙ্গে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের আত্মিক মিলন কখনোই সম্ভব ছিল না। রাজনৈতিক মতের দিক দিয়েও দুজনে ছিলেন দুই মেরুর বাসিন্দা। নিবেদিতা যেমন রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ, তাঁর হিমালয় সদৃশ সাহিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথও নিবেদিতার বাগ্মীতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন—একথা ঠিক। কিন্তু দুজনের আত্মিক মিলনের মাঝখানে বিরাট একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দ নির্দেশিত যে হিন্দু ধর্মের প্রতি নিবেদিতা একনিষ্ঠ ছিলেন—তা রবীন্দ্রনাথের না-পসন্দ ছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি নিবেদিতার ঝোঁক, বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। দুজনে ছিলেন দুই ভিন্ন দর্শনের উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ এবং সাহিত্য প্রতিভার যতই কদর করুন না কেন, কবি যে তাঁর 'মনের মানুষটি' নন একথা জানাতেও ভোলেননি নিবেদিতা। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন (১৫ অক্টোবর, ১৯০৪), 'The Poet, Mr. Tagore, was a perfect guest. He is almost the only Indian man I have ever seen who has nothing of the spoiled child socially about him. He has a naif sort of vanity in speech which is so childlike as to be rather touching. But he thinks of others all the time–as no one but a Western hostess could. He sang and chatted day and night –was always ready– either to entertain or to be entertained– served Dr. Bose as if he were his mother–struggles all the time between work for the country and the national longing to seek Mukti. In short –never was any man so ridiculously maligned when suspected of things vulgar and immoral. But for all this, Mr.Tagore's is not the type of manhood that appeals to me. He is much more attarctive to Christine.'

'Manhood' বলতে নিবেদিতা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে নানারকম বিতর্ক থাকতে পারে। তবে স্বভাবে শান্ত সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবেন বলে বোধকরি কবির প্রতি কিছুটা কটাক্ষই করেছিলেন তিনি।

আদর্শগত এই দূরত্ব থাকলেও, রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন বড় অনুরাগী নিবেদিতা বরাবরই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে 'ছুটি', 'দেনাপাওনা' এবং 'কাবুলিওয়ালা' এই তিনটি গল্পের

অনুবাদ করেন নিবেদিতা; যদিও নিবেদিতার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র 'কাবুলিওয়াল'র পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 'কাবুলিওয়াল'র অনুবাদ নিয়ে তিনি যে ব্যস্ত ছিলেন তা জানা যায় ১৯০০ সালের ২২ নভেম্বর সারা বুলকে লেখা একটি চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I must not stay writing long– for I have finished the Cabuliwalah and must have the introduction ready tonight. So I must hurry on.'

পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা প্রসারে নিবেদিতার ভূমিকাকে বরাবর সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন। নিবেদিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এইজন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাহার এমন অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি গলির কোণে যে কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন তাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।'

নিবেদিতার শিক্ষাদান প্রণালীতে এতটাই উৎসাহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে তাঁকে একটি স্কুল চালু করতেও অনুরোধ করেন কবি। ১৯০৪ সালে ৪ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে এ কথা জানিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Mr. R.N. Tagore has offered me his beautiful house for a Normal School. But I must have someone else as the centre of that undertaking.'

নিবেদিতা যে স্কুলটি চালু করার বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী এবং উদ্যোগী হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা একটি চিঠিতে। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়িতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না। আর টাকার দরকারও মনে হয়।' তবে, এই স্কুলটি শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা শুরু করতে পারেননি। হয়তো দুটি কারণ এর পিছনে ছিল। প্রধানত, অর্থাভাব এবং দ্বিতীয়ত রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়া।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের আনা 'ইউনিভার্সিটি বিল'-এর প্রতিবাদেও নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি এসেছিলেন। লর্ড কার্জনের এই বিলটি পাশ করানোর দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটি সরকারের কুক্ষিগত করা এবং

উচ্চশিক্ষার অধিকার সংকোচন করে আনা। লর্ড কার্জনের এই বিলের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী? আমাদের কানে এ কথাটি অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।... সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেমব্রিজ অক্সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে— কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেশন করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।'

ঠিক একইরকম ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছিল নিবেদিতার কণ্ঠেও। ২৮ জানুয়ারি, ১৯১৩— নিবেদিতা লিখলেন, 'We have had a Universities commision lately, which has done its very best to kill all Education, and especially all Science Education.

'This is the point in India's wrongs that fires me-

'The right of India to be India.

'The right of India to think for herself.

'The right of India to knowledge.'

১৯০৪ সালের ৪ জুলাই জোসেফিনকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I can not tell you how avenues of work are multiplying nor how the pressure upon the people, to deprive them of Education, is multiplying also. But if only we put our shoulders to the wheel, I have great hope that every attack of Government on thought will only succeed in driving knowledge deeper, and making it sounder and truer. I think this, because I belive that the People already have that minimum from which they cannot be dislodged. And if I am right, Lord Curzon will stand in history as the most anti-British influence that India ever saw.'

কিছু বিষয়ে দুজনের মতের ঐক্য থাকলেও সার্বিকভাবে যে কখনোই মতৈক্য সম্ভব নয়, এবং নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর চলার পথ যে আদতে ভিন্ন, তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা

বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সহিত মিলিয়া চলা কঠিন ছিল।...তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দন্ত জোর ছিল এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে।... তাঁহার এই পাশ্চাত্য স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না— কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, তাহাই মানুষের শত্রু— তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেকদূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল।' নিবেদিতার এই 'উদগ্র প্রবলতা'কেই রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। জগদীশচন্দ্র বসুর আত্মীয় অরবিন্দমোহন বসুর কথায়, 'নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংঘর্ষ হত; নিবেদিতার উগ্র জাতীয়তা রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে তুলত; ও বস্তুটা তাঁকে ধাক্কা দিত, যার থেকে তিনি নিজে সরে এসেছিলেন।' অরবিন্দমোহন বসুর লেখা থেকেই আঁচ পাওয়া যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথের ভিতর একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য আরো তীব্র হয় শিলাইদহে, কবির আতিথ্যে থাকার সময়। মতানৈক্যটি সৃষ্টি হয় 'গোরা' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। ১৯০৪ সালের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সিস্টার ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা শিলাইদহে যান, কয়েকদিন পদ্মাবক্ষে কবির সঙ্গে ছুটি কাটানোর জন্য। ওই সময়ে জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুও পদ্মাবক্ষে কবির সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। পদ্মাবক্ষে ছুটি কাটানোর সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসটি শোনান নিবেদিতাকে। উপন্যাসটির মূল চরিত্র গোরা নিবেদিতার চরিত্র অনুসরণ করেই লেখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গোরা নিবেদিতাকে ক্ষুব্ধ এবং আহত করে। উপন্যাসের গোরার মতোই নিবেদিতাও নিজে আইরিশ। গোরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ করলেও তাকে তার শিষ্য সুচরিতা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, জন্মসূত্রে গোরা ভারতীয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গোরার এই ছিল প্রাথমিক খসড়া। রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন, বিদেশি বংশোদ্ভূত কেউ যতই ভারতীয়রা জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে চান না কেন—ভারতীয়রা তাঁকে আপনার জন হিসাবে গ্রহণ করবে না। স্বাভাবিকভাবেই, রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিত নিবেদিতাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। উপন্যাসের গোরার মতোই নিবেদিতাও ভারতকে ভালোবেসে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল, কবি যেন বলতে চাইছেন, নিবেদিতার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

তবে, 'গোরা'-র এই প্রাথমিক খসড়ার সঙ্গে পরবর্তীকালে মূল উপন্যাসের কিছুটা তফাৎ আছে। 'গোরা'-র প্রাথমিক খসড়া যে এইরকমই ছিল এবং তা যে কিছুটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তা বোঝা যায় পরবর্তীকালে

পিয়ারসনকে লেখা কবির একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, 'You ask me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita. She was our guest in Shilaida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in Gora as it stands now–but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.'

বোঝাই যাচ্ছে, নিবেদিতা ভারতীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন না—এটি তাঁকে বোঝানোই কবির উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি 'গোরা' উপন্যাসটি লিখেছিলেন। নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ করে এনে কবির এই আচরণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছিল— তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে, নিবেদিতারই অনুরোধে 'গোরা' উপন্যাসের শেষটা তিনি বদলে ফেলেছিলেন, একথাও বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বনফুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন, '...শেষটা (গোরা উপন্যাসের) বদলে দিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ। নিবেদিতা নাছোড় হয়ে ধরে বসল। আবার ঢেলে সাজালাম সব।

'গোরার শেষটা অন্যরকম ছিল?

'হ্যাঁ, আমি গল্পটা বিয়োগান্ত করেছিলাম। গল্পটা ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বেরুচ্ছিল। কিন্তু ওটা আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। নিবেদিতা তখন বলল— গোরার শেষটা কি রকম করেছেন দেখি। দেখলাম। পড়েই সে বলে উঠল— না, না। এরকম হতে পারে না। ওদের মিলন না হলে বড়ই নিদারুণ ব্যাপার হবে যে। বাস্তব জগতে যা ঘটে না কাব্যের জগতেও কবি সেটাই ঘটিয়ে দেবেন না? কাব্যের ও জগৎ তো আপনার সৃষ্টি, ওখানে আপনি অত নিষ্ঠুর হবেন না। ওদের মিলন ঘটিয়ে দিন। দিতেই হবে। এমন জেদ করতে লাগল যে রাজি হতে হল। সবটা আবার ঢেলে সাজালাম।'

অর্থাৎ, যতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কবি 'গোরা'র প্রাথমিক খসড়া করে থাকুন না কেন, শেষ অবধি অতিথির অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। তবে, শুধু 'গোরা' উপন্যাসকে নিয়ে মতান্তর নয়, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ রক্ষাকালে কবির কিছু আচরণও তাঁর পছন্দ হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল, জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর প্রতি কবি যতখানি মনোযোগ এবং উৎসাহ দেখাচ্ছেন, ততখানি বোধকরি তাঁর এবং সিস্টার ক্রিস্টিনের প্রতি দেখাচ্ছেন না। আবেগপ্রবণ নিবেদিতার এ মনোভাবকে কবির প্রতি অভিমানও বলা যেতে পারে। ফলে, কবির প্রতি তাঁর মন অনেকটাই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। শিলাইদহ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ১৯০৪ সালের ৫ জানুয়ারি

সারা বুলকে নিবেদিতা লিখলেন, 'With all our tust and regard for the poet– and I am grateful to him for having been born!– so tenderly does he love Bairn, (এই নামে নিবেদিতা সম্বোধন করতেন জগদীশচন্দ্রকে) and so assiduously does he serve him!– We are learning how to understand what it was that Swamiji felt about them all. Gradually as we exhausted what we had taken with us on Friday, we both felt the pressure of an atmosphere in which we could not draw breath– in which all had become commonplace, an atmosphere in which both Bo and the Poet were absoulutely happy and in place –but in which the Bairn seemed distorted somehow, By Monday noon, I had left in me to say, either to him or to God.

'And no sooner did we get within these walls, then everyhing began to change. Force seemed to pour back into one, and on Tuesday one...' শিলাইদহ থেকে ফিরে এসে নিবেদিতার মনে হয়েছিল, ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে স্বামীজি এক সময় তাঁর কাছে যে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিই 'সঠিক' ছিল। শিলাইদহ থেকে ঘুরে আসার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার যোগসূত্র ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। মাঝেসাঝে দু-একবার দেখা হলেও প্রথমদিকের সেই আকর্ষণ নিবেদিতা আর কখনো অনুভব করেননি রবীন্দ্রনাথের প্রতি। এরপর যে সাত বছর নিবেদিতা বেঁচেছিলেন, কবিকে যেন সযত্নেই এড়িয়ে চলেছিলেন তিনি। যদিও, স্বামীজির মৃত্যুর পর যখন স্বামীজির স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে হিন্দু সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই অস্বীকার করেছিলেন, তখন নিবেদিতার অনুরোধে সে সভায় বক্তব্য রাখতে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ। মতের অমিল থাকতে পারে, তবে, পারস্পরিক এই শ্রদ্ধার জায়গাটি কখনো নষ্ট করেননি নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ।

সতেরো

রবীন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্মসমাজের আর যে বিশিষ্ট ব্যক্তি নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে শেষ অবধি পছন্দ হয়নি নিবেদিতার। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি সযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন; জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয়নি। জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতার এক আন্তরিক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের মতোই জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার মত এবং পথের বিপরীত দিকেই অবস্থান করতেন।পরন্তু, রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাভাবিক সৌজন্য না দেখিয়ে জগদীশচন্দ্র অনেক সময় কড়া বাক্যবাণেও বিদ্ধ করতেন নিবেদিতাকে। কটু বাক্য বলতেন বিবেকানন্দ সম্পর্কে। তবু নিবেদিতা- জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্কে কখনো চিড় ধরেনি। বিদেশে জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর অক্লান্ত সেবা করেছেন নিবেদিতা। তাঁর গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্র ইংরাজিতে অনুবাদের বিষয়ে সাহায্য করেছেন। তারপর শেষ জীবনে অসুস্থ, নিঃসম্বল নিবেদিতা দার্জিলিংয়ে বসু দম্পতির বাড়িতেই কাটিয়েছেন। ওখানেই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছেন তিনি।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ ঠিক কখন এবং কীভাবে তা সঠিক জানা যায় না। তবে, অনুমান করা যায়, ১৮৯৮ সালের প্রথমদিকে কলকাতা এসে পৌঁছানোর পরই শহরের আরো কয়েকজন বিশিষ্টজনের পাশাপাশি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গেও পরিচিত হন নিবেদিতা। কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর নিবেদিতার বাগ্মীতা যেমন তৎকালীন শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করেছিল, তেমনই জগদীশচন্দ্রও তখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মহলের স্বীকৃতি পেয়ে যথেষ্ট স্বনামধন্য। কাজেই, দুজন-দুজনের কাছে অপরিচিত থাকার কথা নয়। কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতা তৎকালীন আমেরিকান কনসালের মাধ্যমে

কলকাতায় বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই বিশিষ্টজনদের ভিতর জগদীশচন্দ্র ছিলেন— এমন আশা করা যায়। জগদীশচন্দ্রের জীবনীতে প্যাট্রিক গেডিজ লিখেছেন, 'In 1899 Mrs Bull and Miss Margaret Noble (Sister Nivedita), having heard much of Bose's discoveries, came to see him in his Calcutta laboratoty.' এটাই হওয়া স্বাভাবিক। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা শুনে তাঁর গবেষণাগার দেখতে যে এই পাশ্চাত্য বিদুষীরা আগ্রহ প্রকাশ করবেন— সেটাই স্বাভাবিক। আবার ১৯০৩ সালের ১৮ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন নিবেদিতা সেখানে তিনি জানাচ্ছেন, ১৮৯৮-এর শেষ দিকে তিনি জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, ' When I came to Calcutta I first knew Prof. and Mrs Bose in the end of the year 1898. I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected to contiuous annoyances and petty difficulties with the evident earnest desire of those who were about him to and his distinction which was personally galling to him. The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating corresopondence and flagrant misrepresentation.'

রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, কী অসুবিধার মধ্যে জগদীশচন্দ্র গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং কতখানি বৈষম্যের শিকার তাঁকে হতে হচ্ছিল— তা নিবেদিতা প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র বসুর দিন কাটছে নানা গোলমালে। হিন্দু হওয়ার দরুন সরকার তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে নারাজ। তাঁর বেতনের হার কম, তাঁকে নিজস্ব ল্যাবরেটরিও দেবে না ওরা। আচার্য বসু ঠিক করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু সহকর্মীদের পক্ষ হয়ে একাই এ-অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। কম বেতন নিতে তিনি স্রেফ অস্বীকার করলেন। তিনবছর ধরে বিবাদ চলল। 'সমাবর্তন' নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তাতে একটা সাড়া পড়ে গেল, লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সরকার তাঁকে খানিকটা মর্যাদা দিতে বাধ্য হল। কিন্তু এর জন্য আচার্য বসুকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

'জগদীশ বসু ভয়ানক নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে, নিজের পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে তিনি একা। নিবেদিতা এটা আঁচ করেছিলেন। এই সত্যান্বেষীর মাঝে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন যেন। তিনটি বেড়াজালে বন্দী বসু। নিজের ক্ষমতায় যতদূর

কুলায় তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন নিবেদিতা। প্রথম কাজ হল, তাঁর জনকয়েক বন্ধু জুটিয়ে দেওয়া। তিনি নিজে তো আছেনই।'

নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের প্রথম আলাপের মুহূর্তটির একটি বর্ণনা রেমঁর লেখায় পাওয়া যায়। রেমঁ লিখছেন, 'প্রথম আলাপেই নিবেদিতা অদ্বৈততত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এ তাঁর একটা মনের মত প্রসঙ্গ।

'বৈজ্ঞানিক হাসলেন, 'অদ্বৈতজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ চান?'

'ঠিক তাই।'

'জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব যে এক জিনিস, এ আপনি বিশ্বাস করেন?'

'উপনিষদগুলোতে তো তেমন ইশারাই আছে...'

'এই কথাবার্তার ফলে সহজেই ওঁদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, পরস্পরের অনুভব বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা জাগল।'

নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের দিনক্ষণ সঠিক জানা না গেলেও, এটুকু অনুমান করা যায় যে, ১৮৯৮-এ কলকাতা এসে পৌঁছানোর পরই নিবেদিতা বসু-দম্পতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছিলেন। যে কারণে, ১৮৯৮-র নভেম্বরে তাঁর স্কুল চালু করার সময় তিনি অবলা বসুকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। যদিও অবলা বসুর নামে স্বামীজি আপত্তি করেছিলেন। এ থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে, হয় স্কুল শুরুর আগেই বসু-দম্পতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, বা বসু-দম্পতির সম্পর্কে বিস্তারিত তিনি তখনই জানতেন। আবার নিবেদিতা ব্রাহ্ম সমাজের মহিলাদের কাছে ওই সময় প্রতি সপ্তাহে 'শিক্ষা' বিষয়ে যে বক্তৃতা দিতেন, সে বক্তৃতার শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুনীতি দেবী ও সুচারু দেবী, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী এবং ভাগ্নি সরলা ঘোষাল, জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভা বসু। এটুকু অনুমান করা শক্ত নয় যে, লাবণ্যপ্রভার কাছ থেকে নিবেদিতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। এমনও হতে পারে, লাবণ্যপ্রভার মাধ্যমেই হয়তো দুজনের পরিচয়ও হয়েছিল। তদুপরি, নিবেদিতা ভারতে আসার পর ১৮৯৮ সালের ১১ মার্চ নিবেদিতার সঙ্গে কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজের আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য স্বামীজি যে সভাটি ডেকেছিলেন, সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন জগদীশচন্দ্রও। ওই সভায় দুজনের ঘনিষ্ঠ আলাপের সম্ভাবনা না থাকলেও, প্রাথমিক পরিচিতিটুকু ঘটেছিল— একথা বলাই যায়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী নিবেদিতার সঙ্গে ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্রের যে ধর্মমতের কোনো মিল হবে না —তা বলাই বাহুল্য। তা কোনোদিন হয়ওনি। ধর্মমতের এই অমিল হওয়ার কারণেই জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক কটূক্তি প্রকাশ্যেই করেছেন। নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও ধর্মমতের কোনো মিল

কখনো হয়নি। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তফাৎ এই যে, নিবেদিতা আঘাত পাবেন জেনেও জগদীশচন্দ্র তাঁর সামনেই নানাবিধ কটূক্তি করতেন। কেমন ছিল সেই কটূক্তি তা নিবেদিতা নিজেই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন,

' The event of the week has been my talk with Dr. Bose on Friday night. I love that man. He told me with some bitterness that he meant to school himself into calling me 'S. N,' [Sister Nivedita] instead of Miss N. [Noble]. Then he would be able to think of me less as a human being. At present my dreadful narrowness hurt him unbearably. (It haunts me like a bad dream that someone whom I loved and trusted thought me 'narrow' once before. Cd. it have been you or S. Sara?) I coaxed him to tell me our differences. Then it came out. The deification of Swami's Guru. 'A man cast in a narrow mould— a man who held women to be something half fiend– so that when He saw one He had a fit'!!!!!! Did you ever? Between a gasp and a smile I said I could not accept the narrative. I confessed that I too worshipped blindly– but pointed out that we none of us, least of all Swamis, wanted him to worship too. That was personal. 'An Avatar doctrine could not supply India's present need of a religion all-embracing, sect-uniting etc.' (Curious!– to me it seems the only posible way to meet that need. An Avatar who declares that sects are at an end!) The man who doesn't believe in Incarnation will not call him an Avatar like Swarupananda. 'This cd. not prove the new religion.'

'I said no one wanted it. No one was planning or bothering to do more than this one bit of educational work that the Order had before it in all directions now. Questions of worship and the religion of the future could do (I almost said 'what they darned pleased') what they liked. Then he spoke of the great thrill with which he heard Swami say that his mission was to bring manliness to his people, and with which still in England he read his Calcutta lectures and saw him contemeptuously tear his great popularity to tatters for the real good of truth and man. But when he found him proceeding to worship his Guru and other things (my Kali etc) he had dropped with a groan. The man who had been a hero had become the leader of a new sect.

'...I could have argued– but I thought the time for that was not yet.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি কতটা বিতৃষ্ণা এবং অশ্রদ্ধা ছিল জগদীশচন্দ্রের। একদা বিবেকানন্দ-অনুরাগী হলেও তিনি

যে স্বামীজি রামকৃষ্ণ-অনুগামী হওয়ার কারণেই তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, তা-ও নিবেদিতাকে জানিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। স্বামীজিকে 'এক নতুন সম্প্রদায়ের নেতা'-র বেশি যে আর কোনো মর্যাদাই জগদীশচন্দ্র দিতে চাননি— নিবেদিতার এই চিঠিটিই তাঁর প্রমাণ। অথচ, ১৯০০ সনে জগদীশচন্দ্র যখন প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যান, তখন স্বামীজিই সেখানকার বিশিষ্টদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে উল্লেখ করতেন 'বাংলার বিজয়স্তম্ভ' বলে। সে সময়ে বিদেশে জগদীশচন্দ্র কিন্তু স্বামীজি এবং তাঁর অনুগামীদের সাহায্য নিতে দ্বিধা করেননি। পরবর্তীকালেও তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় যাঁর সহায়তা তিনি সবথেকে বেশি পেয়েছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী সারা বুল।

তবে, নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের ভিতর সব থেকে রহস্যময় যেটা তা হল, জগদীশচন্দ্র ওই রকম কটু ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আক্রমণ করলেও, নিবেদিতা নীরব ছিলেন কেন? যে নিবেদিতা বিপিনচন্দ্র পালের সামান্য বিবেকানন্দ-সমালোচনাতে ক্ষিপ্ত হতে পারেন, এমনকী কেঁদে ফেলতেও পারেন, ঠাকুর পরিবার বিবেকানন্দকে অপমানজনক প্রস্তাব পাঠালে যে নিবেদিতা ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হতে পারেন— তিনি জগদীশচন্দ্রের এইসব কটূক্তি শুনেও উত্তেজিত হন না কেন? এক্ষেত্রে নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করবে ১৮৯৯ সালের ৮ এপ্রিল জোসেফিনকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি। নিবেদিতা লিখছেন, 'Now I want to tell you much and invoke your angelic aid. I spent yesterday with the Boses–the whole day– it was like going to you at Bally, almost at Bellur. For at last the friend I loved and craved is mine. And how great! How simple!– and thro what suffering! Oh how I despise my own impatience of suffering when I see the bitterness of life's cup to the truely great. It is so poor to be just happy, though as Nim says with such wonderful truth– it is surely a 'most Godlike thing to be bright.' It would be a breach of confidence to let even the listening atmosphere hear again that story that he told me last night on the verandah– but when I tell you that he ended by a short reference to the difference that race feeling had brought about in his colleagues' treatment of him since his return from the outburst of glory in Europe – and by saying that this robbed him of all heart to do his work– 'for I can not tell you what a need I have of being loved.' You will divinely understand, and though you will never tell even as much as that you will know how to write to those two people, sending them Miss Wilkins' little books ('A Humble Romance' and

'A Far Away Melody') or some other triffle, of your love and pride in their friendship. And you may be proud. A Englishman('strictly confidential') who after a tussle with himself (I'm proud of that Englishman, but ashamed that the struggle should have been necessary) said that the Viceroy would be untying his shoe-strings one day, if he went on as he has began!

'I could not help it– I have just crammed a sheet of notepaper with all the love and courage I could put on to it, and addressed it to Presidencey college, that he may get it as he steps into his laboratory tomorrow morning. And I said that my friendship came as the expression of your and S. Sara's and King's love and pride.'

জোসেফিনকে লেখা নিবেদিতার এই চিঠিটি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। তবে, চিঠির এই অংশটি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না— নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের রসায়ণটি ঠিক কেমন ছিল। জগদীশচন্দ্র একান্তে নিবেদিতাকে বলতে পেরেছিলেন ' তিনি কতখানি ভালবাসার কাঙাল।' তেমনই নিবেদিতাও তাঁর ভালোবাসা এবং সহানুভূতি জানিয়ে একটি চিরকূট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সির গবেষণাগারে। সম্পর্কের কতখানি গভীরতা এবং নৈকট্য থাকলে যে এটা সম্ভব, তা নিবেদিতার চিঠিটি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই গভীরতা এবং বৈশিষ্ট্যের কারণেই, ধর্মমতের বিরোধ যাই থাকুক না কেন, দুজন দুজনের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। করেওছিলেন। যে কারণে, মতাদর্শগত বিরোধকে কেউই তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলতে দেননি।

জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার এই নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অন্যভাবে ব্যাখ্যা কেউ কেউ করতেই পারেন। এমন ব্যাখ্যা যে হবে সে বিষয়েও প্রায় নিশ্চিতই ছিলেন নিবেদিতা; যে কারণে ৩০ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিনকে লিখেছেন, ' Of course I know the suspicious eyes that watch and the sharp tounges that wag in India– over a society where men and women of the country mix– but all said and done I fear I fear I fear–'

তবে, জগদীশচন্দ্র-নিবেদিতার এই বন্ধুত্বের ব্যাখ্যাটি অন্যরকম না হওয়াই ভালো। সারা বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেন নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের প্রতি এতটাই সহানুভূতিশীল এবং আর্দ্র ছিলেন এবং কেনই বা জগদীশচন্দ্রও নিবেদিতার বন্ধুত্বের এতটা প্রত্যাশী ছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I have just been telling Yum how I spend last Sunday at the Bose's. It was just heaven– and for the first time I entered into the full possession of the heart of my dear Dr. Bose. It filled me with

reverence – and leaves me dragging a heavier load than ever of Anglo-Indian shame. When I see you again I shall be able to tell you all, but now I must not. It is hardly fair even to quote (or would be unfair to anyone else!) his last words "and I cannot tell you what a need I have of being loved?"

'He is lonely– you know how and why, without my saying, his brilliant success in Europe might cost him love and sympathy of colleagues that were his before he went. "How can I go and tell them,' he burst out once, 'that it hasn't made a scrap of difference? You know I have no vanity of that sort!"— and that very power of concentration th[illegible]has made his work so great, makes it impossible for him to forget this barrier, and he loses heart for his work– you know all the rest, dear Grannie. He loves you as a son–(he told me never to write you without sending his love and admiration, for 'it was always going on'). Do write to him and treat him just like one! You know too how to inspire a great man to do great work– a greater kind of greatness, in its own sweet and perfect way, than this man's I know you would say that you had never seen. He is sick of life – yet honestly anxious to hold on and on just to prove to his countrymen that their chances of success in experimental sciences are as great as any Europeans.

'...I have had even in the little English Society that I see, to say once or twice 'This man is one of my most intimate friends' in a firm tone, when Dr.Bose's name was mentioned– not that anything was yet beeing said: it was the tone– and his crime lay in what? – that his name was important enough to be mentioned! But such power to love and suffer and endure I have never dreamt of – and the inarticulateness of it is so terrible– for expression has not been his fate— and endurance has. I am thinking now of quite other things of which he told me.

'I wrote him one of my fiery letters, as I told Yum, at which I fear you will smile–and I told him that he must take the friendship I could give him in such unworthy measure as only the Earnest of your and Yum's and Swami's pride and turst in him.' (১৯ এপ্রিল, ১৮৯৯)

এই চিঠিটি পড়লে কিন্তু নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের অন্য ব্যাখ্যা করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যখন পরিচয় হয়, তখন জগদীশচন্দ্র একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি। ইওরোপে তাঁর গবেষণা প্রশংসিত হওয়ার

পর দেশে নানারকম রাজনীতির শিকার তিনি। তাঁর সঙ্গীরা তাঁর গবেষণার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু গবেষণার কাজে বাধা দেওয়াই নয়, কম মাইনেয় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে তাঁকে। এই রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিনিয়ত লড়াই করে জগদীশচন্দ্রকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি ক্লান্ত, হতাশ এবং বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। একজন ভালো, নিঃস্বার্থ, সহানুভূতিশীল বন্ধু তখন খুঁজছেন জগদীশচন্দ্র। আর নিবেদিতার ভিতরে সেই বন্ধুকেই তিনি পেয়ে গেছেন।

আর নিবেদিতাও জগদীশচন্দ্রের ভিতর আবিষ্কার করেছেন একটি লড়াকু মানুষকে। বুঝতে পারছেন এই প্রতিভাধর মানুষটি যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের কাছে। এই ঘটনা তাঁকে জগদীশচন্দ্রের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। সেই সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের নিঃসঙ্গতা এবং একজন ভালো বন্ধুর জন্য তাঁর আকুলতা এই বিজ্ঞানীর প্রতি নিবেদিতার মন আর্দ্র করে তুলেছে। পরম মমতায় তিনি প্রকৃত বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জগদীশচন্দ্রের দিকে। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, ধর্ম্মমতের দিক দিয়ে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যতই বিরোধ থাকুক না কেন—এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান সাধনার কাজে সহায়তা করতে হলে যাবতীয় মতাদর্শগত বিরোধ দূরে সরিয়ে রেখে প্রকৃত বন্ধুর মতো তাঁকে সাহচর্য দিতে হবে। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'বসু আর নিবেদিতার জীবনব্যাপী সৌহার্দ্য বড় অদ্ভুত। দুজনেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁর যাঁর আদর্শ আঁকড়ে ছিলেন। সে আদর্শ পরস্পরের একেবারে বিপরীত, দুয়ের মধ্যে একটা আপসরফার কথা উঠতে পারে না।' শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার বোন মেরি উইলসনের একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন। মেরি বলেছেন, 'ভারতের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসাই বসুর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। সেই সর্বাঙ্গীন ভালবাসাই বসুর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। সেই সর্বাঙ্গীণ ভালবাসাকে কি করে প্রকাশ করব জানি না, তা আবেগময় অথচ গভীর পবিত্র।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেছেন, জগদীশচন্দ্রের প্রতি নিবেদিতার অন্তরে একটি মাতৃভাব ছিল। মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, '...তাঁহার ডায়েরিতে এবং পত্রেও একাধিকবার বসুর উদ্দেশ্যে 'Bairn' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইংরেজী Bairn শব্দের অর্থ খোকা। কোনরূপ বাধা পাইলে শ্রীযুক্ত বসু নিরুৎসাহ বোধ করিতেন; সেই সময় নিবেদিতা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন, জোর করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করিতেন। শ্রীযুক্ত বসুও বলিয়াছেন 'হতাশ এবং অবসন্ন বোধ করিলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় লইতাম।' এই শিশুসুলভ স্বভাবের জন্যই কি তিনি ঐ আখ্যা পাইয়াছিলেন?'

নিবেদিতার এই মাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি চিঠিতেও। ২৬ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখে সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Meanwhile I have never had from any friendship such a realisation of 2 things.

1. Of my own motherhood –all that you will imagine –and
2. Of being glad to be inferior in order to enjoy the greatness and goodness of another– ' I do not want to be sugar, I want to eat sugar.'

তাঁর প্রতি জগদীশচন্দ্রের সপ্রশংস উক্তি এবং সেই উক্তিতে তাঁর উচ্ছলতা— তাও লুকিয়ে রাখেননি নিবেদিতা। ওই চিঠিতেই লিখেছেন, 'Last night he wanted to tell me something that should express all his friendship, and he said–

'I have thought of you in such a way that you may not indeed be up to that mark yet. But it is mine to hope that some day you will reach to it.'

'Wasn't that royal? A prayer for a compliment.'

জগদীশচন্দ্রের প্রতি নিবেদিতার এই মাতৃভাব কেন সে প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, ' ভবিষ্যতে চিঠিতে এই শব্দটি নিবেদিতা বারবার ব্যবহার করবেন, মূল শব্দটি ছিল 'Brain', স্কটিশ শব্দ, অর্থ A Child। জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার থেকে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তবু নিবেদিতার কাছে তিনি শিশুর মতো প্রতীয়মান হতেন, সেবা ও সাহায্য যার দরকার, নিবেদিতার বোন জানিয়েছেন, পূর্বে তা দেখেছি— যাঁর বিষয়েই নিবেদিতার Profound feeling থাকত তাঁকেই সন্তানবৎ দেখতেন।' শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখাতেই পাই নিবেদিতার বোন মেরি উইলসন বলেছেন, ' বসু হলেন সেই শিশু, নিবেদিতা যাকে কামনা করেছিল, এবং বিবেকানন্দ-মারফৎ তাঁকে পেয়েছিল।' 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ, যাঁর সঙ্গে নিবেদিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল— তিনিও জানিয়েছিলেন, কারও সম্পর্কে নিবেদিতার গভীর অনুভূতি থাকলে, তাঁকেই তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। নিবেদিতার চরিত্রের এই আবেগপ্রবণ দিকটা জানা থাকলে এবং তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটি অবহিত থাকলে— তাঁদের সম্পর্কের রসায়নের অন্য ব্যাখ্যা কখনো করা সম্ভব নয়। বরং, একটি নিঃস্বার্থ, সুন্দর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল বন্ধুত্বের সম্পর্ককেই অবিষ্কার করা যায়।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে যতই মতাদর্শগত তফাৎ থাক না কেন, বিজ্ঞানীকে বরাবরই নিবেদিতা এক মহৎ- মহান ব্যক্তিত্বরূপেই দেখেছেন। এমনকী, রবীন্দ্রনাথকেও এই আসন তিনি দেননি। এটুকু বললে অত্যুক্তি হবে না যে, স্বামীজির পরে জগদীশচন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিবেদিতার এরকম অবিমিশ্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা পেয়েছিলেন। ১৮৯৯ -এর ২ মে নেল হ্যামন্ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, ' What friends one has here! One is as great a man as I have ever known– greater it seems to me. What compliment do you think he paid me? Listen, for I must say it softly, it is so very holy–

'I have thought of you in such a way that you may not indeed be upto that mark yet, but at least I have every hope that someday you will be.'

জগদীশচন্দ্রকে যে তিনি কতখানি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতেও। নিবেদিতা সেখানে লিখেছেন, 'Yum Darling, you say "We'll love one or two Hindus enough for their whole race." But what marvellous men they do produce! I have a group of 3 demigods now, Swarupananda, Mr. Padshah and Dr. Bose,' জগদীশচন্দ্রকে এই শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছিলেন বলেই ধর্মমতে বিরোধিতা থাকলেও, তা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পর্যায়ে কখনো নামিয়ে আনতে চাননি নিবেদিতা; বরং, আমৃত্যু বসু পরিবারের সুহৃদ হয়েই থেকেছেন। এমনকী জীবনের শেষ কটি দিনেও বসু পরিবারের সান্নিধ্যেই থাকতে চেয়েছেন।

তবে, জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বামীজিকে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। ধর্মমতের ফারাক থাকা সত্ত্বেও তাঁদের এই বন্ধুত্ব স্বামীজি বা স্বামীজি অনুরাগীরা কীভাবে নেবেন, তা নিয়েও হয়তো একটু সংশয় ছিল তাঁর। লিজেল রেমঁ লিখছেন, সারা বুলকে এই সময় একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আমার মন যেমন জানি তেমনি তোমার মনও জানি। তুমি আর য়ুম— আমরা বসুদের চারপাশে প্রীতির একটা আতপ্ত পরিবেশ রচনা করব। দেব শক্তি, সারা দুনিয়াকে ওদের ঘর করে তুলব। এখনও তার সময় আছে। স্বামীজিকে ভালবাসলে অন্যকে ভালবাসতে বাধা নাই। আর অন্যদের ভালবাসলে তাঁর কাছে তা মিথ্যা হয়ে যায় না।' স্বামীজিকে ভালবাসলে অন্যকে ভালবাসতে বাধা নাই— একথা বলে নিবেদিতা নিজের সংশয়দীর্ণ মনকেই সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন, এরকম আন্দাজ করা যায়।

স্বামীজির সঙ্গে অবশ্য জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর পূর্বপরিচয় ছিল। নিবেদিতা কলকাতা আসার অনেক আগে থেকেই স্বামীজি বসু দম্পতিকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা স্বামীজিকে মুগ্ধ করেছিল। পাশ্চাত্যে বিশিষ্টজনদের কাছে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে প্রশংসা করেছিলেন স্বামীজি। কলকাতায় বসু দম্পতির বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেনও স্বামীজি। অবলা বসু স্বামীজিকে রান্না করে খাইয়েছিলেন। বসু দম্পতির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনাও হত তাঁর। অবলা বসুর স্মৃতিচারণাতেই পাওয়া যায়— বসু দম্পতিকে চমকে দেওয়ার জন্য এক শীতের সন্ধেবেলা সম্পূর্ণ সাহেবি পোষাকে সজ্জিত হয়ে স্বামীজি তাঁদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিবেদিতাও অবশ্য, হাজার শ্রদ্ধা থাকলেও, স্বামীজির উপরে জগদীশচন্দ্রকে স্থান দিতে চাননি। সারা বুলকে তিনি লিখেছিলেন, 'And his position, great thinker and scholar as he is in other

lines, seems, compared to Swami's on this branch, a position of ignorance and supersition compared to science and reason.'

যে জগদীশচন্দ্র স্বামীজি এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে কটু এবং অপমানজনক কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যথোচিত কাজ হবে কিনা—তা নিয়ে নিবেদিতা যে অনেকটাই সংশয়ে ভুগছিলেন, তার প্রমাণও নিবেদিতার লেখাতেই পাওয়া যায়। নিবেদিতার হয়তো মনে হয়েছিল— জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে এভাবে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে তিনি কার্যত তাঁর গুরুর অসম্মানকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যে কারণে এক ধরনের অপরাধবোধেও হয়তো ভুগছিলেন তিনি। সেই অপরাধবোধ থেকেই বসু দম্পতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাও ভেবেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা স্বামীজিকে জানিয়েওছিলেন নিবেদিতা। বসু-দম্পতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে স্বামীজিই তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। এটা যে কোনো অপরাধ নয়— একথা স্বামীজিই তাঁকে বলেছিলেন। এই অসহায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর পাশে থাকা যে ভারত-প্রেমেরই আরো একটি রূপ —নিবেদিতার এই ধারণাকেই সমর্থন করেছিলেন স্বামীজি। ফলে, নিবেদিতার মনের গ্লানি এবং সংশয় দূর হয়েছিল। বসু দম্পতির কাছে বিদায় নেওয়ার বদলে নিবেদিতা তাঁদের জানিয়ে এসেছিলেন, সেই সপ্তাহেই তিনি তাঁদের কাছে আসবেন। স্বামীজির সঙ্গে সেই কথোপকথনের বর্ণনা নিবেদিতা নিজেই দিয়ে গিয়েছেন, 'At lunch I told him a good deal about Dr. Bose–to whom I was to say goodbye that evening. He was so sweetly sympathtic. "I tell you this as a priest, Swami," I said about something, meaning that he was to keep it secret, "No, no, there's no confessional here," he said, "we are talking as patriots."

'Then I asked him what perfection I could strive for in order to be worthy of being a Sanyasini. "You just keep as you are." He said quickly – and sealed my determination for all time. But very cautiously I tried to find out if my running about and paying visits were a blemish in his eyes – as it was begining to be in my own. He declared that it was not. So that evening I told the Boses that I would go on coming on Fridays as long as they would have me.' (জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠি, ১ মে, ১৮৯৯)

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র যে কটু কথাগুলি বলেছিলেন, তা অবশ্য আগেই স্বামীজিকে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। অবশ্য তখন, জগদীশচন্দ্রের ওইসব কথাবার্তাকে গুরুত্বই দিতে চাননি স্বামীজি। বরং স্বামীজি বলেছিলেন, এইসব ব্যক্তিরা নিজেদেরই বুঝতে পারে না। এরা অকারণে ব্যক্তিপূজা নিয়ে হৈ-চৈ করে। বরং, অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বামীজি দাবি করেছিলেন— জগদীশচন্দ্র এক সপ্তাহের ভিতর তাঁর

অনুগামী হয়ে পড়বেন। ৯ এপ্রিল ১৮৯৯, জোসেফিনকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I told him of Dr. Bose– just as I told you last week–every detail, and he said "yet that boy almost worshipped me for 3 days– in a week's time he would be my man.' 'Yes', I said, 'he does worship.' (If you only knew with what a depth of reverence and self- restraint that exquisite worship is given, dear yum!) 'Yes', said the King, 'and those are always the people who make the fuss about worship of the Personal. They don't understand themselves– and they hate in others what they know they are struggling against!'

স্বামীজির এই আত্মপ্রত্যয় দেখে নিবেদিতাও বিশ্বাস করেছিলেন জগদীশচন্দ্রকে বিবেকানন্দ-অনুগামী করে তোলা যাবে। অর্থাৎ, স্বামীজির এই কথার ভিতর একটি আলোর রেখা দেখেছিলেন নিবেদিতা। জোসেফিনকে ওই চিঠিতেই তিনি লিখছেন, 'Sudden light. If I can get my friend once to the Math before His Royalty departs– if–if–if–Sri Ramakrishna helps me– and if not, faith I'll tell himself the diagnosis one fine day.'

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিবেদিতার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা না চাপালেও এর ঠিক পরের দিনই স্বামীজিকে অন্য মেজাজে দেখেছিলেন নিবেদিতা। পরদিন নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় স্বামীজি নিজে থেকেই জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নিবেদিতাকে বলেন, 'জগদীশচন্দ্রকে জানিয়ে দিও—গৃহীর পক্ষে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। ত্যাগ না করলে কোনো শান্তিই তিনি অর্জন করতে পারবেন না। বিবাহ একটি ভয়াবহ ব্যাপার— শুধু সন্তান উৎপাদনের উপায়মাত্র।' নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখছেন, 'Swami was quite irritable and unwell. After tea he took me round the garden and bronched the question of Dr. Bose himself. Then he broke out in one of his strong moods. There was no salvation for a householder. I was to tell him this if I dared. Tell him he would never be strong if he did not commit some great renunciation. Marriage was horrible, it was the door to birth and so on. He had begun now to receive those subtle sensations telling of the desire of those who had touched the food he ate.This thing was horrible. Why had so and so ever married? Even at this moment he was suffering phsically from contacts such as these. His days were drawing to an end but even if they were not he was going to give up compromise. He would go to Almora and live there in mediation. He would go out into the world and preach smashing truths. It had been good fun for awhile to go amongst men and tell

lies about their being in their right place and so on. But it was utterly untrue. Let them give up, give up, give up.

'Then he said very quietly– 'you won't understand this now Margot, but when you get further on, you will. And this is what I have been brought up to believe.' (১মে, ১৮৯৯-এর চিঠি)

জগদীশচন্দ্রের জীবনযাত্রা যে এককথায় নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন স্বামীজি তা নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে-জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার মেলামেশায় তিনি আপত্তি তোলেননি, সেই জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে তিনি একটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন কেন? অবশ্য, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে স্বামীজির এই মেজাজ পরিবর্তনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে নিবেদিতাকে সতর্ক করে দেওয়ার পরও ব্রাহ্মদের ভিতর অনুপ্রবেশের ব্যাপারে নিবেদিতাকে সম্মতি দিয়েছিলেন স্বামীজিই। হয়তো, নিবেদিতার স্বাধীনতায় স্বামীজি কখনোই হস্তক্ষেপ করতে চাননি বলেই এই পরস্পর বিরোধিতা তাঁর ভিতরে দেখা দিয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সেই রকমই বলে অনুমান করলে ভুল হবে না।

অবশ্য, সেদিন স্বামীজির এরকম মেজাজ পরিবর্তনের জন্য স্বামীজির শারীরিক অসুস্থতাকেই দায়ী করেছেন নিবেদিতা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Then I was afraid he would get more excited and be ill– so I stood against a pillar and looked at our beautiful ganges while Mr. Mohini and he talked and then with almost whispered good byes, we came away.'

স্বামীজিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ মনে হয়েছিল বলেই বোধকরি নিবেদিতা দ্বিতীয় দিনের এই কথাটিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি; বরং স্বামীজি যে তাঁকে তাঁর মতোই থাকতে বলেছিলেন সে কথাটিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যে কারণে, এরপরও জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বে তিনি কখনো ছেদ টানেননি।

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বে নিবেদিতা যতই মতপার্থক্যগুলিকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখুন, বা নিঃস্বার্থভাবে এই ভারতীয় বিজ্ঞানীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন না কেন—জগদীশচন্দ্র কি তাঁর পক্ষ থেকে সত্যিই নিবেদিতার সঙ্গে অতখানি নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন? জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে এই সংশয় এবং সন্দেহ জন্ম নিতে বাধ্য। এবং, এই সংশয় এবং সন্দেহের জন্ম দিয়েছে নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের কিছু আচরণই। কলকাতায় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর গবেষণাগার ঘুরে এসে নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন, এই প্রতিভাবান ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যিই বঞ্চনার শিকার। যেভাবে নানা বাধা-বিঘ্ন এবং অপ্রতুলতার ভিতর দিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা কার্য চলিয়ে যাচ্ছিলেন, তা

দেখে নিবেদিতা সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন, যদি সত্যিই ভারতের জন্য কিছু করতে হয় তাহলে সর্বশক্তি নিয়ে এই বিজ্ঞানীর পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত। ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় সবরকমভাবে সাহায্য করা উচিত। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণার কাজ চলিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। নিবেদিতার মনে হয়েছিল, জগদীশচন্দ্রকে এই অর্থ সাহায্য একমাত্র করতে পারেন সারা বুল। সারা বুল এক ধনী মার্কিন পরিবারের কন্যা। অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী এবং ধনী। আমেরিকায় তিনিই ছিলেন স্বামীজির বড় 'ভরসার জায়গা'। বেলুড়ে মঠ এবং সন্ন্যাসীদের আবাসগৃহ নির্মাণের জন্য তিনি সেই সময়েই ১৫ হাজার ডলার দান করেছিলেন। কাজেই জগদীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সারা বুলই যে যোগ্য হবেন তা বুঝতে নিবেদিতার দেরি হয়নি। ফলে, সারা বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের একটি সেতুবন্ধন ঘটিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন নিবেদিতা।

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'বসুর দিকে প্রথম মিসেস্ বুলের মন টানবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে লিখলেন, 'মহৎ হৃদয়কে কি করে বৃহৎ কর্মে উদ্দীপিত করতে হয় তা তুমি জান। বসুর কথা ভেবে দেখ। হৃদয়টি ওর করুণ কোমল, চরিত্র নিখুঁত, ওকে বড় করে তুলতে পারলে তুমি আরও বড় হবে। তুমি ওকে আশ্রয় দাও। স্বামীজির মত ওকেও তোমার আর একটি সন্তান বলে মনে কর। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বসু, তবু অবিশ্রম খেটে চলবার আগ্রহ আছে তার সত্যি। শুধু এইটুকু দেশের লোকের কাছে প্রমাণ করতে চায়, যে কোনও ইউরোপীয়ানের মত তারাও ফলিত-বিজ্ঞানে অম্বিত সাফল্য লাভ করতে পারে।'

'সেই সঙ্গে নিবেদিতা যথাসম্ভব সন্তর্পণে জগদীশ বসুকেও বলেন, 'মিসেস বুলকে মায়ের আসন দাও।' বুঝিয়ে বলেন, 'তুমি তাঁকে চিঠি লেখ, তোমার কাজের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানাও। তাঁর কাছে কিছু লুকিও না। ধীরামাতা তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। একটু সাড়া পেলেই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। তোমার শক্তিতে তাঁর আস্থা আছে।'

'এইটুকুই বসুর দরকার। এদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে যখন আলোচনা হতে লাগল, তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নানা জায়গা থেকে অভিনন্দন-পত্র পেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। অথচ সন্দেহমাত্র করেননি যে নিবেদিতা এসবের পিছনে আছেন।'

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সারা বুলের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে নিবেদিতা সক্ষম হয়েছিলেন। এই যোগাযোগের ফলে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রকে অধ্যাপনার কাজ জুটিয়ে দেওয়া বা তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দেওয়া— এসবই শ্রীমতী বুল করেছিলেন। শুধু

সারা বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই নয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে লেখালেখি করেও এই বিজ্ঞানীর সমর্থনে একটি জনমত গড়ে তোলার নিরলস চেষ্টা চালাতেন নিবেদিতা। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ -এর ভিতর প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের তিনটি বিখ্যাত পুস্তক 'Response in the living and Non-living,' 'Plant Response,' 'Comparative Electro-Physioligy' এবং 'Irritability of plants' ও রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের বহু প্রবন্ধ পরিমার্জন এবং সম্পাদনা করেছিলেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্রের প্রথম পুস্তকটি লেখার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। উদ্ভিদের প্রাণ বিষয়ক জগদীশচন্দ্রের লেখা যে একপ্রকার চক্রান্ত করেই রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়, ১৯০২ সালে ১ মে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তা জানিয়ে জগদীশচন্দ্র লেখেন, '....এই যে Royal Society-তে গত বৎসর মে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা Waller and B. Sanderson চক্রান্ত করিয়া Publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নভেম্বর মাসে এক কাগজ বাহির করিয়াছেন। আমি এতদিন জানিতাম না। আমার Linnean Society-র Paper ছাপা হইবার কথা যখন Council-এ উঠে তখন Waller -এর বন্ধুরা তথায় আমার Paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন— এই বলিয়া যে Waller গত নভেম্বরে একথা Publish করিয়াছেন! Council-এর কথা confidential, সুতরাং এসব চক্রান্ত আমি জানিতাম না।' এর পরই জগদীশচন্দ্র ঠিক করেন বিদেশি পত্র-পত্রিকার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজের গবেষণা পুস্তক আকারে তিনি নিজেই প্রকাশ করবেন। আর এই চিন্তা থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ Response in the Living and Non living-এর কাজ। গ্রন্থটি সম্পাদনা, পরিমার্জনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কাঁধে তুলে নেন নিবেদিতা। এই সময় জগদীশচন্দ্রের বই প্রকাশ, গবেষণার যন্ত্রপাতি কেনা এবং তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য নিবেদিতার দৈনন্দিন জীবনযাপনের যাবতীয় খরচও সারা বুল গ্রহণ করেছিলেন। বোধহয় এই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখেই জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক 'Plant Response as a means of Physiological Investigation'- এর কাজ শুরু করার সময় সারা বুল বিজ্ঞানীকে অনুরোধ করেছিলেন, নিবেদিতাকে যেন 'লিটারারি এগজিকিউটর' হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কারণ, যতই নিবেদিতা ত্যাগ ও সেবা করতে উদগ্রীব থাকুন না কেন, নিবেদিতার জন্য একটি আর্থিক সংস্থানও থাকা উচিত। ১৯০৫ সালের ১২ জুন সারা বুল একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে এই অনুরোধ জানান।

জগদীশচন্দ্রের এই পুস্তকগুলি রচনার কাজে নিবেদিতা কতখানি ব্যস্ত থাকেতন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর চিঠিপত্রেই। ১৯০৫ সলের ২২ নভেম্বর জোসেফিন

ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'We are gradually finishing the gigantic labour of Bairn's book on Botany. We are now working over the conclusion and will hope by his birthday on the 30th to have put in the ineivtable extra discoveries, and even the Introdiction. This does not mean the end of the work but it does probably mean no more serious composition– and I am hoping at the end to take a month or two of rest and travel. We work now 3 and sometimes 4 days a week from 8 A.M. till 5.30 P.M with an hour or two omitted for meals. And in the holidays we do almost more than this everyday.'

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'প্ল্যান্ট রেসপন্স (উদ্ভিদের সাড়া) বইখানা নিবেদিতা আর বসু দুজন মিলে লিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর মনের ভাবগুলোর খসড়া একটা কাগজে লিখে রেখে যেতেন, পরদিন এসে দেখতেন সেগুলো যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে রেমঁ একটি বর্ণনাও দিয়েছেন: 'এরপর ছুটিতে দু'জনে মায়াবতী গিয়ে দিনে পাঁচ-ছয় ঘন্টা খাটতে শুরু করলেন। কুশলী সাহিত্যিক চান ভাব আর ভাষার সমঞ্জস রূপ। পণ্ডিত অনেক সময় তা বোঝেন না।

'যে অধ্যায়টা লিখেছেন ওটা ছিঁড়ে ফেলব আমি। আমার ভাবনার ধারা ওরকম নয়।'

'তা যদি কর তো আমি চললাম। আমি কেবল তোমারই চিন্তাগুলো যতসম্ভব সহজ কথায় বিবৃতি করেছি। কথাকেই তোমার ভয়।'

'জুতসই কথা চাই, একেবারে ঠিক লাগসই... আর কিছু না।'

'তাঁদের মেজাজ দেখে বসুজায়া শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। গৃহকর্ত্রী মিসেস সেভিয়ার তাঁদের ঠাণ্ডা করবার জন্য নিয়ে আসেন চা।'

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুস্তকটির কাজ নিয়েও নিবেদিতা কতখানি উচ্ছ্বসিত ছিলেন তা বোঝা যায় ১৯০৪ সালের ২৮ জুলাই সারা বুলকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা লিখছেন, 'Do you realise what the Bairn's publication in philosophical Transactions means? It means that he plunged into Botany in February and March 1901, and in 1904 has written what the English people are proud to record as their Vedas on the subject. By the end of 1904 we quite hope to have a book ready which will complete and end the vegetable detour—3¹/2 years of work to include a whole science in his synthesis of Fundamental Unity. Think of it! It breaks all records...At present we are working at tremendous tension– shortening and adding. You would laugh if you could see my microscopic writing now!'

প্রায় একই রকম একটি চিঠি ওই বছরই ২১ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকেও লিখেছিলেন নিবেদিতা। লিখেছিলেন, 'You ask about the science. For the last year we have been writing 'bombshell.' Perhaps almost at the rate of one a month. But latterly we have had to slow down a little, being somewhat exhausted physically. However, I hope this will not last, but that after the holidays we shall be able to start again with renewed energy to the making of a great book which may take as much as 2 years.' সারা বুল এবং জোসেফিনকে লেখা নিবেদিতার এই চিঠি দুটি পড়লেই বোঝা যায় জগদীশচন্দ্রের বই সম্পাদনা এবং পরিমার্জনার কাজে কতখানি আন্তরিকভাবে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, এ-ও বোঝা যায় যে, এই পরিশ্রমসাধ্য কাজকে শুধু একা জগদীশচন্দ্রের কাজ হিসাবেই তিনি দেখেননি; এই কাজকে তাঁর এবং জগদীশচন্দ্রের যৌথ কাজ বলেই মনে করতেন নিবেদিতা। যে কারণে চিঠিতে 'আমাদের কাজ' বলে একে তিনি উল্লেখ করেছেন। এতেই প্রমাণ হয়, জগদীশচন্দ্রের কাজের সঙ্গে একটি আত্মিক টান অনুভব করেছিলেন তিনি।

জগদীশচন্দ্রের এই পুস্তকের সম্পাদনা ও পরিমার্জনার কাজ শ্রমসাধ্য হলেও তা যে কত নীরবে এবং নিঃস্বার্থভাবে করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা, তার প্রমাণ রয়ে গিয়েছে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে। ১৯০৫ সালের ২২ নভেম্বরের চিঠিতেই তিনি জোসেফিনকে আরো লিখছেন, 'But I do not want you to speak of this to anyone, either European or Asiatic. To speak of it to Mr. Geddes, for instance, might do positive harm. Only I know that you share something of His love and His burden and this which will be assuredly be His joy, will touch your heart.'

বোঝাই যাচ্ছে, কোনোভাবেই জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বে কোনোরকম ভাগ বসাতে চাননি নিবেদিতা। বরং, কোনোভাবে জগদীশচন্দ্রের যাতে কোনোরকম ক্ষতি না হয় সে বিষয়েই তিনি সজাগ এবং সতর্ক ছিলেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগেই জগদীশচন্দ্র তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'Comperative Electrophysiology'-র কাজ শুরু করে দেন। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনাতেও তিনি নির্ভর করেছিলেন নিবেদিতার ওপর। কিন্তু নিবেদিতা এই সময় স্বামীজির জীবনী রচনার কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এবং স্বামীজির জীবনীই তাঁর কাছে অনেক বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এই সময়েই বেনারসে এক জ্যোতিষী নিবেদিতার ভাগ্য গণনা করে জানিয়েছিলেন, তাঁর আর বেশিদিন আয়ু নেই। সে কথা শুনে নিবেদিতাও চাইছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব স্বামীজির জীবনী রচনার কাজে হাত দিতে।

১৯০৬ সালের ১২ জানুয়ারি সারা বুলকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা সেকথা জানিয়ে লিখেছেন, 'I got from a fortune-teller at Benaras the hint I wanted – the thing I had been seeking for, and my one anxiety now is to put my work for Swamiji on a secure footing, by this wirting, and then place myself for remaining years at the service of the other duties.' স্বামীজির জীবনী লেখার জন্য ৩-৪ মাস একা থাকতেও যে চেয়েছিলেন নিবেদিতা, সে তথ্যও জানা যাচ্ছে এই চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, ' Yours offer to meet me 'anywhere in Europe' – at Assisi if I like. I have been thinking it over – and that reems to me ideal for a life of Swamiji. In such a place, alone with you, 3 or 4 months would perhaps be enough for the book.'

স্বামীজির এই জীবনী লেখার জন্য জগদীশচন্দ্রের পুস্তক লেখার কাজ থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে বিরতও রাখতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তবে সে কথা নিজে জগদীশচন্দ্রকে না বলে সারা বুলকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন। যে কারণে ওই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন, 'Tell the Bairn that you need me. That will make the break easier.' তবে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন নিবেদিতা, তার পরিচয়ও রয়ে গিয়েছে এই চিঠিতেই। তাঁর প্রাপ্য অর্থ বিজ্ঞান গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্রের হেফাজতে রাখার ইচ্ছাও এই পত্রে প্রকাশ করে গিয়েছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, ' On the £ 3000 that I am to assign to original scientific investigations on behalf of India (at the discretion of Deven [D.M. Bose] and Khoka [Arabinda Bose]). I would place and alternative appropriation— to historical or archeological research by Indians (at the discretion of Gangesh). This we can talk over together.'

স্বামীজির জীবনী রচনার পাশাপাশি নিবেদিতার মনে আর একটি চিন্তাও এসেছিল। তা হল, জগদীশচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবনী যাতে ভবিষ্যতে রচিত হয়— তার জন্য যাবতীয় তথ্যাদি তৈরি করে যাওয়া। এই ভাবনা নিবেদিতার মনে এই কারণেই এসেছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের এই প্রতিভাবান বিজ্ঞান সাধকের একটি তথ্যনিষ্ঠ জীবনী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই রচিত হওয়া দরকার। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন তথ্যাদি তিনি সংগ্রহ করে রেখে যেতে পারবেন বলেও মনে করেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর এই বাসনার কথাও তিনি সারা বুলকে পত্রে জানিয়েছিলেন।

শুধু জগদীশচন্দ্র নন। অবলা বসুকেও নিবেদিতা শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার আসনে বসিয়েছিলেন। আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'বো' বলে। বসু দম্পতি এতটাই পছন্দের

ছিলেন নিবেদিতার যে তাঁদের যে কোনো আনন্দ সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। তাঁদের দুঃখে তিনিও গভীরভাবে দুঃখী হতেন। বসু পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার কতটা আবেগ জড়িত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দুটি চিঠিতে। অবলা বসু সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর আনন্দে উদ্বেলিত নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখছেন, 'Did I tell you that Mrs. Bose is to have a baby within the next three weeks? Is it not wonderful? I feel too as if the presence of a child would add a great mystic significance to all I love. I can not explain this even to myself. But doubtless it will be a consecrated babe. I think you should write sweet things to him, when it comes.' এই চিঠিটিই [২৩ এপ্রিল, ১৯০৩] বলে দিচ্ছে, বসু দম্পতির সুখের সঙ্গে নিবেদিতা নিজের সুখকেও কীভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু অবলা বসু একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তাঁর জীবন সংশয়ও হয়। পরে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠতে শ্রীমতী বসুর অনেকটাই সময় লাগে। মৃত সন্তান প্রসব করে শারীরিক এবং মানসিক দুদিক দিয়েই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর এই বিপর্যয় নিবেদিতাকেও গভীরভাবে আঘাত করেছিল। ১৯০৩ সালের ১৮ মে অবলা বসুকে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন নিবেদিতা। চিঠির অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি। নিবেদিতা লিখেছেন,

'Dear litlle mother,

Do not think me impartinent for trying to tell you some of the things, Dear, that have been coming to me all day for you. I want to say to you that to me– whether you think I have the right to say this or not– you are and shall ever be,as much a mother, as if the Baby had remained a living presence with us all... Don't you think it is beautiful to think of it in this way– so that the little one is really with you still, and always with a special link of mother–and –child between you, although you have had renounce so many sweet joys and services? Perhaps you have achieved all the grater motherhood , because it has been turned into the grand sacrament of sorrow instead of that of life... Anyway, Dear, to me you are always mother, and if you have lost a passing joy, I know and feel that you have gained all that great living power that goes with it, and I believe that you are only the more universal in your motherhood, for that realisation that the world calls a lose.' এই চিঠিগুলিই বলে দেয় বসু দম্পতিকে কত আপনার করে নিয়েছিলেন নিবেদিতা।

তাঁর গবেষণার কাজে নিবেদিতার এই নিঃস্বার্থ সহায়তা, তাঁর লেখাগুলিকে সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে তা বিদগ্ধ জনের কাছে মনোগ্রাহী করে তোলা, সর্বোপরি সুখে-দুঃখে সর্বদা বসু-দম্পতির পাশে থাকা—এর যথার্থ প্রতিদান কি জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন? নাকি নিবেদিতাকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে জগদীশচন্দ্রের কুণ্ঠা ছিল? এ সংশয় দেখা দেবেই। কারণ, জগদীশচন্দ্রের আচরণই প্রমাণ করে, নিবেদিতাকে স্বীকৃতি দিতে তিনি আদৌ মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমত, নিবেদিতাকে 'লিটারারি এগজিকিউটিভ' করে নেওয়ার প্রস্তাব সারা বুল জগদীশচন্দ্রকে দিলেও, বিজ্ঞানী তাতে কর্ণপাত করেননি। বোঝাই যায়, নিবেদিতাকে লিটারারি এগজিকিউটিভ করায় তাঁর অনীহাই ছিল। অথচ, নিবেদিতাকে লিটারারি এগজিকিউটিভ করলে জগদীশচন্দ্রের কাজে তাঁর অবদানটিও স্বীকৃতি পেত। নিবেদিতার অবদানকে কোথাও খাতায় কলমে নথিভুক্তই রাখতে চাননি জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছু বিদেশি পত্রিকা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। হার্বার্ট স্পেনসারের মতো দার্শনিকও জগদীশচন্দ্রের প্রশংসা করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর এই জয়যাত্রার কথা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, '...তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্বত্রই জয় সংবাদ।' অথচ, চিঠিতে কোথাও একটি বারের জন্যও নিবেদিতার নামোল্লেখ করলেন না। জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকখানি উৎসর্গ করলেন সারা বুলকে। অথচ এই বইয়েও কোথাও নিবেদিতার নামোল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। অথচ, জগদীশচন্দ্রের এই দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে বিজ্ঞানীর পাশাপাশি নিবেদিতারও কিন্তু সমান ভূমিকা ছিল।

অবশ্য সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বা তাঁদের স্বীকৃতি দানে জগদীশচন্দ্র যে বরাবর কুণ্ঠা দেখিয়েছেন, তা উল্লেখ করেছেন সুবীরকুমার সেন। জগদীশচন্দ্র সম্পর্কিত তাঁর গবেষণামূলক লেখায় সুবীরকুমার দেখিয়েছেন, 'প্রথমাবধি জগদীশচন্দ্রের সমস্ত গবেষণাপত্রের এবং পুস্তকের লেখক সত্ব তাঁর একার। শোনা যায় প্রফুল্লচন্দ্র নাকি জগদীশচন্দ্রকে বলেন তাঁর নামে এই যে এতগুলি করে পেপার প্রতিবছর বের হচ্ছে কেউ কি বিশ্বাস করবে— তিনি একাই যন্ত্র বানাচ্ছেন, পরীক্ষা করছেন, লিখছেন! ছেলেরা কাজ করছে, তাদের নাম থাকবে না? এরপর নাকি জগদীশচন্দ্র সহকারীদের নাম দেওয়া শুরু করেন; কিন্তু তাও 'Assisted by'-বলে।'

শুধু নিজের লেখার ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্র-গল্পের ইংরেজি অনুবাদের জন্যও নিবেদিতাকে প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে নারাজ ছিলেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করানোর একটা উদ্যোগ জগদীশচন্দ্র নিয়েছিলেন। ১৯০০ সালে ২ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, ' তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা

হইতে দিব না।...তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশে অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs Knight-কে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে।' এই প্রথমোক্ত বন্ধুটিই হচ্ছেন নিবেদিতা। লক্ষ করার মতো বিষয় যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর এই পত্রে নিবেদিতার নামোল্লেখ পর্যন্ত করছেন না।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং 'দেনাপাওনা' - এই তিনটি গল্প অনুবাদ করার জন্য নির্বাচন করেন জগদীশচন্দ্র। 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং 'দেনাপাওনা'র অনুবাদের কাজও যে তিনি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন, ১৯০০ সালের ২৯ নভেম্বর সারা বুলকে একটি চিঠিতে সে কথা জানান নিবেদিতা। লেখেন, 'The Cabuliwallah and Leave of Absense are both Englished now, and I have 'Giving and, Giving in Return' ready for the last finish. So we are doing something... But one thing I have done– I have made an ink- impression of my right hand– in memory of Cabuliwallah!' নিবেদিতার করা 'কাবুলিওয়ালা'-র অনুবাদ বিদেশে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। প্রশংসিত যে হয়েছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠি। ১৬ জানুয়ারি ১৯০১, রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'প্রথম । এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মহিলা— সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। 'ছুটী' শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

'দ্বিতীয়—Typical John Bull। 'ছুটী ' শুনিয়া বলিলেন যে , local colour তো কিছু দেখলাম না— ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে, এরূপ দু-একজনকে আমি জানি—true to life। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

'তৃতীয়। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হইলে বলিব, ইঁহার জীবন অতি আশ্চর্য্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয়—ইউরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত। He has not seen such a fine touch in any European literature.

'সুতরাং সাধারণের নিকট কীরূপ লাগিবে জানি না।' জগদীশচন্দ্র তাঁর চিঠিতে তৃতীয় যে ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন তিনি সম্ভবত সেই সময়ে লন্ডনে আশ্রয় নেওয়া রাশিয়ান বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিন। ক্রপটকিন 'কাবুলিওয়ালা'-র অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এ চিঠিতেও নিবেদিতার কথা ঘূণাক্ষরেও উল্লেখ করেননি জগদীশচন্দ্র।

২৬ নভেম্বর ১৯০০ সালে আর-একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, 'তোমার পুস্তকের জন্য অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া

এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।' জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলিই প্রমাণ করে দিচ্ছে, নিবেদিতার রবীন্দ্র-গল্পের অনুবাদ কতখানি মর্মস্পর্শী হয়েছিল। সেই সঙ্গে একটি চিঠিতেও নিবেদিতার নামটুকু উল্লেখ না করায়, এ প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়— এই অনীহার কারণ কী? জগদীশচন্দ্র কি ইচ্ছাকৃতভাবেই নিবেদিতার নাম আড়াল করতে চেয়েছিলেন? প্রাপ্য স্বীকৃতি তাঁকে দিতে কিসের এত দ্বিধা ছিল জগদীশচন্দ্রের? তাঁর এই আচরণ স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মনে এনে দেয় যে, নিবেদিতার বন্ধুত্ব যতখানি নিঃস্বার্থ ছিল, ঠিক ততখানিই নিঃস্বার্থ ছিল কি জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব?

তবে, নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে চটজলদি এইরকম সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় অনুচিত হবে। নিবেদিতার মৃত্যুর পর, ১৯১৩-র ২১ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে সিস্টার ক্রিস্টিন জানিয়েছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যুতে জগদীশচন্দ্র মানসিক-ভাবে ভেঙে পড়েছেন। বিভিন্ন জনের লেখা থেকে এমনও জানা যায় যে, নিবেদিতার বিভিন্ন রচনাকে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য উদ্যোগও নিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। এ ব্যাপারে নিবেদিতার বোন মেরি উইলসন এবং 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফকে তিনি সাহায্যও করেছিলেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর জিন হারবার্ট ও লিজেল রেঁম তাঁর জীবনী লেখার বিষয়ে উদ্যোগী হলে মেরি উইলসন তাঁদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ করিয়ে দেন। ১৯৩৭ সালের ৭ অক্টোবর জিন হারবার্টকে জগদীশচন্দ্র লেখেন, ' Sister Nivedita was also greatly interested in the revival of all intellectual advances made by India, and it was her strong belief in the advance of Modern Science accomplished by Indian men of science that led me to found my Research Institute.'

জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের স্থাপত্যেও আশ্চর্যভাবে নিবেদিতার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশপথেই রয়েছে জপমালা হাতে এক নারীর রিলিফ মূর্তি। বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না— সে নারী নিবেদিতাই। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ফোয়ারাটির নীচে রাখা রয়েছে নিবেদিতার চিতাভস্ম। জগদীশচন্দ্রের সহকারী, নিবেদিতার স্নেহধন্য ড. বশীশ্বর সেন সেই চিতাভস্ম এনে ফোয়ারার নীচে রেখেছিলেন। এবং তাতে জগদীশচন্দ্রের সম্মতিও ছিল। কুমুদবন্ধু সেনের লেখায় পাই, নিবেদিতা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, '...যদি তিনি পাশ্চাত্য দেশে থেকে কাজ করতেন— যশ-মান-প্রতিষ্ঠা-ঐশ্বর্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তো। আজ তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ শোক প্রকাশ করতো। কিন্তু তিনি যে প্রলোভন ত্যাগ করে এই দেশকে এমন আপনার করে নিয়েছিলেন যা এদেশে বড় বড় নেতার মধ্যেও দেখতে পাবে না।... তাঁর মতো

দৃষ্টি, তাঁর মতো সৌন্দর্যবোধ, তাঁর মতো গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁর মতো শিল্পীমন, আমাদের দেশে কারো নেই।... বোসপাড়ায় একটা ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়িতে অর্ধাহারে, প্রায় অনাহারে এই দেশের সেবায় তিনি তিলে তিলে আত্মদান করেছেন। কত অনুরোধ করা হয়েছে ভাল বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য— তাঁর পুষ্টিকর আহারের জন্য। তিনি হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দধীচির মতো আত্মবলিদান, উমার মতো তপস্যা, যা পুরাণে বা কাব্যে বর্ণনা শুনেছি— তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বতোভাবে নিজেকে নিবেদন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম ঠিক রেখেছিলেন— নিবেদিতা।'

এতসব সত্ত্বেও বলতে হবে, জীবৎকালে যে স্বীকৃতি নিবেদিতার প্রাপ্য ছিল, সেই স্বীকৃতি দিতে জগদীশচন্দ্রের অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের দুজনের বন্ধুত্বের মাঝে জগদীশচন্দ্রের এই আচরণ কিন্তু বরাবরই প্রশ্নচিহ্নের মতোই থেকে যাবে। তবু, এটা মানতেই হবে যে, এইসব বিতর্ক সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার সম্পর্কের রসায়নটি ছিল অত্যাশ্চর্য। মতবিরোধ, পারস্পরিক সৌজন্য-শ্রদ্ধা-সব মিলিয়ে সে সম্পর্ক আদতে ছিল পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল এক গভীর বন্ধুত্বের।

আঠারো

জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও, ব্রাহ্ম সমাজের আরো বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নিবেদিতার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্রের মতো সে সম্পর্ক অত অন্তরঙ্গ না হলেও, সেই সম্পর্কগুলিও পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সৌজন্যবোধে পরিপূর্ণ ছিল। এঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে নিবেদিতার মতবিরোধ ছিল, কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও মতাদর্শগত বিরোধ কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলেনি। ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, সরলা ঘোষালের সঙ্গে নিবেদিতার হৃদ্যতা তো ছিলই, পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। শুধু যোগাযোগ গড়ে ওঠাই নয়, অবনীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতার গুণমুগ্ধ। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের উদ্যোগে, ১৯০২ সালে জাপানের নবজাগরণের পথিকৃৎ, শিল্পশাস্ত্রী কাকুজো ওকাকুরা কলকাতায় এসে পৌঁছলে ওকাকুরাকে কেন্দ্র করে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সেই গোষ্ঠীতে ঠাকুরবাড়ির বহু সদস্যও ছিলেন। ওকাকুরা ক্রমে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। নিবেদিতার সঙ্গেও ওকাকুরার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম আলাপ হয় ওকাকুরার সম্মানার্থে দেওয়া আমেরিকান কনসালের পার্টিতে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে লিখছেন, 'প্রথম তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়ীতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা, ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুই তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।

'আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস্ হোমউডের বাড়িতে। আমার উপর ছিল নিমন্ত্রণ করবার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজা-রাজড়া সাহেব-মেম গিস্ গিস্ করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের ছেলে সব; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কতরকম কায়দা, নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাঁদের সৌন্দর্য, ফ্যাশনে চারিদিক ঝলমল করছে। হাসি, গল্প, গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যেও হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী রূপালীতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমন্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগলো। উড্রফ, ব্লান্ট এসে বললেন, 'এ কে?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

'সুন্দরী সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা— সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।... নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর-স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনি আর, উপমা দেব কি।'

ভারতীয় শিল্পকলাকে পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার পিছনেও নিবেদিতা এক বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওই সময়ে নিবেদিতার সেই ভূমিকা ভারতীয় চিত্রকলায় এক নতুন ধারার উন্মোচন ঘটাতেও সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার অন্যতম অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০২ সালেই নিবেদিতার পরিচয় ঘটে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সঙ্গে। সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ। হ্যাভেল ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলা এবং সংস্কৃতি নিয়ে তিনি আলোচনাও করতেন। হ্যাভেলই প্রথম ইউরোপিয়, যিনি বলেন, ভারতীয় শিল্পকলা একদমই স্বতন্ত্র। গ্রিক স্থাপত্য, রোমান চিত্রকলা থেকে তা আসেনি। হ্যাভেল তাঁর গ্রন্থ 'Indian Sculpture and Painting'-য়ে লিখেছিলেন, 'The Greeks no more created Indian Sculpture and Painting than they created Indian Philosophy and Religion.' হ্যাভেলের এই স্পষ্টবাদিতা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল, তবে এই কথার জন্য হ্যাভেলকে ইয়োরোপিয় সমাজের কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছিল। হ্যাভেল সম্পর্কে

নিবেদিতা লিখেছিলেন, ' Poor Havell! he had to a suffer persecution at the hands of the predujiced Anglo- Indian officialdom.' নন্দলাল বসুর জীবনীকার বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী জানিয়েছেন, নন্দলাল বলেছিলেন, 'নিবেদিতা হ্যাভেলকে ভারতীয় চিত্রকলার দর্শন এবং মূল ভাবটি বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু হ্যাভেল তাঁর কোনো গ্রন্থে নিবেদিতার কথা উল্লেখ করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। উল্লেখ করুন কি না-ই করুন — ভারতীয় চিত্রকলাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিবেদিতা এবং হ্যাভেল যৌথভাবে যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তা ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই সময় হ্যাভেল এবং নিবেদিতার মতের আর একজন বড় সমর্থক ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রকর এবং শিল্পসমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী। নিবেদিতা, হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী একযোগে ভারতীয় শিল্পকলার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। এ নিয়ে নিবেদিতা সে সময়ে বহু লেখালেখিও করেন। তাঁর লেখাগুলির ভিতর দিয়েও নিবেদিতা এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পকলা কখনো পাশ্চাত্যের অনুসারী নয়। তার একটি নিজস্ব ঘরানা রয়েছে। এই মতকে সমর্থন করতেন কাকুজো ওকাকুরাও। নিবেদিতার এই লেখাগুলি পাশ্চাত্যের দুই বিশিষ্ট শিল্পরসিক স্যার জন উডরফ এবং লর্ড কিচেনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হ্যাভেল, নিবেদিতা এবং কুমারস্বামী আরো একটি বড় কাজ করেছিলেন। এদেশে আর্ট স্কুলগুলি কীভাবে কাজ করবে সে নিয়েও তাঁরা তখন সরব হয়েছিলেন। সেই সময়ে কলকাতা ছাড়াও মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, লাহোর এবং বোম্বেতে আর্ট স্কুল ছিল। ওইসব আর্ট স্কুলের শিক্ষকরা ছিলেন বিদেশি এবং আর্ট স্কুলগুলিতে পাশ্চাত্য ধারার শিল্পশিক্ষাই দেওয়া হত। নিবেদিতা, হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী এই শিক্ষারীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—ভারতের আর্ট স্কুলগুলির কাজ শুধু ইয়োরোপিয় ধারার শিল্প শিক্ষা দেওয়া নয়; বরং ভারতীয় শিল্পরীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা, ভারতীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার সংযোগ ঘটানো, সর্বোপরি প্রায় ধ্বংস হতে বসা ভারতীয় শিল্পে আবার প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনা—এটিই এদেশে আর্ট স্কুলগুলির অন্যতম কাজ হওয়া উচিত। নিবেদিতা তাঁর 'Religion and Dharma' শীর্ষক লেখায় লিখেছেন, 'Art must be reborn. Not the miserably travesty of would-be European that we at present know. There is no voice like that of Art, to reach the people...And art will be reborn, for she has found a new subject– India herself. Ah, to be a thinker in bronze and give to the world the beauty of the Southern Pariah, as he swings, scarce-clad, along the beach road of Madras! Ah, to be Millet, and paint the woman worshiping a dawn beside the sea! Oh for a pencil

that would interpret the beauty of he Indian Sari; the gentle life of village and temple, the coming and going at the Ganges side; the play of the children; the faces, the labours, of the cows.'

ভারতীয় শিল্পকলাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার গৌরব পুনরুদ্ধারে নিবেদিতা যখন সচেষ্ট—সেই সময়ই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে, অবনীন্দ্রনাথও অন্যদের মতোই পাশ্চাত্য রীতিকেই অনুসরণ করতেন। কিন্তু নিবেদিতার এই প্রয়াস যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছিল তা বোঝাই যায়। নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় রীতি অনুসরণ করে ছবি আঁকতে শুরু করেন। এই সময়েই ভারতীয় রীতিতে 'ভারতমাতা'-র মতো বিখ্যাত ছবিগুলি তিনি আঁকেন। 'ভারতমাতা' ছবিটির প্রভূত প্রশংসা করে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'We see in this drawing something for which Indian art has long been waiting, the birth of the idea of those new combinations which are to make the modern age in India.' অবনীন্দ্রনাথের এই ভারতীয় ধারায় আঁকা ছবিগুলি সম্পর্কে নিবেদিতা এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এই ছবিগুলি তিনি প্রকাশ করেন; সেই ছবিগুলি সম্পর্কে নিজের মতামতও লেখেন। পরে 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই ছবিগুলি ছাপান। সঙ্গে নিবেদিতার লেখাও অনুবাদ করে ছাপিয়ে দেন। তবে, পাশ্চাত্যের শিল্পকর্ম থেকেও যে নিবেদিতা একদম মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন তা নয়। রাফায়েল, মিকেলেঞ্জেলো, রোসেত্তি, মরিস—এইসব বিশিষ্ট চিত্রকরদের ছবিও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন নিবেদিতা। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্যের এই শিল্পকলা সম্পর্কেও তিনি লেখেন। এগুলিও পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নিবেদিতা এবং হ্যাভেলের উৎসাহেই এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি নতুন শিল্পীগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত হালদার এবং ভেঙ্কটাপ্পার মতো অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা— যাঁরা পরবর্তীকালে যশস্বী চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত হন। আনন্দ কুমারস্বামী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার জন উডরফ এবং ওসি গাঙ্গুলিরও সমর্থন লাভ করে এই গোষ্ঠীটি। পরে এই গোষ্ঠীর উদ্যোগেই ১৯০৭ সালে জন্ম নেয় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট।

নিবেদিতা এই গোষ্ঠীর তরুণ শিল্পীদের কাজকর্মের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হন। এই তরুণ শিল্পীদের চিত্রকলা সম্পর্কে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালিখি করতেন নিবেদিতা। নন্দলাল বসু যখন আর্ট স্কুলের ছাত্র, সেই সময়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আর্ট স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি নন্দলালের আঁকা দেখে মুগ্ধ হন। পরে নিবেদিতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে নন্দলাল বসু লিখেছেন, 'তাঁর কাছে আমরা

এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্তু প্রকাশ করে বলা কঠিন। নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। আমি তখন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল দেখতে এলেন। আমি তখন দু'খানা ছবি করেছিলাম। একখানা মা কালীর আর অন্যখানা সত্যভামার মানভঞ্জন।

'নিবেদিতা অনেকক্ষণ ধরে খুব যত্ন করে ছবি দুখানা দেখলেন, প্রশংসা করলেন ও আমাকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবিখানি দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশি হবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে।' আমাকে তাঁর বোসপাড়ার বাড়িতে যাবার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পপ্রেমিক।'

নিবেদিতার সঙ্গে এই তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর যে একটি হার্দ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নন্দলাল বসু এবং অসিতকুমার হালদারের লেখায়। নন্দলা-। বসু লিখেছেন, 'কিছুদিন পরে সহপাঠী সুরেন গাঙ্গুলিকে সঙ্গে করে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সিস্টার ক্রিস্টিন ও নিবেদিতা দু'জনে বসেছিলেন।

'নিবেদিতা বললেন, 'তোমরা নীচে আসন করে বস, আমি দেখি।'

'আমরা দু'জনে নীচে আসন করে বসলাম।

'নিবেদিতা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার প্রতি চেয়ে রইলেন।

'আমরা নিবেদিতার এই অদ্ভুত আচরণে মনে মনে আশ্চর্য বোধ করলেও মুখে কিছু বললাম না। দেখলাম, কী প্রশান্ত উজ্জ্বল সেই দৃষ্টি— এমনটি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। তারপর ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি এনে আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'কি দেখছ, বল দেখি?'

'আমি উত্তর করলাম, 'একটি বুদ্ধমূর্তি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দেখ আমার গুরুদেবের চেহারার সাথে এ মূর্তির কী আশ্চর্য মিল।'

'তারপর নিবেদিতা আমাকে স্বামীজির একখানা ছবি তৈরি করতে অনুরোধ করেন। দিনকয়েক পরে আমি স্বামীজির একখানা ছবি করে নিবেদিতাকে উপহার দিলাম। ছবি দেখে নিবেদিতার আনন্দের সীমা ছিল না। আমাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'ছবির কাপড়-চোপড় একটু বেশি দেওয়া হয়ে গেছে।'

অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, 'আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে যেতাম। তাঁর বাড়িতে একটি স্কুল ছিল ও সব জিনিসপত্র খুব তকতকে

ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থাকত। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে এইভাবে পরিচ্ছন্নতারও শিক্ষা দিতেন তিনি। আমাদের উপদেশচ্ছলে বারবার সাবধান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দিই। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণের নির্ভর করছে— সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।...

'আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন আমাদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন।'

ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে নিবেদিতা শেষবার গিয়েছিলেন ১৯১০ সালের ফ্রেবুয়ারি মাসে। সেবার প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ভেঙ্কটাপ্পা, অসিত হালদার, ও সি গাঙ্গুলি, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখের ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনী দেখে এসে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন,' And for ourselves, we came away much gladdened, for never had the continuity of the new school with the old, been so convincingly demonstrated, and we felt, in that fact, many miles nearer to our dream– the great Indian school of mural painting, historic, national and heroic, which is to be the gift of the future to the Chosen Land?'

নিবেদিতাই উদ্যোগী হয়ে নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে অজন্তায় পাঠিয়েছিলেন সেখানকার চিত্রলিপির কপি করে আনতে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নিবেদিতা নইলে নন্দলালের যাওয়া হত না অজন্তায়।' বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী নন্দলাল বসুর জীবনীতে জানিয়েছেন, নন্দলাল এবং অসিত হালদার কাউকেই বুঝতে না দিয়ে নিবেদিতা অজন্তা যাওয়ার দুটি টিকিট কেটে তাঁদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এরকমই ছিল নিবেদিতার কাজকর্মের ধরন। কিন্তু নন্দলাল বসুরা অজন্তায় পৌঁছনোর পর নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসু এবং গণেন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে উপস্থিত হলেন। ওদের থাকার এবং কাজকর্মের সব ব্যবস্থা করে অজন্তা ত্যাগ করলেন। বরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, নন্দলাল বলেছিলেন—নিবেদিতার মৃত্যুর পর তিনি একজন পথপ্রদর্শনকারী দেবদূতীকে হারিয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গেও অম্লমধুর সম্পর্ক ছিল নিবেদিতার। ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার ধর্মমতের কোনো মিলই কোনোদিন হয়নি। উপরন্তু বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে চূড়ান্ত বিরোধই ছিল নিবেদিতার। আবার বিপিনচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিপিনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের জন্য তাঁকে

শ্রদ্ধাও করতেন নিবেদিতা। এই কারণেই বিপিনচন্দ্র সম্পাদিত 'New India' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন নিবেদিতা। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হয় আমেরিকায়। ওই সময়ে নিজের স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে নিবেদিতা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ঘুরছিলেন। ওই সময়ই বোস্টনে সারা বুলের বাড়িতে নিবেদিতা আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্রও একই সময় শ্রীমতী বুলের বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন। বিপিনচন্দ্র স্মৃতিচারণায় লিখছেন, 'সেই সময়ই মিস নোব্‌লের সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের ফলিত জ্যোতিষে মানুষের একটা 'গণ' নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, কেহ দেবগণ, কেহ বা নরগণ, কেহ বা রাক্ষসগণ। নিবেদিতার কোন 'গণ' ছিল জানি না, আমারই বা কি 'গণ' সেকথা মনে নাই। কিন্তু আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই সেই প্রথম দিন অবধি যেরূপ দৈব দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহাতে নিবেদিতার দেবগণ এবং আমার রাক্ষসগণ, এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ দেখা হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুণ উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় কোন বৈরিতার লেশমাত্র জাগে নাই।... স্বর্গীয় পি মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, নিবেদিতা আমার কথা উঠিলেই বলিতেন—'পাশের দাঁতগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি কি? দাঁত দেখিলেই আমার মনে হয় তাহার ভিতর বাঘ লুকাইয়া আছে।' কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে অনাবিল সৌজন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।'

সারা বুলের বাড়িতে অবস্থানকালেই নিবেদিতার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সেই বিখ্যাত ঝগড়াটি সংঘটিত হয়। বিপিনচন্দ্রের মুখে স্বামীজি সম্পর্কে মন্তব্য শুনে নিবেদিতা কঠোর ভাষায় বিপিনচন্দ্রকে আক্রমণ করেন। বিপিনচন্দ্র এই বিখ্যাত ঝগড়াটি তাঁর স্মৃতিচারণায় (মার্কিনে চারিমাস) উল্লেখ করেছেন। বিপিনচন্দ্রের লেখার সেই অংশবিশেষ এর আগেই তুলে দিয়েছি। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার এই ঝগড়ার ঘটনাটি জগদীশচন্দ্র চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। সেই চিঠি পড়ে অনুমান করা যায় যে, নিবেদিতার গুরুভক্তি নিয়ে কবি ও বিজ্ঞানী নিজেদের ভিতর যথেষ্ট রঙ্গরসিকতাও করেছিলেন। ১৯০০ সালের ১৮ এপ্রিল জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'এবার আমেরিকা হইতে বিপিনচন্দ্র পালের একখানি চিঠি দেখিলাম। তাঁহার সহিত নিবেদিতার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। বিপিনবাবু এবং নিবেদিতা Mrs Bull এর বাড়িতে অথিথি ছিলেন। সেখানে বিপিনবাবু বিবিধ প্রকার Pleasant কথাই বলিতেছিলেন, কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ! সেখানে একটি meeting হয়, তাহাতে নিবেদিতা জাতিভেদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, বিপিনবাবু চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিবেদিতার মনে হইল যে ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ মানেন না। এবং স্বামীর (বিবেকানন্দ) প্রতি ভক্তি অপরিমিত নহে। অমনি বলিলেন যে, "আমি জানি

যে এই meetingএ একজন আছেন তিনি জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্ম্মের উপর যাঁহার আস্থা নাই।' তাহার পর বিপিনবাবুকে রণং দেহি বলিয়া challenge করিলেন। এইরূপ আকস্মিক রূপে আক্রান্ত হইয়া বিপিনবাবু বলিলেন যে জাতিভেদের অনেক সদগুণ আছে। তবে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে It keeps down men of genius; for example Swamiji could not have had so much influence যদি জাতিভেদ থাকিত। ...আর কোথা যায়। মনে করিতে পারেন স্বামীজির সম্বন্ধে এ রূপ কথা। অমনি এক scene; পরিশেষে ঘোরতর ঘৃণার সহিত নিবেদিতা বলিলেন যে, ব্রহ্মোরা হিন্দুও নহে, খৃষ্টানও নহে, বিপিনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মৎস্যও নহ, মাংসও নহ!!!"

'আপনাকে সমস্যা দিতেছি, বিপিনবাবু তবে কি?'

নিবেদিতার সঙ্গে বারবার এইরকম তর্ক-বিতর্কের ফলে বিপিনবাবু সারা বুলের আতিথ্য ছেড়ে নিউইয়র্কে চলে যান। কিন্তু এর কিছুদিন পরই বোস্টনে ধর্ম সম্মেলনে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় নিবেদিতা এতটাই উচ্ছ্বসিত হন যে, বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেন। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'এই কংগ্রেসে আমি যখন বক্তৃতা করিতেছিলাম, তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরব কাহিনী শুনিয়া নিবেদিতার দেহ-মন-প্রাণ সকল গরবে ভারী হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে ব্রাহ্মসমাজের লোক , নিবেদিতা তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার গুরুনিন্দা করিয়াছি বলিয়া আমার উপরে যে রাগ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি পর্যন্ত তাঁহার মনে রহিল না। ভারতের কীর্তিগাথা বিদেশীনীদের নিকটে গাহিতেছি দেখিয়া নিবেদিতার চক্ষে আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। মিসেস বুলের বাড়িতে আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে মিলিয়াছিলাম। এই 'কংগ্রেস অব রিলিজিয়ন'-এর অধিবেশনে ভারতের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আমরা উভয়ে এমন এক সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত মতভেদ সত্ত্বেও চিরদিন অটুট ছিল।'

বিপিনচন্দ্র পালের এই লেখার ভিতর দিয়েই নিবেদিতার চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। প্রথমত, মতাদর্শগত কোনো বিরোধ থাকলেও তা তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাঝে আনতেন না। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটিই লক্ষ করা গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নিবেদিতার আবেগপ্রবণ মন। দুঃখে তিনি যেমন অধীর হয়ে উঠতেন, আনন্দে উদ্বেল হতেও তাঁর বেশি সময় লাগত না। তৃতীয়ত, ভারতের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা। ভারতের প্রতি এই অসীম ভালোবাসা থেকেই বিপিনচন্দ্রের 'New India' পত্রিকায় নিয়মিত লিখে গিয়েছেন নিবেদিতা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজের মতামত প্রকাশের এবং ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধর্মভাবনাকে তুলে ধরার জন্য নিবেদিতা জাতীয়তাবাদী

পত্র-পত্রিকাগুলিকেই সেই সময়ে বেছে নিয়েছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই সূত্রেই পরিচয় নিবেদিতার। সেই পরিচয়ই পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে নিবেদিতা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য কাশীতে যান। অধিবেশনের পরে ১৯০৬ -এর জানুয়ারি মাসে তিনি তিলভাণ্ডেশ্বরে অবস্থান করেন। সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, 'ঠিক সাল আমার মনে নাই, বোধহয় ১৯০৬ সালে ভগিনী নিবেদিতা কিছুদিন কাশী তিলভাণ্ডেশ্বরে একটি বাড়িতে বাস করেন। তিনি একদিন রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী'র প্রচুর প্রশংসা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেমন করিয়া 'প্রবাসী'র প্রশংসা করিলেন ইহাই ভাবিতেছিলাম, কারণ 'প্রবাসী' ত বাংলা কাগজ। তবু দেখিলাম 'প্রবাসী'র সব মতামত, সব খোঁজখবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দবাবুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন।

'ভগিনী নিবেদিতা একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, 'এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায়— বাংলার সুখদুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখন ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।' পরে 'মডার্ন রিভিউ' বাহির হইবার পর ভগিনী নিবেদিতার সহিত দেখা হইলে আমি বলিয়াছিলাম, 'আপনার সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী এতদিনে সফল হইয়াছে। কিন্তু আপনি এত আগে হইতে কি করিয়া এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন?' ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, 'গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালিল, দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশপ্রদীপ হইবে। অলোকস্তম্ভের মহাদীপের মত যে শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতে নিঃশেষিত হয়?'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি নিবেদিতার গভীর শ্রদ্ধার কারণটি ছিল রামানন্দের গভীর স্বদেশ অনুরাগ। রামনন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আর সেটিই নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের মাধ্যম ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। রামানন্দ যখন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন জগদীশচন্দ্রের মাধ্যমে নিবেদিতাকে লেখার জন্য অনুরোধ জানান। ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা নিয়মিত এই কাগজে লিখতেন। নিবেদিতার মৃত্যুর কয়েকমাস পরেও তাঁর লেখা 'Star Picture' প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা

ছিল সরকার বিরোধী। ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্মের খোলাখুলি সমালোচনা থাকত এই পত্রিকায়। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের খুব সুনজরে পত্রিকাটি ছিল না। এ জন্য মাঝে মাঝেই পুলিশ রামানন্দের বাড়িতে খানাতল্লাশি চালাত। নিবেদিতার সঙ্গে সরকারের উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন ব্যক্তির যোগাযোগ থাকার ফলে তিনি খানাতল্লাশির সংবাদ আগেই পেয়ে যেতেন এবং সেইমতো রামানন্দকে আগাম সতর্ক করে দিতেন। শুধু লেখা নয় আরো নানভাবে 'মডার্ন রিভিউ' কাগজটির জন্য রামানন্দকে সহায়তা করতেন নিবেদিতা। নিবেদিতা তাঁর লেখার ওপর কারও কলম চালানো পছন্দ করতেন না। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি এতটাই আস্থা ছিল তাঁর যে, রামানন্দকে লেখার ওপর কলম চালানোর অধিকারও তিনি দিয়েছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'চিঠিতে ছাড়া এ সব বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সহিত মৌখিক কথা যখন হইত, তখন কথা বলার কাজ তিনিই বেশী করিতেন, আমি বেশীর ভাগ শ্রোতার কাজ করিতাম। আচার্য বসু (জগদীশচন্দ্র বসু) হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'উনি চান যে তুমিও খুব তর্ক কর এবং তর্কে তাঁহার নিকট তুমি পরাস্ত হও, তাহা হইলে তিনি খুব খুশি হন।' নিবেদিতা শুনিয়া হাসিতেন।'

নিবেদিতার মৃত্যুর পর 'মডার্ন রিভিউ' -এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'She was, if one may be pardoned a trite epithet, a born journalist. She wrote with brilliance, vigour and originality and, even on commonplace themes, with something like inspired fervour. She could write with great facility and on a great variety of topics, and could therefore comply with the requests of many editors for her paragraphs and articles. But nothing that she wrote was commonplace, even the most hackneyed topic were invested by hér pen with new power and grace, and became connected with the first principles of human action and with the primal source of all strength. She could never be a hireling , she would either write on topics of her own choice and when the spirit moved her, or not write at all...

'From the very birth of this Review, she helped us with her contributions and suggestions and in other ways in an uncommon measure. Her unsparing criticism, in private conversation, of our shortcomings and faults, was of no less advantage to us. The sense of the value of all this help is daily growing upon us, and we feel that we must not try to give it adequate expression. Would that all who are kindly were as unsparing in their criticism, and all who are severe critics as kindly and helpful as she! She was, indeed, a sister

and she was Nivedita, dedicated to the service of all who came within the orbit of her life's way,'

রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গেও নিবেদিতার সম্পর্কটি ছিল সুমধুর। যদিও রমেশচন্দ্র ছিলেন উচ্চ রাজকর্মচারী এবং নরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের এই পার্থক্য রমেশচন্দ্র এবং নিবেদিতার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং রমেশচন্দ্রের প্রতি নিবেদিতার একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের সুগভীর গবেষণা নিবেদিতার অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছিল। ১৯০০ সালে নিবেদিতা যখন তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্রও সেই সময়ে ওই দেশেই ছিলেন। ওই সময় রমেশচন্দ্রই তাঁকে পুস্তক রচনায় উৎসাহ দেন। রমেশচন্দ্রের উৎসাহেই নিবেদিতা 'The web of India' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই বইটি লেখার বিষয়ে রমেশচন্দ্র তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন। রমেশচন্দ্রের সেই সাহায্যের কথা নিবেদিতা বইয়ের মুখবন্ধে স্বীকারও করেছেন। নিবেদিতাকে সংস্কৃত এবং বাংলা লিখতেও রমেশচন্দ্র সাহায্য করেন। রমেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'One felt more and more, in his calm disinterestedness, in his loneliness and in his concentration, that as his forefathers had gone to the forest to live the life of the Vanaprastha for the development of the self, so here was one leading the same life in the forest of bricks and mortar for the development of his people.' রমেশচন্দ্রের শান্ত সমাহিত ব্যক্তিত্ব নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯০২ সালে নরওয়েতে সারা বুলের বাড়িতে রমেশচন্দ্র এবং নিবেদিতা একই সময়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে 'মডার্ন রিভিউ'-এ নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'As his fellow-guest on one of the Norwegian firods I remember how his only recreation consisted of the long evenings spent in boating or in music, and the hour after the forenoon sea-bathing, when he would come to the verandah to eat a little food, while one of us would reach to the others the last instalment of his work. I have been awakened at night sometimes, to see the candle light streaming through the half-open door, and catch a glimpse of the head bowed over its manuscript, at the other end of the great music room, where he had lain sleepless for hours and risen to the work.'

'A history of the Bengali Language and Literature' গ্রন্থের প্রণেতা বিশিষ্ট ভাষাবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গেও নিবেদিতার হার্দ্যিক সম্পর্ক ছিল। দীনেশচন্দ্র বাগবাজারে নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ির কাছেই থাকতেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর

উপরোক্ত পুস্তকখানি নিবেদিতাকে দেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং প্রায় একবছর ধরে নিষ্ঠাসহকারে পুস্তকটি দেখেও নিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপর-ভাববিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণ উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশি দেখিয়াছি বালিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'এই পুস্তক দেখিবার সময় দীনেশবাবুর সহিত সাহিত্য, কবিতা এবং সঙ্গীত সম্পর্কে নিবেদিতার বহু মূল্যবান আলোচনা হইত। আলোচনা মাঝে মাঝে তর্কের আকার ধারণ করিত। কোন কোন দিন এক লাইনও পড়া হইত না, তর্কযুদ্ধেই সময় চলিয়া যাইত। তাঁহার (নিবেদিতা) উপর ভার ছিল ইংরেজী সংশোধনের, কিন্তু পুস্তকের কোন অংশ তাঁহার মনোমত না হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন এবং জোরের সহিত বলিতেন, 'দীনেশবাবু, ঠিক বলছি, যদি এই অংশ পরিবর্তন না করেন, তবে এ পুস্তক আমি আর পড়ব না।'

'দীনেশবাবু প্রমাদ গণিয়া কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। নিবেদিতার পক্ষে নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া অপরের মত গ্রহণ করা অসম্ভব। ইহা ব্যতীত মনে হয়, পুস্তকখানি ইংরেজীতে লিখিত হওয়ায় তাঁহার মনে হইত, বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি বা অন্যায় থাকিলে তাহা দ্বারা জগৎসমক্ষে ভারতবাসীর মর্যদাহানি হইবে। সুতরাং পুস্তকের মধ্যে ধনপতির গল্পে খুল্লনার প্রতি সমাজের শাস্তিবিধান সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আপত্তি ছিল। তাহার কারণ প্রকৃতদোষী লহনার পরিবর্তে নির্দোষ খুল্লনার প্রতি যদি সমাজ শাস্তির বিধান করে, তবে সে সমাজ সম্বন্ধে লোকের উচ্চধারণা হইতে পারে না। নিবেদিতা বলিতেন, 'আপনার গল্পে যদি এ কথা থাকে, তবে পৃথিবীর লোক এটাকে 'কাজির বিচার' বলে আপনাদের ঠাট্টা করবে। না, না, না, একথা আপনি রাখতে পারেন না; গল্প থেকে একে ছেঁটে ফেলুন।'

নিবেদিতার এ-হেন কথাবার্তায় দীনেশচন্দ্র যে বিরক্ত হতেন না, তার প্রমাণ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, 'কেন না, আমি তাঁহার রুষ্ট কথার মধ্য দিয়া তাঁহার অতি কোমল পুষ্পকোরকের মত সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি দেখিতাম।' আর নিবেদিতা কী ভাষায় প্রশংসা করতেন দীনেশচন্দ্রের? তা-ও ওই লেখায় দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন। দীনেশচন্দ্রের লেখা থেকেই জানা যায় নিবেদিতা বলতেন, 'দীনেশবাবু, আপনি সত্যিই একজন প্রধান কবি; আপনার লেখা গদ্য হলে কি হবে? আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব।' দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'তাঁহার ভাগিনীজনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর

ছিল, তাহা আর কি লিখিব। যেদিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।'

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতেই হবে, সেই সময়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিভাবানেরা প্রত্যেকেই নিবেদিতার সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যদুনাথ সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আনন্দমোহন বসু, নীলরতন সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সরোজিনী নাইডু, মতিলাল ঘোষ, প্রমুখ। এঁদের সকলের সঙ্গেই যে নিবেদিতার মতের মিল হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এঁরা সকলেই নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মীতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং মতদ্বৈততা থাকলেও ব্যক্তিগত স্তরে নিবেদিতার সঙ্গে এঁদের একটি সুসম্পর্ক চিরকালই ছিল। এটিই বলে দিচ্ছে— এদেশের বিদ্বজ্জন সমাজের পক্ষে নিবেদিতাকে তখন কোনোমতেই অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। আর এদেশের বিদ্বজ্জন সমাজে এটাই ছিল নিবেদিতার সবথেকে বড় জয়।

উনিশ

১৮৯৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা স্বামীজিকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে যান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তার আগে নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়ির চা-চক্রে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন স্বামীজি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুটি ঘটনার মাঝে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটে। তা হল, ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার অ্যালবার্ট হলে 'কালী' সম্পর্কে নিবেদিতা একটি ভাষণ দেন। নিবেদিতার সেই ভাষণ সে সময়ে কলকাতা শহরে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছিল। ১৮৯৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার 'কালী' এবং 'কালীপূজা' সম্পর্কিত বক্তৃতাটির আয়োজন করা হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের এক বিদেশিনী শিষ্যা কালী সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন— এ সংবাদে শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল স্বামীজির উদ্যোগেই।

১৮৯৮-র কালীপুজোর দিনই বাগবাজারে নিবেদিতার স্কুলের উদ্বোধন করেন সারদা দেবী। অমরনাথ এবং কাশ্মীর ভ্রমণের সময় স্বামীজির কাছ থেকে কালী রূপের ব্যাখ্যাও শুনেছিলেন নিবেদিতা। ফলে 'কালী' সম্পর্কে একটি ধারণা তাঁর মনে আগে থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। পরে ১৯০১ সালে স্বামীজি নিজেই বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার মাধ্যমে শক্তি আরাধনার সূত্রপাত করেছিলেন।

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'নিবেদিতার এই অগ্রাভিযানের দিকে খরদৃষ্টি বিবেকানন্দের। যখন বুঝলেন নিবেদিতা শক্তি অর্জন করেছেন, তখন পরীক্ষায় ফেললেন তাঁকে।

'বললেন, 'এবার তোমায় কালীর সম্বন্ধে বলতে হবে—তোমার কালী। যেমন বুঝেছ তেমনি তাঁকে প্রকাশ কর।'

'বিদেশী খৃষ্টান হয়ে করতে হবে মা-কালীর বিশ্লেষণ। তাতে আবার ধর্মান্ধ জনসাধারণের মনকে খুশী করা চাই। খুশী করা চাই উত্তরপথিক গুরু আর ব্রাহ্ম সমাজের পাণ্ডাদের। এই প্রথম এক কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে নিবেদিতাকে। মনে ভাবেন, 'কি বলতে যাচ্ছি? মাগো, দেখো যেন একেবারে ডুবে না যাই।'

প্রশ্ন উঠতেই পারে অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার এই বক্তৃতা আয়োজন করার বিষয়ে স্বামীজি এতটা উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন কেন। সম্ভবত স্বামীজি কলকাতার বিশিষ্টজনদের কাছে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মমত বিদেশিদের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে এবং বিদেশিরা এ বিষয়ে চর্চা করছে। বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি এই বার্তাটি দেওয়া স্বামীজির পক্ষে অতীব জরুরি ছিল তখন। যে কারণে অ্যালবার্ট হলের ওই সভায় বহু বিশিষ্টজনদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মাথারাও উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় শ্রোতা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, সত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুর, সরলা ঘোষাল, ডা. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ।

অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার এই সভাটি কিন্তু খুব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। নিবেদিতা ভাষণ শুরু করবার পর ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার উঠে দাঁড়ান এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নিবেদিতাকে আক্রমণ করেন। বলেন, 'আমরা দেশ থেকে এই সব কুসংস্কার তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা সেই সব আবার প্রচার করছ।' মহেন্দ্রলালের এ-হেন কথায় শ্রোতাদের ভিতর হই-হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। শ্রোতাদের ভিতর থেকে মহেন্দ্রলালের উদ্দেশে কটূক্তি ভেসে আসে। গণ্ডগোল বেধে যায় সভায়। কোনো মতে তারই ভিতর বক্তৃতা দেন নিবেদিতা। তবে, অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে স্বামীজি যে খুশি হয়েছিলেন, এই তথ্য পাওয়া যায় নিবেদিতারই লেখা থেকে। ১৮৯৯ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে চিঠিতে অ্যালাবার্ট হলের বক্তৃতার কথা লিখেছেন নিবেদিতা, 'Well–my lecture on Kali came off on Monday. The Albert Hall crammed. Dear old Dr. (Mahendralal) Sirkar spoke against Kali and me–with tears— and was very touching— when unfortunately a mad devotee of Sri R.K. got up and amidst tremendous excitement called him– with other things— 'an old devil'. I am so sorry to tell you that I laugh whenever I think about it all. Swami was greatly pleased about the lecture– and I trust there is some reason– for I have several times since been inclined to think that I had done nothing but harm. You see the Brahmos declare that that was not Kali worship–and that only what appealed to their lowest feelings was understood by the mob.' এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। মহেন্দ্রলাল সরকারের

সম্পর্কে অ্যালবার্ট হলের সভায় জনৈক শ্রোতার কটূক্তি কিন্তু নিবেদিতাকে ব্যথিতই করেছিল। নিবেদিতার এই বক্তৃতায় স্বামীজি যে কতটা চমৎকৃত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে লিজেল রেঁম লিখেছেন, 'দেখলেন গুরু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সরলা ঘোষালের সঙ্গে কথা বলছেন। বললেন, 'চমৎকার বলেছ, মার্গট।' সমালোচনাগুলো গাড়িতে যাওয়ার সময়ের জন্য তোলা রইল।

'নিবেদিতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, বার-বার বলছেন, 'কেবল ক্ষতিই করেছি। আমার কিছু না বলাই ভাল ছিল। কী যে বলেছি এখন মনে করতে পারছি না...'

অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার কালী-বিষয়ক বক্তৃতায় তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুরা বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা বিরক্ত হলেও হিন্দু সমাজে এবং সাধারণ হিন্দুদের ভিতরে নিবেদিতার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। কালীঘাটের প্রধান পুরোহিত বাগবাজারে এসে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানালেন, ২৮ মে কালীঘাটে কালীমন্দিরে গিয়ে কালী সম্পর্কিত বক্তৃতা দিতে। অবশ্য, এরই ভিতর, অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার পর, বিশেষত তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছ থেকে নানারকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নিবেদিতাকে। ৯ মার্চ ১৮৯৯ তারিখে বন্ধু নেল হ্যামন্ডের কাছে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন,

'Of course I am being attacked–what people seem to loose sight of is that no one is making speculation–investments in the worship of Kali now in order to get Sri R.K's (Sri Ramakrishna) realisation later on. That, we can believe, is millenniums distant. But we worship Her for what She is– i.e.She is GOD–one of those conceptions which are as names of GOD–and as you respond when your name is uttered– in tones of need or of love– so He when this name of Kali–as much as when we say "Our Father who art in Heaven..." নিবেদিতার বক্তব্য এটাই ছিল যে, ভগবানের বিভিন্ন নামের মতো তাঁর বিভিন্ন রূপেরও একটা কল্পনা আছে। কোনো প্রয়োজনে বা কেউ ভালোবেসে ডাকলে আমরা যেমন সাড়া দিই—তেমনিই কালী নামেও সেভাবেই ভগবানকে ডাকা হয়। যেমন, আমরা প্রার্থনা করি, 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা...' তেমনি প্রার্থনা কালী নামেও করি।

অ্যালবার্ট হল এবং তারপর কালীঘাট মন্দিরের কালী-বিষয়ক বক্তৃতাই নিবেদিতাকে পরবর্তীকালে 'কালী দ্য মাদার' বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করে। কালী সম্পর্কে তাঁর ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখাতেই। নিবেদিতা লিখেছেন, 'It was so easy to say that GOD is love, and to think our own private happiness proves it. GOD is love– but when do we learn that? How do we know it? It is not in moments of anguish in our own lives that

the Great Reality is borne in upon us as all Love, all Beauty, all Bliss? This was the paradox so boldly stated in the Kali image–this paradox of Nature and of the Universe and of the soul of man–that She who stands there surrounded by all that is terrible to Humanity is, nevertheless, the Mother, and all we Her babes.' ১৮৯৮-র মাঝামাঝি অমরনাথ দর্শনের পর বিবেকানন্দ যেমন মাতৃচিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছিলেন, মনে হয়, ওই সময় থেকেই গুরুর সংস্পর্শে থেকে নিবেদিতাও কালী আরাধনার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। ১৮৯৮-এর ডিসেম্বরে শ্রীমতী লেগেটের মেয়েকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতেও এই কালী-মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Baby, some people think GOD is just like that. A great great Mother–so great that all this big world is Her Baby. God is playing with Her World, and she shuts Her eyes...And what do we call the Mother with Her eyes shut? We call Her Kali...And so, wee one, will you remember that the Great Mother Kali is everywhere?'

'দ্য ভিশন অব শিবা' লেখাটিতে কালীরূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Her mass of black hair flows behind Her like the wind, or like time, 'the drift and passage of things.' But to the great third eye even time is one, and that one, God. She is blue almost to blackness, like a mighty shadow, and bare like the dread realities of life and death. But for Him there is no shadow. Deep into the heart of the Most Terrible, He looks unshrinkking, and the ecstasy of recognition He calls Her Mother. So shall ever be the union of the soul with God.'

নিবেদিতার এই তীব্র কালী-অনুরাগের কথা আরও জানা যায়, 'দ্য হিন্দু রিভিউ' পত্রিকার একটি লেখায়। নিবেদিতার মৃত্যুর পর, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত এই লেখাটির অংশবিশেষ, 'Once I was sitting with Nivedita in her house in Bosepara Lane, sipping tea out of her Quaint Swadeshi Cups. Suddenly the sky was overcast with black scowling clouds as often times happend in our early summer evenings; and there was immediately a marked change in the mood of my hostess. Her face seemed atonce to reflect the awfully dynamic mood of Nature. It beamed with a new light, at once awful and lovely. And she sat silent, apparently unconscious for the moment of my presence, looking intently through the window, at the gathering gloom about the earth and the heaven and listening, like one in a trance, to the rising tumult of the growing storm. And just as there came, in a little while, the first flash of lightning followed by the crash of the first thunder, she cried out with bated breath—'Kali'.

কালীঘাটে নিবেদিতাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—এ সংবাদে স্বামীজি অতীব আনন্দিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ রামকৃষ্ণ আন্দোলনকেই পরোক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া। হিন্দু সমাজের কাছ থেকে সেই সময়ে এই স্বীকৃতিটি পাওয়া স্বামীজির পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বের ছিল। বিশেষত, সেই স্বীকৃতি যদি কালীঘাটের মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসে। নিবেদিতার কালীঘাটের বক্তৃতার আগের দিন সকালে স্বামীজি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেদিন কালী বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনাও করেন তিনি। স্বামীজির সঙ্গে সেই কথোপকথন বিস্তারিতভাবে লিখে রেখেছিলেন নিবেদিতা। ১৮৯৯-এর ২৯ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে এই কথোপকথনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ওই দিনই নিবেদিতাকে স্বামীজি বলেছিলেন, কালীঘাটে বক্তৃতা শুনতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সকলকে টুপি খুলে, খালি পায়ে মেঝের ওপর বসতে হবে। এমনকী নিবেদিতার ইওরোপীয় এবং ব্রাহ্ম বন্ধুরাও যদি বক্তৃতা শুনতে আসেন, তাহলে তাঁদেরও জুতো এবং টুপি খুলে মেঝেতে বসতে হবে। নিবেদিতা শ্রোতাদের সামনে কয়েক ধাপ ওপরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন। স্বামীজি নিবেদিতাকে এ-ও জানান, কালীঘাট মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই সভায় পৌরোহিত্য করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু শরীর সুস্থ নয় বলেই তিনি সেখানে যাবেন না। স্বামীজির কথা উদ্ধৃত করে নিবেদিতা লিখেছেন, 'They have put me down to preside to your lecture. But I shall not go, unless I am perfectly well, and I must tell you plainly that I don't expect to be that. It will be awfully hot, and I could not restrain my excitement. For we have been Kali worshipers for centuries and every bit of that place is holy to me. Even the very blood on the ground is holy. Every drop of it. I could lick it all up out of reverence.

'But I have given strict orders about your lecture. There are to be no chairs. Everyone is to sit on the floor of the theatre at your feet. And all shoes and hats are to be taken off. If Europeans and Brahmos are present you may have to insist on this yourself. You will be on the steps with a few of the guests.'

কালীঘাটের বক্তৃতার আগের দিন নিবেদিতার সঙ্গে কালী-বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথাও উত্থাপন করেন স্বামীজি। এই প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা নিবেদিতাকে তিনি বলেন, যা আর কখনও কাউকে স্বামীজি বলেছিলেন বলে শোনা যায়নি। স্বামীজি বলেন, 'এই কালী আর তাঁর যত কাণ্ড-কারখানাকে কী অশ্রদ্ধাই না করতাম! আমি তাঁকে স্বীকার করিনি, ছ'টি বছর লড়াই করেছি। তখন তাঁকে আমি এক বিকারগ্রস্ত বালক মনে করতাম। পরমহংসদেব আমায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর

পায়, তবুও এতদিন যুঝছি। জান তো মানুষটাকে ভালবাসতাম, তাতেই জোর পেয়েছি। জানতাম এত খাঁটি লোক আর কখনও দেখিনি বা দেখব না, আর জানতাম তিনি আমায় যেমন ভালোবাসেন আমার বাপ-মারও তেমন ভালোবাসবার সাধ্য নেই। কিন্তু তিনি যে কী বিরাট তখনও তা বুঝতে পারিনি। বুঝেছি পরে। যখন আত্মসমর্পণ করলাম তখন...'

কৌতূহলী নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু কিভাবে আপনার মনের এই বিরূপভাব দূর হল?' স্বামীজি সে কথার উত্তর দেননি। বলেছিলেন, 'ও কথা জানার দরকার নেই। ও কথা আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। এই সময় ভয়ানক দুরবস্থায় পড়েছিলাম। মা দেখলেন এই সুযোগে আমায় গোলাম বানাতে হবে। ঠাকুর আমায় তাঁর পায়ে সঁপে দিলেন। আশ্চর্য, এর পরে তিনি আর মোটে দুবছর বেঁচে ছিলেন, আর তার বেশির ভাগই অসুখে ভুগেছেন। মাত্র ছটি মাস তাঁর শরীরটা ভালো ছিল, হাবভাবে ঝলক ছিল। গুরু নানকও এমনি ছিলেন, জান? তিনিও তাঁর শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটি শিষ্য খুঁজে বেড়াতেন... তাঁকে পেলে তবে তিনি দেহ ছাড়তে পারবেন।'

স্বামীজি সেদিনই বলেছিলেন, 'কোনও সন্দেহ নেই, মা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আশ্রয় করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এক বিরাট শক্তি আছেন যিনি আপনাকে 'নারী' ভাবনা করেন, তিনিই কালী। এ আমি বিশ্বাস না করে পারি না। আবার ব্রহ্মকেও বিশ্বাস করি। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই, এ-ও। অসংখ্য কোষে মিলে দেহ গড়ে ওঠে, তৈরি হয় একটা মানুষ, অগণ্য মস্তিষ্ক কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় এক চেতনা। সর্বত্রই বহুর মধ্যে এক। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, আবার তিনিই বহু দেবতা। এক এক সময় কী যে যন্ত্রণা দেন মা! তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলি, কাল যদি আমায় এই-এই না দাও, আমি তোমায় দূর করে দিয়ে শুধু চৈতন্যের কথা বলে বেড়াব।...সেসব জিনিস কিন্তু ঠিক ঠিক পেয়ে যাই।'

জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে ২৯ মে তারিখে লেখা চিঠিতে স্বামীজির এই কথাগুলিই হুবহু লিখে জানিয়েছেন নিবেদিতা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'S(Swamiji). I had to– Ramakrishna Paramahamsa dedicated me to Her. And you know I believe that She guides me in every little thing I do–and just does what She likes with me.

'Yet I fought so long—I loved the men you see, and that held me. I thought him the purest man I had ever seen, and I knew that he loved me as my own father and mother had not power to do.

'N (Nivedita). But when you doubted so long– with all your chances –what wonder if Brahmos still doubt?

'S. Yes– but they never saw that immense purity in Him that I saw!...Nor got the love.

'N. But I fancy it was His greatness that made the love hold you without palling. Wasn't its?

'S. His greatness had not dawned on me then. That was afterwards, when I had given in. At that time I thought Him simply a brain-sick baby, always seeing visions and things, I hated it–and then I had to accept Her too!

'N. Won't you tell me what made you do that Swami? What broke all your opposition down?

'S. No, That will die with me. I had great misfortunes at that time you know. My father died and so on. And She saw Her opportunity to make a slave of me. They were Her very words- "To make a slave of you." And R.P.[Ramakrishna Paramahansa] made me over to Her ... Curious, He only lived 2 years after doing that, and most of that time He was suffering. He was only 6 months in His won health and brightness.

'Guru Govind Singh (or Nanak?) was like that, you know, looking for the one disciple to give his power to –and he passed over all his own family. His children were as nothing to him. Till He came upon the boy, and gave it to Him, and then He could die.

'N. I always look upon Sri R.K. as an Incarnation of Kali. Is'nt that what the future will call him?

'S, Yes, I think there's no doubt that kali worked upon the body of Ramakrishna for Her Own Ends. You see Margot I can not but believe that there is, somewhere, a Great Power that thinks of itself as Feminine and called Kali, and the Mother! ... And I believe in Brahman too,– that there is nothing but Brahman ever, – but you see it's always like that. It's the multitude of cells in the body that make up the person– the many brain- centres that produce the one consciousness.

'N. Yes–always unity in complexity.

'S. Just so ! And why should it be different with Brahman? It is Brahman–the One–and yet it is the god too.

'And you see I believe in Brahman and the gods and not in nothin' else!

'But how She torments me sometimes! And then I go to Her sometimes, and say. "If you don't give me so an so tomorrow, I'll throw you over, and preach Chaitnya,"–and that thing always comes.

'But these things must never be told to anyone–mind that.' নিবেদিতার সঙ্গে একান্ত আলাপে বলা তাঁর এই কথাগুলি আর কাউকেও না বলতে

বলেছিলেন স্বামীজি। কিন্তু জোসেফিনকে লেখা এই চিঠিটি পড়ে বোঝাই যাচ্ছে, অন্তত জোসেফিনকে স্বামীজির এই কথাগুলি বিস্তারিতভাবে না বলে থাকতে পারেননি নিবেদিতা।

কালীঘাটে বক্তৃতার দিনটির একটি রুটিনও নিবেদিতা করে ফেলেছিলেন। বক্তৃতার দিন, অর্থাৎ ২৮ মে, সকালে, জোসেফিনকে লেখা চিঠিতে এই ঘটনাটি জানাচ্ছেন নিবেদিতা। জানিয়েছেন—দুপুর একটায় স্নান করে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে নেবেন। কালীঘাট মন্দিরে যাবেন খালি পায়ে। দুপুর দুটোর সময় এক কাপ চা খাবেন। তিনটের সময় কালীঘাটের দিকে যাত্রা করবেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বক্তব্য রাখতে শুরু করবেন। নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যাচ্ছে—ওই দিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কাও নিবেদিতা করেছিলেন। কালীঘাট মন্দিরে স্বামী সদানন্দও নিবেদিতার সঙ্গী হয়ে যাবেন— এমনই ঠিক হয়েছিল।

লিজেল রেমঁ নিবেদিতার কালীঘাট যাত্রার বর্ণনা দিয়ে লিখছেন, 'নিবেদিতা খালিপায়ে কালীঘাটে চললেন। স্বামী সদানন্দ সঙ্গে আছেন। দীর্ঘ পথ। মন্দিরের চারদিকে ভিখারিরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভক্ত-যাত্রীদের মন গলাতে চায়, ভিক্ষাপাত্রটা ঠনঠন করে বাজায়। পুরোহিতরা ওদের দিনে একবার খেতে দেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে গোলপাতায় ছাওয়া বিরাট চাল। তার মধ্যে নানা রঙের ছড়াছড়ি—নীল, লাল, সোনালী, বেগুনী, সিঁদুরে নানা রঙের ফুলের সমারোহে মহাকালীর জয়ধ্বনি উঠছে যেন।'

কালীঘাটে নিবেদিতার এই বক্তৃতাটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেছিলেন, 'হিন্দু পারিবারিক জীবনে মায়ের প্রভাব সর্বাধিক। মাতাপুত্রের সম্পর্কই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও নিবিড়। জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত জননীর সুগভীর স্নেহ। সেই জন্যই বোধ হয় অনাদিকাল হইতে সৃষ্টির যিনি মূল কারণ, সেই পরমেশ্বরকে আপনার হইতে আপনার করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'মা'। হিন্দুর নিকট ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর ও মধুরতর নাম আর কিছুই নাই।

'... কাপুরুষ যে, সেই মায়ের ভয়ঙ্করা রূপে ভীত। সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, ...মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

অ্যালবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার সময় কালীপূজা নিয়ে যেসব আপত্তি উঠেছিল, কালীঘাটের বক্তৃতায় একে একে সেগুলি খণ্ডন করেন নিবেদিতা। ব্রাহ্মরা কালীপূজার পৌত্তলিকতা সম্পর্কে সমালোচনা করেছিল। কালীঘাটের বক্তৃতায় নিবেদিতা বললেন, 'হিন্দুগণ বস্তুতঃ মূর্তিকে পূজা করেন না। কোন প্রতীক অবলম্বনে মনকে তন্ময় করিবার ইহা একটি উপায় মাত্র। প্রকৃত পূজা প্রতিমার সম্মুখে অবস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভের উপর

অনুষ্ঠিত হয়; এবং ঐ পূর্ণ কুম্ভটিকে সেই অখণ্ড শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।'

কালীমূর্তির কল্পনাতে বীভৎস রসই প্রাধান্য পেয়েছে, এ অভিযোগকে খণ্ডন করে নিবেদিতা বললেন, 'অভিযোগকারী যুরোপীয় হইলে যুরোপীয় ভাস্কর্য এবং শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতেন যে, য়ুরোপীয় শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতেও কালীমূর্তির নাটকীয় ভঙ্গী অপূর্ব বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাবতীয় প্রাচীন শিল্পভাব ও কল্পনা সহায়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছে; এখনও উহা সার্থকতা লাভ করে নাই। কালীমূর্তির মধ্যে শিল্পের গভীর তাৎপর্য সন্ধানী দৃষ্টির নিকটেও সুপষ্ট এবং বিস্ময়কর।'

কালী সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে স্বামীজির চিন্তারই অনুসারী ছিল, তা নিবেদিতা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থেও লিখেছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'কালীমূর্তির ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি (বিবেকানন্দ) বলিতেন—'মা যেন একখানি মহাগ্রন্থ; যাহা পাঠ করিয়া মানব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে; পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া অবশেষে দেখে, উহাতে কিছুই নাই। আমার মনে হয় ইহাই চরম ব্যাখ্যা। ভারতের ভাবীযুগের বংশধরের একমাত্র উপাস্য হইবেন মা-কালী। তাঁহার নাম লইয়াই মাতৃভক্ত সন্তানগণ নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন। তথাপি সর্বশেষ তাঁহাদের হৃদয়ে সেই সনাতন জ্ঞানের বিকাশ ঘটিবে, এবং প্রত্যেক মানব নিজ নিজ শুভ মুহূর্ত উদয় হইলে জানিতে পারিবে যে, সমগ্র জীবন ছিল এক স্বপ্নমাত্র।'

অ্যালবার্ট হল এবং কালীঘাট মন্দিরের বক্তৃতার মাঝেই ১৮৯৯-র মার্চ মাসে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও বক্তব্য রাখেন নিবেদিতা। তবে, এই সময়ের ভিতর নিবেদিতার সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ২৬ মার্চ স্বামীজি কর্তৃক তাঁকে রামকৃষ্ণ মঠের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হিসাবে গ্রহণ করা। ১৮৯৮-এর ২৫ মার্চ স্বামীজি নিবেদিতাকে দীক্ষা দেন। 'নিবেদিতা' নামকরণ করেন। তার ঠিক একবছর পর ২৬ মার্চ নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হিসাবে উপস্থিত করলেন স্বামীজি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হিসাবে তাঁর দীক্ষার দিনটির কথা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে জানা যায়। এই দিনটির বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'আটটার সময় মঠে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পূজার ফুল না আসা পর্যন্ত মেঝেতে বসে রইলাম সবাই। রাজা (বিবেকানন্দ) আমায় বুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন। খুব সময়োপযোগী আর সুন্দর আলোচনা, না? জীবনের নিষ্ঠাপূত চিরন্তন আদর্শের কথা বারবার বললেন : মুক্তিই নয়, ত্যাগ— আত্মপোলব্ধিই নয়, আত্মবিসর্জন।

'তারপর সব উপকরণ এসে গেলে আমায় পূজা করতে শিখিয়ে দিলেন। এতদিনে আমার চিরসাধের শিবপূজা করার শিক্ষা পেলাম তাঁর কাছে। দুজনে মিলে পূজা করলাম। মা যেমন আদর করে ছেলেকে শেখায়, সারাক্ষণ তেমনি মিষ্টি সুরে মন্ত্র পাঠ করে আমায় সব শেখালেন। দশাবতার স্তোত্র পাঠ করে পূজা শেষ হল।

'যখন ফুল দিয়ে বেদি সাজিয়ে দিয়েছি, রাজা বললেন, "এবার আমার বুদ্ধকে কিছু ফুল দাও, আমি ছাড়া এখানে আর কেউ তাঁকে পছন্দ করে না।" যারা তাঁর কাছে পথের দিশা খুঁজতে আসবে আজ যেন আমার মাঝে তাদের সবাইকে সম্বোধন করে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পাঁচশ' বার পরার্থে জীবন দান করেছেন তাঁকে অনুসরণ করে চল।"

পূজা শেষ হলে হোম করার জন্য নীচে নেমে এলাম।'

৩০ মার্চ ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন নিবেদিতা, তাতে এই রকমই বর্ণনা দেওয়া ছিল। আর ২৬ মার্চ সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'I fancy he made me a Brahmacharini for life partly for the sake of reviving the old order of Naishtik Brahmacharini, and partly because I am not really ready for anything higher in his eyes.' তাঁকে যে স্বামীজি সন্ন্যাস দেননি, শুধুই ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা দিয়েছেন সেকথা ৩০ তারিখের চিঠিতে জোসেফিনকেও জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। লিখেছিলেন, 'I am only a Brahmacharini–not a Swamy.'

অথচ নিবেদিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল স্বামীজি যেন তাঁকে সন্ন্যাস দেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হিসাবে স্বামীজি তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার পরও ওই বছরই এপ্রিল মাসের শেষে, স্বামীজি যখন অসুস্থ অবস্থায় বেলুড়ে অবস্থান করছেন, তখন নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, সন্ন্যাসিনী হতে গেলে তাঁকে কী কী করতে হবে। স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'তুমি যেমন আছো তেমনিই থাকো।' এ প্রসঙ্গে ১ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Then I asked him what perfection I could strive for in order to be worthy of being a Sanyasini. "You just keep as you are."— he said quickly–and sealed my determination for all time.'এখানে, একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, নিবেদিতার মনে সন্ন্যাস গ্রহণের এই আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল কেন? প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন,সম্ভবত স্বামী অভয়ানন্দকে দেখেই নিবেদিতার মনে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা জাগে। মুক্তিপ্রাণার এই ব্যাখ্যাটি ঠিক বলে মনে হয় না। কেননা অভয়ানন্দের প্রতি নিবেদিতার কখনোই তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। বরং, নিবেদিতার বরাবরই মনে হয়েছিল—স্বামীজির প্রতি অভয়ানন্দের তেমন কোনো শ্রদ্ধা নেই। অভয়ানন্দের

পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মেরি লুই। তিনি ছিলেন ফরাসি মহিলা; কিন্তু আমেরিকার নাগরিক। স্বামী কৃপানন্দ (লিওঁ ল্যান্ডসবার্গ) 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় লিখেছিলেন—তিনি এবং অভয়ানন্দ বারবার অনুরোধ করার পর স্বামীজি তাঁদের সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালের ১১ মার্চ অভয়ানন্দ কলকাতা এসে পৌঁছন। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন নিবেদিতা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ২৩ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Abhayananda arrived on Friday evening. A crowd of about 40 persons assisted Brahmananda and myself to receive her at Howrah. And she proceeded to 'receive' these on Saturday evening at 57 Ramkanta Bose's Lane.'

তবে, অভয়ানন্দের ব্যবহারে প্রথম থেকেই যে নিবেদিতা বিরক্ত ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলিতে। আমেরিকায় যদিও স্বামীজির কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন অভয়ানন্দ, তথাপি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন সম্বন্ধে তাঁর ভিতর কোনো শ্রদ্ধার ভাব প্রথমাবধিই ছিল না। তদুপরি, প্রাচ্যের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এক উন্নাসিক মনোভাব অভয়ানন্দের ভিতর কাজ করত, যা প্রথম থেকেই নিবেদিতার চোখ এড়ায়নি। অভয়ানন্দ কলকাতায় এলে তাঁকে রামকান্ত বোস লেনে সারদা দেবীর বাড়িতেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন স্বামীজি। কিন্তু সেই বাড়ির পরিবেশ অভয়ানন্দের পছন্দ হয়নি। নিবেদিতা ২৩ তারিখের চিঠিতেই লিখছেন, 'On Sunday we went to the Birthday (রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথির কথা বলেছেন). There she (Abhayananda) told me that she did not feel in the least at home here—and it seems she told Swami that she "could not live with that lady (সম্ভবত সারদা দেবী)— she was simply crazy."...

Such egotism I have never imagined!'

অভয়ানন্দের এই ধরনের ব্যবহারে কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতা তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৩০ মার্চ ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিনকে লেখা আর একটি চিঠিতে। নিবেদিতা লিখছেন, 'She is so rude, raving about the dirtiness and inconvenience of Hindu homes in the presence of her host and hostess, and abusing the monks for their intention to her, so that it comes round to their ears, that I have no patience. I told the Mother (সারদা দেবী) I was ashamed of her for the first and Loki Didi said she thought it must be because she was not a buroo Sahib (a great lady)—then very touching references were made to you and 'Sara Mem.'

অভয়ানন্দের এই আচরণ দেখে স্বাভাবিকভাবেই নিবেদিতার সন্দেহ হয়েছিল ইনি কোনো মতেই স্বামীজির প্রতি সত্যিই শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন না। সে কথাও

৩০ মার্চের চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'She does not really love Swami I think, and she says that my love is very foolish and emotional, because I eat meat if he gives it me, and do things just because he tells me; and sometimes show that I am greatly struck by (the humility of) words that seem to her quite natural for him. I suppose the fact is that anyone can see that I worship him– and that's the truth.'

অভয়ানন্দের সঙ্গও যে তিনি পছন্দ করতেন না তা-ও নিবেদিতার চিঠি পড়ে জানা যায়। তিনি এবং স্বামীজি সরলা ঘোষাল এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে যেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যান, সেদিন অভয়ানন্দ তাঁদের সঙ্গী হতে না পারায় নিবেদিতা খুশিই হয়েছিলেন। ২৩ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠি থেকেই নিবেদিতার এই মনোভাব জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, '...told me–with regard to prostrations before the Mother— that they would soon find out what an American was like— and realise that she had not come to teach Ritualism. I ventured suggest humbly that they knew two Americans pretty well already–snubbed me on some small matter by telling me that I did not belong to the Order–was not a sanyasini – etc. – to this of course I did not reply–and so on and so on.

'But I am sorry for her sake that the poor thing did not take her chance of joining our expedition to Dukineswar Yesterday. On the other hand, even Swami said like a joyful child–what a good thing she had not come.' এত বিতৃষ্ণা যে অভয়ানন্দের প্রতি তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতা সন্ন্যাস গ্রহণের কথা চিন্তা করবেন—এটা বোধহয় ঠিক নয়।

অভয়ানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি। বরং, পরে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, অভয়ানন্দকে নিবেদিতাই সম্যক চিনেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ২৫ মার্চ আমেরিকার 'মিরর' পত্রিকা অভয়ানন্দ সম্পর্কে লিখেছিল, 'অভয়ানন্দ ফরাসি মহিলা, কিন্তু (আমেরিকার) নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত। পঁচিশ বছর ধরে নিউইয়র্কের অধিবাসী। তাঁর ইতিহাস বিচিত্র। উদারনৈতিক মহলে পঁচিশ বছর ধরে তিনি বস্তুতান্ত্রিক সোস্যালিস্ট (কেউ কেউ বলেন অ্যানার্কিস্ট) বলে পরিচিত, এমা গোল্ডম্যান এবং সেই ধরনের মানুষের বন্ধু। বারো বছর আগে তিনি মানহাটান লিবারেল ক্লাবের সদস্যদের একজন ছিলেন। তখন তিনি সংবাদপত্রের কাছে এবং বক্তৃতা মঞ্চে মাদাম মারি লুই, এই নামে পরিচিত ছিলেন—নির্ভীক, প্রগতিশীল, অগ্রগামী নারী; তিনি দর্প করে বলতেন,আমি সর্বদাই সংগ্রামের পুরোভাগে থাকি, আমি আগামীকালের মানুষ।'

অভয়ানন্দ যখন প্রথমবার ভারতে এলেন তখন শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তাঁর বিরোধিতা করে লেখা হয়েছিল, 'আমরা শুনে চমকে উঠেছিলাম—অভয়ানন্দ নারী।' অভয়ানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধিতা করে লেখা হয়েছিল, 'হিন্দু দর্শনের বিধান, নারীরা কোনো উচ্চতর শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে না।' মাত্র একবছরের মধ্যেই অভয়ানন্দ সম্পূর্ণ ভোল বদলে ফেলেছিলেন। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গ ত্যাগ করে শিশিরকুমার ঘোষেদের বৈষ্ণব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। যে কারণে, পরে অমৃতবাজার পত্রিকাই অভয়ানন্দের প্রশংসা করে লিখেছিল, 'এক ইউরোপীয় নারীই (ব্লাভাৎস্কি) হিন্দুদের পূর্বপুরুষগত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে—যা তারা বিস্মৃত হয়েছিল—সচেতন করে তোলেন। একজন ইউরোপীয় নারীই (বেসান্ত) তাঁর অনুসরণে হিন্দুদের উন্নত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং পুনশ্চ আর একজন ইউরোপীয় নারী (অভয়ানন্দ) ভারতে আসছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত পরম মধুর বৈষ্ণবধর্মে নবপ্রাণ সঞ্চার করতে।' (৭মে, ১৯০২)

অভয়ানন্দ শুধু যে বিবেকানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন তা-ই নয়, বিবেকানন্দকে খাটো করার জন্য প্রকাশ্যেই তিনি নানারকম কথাবার্তা বলতে এবং লেখালেখি করতে শুরু করলেন। ১৯০০ সালে ৮ই মার্চ, অমৃতবাজার পত্রিকায় তিনি লিখলেন, 'The Parliament of Religions at the World's fair in 1893, for a year or so, stirred people here to think and investigate the religions represented at the Parliament. But it was simply a breeze that blew, it had no foundation.' একথা লিখে ধর্ম মহাসম্মেলনের গুরুত্ব যেমন খাটো করতে চেয়েছিলেন অভয়ানন্দ, তেমনই আমেরিকায় বিবেকানন্দের প্রভাব নস্যাৎ করে দেওয়ার একটি চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এছাড়া, তিনি বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথাও বলেছিলেন। 'মাদ্রাজ টাইমস'-এ একটি চিঠিতে অভয়ানন্দ লিখেছিলেন, 'I have been ordained a Sanyasini, pure and simple, never was a Saiva, nor a devotee of Kali; never recognised Swami Vivekananda's Guru as God and never taught anyone to worship him.'

অভয়ানন্দ বলতে চেয়েছিলেন, তিনি স্বামীজির মন্ত্রশিষ্য নন। কিন্তু অভয়ানন্দের এই দাবি সঠিক ছিল না। কেননা এর বহু আগেই, ১৮৯৬ সালের ২৮ মার্চ, 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় স্বামী কৃপানন্দ (পূর্বনাম লিওঁ ল্যান্ডসবার্গ) লিখেছিলেন যে, তিনি এবং অভয়ানন্দ দুজনেই দীক্ষা দেওয়ার জন্য বারবার স্বামীজিকে পীড়াপীড়ি করতেই স্বামীজি বাধ্য হয়ে তাঁদের সন্ন্যাস দীক্ষা দেন।

অভয়ানন্দ অভিযোগ করেছিলেন, বেদান্ত দর্শন প্রচারের ছল করে স্বামীজি আসলে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। অভয়ানন্দ লিখেছিলেন,

'The Swami Vivekananda ostensibly taught Vedanta philosophy, but the real aim of his work was to establish among those of the 'inner circle' the recognition of his late teacher Ramakrishna, as having been God on earth, the ruler of our destiny.' অভয়ানন্দের এই অভিযোগও ধোপে টেকে না। কেননা, সেভিয়ার দম্পতি রামকৃষ্ণ পরমহংসের অবতারত্ব স্বীকার করতেন না। তাঁরা স্বামীজির বেদান্ত দর্শন এবং অদ্বৈতবাদেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বাস করতে শুরু করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অবতারত্ব স্বীকার না করলেও রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁদের কিন্তু সম্মানের আসন দেওয়া হয়েছিল।

আর একটি চূড়ান্ত মিথ্যাচার অভয়ানন্দ করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, বিবেকানন্দ অনুগামীরা তাঁর সামনে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন।

'My attitude won me the ill will of all the followers of Swami Vivekananda, who, though they were but a few, managed to make things very hard for me ever since the second week of my initiation.' অথচ অভয়ানন্দ ভারতে আসার অনেক আগে থেকেই 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় তাঁর প্রশংসা করে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। অভয়ানন্দ কলকাতা পৌঁছনো পর কতখানি সমারোহে তাঁকে হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, তা-ও নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যায়। এছাড়াও, রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ঢাকায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। আসলে, অভয়ানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গ ত্যাগ করতেনই। সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তাঁকে কিছু অসার যুক্তি খাড়া করতে হয়েছিল।

অভয়ানন্দের এই আচরণ যে স্বামীজিকে খুবই আঘাত দেবে, তা বুঝেছিলেন নিবেদিতা; যে কারণে ১৮৯৯-র ১২ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, '...And then, why tell him of the sins of Lansberg [Landsberg] and Abhayananda? I should like to keep these things from him if I could, and leave them in his love, without letting them, poor things, stab him.'

তবে, এসবের জন্য বিবেকানন্দ কিন্তু পালটা কাউকে দায়ী করেননি। সবটুকু দায় নিজের ওপরই টেনে নিয়েছিলেন। যে কারণে ১৮৯৯-র ১৪ সেপ্টেম্বর ই টি স্টার্ডিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি জানি যে, আমার উপর এত বিদ্বেষ এবং ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে, তার জন্য দায়ী আমি এবং শুধু আমিই। এমনটি না হয়ে অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়।' বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর, ১৯০২ সালের ২৮ জুলাই, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে

শেষ সাক্ষাতের সময় স্বামীজি অভয়ানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। 'Abhayananda is here. He (Swamiji) laughed and talked about her with me that last Wednesday. She never came or wrote, when it happened. And yet I am sure that for her too He holds Him reponsible' নিবেদিতার এই চিঠিতেও বোঝা যায় অভয়ানন্দের ছেড়ে যাওয়ার দায়ও স্বামীজি নিজের ঘাড়েই রেখেছিলেন।

অভয়ানন্দ যদি তাঁকে অনুপ্রণিত করে না-ই থাকেন, তাহলে কার অনুপ্রেরণায় নিবেদিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন? নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের অনুপ্রেরণাও ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দই। স্বামীজির প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ এবং অনুরাগ সব কাজেই তাঁকে স্বামীজির অনুগামিনী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এমনকী, তাঁর ভারতে আসাও মূলত স্বামীজির আকর্ষণেই। ফলে, এটুকু আশা করাই যায়, স্বামীজিই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের অনুপ্রেরণা। এছাড়া, এ দেশে আসার পর বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের জীবনচর্চাও নিবেদিতাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। এবং সেই জীবনযাত্রার প্রতি তিনি যে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, তা-ও নিবেদিতার বিভিন্ন লেখাতেই প্রমাণিত। এটিও তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা বাড়িয়ে দিয়েছিল—বলাই যায়।

কিন্তু নিবেদিতা ইচ্ছুক থাকলেও বিবেকানন্দ কেন তাঁকে সন্ন্যাস দেননি? বিবেকানন্দ এটুকু বুঝেছিলেন কোনো কঠোর অনুশাসনের ভিতর নিবেদিতাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মিশনের অবশ্য পালনীয় আচরণগুলি আদৌ নিবেদিতা পালন করতে সম্মত হবেন কিনা—তা নিয়েও হয়তো সংশয় ছিল স্বামীজির। তদুপরি, স্বামীজি জানতেন নিবেদিতা স্বাধীনচেতা। যে কারণে, প্রথমাবধিই নিবেদিতাকে তাঁর মতো করে চলারই একটা পথ করে দিয়েছিলেন স্বামীজি। সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়ে সে পথে হয়তো কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাননি। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, স্বামীজি তঁকে সন্ন্যাস দেননি; তবে একখানি গৈরিক উত্তরীয় দিয়েছিলেন। ধ্যান করার সময় নিবেদিতা সেটি দিয়ে মাথা ঢেকে বসতেন। মুক্তিপ্রাণা আরও জানিয়েছেন, নিবেদিতা বহু সময়ে কমলালেবু রঙের পোশাক পরতেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগের সময় ডা. রাধাগোবিন্দ কর যখন নিবেদিতাকে প্রথম দেখেন, তখন 'গৈরিক পরিচ্ছদে ভূষিতা' নিবেদিতাকেই দেখেছিলেন। এসব দেখে মনে হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীজি তাঁকে সন্ন্যাস না দিলেও তাঁর মনে বরাবরই সন্ন্যাসিনী হিসাবে গুরুর পাশে থাকায় সুপ্ত ইচ্ছাটা ছিলই।

অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার কালী-বিষয়ক বক্তৃতার পরে তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুরা, বিশেষত জগদীশচন্দ্রের সমালোচনা নিবেদিতাকে কিছুটা আঘাত করেছিল। ১৫ মার্চ, ১৮৯৯ তারিখে সারা বুলকে লেখা একটি চিঠিতে সেই বেদনা প্রকাশও করেছেন

নিবেদিতা। লিখেছেন, 'It grieves me much to find the attitude of men like Dr.Bose–whom I love as I love Mr. Apperson, short time as I have known to him, –to the Swami, since I lectured on Kali. Now all that you said about the comparative study of Religion is begining to have its real value for me. I understand by the baffled feeling he gives me when we talk on the question how impossible any other line of approach will be for him, to see these things as we see them. And his position, great thinker and scholar as he is in other lines, seems, compared to Swami's on this branch, a position of ignorance and superstition compared to science and reason.'

অথচ জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রতি এই রকম সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করার আগেই কিন্তু নিবেদিতা বিজ্ঞানীকে সাহায্য করার আরজি জানিয়েছেন শ্রীমতী বুলের কাছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্যের যাতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য সারা বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। ওই ১৫ মার্চের চিঠিতেই সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I want to tell you about Dr. J. C. Bose and his desire to write to you. I quite hope that you will soon be writing him a little letter perhaps with Miss Willkins' two little books about which I told Yum– for he may prove too shy to write himself. He says he is talking of you as of one to whom he would like to go in some great sorrow and just stay quietly near. So I told him much about your Norway home and its cloister of light and some of beautiful memories that cling to it, and I know that it must be falling on his spirit like balm– for he was in a mood of terrible depression – and so I went at once, afterwards, that nothing less holy might break the charm of the thoughts that that come with that subject.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সারা বুলের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে দিতে কতটা উদগ্রীব তিনি। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ও বলা দরকার। তা হল— নিবেদিতা যখন এই চিঠিটি সারা বুলকে লিখছেন, তখনো পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র এবং সারা বুল কেউই কারো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেননি। তবু সারা বুলকে লেখা চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের এমন একটি চিত্র তিনি এঁকেছেন, যা পড়ে মনে হবে, জগদীশচন্দ্র দুঃখের দিনে শ্রীমতী বুলকেই একমাত্র আশ্রয় হিসাবে যেন দেখেন। বন্ধু জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রীমতী বুলের মনোভাব নরম করে তোলার জন্যই নিবেদিতা কিছুটা অতিরঞ্জিত করে চিঠিটি লিখেছিলেন—এমন ভাবা বোধকরি অন্যায় হবে না। লিজেল রেমঁর লেখা থেকেও জানা যায়, নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকেও পরামর্শ

দিয়েছিলেন সারা বুলকে 'মা' বলে ডাকতে। নিবেদিতার এই পরামর্শ কিন্তু মেনেও ছিলেন জগদীশচন্দ্র। ফলে, বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাঙালি বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রীমতী বুলের মনোভাব আর্দ্র করে তোলার একটি প্রয়াস নিবেদিতার ভিতর ছিলই।

১৫ মার্চের ওই চিঠির পর ২৬ মার্চ আবার সারা বুলকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I wish you knew how I love the Boses. And I do hope you will take Dr.Bose into your heart as a son– for he always talks of you.' সারা বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মাতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে তোলাতে কতটা উৎসাহী ছিলেন নিবেদিতা—এই চিঠিই তার প্রমাণ। ১৮৯৯-র এপ্রিল সারা বুলকে লেখা চিঠিতেও জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'He loves you as a son...'।

তবু এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, যে-জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনাকে সার্থক রূপ দিতে তিনি এতখানি প্রয়াসী হয়েছেন, সেই জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ এবং গুরু অনুসৃত পথে কালীসাধনাকে বিদ্রুপ করেন, তখন নিবেদিতার মনেও কি অনুশোচনা এবং দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়নি? হয়তো হয়েছিল, আর হয়েছিল বলেই ১৫ মার্চের চিঠিতে শ্রীমতী বুলের কাছে জগদীশচন্দ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেও লিখেছিলেন, 'And his position, great thinker and scholar as he is in other lines, seems, compared to Swami's on this branch, a position of ignorance and superstition compared to science and reason.'

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হিসাবে দীক্ষালাভ, ১৮৯৯-র মার্চ-এপ্রিলে কলকাতায় প্লেগের মোকাবিলা (আগেই এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে) এবং জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা জোগাড় করা— ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার মধ্যেও নিবেদিতা কিন্তু তাঁর স্কুলের কাজে শৈথিল্য দেখাননি। বরং নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দের যৌথ প্রচেষ্টায় নিবেদিতার স্কুলে ছাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাগবাজার এবং আশপাশের অঞ্চলের হিন্দু পরিবারগুলির কাছে ক্রমেই নিবেদিতার স্কুল গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠেছিল। স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও—স্কুল চালানো নিয়ে এই সময়ে সংকটেও পড়েছিলেন নিবেদিতা। স্কুল শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই অর্থের একটা সমস্যা ছিলই। তদুপরি এই সময়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনও অর্থ সংকটে পড়ল। অর্থ সংকট এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, স্বামীজি এই সময় নিবেদিতাকে দেশে ফিরে যেতে বলেন। বলেন, এই অবস্থায় আর স্কুল চালানো সম্ভব নয়। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'মঠের অবস্থা সত্যিই নৈরাশ্যজনক। পুরানো সাধুরা দারিদ্র্যের কঠোরতা সইতে প্রস্তুত, কিন্তু তিতিক্ষায় যাদের চরিত্র এখনও পোক্ত হয়ে ওঠেনি সেই সব

নবাগতের কি হবে? স্বামীজি অল্পবয়সীদের আবার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যেই কাজের ভার দিয়ে যাদের যাচাই হয়ে গেছে কেবল তাদের রাখলেন।'

কাশ্মীরের রাজা স্বামীজিকে যে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন তা-ই এবং নিবেদিতার সঞ্চিত কিছু ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে স্কুলটি শুরু হয়েছিল। স্কুলের কোনো নির্দিষ্ট তহবিল ছিল না। ফলে, স্বামীজির মনে হয়েছিল মঠ-মিশনের এই আর্থিক সংকটের সময়ে স্কুলের দায়িত্ব না নেওয়াই ভালো। নিবেদিতা কিন্তু স্বামীজির এই প্রস্তাব নস্যাৎই করে দিয়েছিলেন। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে বলা যায়, স্বামীজি হতাশ হয়ে পড়লেও নিবেদিতা দৃঢ়চিত্ত এবং হার না মানা স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। লিজেল রেঁম লিখছেন, '... একটি প্রশ্ন শুধু সাহস করে শুধ'লেন, 'আপনি যদি বলেন আমি চলে যাব—কিন্তু স্বামীজি, আমি কি অযোগ্যতার কোনরকম পরিচয় দিয়েছি।'

'উত্তর পেলেন, 'না, তুমি তোমার কাজ ভালই করেছ। আমরাই পারলাম না।'

'এসব হতাশার কথায় নিবেদিতার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এদেশের বিচ্ছিরি জলবায়ুর ফল বোধহয় এই।

'এক বন্ধুকে বললেন, 'বেশ জানি, কিছুতেই আমার মন দমত না। কিন্তু যা গরম, সমস্ত শরীর যেন নেতিয়ে পড়ে। আর এ আবহাওয়ায় যারা জন্মেছে, তারাও আমাদেরই মত কি তার চেয়েও বেশি কষ্ট পায় বোধহয়।'

'কিন্তু অসীম সাহস নিবেদিতার, সেই কবচে সুরক্ষিত হয়ে গুরুর সামনে এসে দাঁড়ান।

'স্বামীজি আপনি অপারাগ হতে পারেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কি পরাজয় হতে পারে কখনও?'

'এভাবে আমি তাঁকে দেখি না। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা কিছুটা সৃষ্টিছাড়া। আমি তাঁকে ভাবি আমার ছেলে। জান তো, দলের মধ্যে আমি সবচেয়ে গুণ্ডা বলে আমার 'পরে সব সময় তাঁর একটা নির্ভর ছিল...

'দুজনের মধ্যে সত্যি একটা ঝুটোপুটি লেগে গেল।

'নিবেদিতা আবার মিনতি করেন, 'স্বামীজি আমার ছ'শ কুড়ি টাকা জমানো আছে, ওটা আমি ছুঁইনি। মনে হয়, কাজ করবার যথেষ্ট সামর্থ্য আমাদের আছে। না হয় এক সঙ্গে সবাই ডুবব। আপনি যে ভাবেন মাথা উঁচু রেখে বাঁচতে হবে, এ তো লোক-দেখানো ব্যাপার। আমাদের লোককে দেখাবার কিছু নাই।...আমার কি করে চলবে তা মোটেই ভাববেন না, স্বামীজি। আমার যা আছে তাতে সেপ্টেম্বর অবধি আমায় চালাতে দিন। এমনভাবে কাজ করে যাব যেন ক্ষয়-ক্ষতির কোনও সম্ভাবনাই নাই। কেন জানি না, মনে হয়, যা করছি ঠিকই করছি, শাশত কালের জন্য করে যাচ্ছি...'

স্বামীজির সঙ্গে এই কথোপকথনের উল্লেখ পাওয়া যায় নিবেদিতার লেখায়। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখছেন, 'He (Vivekananda) told me that I must return to England. There was no money here – and no hope of any– and my work would be wasted unless I could now proceed to take in 10 or 20 girls as boarders. If I did this at all I must have vested security–so that if I died or turned etc, they might not be thrown back on their families' hands. There must be permanent security. As far as girls went he could give me 100 anyday for amongst his own disciples– some widows, some Brhamos. (Sadananda also tells me this. Only a word is needed). He had failed –failed in everything for years past – and no one stuck to the man who failed etc, etc, – hence he could do nothing for me—Miss M. [Muller] gone because of failure –work spoilt here-there and everywhere . It was now only a question of when I should go. I told him that if he wished of course I would go–and then I told him about Nim. He said, 'You have no alternative. Start this month. The emergency is sufficient reason, and you leave in the height of your Power–which is always good.' He nearly arranged my ship. Then food and monk came and we could say no more. Afterwards I asked if I had failed in anyway. He said, 'No– you have done very well. We have failed.' Then I said, 'May I use what money remains?' 'But there is none,' he said. I 'Why I have 620 rupees untouched.' He 'what? After all these months?' I—'And I think we are strong enough to work and fail if need be. Your idea of leaving in power is mere show after all. We need not think of show.' He 'that's true..' I- 'This anxiety has had the good effect of making you consult me about the plan– but it doesn't seem terrible in itself to me. Do't think further about providing for me. Let me go on till September on what I have— and work as if there were no chance of being called home. Then let us face the situation again.'

নিবেদিতার এই মনোভাবের কাছে স্বামীজি সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন। মেনে নিয়েছিলেন, নিবেদিতার প্রস্তাব মতোই স্কুল চালু রাখা হবে। কোনো অবস্থাতেই স্কুল বন্ধ হবে না। নিবেদিতা লিখেছেন, 'To this he agreed. And if Mr. Mohini will give me the 15/- he promised monthly, I am going to take Santoshini at once.'

নিজের যুক্তিজালেও নিবেদিতা সেদিন পরাস্ত করেছিলেন বিবেকানন্দকে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I-if you could fail, Swami, do you feel that R. K. [RamaKrishna] could fail?

S.- I never look upto Him in that way...My feeling about Him is rather peculiar...I always think of Him as my child... you know He always depended on me, as the srongest of the whole lot, and at the very end– when He was nearly at the last, He put his arms about my shoulders and said 'This is a hero!'

জোসেফিনকে লেখা এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, নিবেদিতার মানসিক দৃঢ়তা সেদিন স্বামীজিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। এবং, অনুমান করাই যায়, সেই দৃঢ়তাই স্বামীজিকে হতাশা মুক্ত করতে অনেকটাই সাহায্যও করেছিল। এই চিঠিতেই নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি হিসাব দিয়েছেন জোসেফিনকেও। লিখেছেন—'There will have to be some risk and some faith on both sides, but we find that with our income of 150 rupees a month–i.e.£ 150 a year or less—I could board and train 5 girls! Isn't it wonderful? For that sum 5 lives gained! I cannot believe that every difficulty will not give way—but I am going to work as if nothing else existed, and I can not forget really that Swami has other anxieties in abundance.'

শুধু যে মঠ-মিশন আর্থিক সংকটে পড়েছিল তা নয়, এই সময় স্বামীজির শরীরও অনেকটা ভেঙে পড়েছিল। বলতে গেলে, স্বামীজি অসুস্থ হতে শুরু করেছিলেন ১৮৯৮ সালে উত্তর ভারত ভ্রমণের শেষ দিক থেকেই। ওই সময়ে স্বামীজির লেখা বিভিন্ন পত্রগুলি থেকেই জানা যায় তাঁর শরীর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল। ১৮৯৮-র নভেম্বর মাসে খেতড়ির মহারাজাকে স্বামীজি লিখেছেন, 'আমার হৃদযন্ত্রটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বায়ু পরিবর্তনে আমার আর কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না— গত চৌদ্দ বৎসর ধরে আমি একনাগাড়ে কোথাও তিনমাস থেকেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হয়, যদি কোনক্রমে বেশ কয়েক মাস কোন একস্থানে থাকতে পারি, তবেই আমার পক্ষে ভাল হবে।' চিঠিটি পড়ে বোঝাই যাচ্ছে, ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজি তখন একটু বিশ্রাম চাইছিলেন। ১৮৯৯-এর ২ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে স্বামীজি লিখেছেন, 'ডাঃ সরকার এখন আমার চিকিৎসা করছেন। আগের মত হতাশ ভাব আর নেই। অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। এটা আমাদের পক্ষে বড় দুর্বৎসর। যোগানন্দ, যে মায়ের বাড়িতে থাকত, এক মাস ধরে ভুগছে এবং প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। মা-ই ভাল জানেন। আবার কাজে লেগেছি, ঠিক নিজে করছি না, ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সারা ভারতে, আবার একটা আলোড়ন জাগাবার জন্য। সার্বোপরি তুমি তো জানই, অর্থাভাবই হচ্ছে প্রধান অসুবিধা। জো, তুমি এখন আমেরিকায়, আমাদের এখানকার কাজের জন্য কিছু টাকা তুলতে চেষ্টা

কর।' শরীর খারাপের পাশাপাশি অর্থচিন্তাও যে কতখানি কাতর করে তুলেছিল স্বামীজিকে তা এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। আবার ১৮৯৯র ১১ এপ্রিল কোনো এক শুভানুধ্যায়ীকে লিখছেন '...দু বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে।'

স্বামীজির শরীর সম্পর্কে নিবেদিতাও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা এই সময়কার বেশ কিছু চিঠিতে স্বামীজির শরীর সম্পর্কে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন নিবেদিতা। এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি স্বামীজির কোষ্ঠী বিচার করতেও দিয়েছিলেন। যাঁকে কোষ্ঠী বিচার করতে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, স্বামীজি আরও ন'বছর বাঁচবেন, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ১৮৯৯-র ৯ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠি থেকে এই কথা জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I have made them hunt up the horoscope and they say the King's life is safe for 9 years to come, but he will be ailing. I am selfish enough to want to keep him at all costs. Blessed be the earth he treads on!'

স্বামীজির শারীরিক অবস্থা যে সেই সময়ই নিবেদিতাকে যথেষ্ট চিন্তিত করে তুলেছিল, তার আরও প্রমাণ ওই পত্রে রয়েছে, 'They look for him to say 'I have got my mango'– and then they will know– referring to the story that on His death-bed, Sri R.K.[RamaKrishna] gave him a secret saying 'there my boy is your mango–that I have kept for you.' And this they connect with His prophecy to the others that first afternoon that when he should know who and what he was, he would leave this body. Sadananda says that always before when he has been ill they have said 'but we can not die; our mission is not accomplished.' This conviction is not so now.' স্বাভাবিকভাবেই এটা মনে হয় যে, তাঁর আচার্যের জীবন যে শেষ হয়ে আসছে-এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। ১৮৯৯-এর ৯ এপ্রিলের চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন—

'...and stood talking with one of the younger of Sri Ram Krishna's disciples–such a fine man! And he said gravely, 'But I must tell you, Sister, it has been my observation that in this country at least, great men never never live long...' The fact is Yum I am frightened. My old terror that he will never go West is on me and I am haunted by the Madras prophecy 'in 3 years'—Yum Yum Yum. If only you were here. I made this man promise if anything happened to send for me in time...

'Yet there is nothing really the matter. A foolish attack of fear— Swami Joginanda's death pulled him down they say. But I am so frightened. ...But oh Yum! how near it seems, and no philosophy avails me! And the only prayer one can offer– 'If indeed he be soon to enter into peace– give him a little ease and rest before he goes– and give me the pain you would have given him.' It's babyish to say but if God gives Swami awful torture at the last I never want to know Him or love him anymore. I will be shut up in the personal to all Eternity– but for this one sweet Person. Yes for the Personal part of him as much as any other I will live and work till I drop.But He won't–He can't– it would be fiendish cruelty.

'I feel as if he were a baby and I could not bear the quiver of the lip and the shrinking from or scourging only fit for a slave. When it would be enough to say to the heart 'stop!' and all would be over. He might die in his sleep even.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লে কতগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়। প্রথমত, স্বামীজির শরীর যথেষ্টই খারাপ হয়েছিল। যে কারণে এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা। দ্বিতীয়ত, স্বামী যোগানন্দের মৃত্যুর ঘটনা নিবেদিতাকে আরো বেশি করে স্বামীজি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কেননা ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'since Joginanda's death I seem so terribly near this last terrible shock– and I can not get over it.'

এবং সর্বোপরি, বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার ভালোবাসা, যা স্বামীজির শরীর সম্পর্কে এতটাই উতলা এবং শঙ্কিত করে তুলেছিল তাঁকে। লক্ষ্যণীয় যে, অসুস্থ স্বামীজিকে এদেশে ছেড়ে একদিনের জন্যও দেশে ফিরে যেতে রাজি ছিলেন না নিবেদিতা।

স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু অবশ্যই বিচলিত করে তুলেছিল নিবেদিতাকে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবং স্বামীজির গুরুভ্রাতা যোগানন্দ বেশ অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। স্বামীজি বিদেশ থেকে যেসব চিঠি লিখতেন তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের, সেই চিঠিগুলির ভিতর বেশ কয়েকটিতে যোগানন্দের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁরও যে বিশেষ উদ্বেগ ছিল, সে চিত্রটা পাওয়া যায়। যোগানন্দ থাকতেন বাগবাজারে, সারদা মায়ের বাড়িতেই। যোগানন্দের প্রতি সারদা দেবীরও অসম্ভব স্নেহ-ভালোবাসা ছিল। নিবেদিতা তাঁর স্কুল চালু হওয়ার আগে যখন সারদাদেবীর বাড়িতে থাকতে শুরু করেন, তখনই যোগানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই সময়ে রোজই

যোগানন্দের কাছে বাংলা শিখতেন নিবেদিতা। অসুস্থ-রুগ্ন যোগানন্দের প্রতি নিবেদিতার অকৃত্রিম স্নেহ ছিল।

যোগানন্দের শেষ দিনটি বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদিতা তাই আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। যোগানন্দের মৃত্যু হয় ১৮৯৯র ২৮ মার্চ। নিবেদিতার বর্ণনায় জানা যায়, শেষ সময়ে যোগানন্দের সন্ন্যাসী ভ্রাতারা তাঁর রোগশয্যা ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, 'কেমন লাগছে এখন? কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?' যোগানন্দ উত্তর দিলেন, 'আমি নির্গুণের ধারণা করতে চাইছি, কিন্তু মন আমার পড়ে রয়েছে সগুণে। আমাকে গীতা পড়ে শোনাও।' সন্ন্যাসীরা গীতা পাঠ শুরু করলেন। গীতাপাঠ শুনতে শুনতে যোগানন্দ বললেন, 'এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে না। এখন নির্গুণের আভাস পাচ্ছি।' তারপরই 'ওম রামকৃষ্ণ' বলে উঠলেন।

এরপরই সব শেষ। নিবেদিতা সারদা দেবীর কাছে গেলেন। সারদা দেবীও তখন শোকে অধীর। যোগীন মা, যিনি দিনের পর দিন স্বামী যোগানন্দের সেবা করছিলেন, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। নিবেদিতার এই বর্ণনাতেই আছে, যোগানন্দের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বামীজিও ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজিকে তাড়াতাড়ি মঠে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে চাইছিলেন। কারণ, গিরিশচন্দ্রের মনে হয়েছিল, স্বামীজির শরীর খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, স্বামীজির স্বাস্থ্য নিয়ে সেই সময় শুধু নিবেদিতা নন, স্বামীজির ঘনিষ্ঠ সকলেই যথেষ্ট চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন।

যোগানন্দের শেষ দিনটির বিবরণ দিয়ে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন (৩০.৩.১৮৯৯), 'On Tuesday afternoon, Joginanda died. They were most of them with him, and asked him– 'Brother how do you feel now? Any pain?'And he answered – 'I am trying all the time for Brahma- Gnan, but my mind will cling to the Personal. Read me the verses from Gita.' They read then and he said 'there is no pain now. Everything is melting. Brahma-Gnan is coming,' And then saying 'Om Ram Krishna!' in a sudden accession of voice and strength, he died.

'Wasn't it wonderful?

'Swami came over and dear old Mr. (Girish Chandra) Ghose was afraid he was going to have an attack, and persuaded him to go back to the Math, for which I was most thankful.

'I went to the Mother, who was in tears, Jogin Ma who has nursed continually for months lay on the floor without a word or a tear. I was there a long time when we heard 'Hari om'! from 50 or 60 voices down stairs, and the mother told me hurriedly to go and see.

'It was very awful. The dead man, wearing a great truban of yellow silk and covered with the flowers Swami had thrown on him was held

up in the arms of Sadananda and another– while burning camphor was waved before him, and the crowd within and without chanted the sacred name...

'But a long wail broke out upstairs–and went forth with the sound of the worship from below– for the women knew that it meant that he who had so long been master of the house was about to leave it for ever. Jogin Ma's icy calm was broken now–and I thought she and the Mother would break their hearts. And then he went. The bed was made so soft to receive him– and he was covered with flowers– he with white, the bed with yellow.

'Down at the burning ghat, they built the pyre– and talked to him all the time, and then before the lighted straw was put beneath it by Brahmananda they all asked his pardon for anything they might have done.'

স্বামীজির শারীরিক অসুস্থতা কিন্তু শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় থেকেই। পরিব্রাজক জীবনে অসম্ভব পরিশ্রম এবং কষ্ট সহ্য করার ফলে স্বামীজির শরীর ভেঙে পড়তে শুরু করে। পরে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশ দেশে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে শরীরের ওপর আরো চাপ পড়ে। সেই সঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব এবং দিনের পর দিন কষ্টসাধ্য জীবনযাপন। ফলে, নানারকম ব্যাধি স্বামীজিকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। হার্ট এবং লাংসের দুর্বলতা, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করাবৃদ্ধি, হাঁপানি—ইত্যাদি নানা রোগে কাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন স্বামীজি। সেই সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাও এত উন্নত ছিল না যে, এই অসুখগুলির ঠিকমতো চিকিৎসা হবে। ফলে, যত দিন যাচ্ছিল, স্বামীজির শরীর ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। বিদেশে থাকতেই স্বামীজি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তা জানা যায় স্বামীজির লেখা চিঠি থেকে। ১৮৯৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক থেকে মেরি হেলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'নিরন্তর কার্য করার ফলে এ বৎসর আমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গেছে। স্নায়ুগুলি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই শীতে আমি একরাত্রিও ভালভাবে ঘুমাইনি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমার খাটুনি খুব বেশি হচ্ছে। এখন ইংলণ্ডে এক বৃহৎ কার্য বাকি আছে।' শরীর এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, সারা বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আমি এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছমাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ।'

তাঁর শরীরের এই অবস্থায় স্বামীজিও সম্ভবত বুঝেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। কেননা,১৮৯৯-র ১৪ জুলাই এডওয়ার্ড স্টার্ডিকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'অধিকন্তু আমার আয়ু ফুরিয়ে এল— অন্তত: আমাকে এটা সত্য বলে

ধরে নিয়েই চলতে হবে।' শরীর দ্রুত ভেঙে পড়েছে, সেই সঙ্গে মঠ এবং মিশনের আর্থিক সংকট— সহজেই অনুমান করা যায়, স্বামীজির মানসিক অবস্থা কী হবে! তদুপরি, যে বিশ্রামের জন্য তিনি ছটফট করছিলেন — সে বিশ্রাম তিনি কখনো পাননি। বরং দেশে ফেরার পর তাঁর কাজের চাপ এবং পরিধি আরো বেড়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সকলে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল ছিল। মঠের জন্যে অর্থ সংগ্রহ, মঠের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলা, মঠের প্রতিটি কর্মপদ্ধতি ঠিক করা—এক কথায় সর্বকাজে স্বামীজি ছিলেন প্রধান। ফলে, বিশ্রাম স্বামীজির ভাগ্যে কখনোই জোটেনি।

নিজের এই শারীরিক অসুস্থতা এবং আর্থিক সংকটের ভিতরই স্বামীজি ১৮৯৯ সালের গোড়াতে নিবেদিতাকে এখানকার কাজ বন্ধ করে দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। স্বামীজির এই প্রস্তাব শুনে নিবেদিতার মনে হয়েছিল—স্বামীজি তাঁকে একটি অতিরিক্ত বোঝা বলে মনে করেছেন। ১৮৯৯-র ৭ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I see more clearly that I am really a burden to Swami. His one idea in saying what he did was to get rid of the responsibility of my work somehow.'

১৮৯৯-র ৫ মার্চ সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I begin to feel that my being here is a burden. Yum [Josephine] will tell you the awful possibility that is before me. That it would be cowardly and mean to shirk. I mentioned it today to Swami Saradananda, and he said in reply– 'Well– Swamiji was talking of making you return to Europe the other day.' I felt as if the ground had opened at my feet— for I thought so much work was coming to me– but goodness knows– I don't know about anything.' নিবেদিতার এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, হাজার কষ্ট সহ্য করেও এদেশে থেকে স্বামীজির সঙ্গে কাজ করার কী অদম্য বাসনা তাঁর ছিল। ফলে, স্বামীজির এই প্রস্তাবে তিনি মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অভিমানী হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজির প্রতি।

সেই সময় মঠের চূড়ান্ত অর্থিক অনটন এবং তার ফলে স্বামীজির মানসিক অবস্থার কিছুটা আঁচও অবশ্য পাওয়া যায় নিবেদিতার লেখা এই চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Swami Saradananda is to go to Bombay to collect funds. Swami himself will work the Math for a while. Everyone is being scattered, and a number of the boys are to be turned out to beg, because they can not be supported there. Swami feels himself in a terrible struggle I see. Joginanda's illness and his own have been great

additional burdens. Joginanda 10 rupees per day. He says he cannot see his disciples go through his experiences. Man-Makeing is his work, but he thinks he could do it better giving them bread to eat and with necessities available than without. Too much struggle, especially for the immature, drowns everyone. Oh how true it all is! How terribly, terribly true.'

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে সত্যিই কি নিবেদিতাকে তাঁর পক্ষে বোঝা মনে করছিলেন স্বামীজি? মনে রাখতে হবে, ১৮৯৮ র জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা লন্ডন থেকে কলকাতা এসে পৌঁছনোর পর কলকাতার শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী সমাজে নিবেদিতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র ছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতাকে কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য স্টার থিয়েটারে সভার আয়োজন করেছিলেন স্বামীজিই। উত্তরভারত ভ্রমণে তাঁর বাছাই করা সঙ্গীদের ভিতর নিবেদিতাকেও তিনি রেখেছিলেন। বাগবাজারে নিবেদিতার স্কুল প্রতিষ্ঠার পিছনেও স্বামীজির ঐকান্তিকতা এবং উৎসাহই ছিল। ১৮৯৯-র শুরুতেই, যখন মঠ ও মিশন চূড়ান্ত অর্থ সংকটে পড়েছে—তখনো কিন্তু স্বামীজি নিবেদিতাকে বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই সামনে এগিয়ে দিয়েছেন। অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার কালী-বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজক ছিলেন স্বামীজিই। কালীঘাট মন্দিরে নিবেদিতার কালী-বিষয়ক বক্তৃতার ক্ষেত্রও নেপথ্য থেকে স্বামীজিই অনেকখানি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। কলকাতা শহরে প্লেগ মোকাবিলাতেও নিবেদিতাকেই শীর্ষে রেখেছিলেন তিনি। প্লেগ মোকাবিলায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে সভা ডেকেছিলেন,সেই সভাতেও নিবেদিতাকেই বক্তা হিসাবে রেখেছিলেন। এই সময়েই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হিসাবে নিবেদিতাকে দীক্ষা দেন স্বামীজি। নিবেদিতার কাজ সম্পর্কে যে সেই সময় স্বামীজির কতখানি আগ্রহ ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে নিবেদিতার লেখায়। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন এবং স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিতেন, একটি আদর্শ- বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে আকাশ কুসুম রচনা করিতেন, এবং ঐ সংক্রান্ত নানা বিষয় সাদরে বর্ণনা করিতেন। হয়তো উহার কোন অংশই যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হইবে না, তথাপি উহার সবটাই নিশ্চয় মূল্যবান। কারণ, উহা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি কতটা স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিও কিরূপ ফললাভ বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইত।'

এইসব ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়— স্বামীজি কখনোই নিবেদিতাকে বোঝা মনে করেননি। তবু, ১৮৯৯ সালে মঠ আর্থিক সংকটে পড়ার পর স্বামীজিই নিবেদিতাকে বারবার ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন? এর

কারণটি বোঝা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। মঠ আর্থিক সংকটে পড়ার পর, স্বামীজি ভেবেছিলেন, এই অবস্থায় নিবেদিতার কাজকর্ম চালানো কষ্টকর হয়ে পড়বে। তদুপরি, নিবেদিতাকেও চূড়ান্ত কষ্টের ভিতর দিনযাপন করতে হবে। এই সংকটের মুখে নিবেদিতাকে ফেলতে একেবারেই রাজি ছিলেন না স্বামীজি। নিজে যে কষ্ট ভোগ করেছেন, তা তাঁর অন্য শিষ্য শিষ্যারা ভোগ করুন —এটা যে স্বামীজি কখনই চাননি—তা নিবেদিতার ৫ মার্চের লেখা চিঠি থেকেই জানা যায়। তদুপরি, স্বামীজির শরীরও ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল। মনে হয়, স্বামীজিও কিছুটা অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন এই সময়ে, যে কারণেই তিনি আরো বেশি করে চাইছিলেন, নিবেদিতা দেশে ফিরে যান। নিবেদিতা এটিকেই একটু ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন, ভুল বুঝেছিলেন। আসলে, স্বামীজির প্রতি চূড়ান্ত অভিমান থেকেই যে নিবেদিতার নিজেকে স্বামীজির কাছে 'বোঝা' মনে হয়েছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

স্বামীজির শরীর ক্রমশ খারাপ হতে দেখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশীয় শিষ্য-শিষ্যারা বারংবার স্বামীজিকে পাশ্চাত্যে আসার আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। নিবেদিতার সঙ্গে জোসেফিন এবং সারা বুলের নিয়মিত চিঠিপত্রে যোগাযোগ থাকার ফলে তাঁরাও স্বামীজির দৈনন্দিন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এমনকী, মঠ ও মিশন যে আর্থিক সংকটে পড়েছে—তা-ও তাঁরা জানতেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ড পরামর্শ দিলেন—নিবেদিতা আমেরিকায় এসে বেশ কিছু বক্তৃতা দিয়ে নিজের স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করুন, স্বামীজিও নিবেদিতাকে এই পরামর্শই দিলেন। স্বামীজি ঠিক করলেন, একটি বক্তৃতা পরিচালন সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকায় নিবেদিতার বক্তৃতাগুলির আয়োজন করা হবে।

নিবেদিতাও এই সময় বুঝতে পারছিলেন—এইরকম অর্থ সংকটের ভিতর দিয়ে স্কুল চালিয়ে যাওয়া যাবে না। স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহে নামতেই হবে। আর তার জন্য তাঁকে যেতেই হবে পাশ্চাত্যে। ১৮৯৯-র ২১মে জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'On yesterday morning I gave in and told Swami that I now know that my school was a waste of time– and he was sweet and told me he would give me some important work at Poona 'as soon as we got the wild cat out of the country'–pending the time when I could go to Europe and bring back money for my 'Home for Widows and Girl'.'

মুখে 'সময় নষ্ট' বললেও, আসলে তাঁর স্কুল এবং স্কুলের ছাত্রীদের সম্পর্কে কতখানি উচ্চাশা যে নিবেদিতা পোষণ করতেন, তা-ও জানা যায় এই চিঠিতেই। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Of course it's only a 'waste of time' in one sense. In another, I have been very much encourged, for Sadananda said he

found that the discipline here grew out of the will of the children in a curious way, and also that he found this the best place for seeing them in their true characters, better even than their homes. I thought these were very subtle and beautiful observations, and if he had known anything of educational theory I should have trusted them less, and been less comforted. But when a girl grows exquisite, she marries, and I can do no more for her. If I could go round to zenanas of course and teach English to the ladies it would be a great thing, but I am only one person and my time, what with school and sanitation and writing, is quite full–and Swami's little cousin is the only person I treat in this way. Of course I have already done something, however little, for Santoshini. And I have done a wee wee bit for the Brahmos and a morsel for those xtians. But the children whom I came to serve must be reached more largely and enduringly. My place is to train EDUCATIONAL MISSIONARIES– and for that, I must have their whole lives in my hand.'

অবশেষে স্থির হল, স্বামীজি পাশ্চাত্যে যাবেন। তাঁর সঙ্গী হবেন নিবেদিতা এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ। এবার বিদেশ যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল দুটি। প্রথমত—কিছুদিন দেশের বাইরে কাটিয়ে এবং অত্যধিক পরিশ্রম থেকে ছুটি নিয়ে স্বামীজির শরীর ভালো করে তোলা। এবং দ্বিতীয়ত— মঠ-মিশন এবং নিবেদিতার স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। ভারতে আসার পর প্রথমবার নিজের দেশের দিকে যাত্রা করলেন নিবেদিতা, স্বামীজিকে সঙ্গে নিয়ে। সেই সঙ্গে ফিরে এসে পূর্ণোদ্যমে তাঁর স্কুলটি গড়ে তুলবার সঙ্কল্প নিয়ে।

কুড়ি

স্বামীজি, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং নিবেদিতার বিদেশ যাত্রার দিন ঠিক হল ২০ জুন ১৮৯৯। এর মাঝে অবশ্য বেশ কয়েকবার যাত্রার দিন স্থির হয়েও তা বদল করতে হয়েছিল। মঠ এবং মিশনের জন্য অর্থ সংগ্রহের পাশাপশি, পারিবারিক প্রয়োজনেও যে তাঁর একবার ইংল্যান্ডে যাওয়া দরকার তা-ও অনুভব করছিলেন নিবেদিতা। তিনি ভারতে আসার সময়ে তাঁর উইম্বলডনের স্কুলের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বোন মেরিকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। নিবেদিতার যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা মেরি সবসময়ই ঘাড় পেতে নিয়েছিলেন। ওই বছরই মেরি বিয়ে করবেন মনস্থ করেন। তিনি চাইছিলেন, তার আগে নিবেদিতা এসে উইম্বলডনের স্কুলটির একটা ব্যবস্থা করে যান। মেরি নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, এত চাপ তিনি আর নিজেও নিতে পারছেন না। নিবেদিতা বুঝতে পারছিলেন, বোনের বিয়ের আগে তাঁর অন্তত একবার দেশে গিয়ে বোনকে ভারমুক্ত করা উচিত। স্বামীজির সঙ্গে বিদেশযাত্রা ঠিক হওয়ার অনেক আগেই নিবেদিতা ১৮৯৯-র ৩০ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছিলেন: 'Now I have curious thing to tell you. I might have to go home and give everything up this year. Indeed, it seems inevitable. I had a letter from Nim–actually reproaching me and syaing that she broken down with strain and worry–and how can she marry? It seems that she will probably want to marry this year– but with a school on her hands and that in its present state–she would have to go on indefinitely. This can not be. I only know one reply. Her life has always given way to mine and now mine must give way to hers. If she wants to marry and there is no other outlook– I must simply go home and take the old place over. But I have found some peace in the prospect when I thought this would be made clear here too. Looking at the thing all round, I think I did right to come– indeed

I can not doubt it –yet I have sacrificed my sister, and that is terrible. But I do not forget that even for her there have been compensations. So I shall spend no time in vain regret. Only I am saying to GOD that beyond a certain point in the killing of her happiness I will not go – even for Him and wouldn't it be very conceited of me to think I was very necessary to GOD anyway? But I have said nothing to Swami lest I might seem uncertain–when it will be like tearing the heart out of my body to have to go back. I shall always know that you understand, anyway. But I wish I had finished the whole thing off last year. Yet I don't know. One seems to have been guided. I simply won't think about it.

চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় নিবেদিতা যথেষ্ট দোলাচলে ভুগছেন। তাঁর বোন তাঁর জন্য ব্যক্তিগত জীবনে অনেকখানি স্বার্থত্যাগ করছেন, এবং তাঁর জন্যই বোনকে যথেষ্ট চাপ সহ্য করতে হচ্ছে—এটা নিবেদিতাকে পীড়িত করত। তেমনই, এদেশে তাঁর কাজকর্ম ছেড়ে ফিরে যেতেও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না নিবেদিতা। এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে তিনি রীতিমতো দোটানায় ভুগছিলেন। এমনকী, তাঁর এই দোলাচলের কথা তিনি স্বামীজিকে জানাতেও পারেননি। কাজেই, ১৮৯৯-র জুন মাসে যখন স্বামীজির সঙ্গে বিদেশযাত্রার দিনক্ষণ ঠিক হল তখন ব্যক্তিগতভাবে নিবেদিতার একটু সুবিধাই হয়েছিল বৈকি। ওই সময়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর নিবেদিতা যাত্রার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ৮ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I am to arrange passages tomorrow. We insist on two firsts. Then I am to buy a trunk. And then he (Swamiji) starts–for the West and you. He will go to Nim's wedding and give her blessing!!!'

এই চিঠিটি পড়ে আন্দাজ করা যায়, নিবেদিতার বোনের বিয়েতেও স্বামীজি উপস্থিত থাকবেন—এ রকম পরিকল্পনাই হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীজি অবশ্য সে বিয়েতে থাকতে পারেননি। তাঁকে তার আগেই আমেরিকা চলে যেতে হয়েছিল। বোনের বিয়ের পর নিবেদিতা আমেরিকা গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে যোগ দেন।

যাওয়ার দিন ঠিক হওয়ার পর এবার সাময়িকভাবে স্কুল বন্ধ রাখার ঘোষণা করতে হল। ১৬ মে স্কুল কয়েক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। তার আগে নিবেদিতা একদিন তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। একদিন শ্রীমার বাড়িতে তাঁর স্কুলের মেয়েদের হাতের কাজের প্রদর্শনী করলেন। এলাকার মানুষরা ভিড় করে সে প্রদর্শনী দেখতে এল। প্রশংসাও করল সকলে।

নিবেদিতা চলে যাচ্ছেন— এ সংবাদে স্কুলের ছাত্রীরা মুষড়ে পড়ল। নিবেদিতা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তিনি পাকাপাকিভাবে চলে যাচ্ছেন না। কয়েকমাসের মধ্যে আবার ফিরে আসবেন। আবার স্কুল শুরু হবে। লিজেল রেঁম লিখেছেন, 'স্বামী সদানন্দ পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের বললেন, 'তোমাদের আমরা ছেড়ে যাচ্ছি না। ফিরে এসে মস্ত ইস্কুল খুলব। তাতে বাগান থাকবে। বিধবাদের জন্যও ব্যবস্থা হবে।'

'ঝি আপাতত: তার গাঁয়ে চলে গেল। সন্তোষিণী দুচোখে অন্ধকার দেখল। নিবেদিতা সস্নেহে তাকে বকেন, 'কাঁদে না, জান তো তুমি আমার। তোমার ইংরেজী শেখাবার জন্য তোমার বাবার হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেলাম। যতদিন আমি থাকব না, সন্ন্যাসীরা তোমায় দেখবেন।

'হিসাব করে দেখলেন, স্কুলের জন্য যে টাকাটা দরকার, মাস আটেকের মধ্যেই বোধ হয় তা যোগাড় করতে পারবেন। এর মধ্যেই ছ'মাসে যে কাজ হয়েছে, তাকে ভিত্তি করে পাকারকম পরিকল্পনা করেছেন। মঠের সঙ্গে সে পরিকল্পনার যোগ আছে।'

স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিবেদিতার কষ্ট হয়েছিল —একথা ঠিকই। আবার হতাশা কাটিয়ে নিবেদিতাকে উজ্জীবিত হতেও সাহায্য করেছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতার স্কুলের জন্য ভবিষ্যতের এক বিরাট কর্ম পরিকল্পনা তিনি নিবেদিতার সামনে তুলে ধরেছিলেন, যা নিবেদিতাকে অবশ্যই উজ্জীবিত করেছিল। নিবেদিতা লিখেছেন, 'It strikes me as excellent. You have no idea of deliciousness of green mango jam. And of course, you know Bengali chutney. I am sure we can do this, and it would be widening the scope of our work educationally. To be managed entirely by women, think of that! Of course, we would make a very small begining. Oh! I am dying to really earn what we want.' স্বামীজি নিবেদিতাকে এই প্রস্তাবই দিয়েছিলেন যে, বেলুড় মঠে তিনি একটি কুটির শিল্প কেন্দ্র খুলবেন, যেখানে নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রীরা জ্যাম, আচার প্রভৃতি বানিয়ে বিক্রি করতে পারবে।

বিদেশ যাত্রার আগে নিবেদিতা তাঁর স্কুলের অর্থ সংগ্রহের জন্য আরো একটি পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমেরিকা-ইংল্যান্ড এবং ভারত থেকে কয়েকজনকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করবেন। সেই সমিতির সদস্যরা বার্ষিক সামান্য অনুদান দিলেই স্কুল চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন—এরকমই ভেবেছিলেন নিবেদিতা। তিনি লিখেছিলেন, 'The work would never want money. I believe in tiny subscriptions to work done for the people, by the people, as a joy to the worker and the user.'

নিবেদিতার এই ধরনের ভাবনা কতখানি বাস্তবসম্মত ছিল তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, নিবেদিতা তাঁর কাজের প্রতি যতখানি আন্তরিক ছিলেন, যতটা সদিচ্ছা তাঁর ভিতরে ছিল—সেগুলি কিন্তু এইসব ভাবনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

যাত্রার দুদিন আগে, ১৮ জুন, নিবেদিতা গেলেন সারদা দেবীর বাড়িতে। সারাদিন তাঁর সঙ্গে কাটালেন। এমনকী সারদা দেবীর সঙ্গে সাদা শাড়ি পরে একাদশীও পালন করলেন। ওই দিনই জোসেফিনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন,

'I am keeping Ekadashi–just for fun, Colthed in a white sari and spending the whole day with the Mother;'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, সারদা দেবীর বাড়ি থেকে নিবেদিতা ওই দিনই বিকেলে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোটখাটো চায়ের মজলিস ছিল। মঠের পক্ষ থেকে সন্ন্যাসীরা তাঁকে অভিনন্দন পত্র এবং গোলাপফুলের তোড়া দিয়েছিলেন। মঠ থেকে নিবেদিতা দক্ষিণেশ্বরে যান। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ ধ্যান করেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য দেন। নিবেদিতা ১৮ তারিখে জোসেফিনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি পড়লে এর বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Now I will tell you about last night.

'Sadananda, Mr. Mohini and I left this about 5.30 for the Math, where we had some tea, and 'the younger members of the Math' read a sweet letter to me and gave me 7 roses tied with gerua.

'Then we went to Dukshineswar and stayed under the tree till after 10.

'We also went into the room, and I laid my 7 roses at the foot of the picture. Fancy not seeing it again till I come back!

'Under the tree we meditated (M&I)

'then talked–

'then visited the room–

'then went back and talked again.

'Meditated again–but I got very tired and went to sleep. Then down to the boat where S. and I feasted on mangoes and M. would eat nothing, and go home.'

স্বামীজিকে বিদায় দেবার ব্যাপারে মঠের সন্ন্যাসীরা যথেষ্টই চিন্তিত ছিলেন। কারণ, স্বামীজির শরীর ভেঙে পড়ছে। সমুদ্রযাত্রার ধকল স্বামীজি কতটা নিতে পারবেন—এ নিয়ে সকলেই চিন্তিত ছিলেন। তবে, স্বামীজি মনে করেছিলেন, সমুদ্রযাত্রা তাঁর পক্ষে ভালোই হবে। ১৮৯৯ সালের ১৪ জুন, বিদেশযাত্রার কয়েকদিন

আগে, জনৈক শুভানুধ্যায়ীকে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'এবার সমুদ্রযাত্রায় কিছু উপকার হবে, আশা করছি।' বিদেশযাত্রার আগের দিন, ১৯ জুন রাতে স্বামীজি মঠে সন্ন্যাসীদের সামনে বিদায়কালীন সভায় একটি ভাষণও দেন। লিজেল রেঁম লিখেছেন, বিদেশে যাওয়ার আগে স্বামীজি কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসেন। স্বামীজির সঙ্গে নিবেদিতাও ছিলেন। কিন্তু এ তথ্য একেবারেই ঠিক নয়। কেননা, নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, নিবেদিতা ১৮ তারিখে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী সদানন্দ এবং মোহিনী চট্টোপাধ্যায়। স্বামীজি বা তাঁর গুরুভ্রাতারা কেউ ছিলেন না। স্বামীজি যদি যাত্রার আগের দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েও থাকেন, তবে তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে নয়।

নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যায়, তাঁর বিলেত যাত্রার খরচ জুগিয়েছিলেন শ্রীমতী সেভিয়ার। শ্রীমতী সেভিয়ার তাঁর ব্যাংককে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন নিবেদিতা যখন চাইবেন, তখনই যেন তাঁর টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশ যাত্রার সময় স্বামীজির টিকিট কাটা হয়েছিল জাহাজের প্রথম শ্রেণিতে। কিন্তু স্বামীজি চেয়েছিলেন নিবেদিতাও প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ করুন। এ জন্য নিবেদিতাকে দেড়শো টাকা অতিরিক্ত খরচ করে প্রথম শ্রেণির টিকিট কাটতে হয়েছিল। যাওয়ার দুদিন আগে জোসেফিনকে চিঠিতে জানাচ্ছেন নিবেদিতা, 'I never thought of telling you that Rev. Mother had left standing orders, and again sent special instructions later, to her bankers, to get me a ticket any time I wished. So that was all right–only as Swami was to go first class he of course insisted on my doing the same– so I sent a chaque for 150 Rupees extra.'

ওই চিঠিতেই জানা যায়, নিবেদিতা আমেরিকা পৌঁছনোর আগেই তাঁর জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলেন জোসেফিন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'But another line in your letter caught my eyes as I opened it– 'Mrs. Scott'– I don't know who she is!– 'wants you to lecture in America' etc– I laughed– So Sri Rama Krishna has been arranging as usual at both ends of the rope.'

নিবেদিতার এই বিলেত যাত্রার ফলে, তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এই সময়েই নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে ছুটি কাটানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বিদেশ যাত্রার কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেবার ছুটি কাটাতে যাওয়া হয়নি নিবেদিতার। ১৮৯৯ সালে ১৬ জুন সেজন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে একটি চিঠিও দিয়েছিলেন নিবেদিতা। এই চিঠির

কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটলেও, জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বে তিনি যে সবিশেষ আগ্রহী—সে কথা ওই চিঠিতেই জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। বিলেতযাত্রার পূর্ব মুহূর্ত পযন্ত বন্ধু জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে নিবেদিতা যে গভীর ভাবনা-চিন্তা করতেন, তারও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে তাঁর লেখায়। বিলেত যাত্রার ঠিক আগে, ১৮ জুন ১৮৯৯, জোসেফিনকে লেখা একটি চিঠিতে বসু দম্পতির কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা লিখেছেন,'Why of course Dr. Bose and his wife loves you! I quite agree that no one could resist anyway–but they did–quite specially–what gave you any other idea? Nasty old Yum! Aren't they people of vision! Isn't loving you implied in that? Don't easily permit yourself to asperse persons dear to me in that manner!'

চিঠির এই অংশটুকু পড়লেই বোঝা যায়, বসু দম্পতি সম্পর্কে তখনও তাঁর মনে কী গভীর প্রীতি এবং অনুরাগ! ১৬ জুন রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন নিবেদিতা—তাতে তিনি বলেছিলেন, ভারত ছেড়ে যেতে তাঁর একদমই ভলো লাগছে না; তবু তাঁকে যেতে হচ্ছে। হয়তো সত্যিই সে সময় নিবেদিতার কলকাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। তবে, তখন বিলেতে না গেলে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাটাই যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে— তা বুঝেছিলেন নিবেদিতা। তবে, বিলেতে পদার্পণের পরেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জগদীশচন্দ্রের প্রতি নিঃস্বার্থ দায়িত্ব পালনে যে এতটুকু ত্রুটি হয়নি নিবেদিতার, তা বোঝা যায়, ১৯০১ সালে প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেস যোগ দেওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্র ইউরোপে পৌঁছলে।

অবশেষে যাত্রার দিন চলে এল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'সকলের মন বিষাদগ্রস্ত। ২০শে জুন শ্রীমা স্বামীজি, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অন্যান্য সন্নাসীগণকে ভোজন করাইলেন। বিকালের দিকে সকলে প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতাকে বিদায় দিবার জন্য মঠের সন্ন্যাসীগণ ছাড়াও বহু লোকজনের সমাবেশ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজ তীর ছাড়িল। নিবেদিতার অন্তরে বেদনার সহিত দৃঢ় আশ্বাস— আবার তিনি ভারতভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন।'

যাত্রার দিনের আর-একটি বিবরণ পাওয়া যায় সারদা দেবীর দীক্ষিত শিষ্য, সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখায়। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'১৮৯৯ সালের ২০ জুন। প্রভাতে বেলুড় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজি গুরুভাইদের সহিত বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার আলয়ে অসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী সন্ন্যাসী সন্তানদিগকে পরিতোষ সহকারে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া সুখী হইলেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া, ভক্ত ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া

স্বামীজি ভাগীরথী তীরে 'প্রিন্সেপ ঘাটে' উপস্থিত হইলেন। বন্ধু শিষ্য ও জনমণ্ডলীর বিদায় অভিনন্দন হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়া স্বামীজি 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনে সুপণ্ডিত মহাযোগী স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।'

নিবেদিতার এই বিলেত যাত্রা নিয়ে স্বামীজিও কি একটু দোলাচলে ভুগছিলেন? তাঁরও কি মনে এইরকম সংশয় জাগছিল যে, নিবেদিতা যদি আর এদেশে ফিরে না আসেন? এবং সে সংশয় কি তিনি প্রকাশ করতে পারছিলেন না? গোলকুণ্ডা জাহাজ থেকে নিবেদিতা ২৮ জুন ১৮৯৯ তারিখে যে চিঠিটি জোসেফিনকে লিখেছিলেন, সেটি পড়ে এরকমই কিন্তু মনে হয়। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'He does not in the least know, as you said, what is before him. He lunched with me in the Mothers's sitting-room before we came away. Someone asked me when I would come back and I answered as usual. 'Suppose you are not back in two year' he (Vivekananda) said in an undertone.

'Then one day we were talking about plans, and I said 'but you must send me back before that Swamiji!'

'Oh no!' he said, with a sudden look like a rightened child. 'I'm not going to stay this time! I can't earn my living anymore.' And then, as if peace came that way only– 'But these things will settle themselves Margot! Remember– Mother knows the best.'

বোঝাই যায়, স্বামীজির কাছে নিজেকে যে 'বোঝা' মনে করেছিলেন নিবেদিতা তা কতখানি ভুলভাবনা ছিল। বরং, নিবেদিতাকে না হারানোর একটা ইচ্ছা স্বামীজির মনেও ছিল। এই ইচ্ছা ছিল বলেই তিনি এই আশঙ্কায় ভুগছিলেন যে, নিবেদিতা যদি বিলেত থেকে আর না ফেরেন! সন্ন্যাসী সুলভ সংযমের কারণে স্বামীজি তা প্রকাশ করেননি ঠিকই; কিন্তু নিবেদিতারও নিশ্চয়ই তা অজানা ছিল না। আর অজানা ছিল না বলেই নিবেদিতা জোসেফিনকে এই কথাগুলি লিখতে পেরেছিলেন।

এক গভীর শ্রদ্ধা এবং স্নেহ-মমতার বন্ধনে যে নিবেদিতা এবং স্বামীজি পরস্পরকে ধরে রেখেছিলেন—তা-ও প্রকাশ পেয়েছে নিবেদিতার চিঠিতে। লিখেছেন, 'I forget to tell you that I got my wish at last of worshipping him (Vivekananda) with flowers. Someone brought me roses, and he let me put them on his feet, and blessed me– oh Yum! that last morning!

And how often he carries my chair across the deck!!!'

বোঝাই যায়, নিবেদিতা যেমন তাঁর উপাস্য দেবতার স্থানে কার্যত বসিয়েছিলেন স্বামীজিকে, তেমনিই স্বামীজিও অসম্ভব স্নেহে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতার প্রতি স্বামীজির এই স্নেহ এবং আগলে রাখার মনোভাব

এর আগেও দেখা গিয়েছে অমরনাথ দর্শনের সময়। অমরনাথে গিয়ে পথশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন নিবেদিতাকে অতি যত্ন, মমতায় এভাবেই আগলে রেখেছিলেন স্বামীজি।

স্বামীজির সঙ্গে এই সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন, 'এই দেড়মাস ব্যাপী সমুদ্রযাত্রা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া মনে করি। এই কালে স্বামীজির সহিত মিশিবার যে-কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিতাম। অপর কাহারও সহিত একপ্রকার মিশিতাম না বলিলেই চলে। অবশিষ্ট সময় লেখা ও সূচীকর্মেই কাটিত। এই রূপে দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার অপূর্ব চরিত্র ও মনের সংস্পর্শ লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। এ সম্পর্কের কি তুলনা হয়?'

এই যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'সমুদ্রের হাওয়ায় স্বামীজির স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হচ্ছে তা স্পষ্টই বোঝা গেল। কিন্তু জাহাজে যে ইউরোপীয়নরা ছিল তাদের ঔদ্ধত্যে তাঁর মেজাজ খিটখিটে হয়ে নাড়ী দৌর্বল্য দেখা দিল। মেয়েরা নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য খুবই উৎসুক ছিল, কিন্তু সাধু দুজনের সঙ্গে তিনি ডেকে পায়চারি করছেন দেখলেই পুরুষরা সরে যেত। অনেকগুলি আমেরিকান মিশনারি পরিবার ছুটিতে দেশে ফিরে যাচ্ছিল। তারা এঁদের সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করল যে, নিবেদিতা তাদের সঙ্গী পাদ্রীটিকে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন, এই হিন্দু দুটিও তাদের মতো ধর্মযাজক। তারপর থেকে সমস্তটা রাস্তায় উভয় পক্ষের মধ্যে নিতান্তই মেকী-ভদ্রতার খাতিরে একটা শুকনো শিষ্টাচারের আদান-প্রদান চলত।

'কলম্বোতে তখন প্লেগের প্রকোপ। বিধিনিষেধের কড়াক্কড়িতে জাহাজ থেকে নামাই শক্ত। কোনরকমে নিবেদিতা আর সাধু দুজন নামলেন। বন্ধুরা ভিড় করেছিলেন সেখানে। ব্যান্ড বাজিয়ে ওঁদের সংবর্ধনা করে নেওয়া হল জনকয়েক শিষ্যের বাড়ি। তাঁরা পয়সাওয়ালা লোক। সাধুদের সম্মানার্থে ভোজের আয়োজন হল। স্বামীজি একটু ফল খেলেন, এককাপ দুধও খেলেন নিবেদিতা আর স্বামী তুরীয়ানন্দ দুধে চুমুক দেবার পর। সবাই দেখলেন, এই বিদেশী ব্রহ্মচারিণী আর সাধু দুটির মধ্যে জাতি বর্ণের কোনও বেড়া নাই। স্বামীজি বিদায় নিতে চাইলে জয়ধ্বনি করে তাঁদের জাহাজে পৌঁছে দেওয়া হল।'

১৮৯৯ সনের ২০ জুন কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন স্বামীজি, নিবেদিতা এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ। ৩১ জুলাই তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন ইংল্যান্ডে। প্রায় দেড়মাসের এই জাহাজযাত্রার কিছুটা বিবরণ দিয়েছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাও। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, '২৪ শে জুন জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছিল। দূর হইতে দেখা গেল সমুদ্রতীরে অপেক্ষমান বিরাট জনতা। প্লেগ আক্রমণের আশঙ্কায় সরকার কর্তৃক কোন ভারতীয় যাত্রীর অবতরণ নিষিদ্ধ ছিল। বহু লোক নৌকায় নানা উপহারসহ জাহাজের নিকট

আসিয়া স্বামীজিকে দর্শন করিয়া গেল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও আসিয়াছিলেন। রেলিং-এর নিকট দাঁড়াইয়া স্বামীজি প্রসন্ন হাস্যে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। কলম্বোতে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এখানেও বিরাট জনতা স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিল। কলম্বোতে তাঁহারা মিসেস হিগিনের বৌদ্ধ বালিকা বিদ্যালয় এবং কাউন্টেস ক্যানোভারার কনভেন্ট ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে মিসেস হিগিনের সহিত নিবেদিতার বহু আলোচনা হইল। তাঁহার সাহায্য পাইলে মিসেস হিগিন একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। নিবেদিতা প্রস্তাবটি ভাবিয়া দেখিবেন জানাইলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল, প্রত্যাবর্তনান্তে অন্ততঃ কলিকাতা মাদ্রাজ এবং পুণায় একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এখন কলম্বোতেও একটি বিদ্যালয় খুলিবার সম্ভাবনা দেখা গেল।...

'...জাহাজে স্বামীজি তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিয়মিত ব্যায়াম করিব স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। যদি ভুলে যাই বা অনিয়ম করি, তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও।'

'হরি মহারাজ (তুরীয়ানন্দ) রাজী হইলেন। প্রথম দুই চারিদিন স্বামীজি কথামত ব্যায়াম করিলেন। তারপর দেখা গেল নিবেদিতার সহিত নানা প্রসঙ্গে তিনি একেবারে তন্ময়। ব্যায়ামের কথা আর মনে নাই।...'

এই যাত্রাপথের বর্ণনা নিবেদিতার লেখাতেও পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন (২৮ জুন, ১৮৯৯), 'It was quite exciting at Madras. Crowds of people and an appeal to the Governor to let him land. But plague considerations prevailed and we were kept on baord– to my great relief, for the sea voyage is doing him a world of good, and one day of crowds and lecture would be enough to pull him down from his present magnificent condition into the lowest depths of exhaustion. It was sufficiently tiring to have to look down and be polite to constant succession of boat-loads who came to the ship's side present and addresses all day.'

বোঝাই যাচ্ছে, জাহাজযাত্রার সময়েও স্বামীজির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কতখানি উদ্বেগে ছিলেন নিবেদিতা। ওই জাহাজ যাত্রায় স্বামীজির শারীরিক অবস্থার যে উন্নতি ঘটেছিল তা-ও জানা যাচ্ছে নিবেদিতার এই চিঠিতে। এই কারণেই নিবেদিতা চাইছিলেন না, মাদ্রাজ বন্দরে নেমে স্বামীজি কোনো সভায় বক্তৃতা করুন। কারণ, নিবেদিতার মনে হয়েছিল, তাতে স্বামীজির শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি ঘটবে। এমনকী নৌকায় উপহার সামগ্রী নিয়ে লোকজন যে ভিড় করে স্বামীজিকে দেখতে আসছিল, তা-ও খুব একটা ভালো লাগেনি নিবেদিতার। নিবেদিতা লিখেছেন, 'At Madras Alasinga took passage for Colombo and so the King is having grand comforts in his cabin all the time. They all three mess there

now– so I am alone at table, growing more or less acquainted with other people. Did I tell you that I was looking forwad to this voyage as a means of testing race -question? I am having great fun out of it, all the time. There was such a crowd of yellow and other robed ones to see us off and I was so complacent about wearing all the garlands and receiving all the bouquets that Swami rejected, that there could be no possible mistake from the beginning as to who we were. I don't know whether anyone tried to remember it against me or not. Swami was so much with me the first day or two. Whenever a man spoke to me I always contrived to shunt the conversation to him, making it evident that I sailed under his flag. Presently, I found that every WOMAN had made my acquaintance, in spite of my reserve. So of course the battle is won. At present a good many men are in the habit of coming up and talking to me–then if a 'Native' comes to the otherside, they suddenly disappear, driving my effusive greeting. But even this is only some. Others stay and talk to Swami before they go.'

যে বর্ণনাটি নিবেদিতা দিয়েছেন, লিজেল রেমঁর লেখাতেও সেটিই ধরা পড়েছে। সেই সময় ভারতীয়দের কী ভীষণ বর্ণবিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হত নিবেদিতার লেখার এই অংশটি পড়লেই তা বোঝা যায়। এই বর্ণবিদ্বেষের সম্মুখীন যে স্বামীজিকেও হতে হয়েছিল—তাও বোঝা যায় নিবেদিতার এই লেখা থেকে। নিবেদিতার লেখা থেকেই জানা যাচ্ছে, স্বামীজির শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল মাদ্রাজ বন্দর থেকে এই জাহাজযাত্রায় সঙ্গী হন। কলম্বো বন্দর পর্যন্ত যান আলাসিঙ্গা। আলাসিঙ্গা জাহাজে ওঠার পর স্বামীজি, তূরীয়ানন্দ এবং আলাসিঙ্গা একত্রে বেশি সময় কাটাতেন। ফলে, অনেকটা সময় নিবেদিতাকে একা বা জাহাজের অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাতে হত।

এই যাত্রাপথের বিবরণ স্বামীজির লেখাতেও পাওয়া যায়। 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য তখন যে ধারাবাহিক রোজনামচা তিনি লিখেছেন (পরে যা 'পরিব্রাজক' শিরোনামে গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত), ততে যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে, 'জলে কি আর রূপ নেই? জলে জলময়; মুষলধারে বৃষ্টি কচুপাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ। এতে কি রূপ নেই? আর আমাদের গঙ্গার কিনারে বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মন্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারকেল খেজুরের মাথা

ঝাপসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকমের সবুজের কাঁড়ি-ঢালা আম, লিচু জাম, কাঁটাল,— পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না।'

প্লেগের অজুহাত দেখিয়ে কলকাতা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় স্বামীজিকেও যে ব্রিটিশ অভিবাসন দপ্তরের কিছুটা হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল জাহাজ যাত্রার সময় স্বামীজির লেখা থেকে তা-ও জানা যায়। এই ঘটনার ভিতর কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার লক্ষ করেছিলেন স্বামীজি। ব্রিটিশ সরকারের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীজি তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন, 'এবার আমরা যখন আসি, তখন জাহাজ কোম্পানী প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, কোন কালা আদমী এমিগ্রান্ট আপিসের সার্টিফিকেট ছাড়া বাইরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে আমায় জাহাজে নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এখন প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাইরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমাদের দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্রজাত, অমুক ছোট জাত! সরকারের কাছে সব নেটিভ। মহারাজা রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্য সব একজাত— 'নেটিভ'। কুলির যে আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভের' জন্য —ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলাম।

'...সব 'নেটিভ', সরকার বলেছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁছ কমবেশি বোঝা যায় না। সরকার বলছেন, ওসব নেটিভ। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিন্দুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চেয়ে, চোট্‌টা বেশি বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজ রাজ! তোমার ধনে-পুত্রে তো লক্ষ্মীলাভ হয়েছেই, আরো হোক, আরো হোক। কপ্‌নি ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায়, শুধু পায়ে, শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় হাতচুব্‌ড়ে সপাসপ ডালভাত খাই। দিশী সাহেবিত্ব লুকিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশী কাপড় ছাড়লেই, দিশী ধর্ম্ম ছাড়লেই, দিশী চালচলন ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনেছিলুম। কর্তেই যাই আর কি, এমন সময় গোরা-পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,— পালা পালা, সাহেবীতে কাম নেই, নেটিভ কবলা! 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য ইংরেজ সরকার, তোমার 'তকৎ তাজ্‌ অটল রাজধানী হউক'।' স্বামীজি এই লেখায় শুধু যে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করেছেন তা-ই নয়; ব্রিটিশের তাঁবেদারি করা ভারতীয়দের প্রতিও তীব্র কশাঘাত হেনেছেন।

এই 'পরিব্রাজক'-য়েই স্বামীজি একটি আমেরিকান পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামীজি লিখেছেন, ওই আমেরিকান পরিবারের অনেকগুলি সন্তান। কিন্তু সন্তানদের মা-র তাদের দিকে দেখার সময় নেই। ওই সন্তানগুলির প্রতি নিবেদিতার স্নেহ লক্ষ করে স্বামীজি লিখেছেন—' আমাদের নিবেদিতা টুট্‌লর ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে।' নিবেদিতার লেখাতেও এই আমেরিকান পাদ্রি পরিবারের কথা পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'We are only 3 women, and one is the wife of an American Missionary, on board with her husband and 4 young children. They don't look at all fiendish to me, poor things, but pathetically kind and cheerful and poverty sticken. However, it is certainly very wrong of them to look so ill and have so many weakly bairns, and I try to remember what horrid things they will be saying presently. I can't help being friendly to them, but I keep as far away as I can, by way of caution. Boggess they are called. Isn't that a fearful fate? They are going to West Virgina.[২৮ জুন, ১৮৯৯]

স্বামীজির সঙ্গে এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'গুরুর সহিত যদি ভূ-প্রদক্ষিণও করা যায়, তবে উহাই তীর্থযাত্রায় পরিণত হয়। একদিন লোহিত সাগরে সন্ধ্যার কিছু পরে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা লইয়া আমি স্বামীজির নিকট উপস্থিত হই। প্রশ্নটি ছিল, অপরকে সাহায্য করিবার প্রকৃত পন্থা কি? বস্তুত: এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর তিনি শাস্ত্রোক্তি অবলম্বন ব্যতীত স্বয়ং কদাচিৎ দিতেন। এইরূপ উত্তরের জন্য পরে আমরা কতই না কৃতজ্ঞ বোধ করিয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিগত মত আমরা জানিতে চাহিতাম। কিন্তু কোন শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা সহযোগে ঐ মত প্রকাশ করায় আমাদের মনে উহা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত, এবং অসহিষ্ণু প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় মতো তৎক্ষণাৎ কোন একটা উত্তর দিলে যেরূপ হইত, তাহা অপেক্ষা অধিক দিন ধরিয়া আমরা ঐ বিষয়ে চিন্তা ও অলোচনা করিতে পারিতাম।'

নিবেদিতার লেখার এই অংশটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য আর একটি কারণেও। নিবেদিতা লিখেছেন, কোনো একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তিনি স্বামীজির সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যক্তিগত সমস্যাটি কী তা না লিখলেও, নিবেদিতার লেখা পড়ে আঁচ করা যায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কোনোরকম সাহায্য করার কথা ভাবছিলেন। কাকে সাহায্য করার কথা ভাবছিলেন, যার জন্য সমুদ্রযাত্রাতেও তিনি উতলা ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটি নামই মনে আসে। তা হল, জগদীশচন্দ্র বসু। লন্ডনের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে পর্যন্ত নিবেদিতা

জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্য উৎসুক ছিলেন। এ কারণে, সারা বুলকে বেশ কয়েকটি পত্রও লন্ডন রওয়ানা হওয়ার আগেই লিখেছিলেন তিনি। কাজেই, এমন যদি অনুমান করা যায়, জগদীশচন্দ্রের বিষয়েই স্বামীজির সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন— তাহলে তা ভুল অনুমান করা হবে না।

স্বামীজির সঙ্গে এই সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন 'এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভাব ও গল্পের একটা অবিরাম স্রোত চলিয়াছিল। কেহই জানিত না, কখন সহসা স্বামীজির উপলব্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, এবং তাহার ফলে আমরা জ্বলন্ত ভাষায় নূতন নূতন সত্যের বর্ণনা শুনিতে পাইব। প্রথম দিন অপরাহ্ণে আমরা ভাগীরথীবক্ষে জাহাজে বসিয়া কথাবর্তা বলিতেছি, এমন সময় সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'যত দিন যাচ্ছে, তত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৌরুষই (manliness) জীবনের সারবস্তু। এই আমার নূতন বার্তা। পাপ করবে, তাও যথার্থ 'মানুষের' মতো কর। যদি দুষ্টই হতে হয় তবে বড় রকমের দুষ্ট হও।'

এই জাহাজ যাত্রার সময়ই নিবেদিতা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য দুটি লেখা পাঠান। লেখা দুটি যথাক্রমে ১৮৯৯-র আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভারতে থাকাকালীন হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং ইওরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির তুলনা—তা নিয়েই নিজের মতপ্রকাশ করেছেন নিবেদিতা এই লেখাদুটিতে। প্রথম লেখায় তিনি লিখছেন, 'Hindu feeling is something that makes me merely Western feel himself a dwarf before a giant. That jealous privacy which marks the inner life of Oriental nations causes this feature to be little suspected by Europeans. They are more or less deceived by the mark of indifference that is worn with such success. To a certain extent indeed the indifference is real. Strong farces are rarely evoked by a slight stimulus. But when the secret note is sounded in this case, sleeping energies of joy or suffering are apt to be aroused, beside which life itself seems a very very little thing.'১৮৯৯ সালের ২৭ জুন নিবেদিতা এই লেখাটি লিখেছিলেন। দ্বিতীয় লেখাটি লিখেছিলেন ২৯ জুন। ওই লেখায় তিনি লিখেছেন, 'Hindu culture is, infact, like a gigantic tree which is constantly embracing a wider and wider area with the roots. Through ages this huge organism has been at work, silently reclaiming more and more of humanity from barbarism. Perhaps each successive stratum won may have been a new caste taken in. Religious notions would seem to be the first great unifying nerves sent out. Then follow, though in what order I can not guess, various accretions of custom, till by degrees appear the old gentleness, the old self-direction, and the old horror of defilement.'

নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে জানা যায় দীর্ঘ এই দেড়মাসের জাহাজযাত্রায় রোজই নানাবিধ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে স্বামীজির দীর্ঘ আলোচনা হত। এই আলোচনার মধ্যে হিন্দু ধর্ম, বেদান্ত দর্শন, বুদ্ধের বাণী ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনই ভারতের নানাবিধ সামাজিক সমস্যা এবং প্রতিকারের উপায় নিয়েও আলোচনা হত। হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে নিবেদিতার এই ধারণাটি যে জাহাজযাত্রার সময়ে এবং তারও আগে স্বামীজির সঙ্গে আলোচনার ফলেই গড়ে উঠেছিল— তা আন্দাজ করাই যায়।

এই জাহাজযাত্রায় স্বামীজির স্বাস্থ্যের যে কিছুটা উন্নতি হয়েছিল তা-ও নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায়। ৫ জুলাই ১৮৯৯, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে জানাচ্ছেন নিবেদিতা, 'The King is looking magnificent and sleeping well. He has almost stopped smoking and drinking iced water– is deep in the Imperial Gazette– and is of course impatient to be at the next place. The rolling and pitching do not seem to cause him the last sufferings, but rather to do him good. He said to me this morning, 'I threw the load down so completely!'

এই জাহাজযাত্রার সময় স্বামীজির সঙ্গে যে তাঁর মান-অভিমানের ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যক্তিগত ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন নিবেদিতা। ১৩ জুলাই, ১৮৯৯, তিনি লিখছেন,

'Here it is–at dinner on Sunday Swami told me that he thought I had been 'imprudent' in certain kindness that I had shown to the Captain here. He had terrible neuralgia, and I fomented his face for him, and got Turiananda to 'treat' him–with the consequence that whereas he had been almost an invalid for 3 or 4 voyages, in excruciating pain– he is now all but well. Just imagine! However, the old gentleman took to sending me presents at which I protested and offended him bitterly – and about this I laughingly told the King. Then he used the word above (only I thought he said 'impudent'!) and told me about horrid little smiles that he had seen on men's faces– whereupon I rather astonished him by going from table to my cabin suddenly, to cry.

'After a while I went up on deck– and he came softly and found me here in dark, and he was just like one's mother. There was nothing he didn't think of– in talking it over– that would be tender and chivalrous– and after all it turned out that he had not used the word I thought, and my unhappiness therefore was quite unnecessary, for of course I cared nothing for anyone else.'

নিবেদিতার লেখার এই অংশটি পড়লেই বোঝা যায়, স্বামীজির সামান্য তিরস্কারেও কত অভিমানী হতেন তিনি। এতটাই অভিমানী হতেন যে চোখের জলও বাঁধ মানত না। শিষ্যার অভিমান দূর করতে আচার্য বিবেকানন্দও যে কতটা স্নেহশীল আচরণ করতেন— নিবেদিতার লেখাতেই তা-ও জানা যাচ্ছে। স্বামীজির কঠোর আচরণে যে অভিমান তাঁর হত, সেই অভিমান কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে নিবেদিতার আচরণে প্রকাশ পায়নি কখনও। জগদীশচন্দ্রের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আচরণে কখনো কখনো দুঃখিত হতে পারেন নিবেদিতা, কিন্তু অভিমানী হননি। অভিমান প্রকাশ করেছেন একমাত্র স্বামীজির ক্ষেত্রেই। এতে এটুকু অন্তত প্রমাণ হয়, তাঁর অন্তরে অনুরাগ, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় স্বামীজির স্থানটি ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। সে স্থান তিনি আর কাউকেই কোনোদিন দেননি।

নিবেদিতার স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি নিয়ে জাহাজযাত্রার সময়ও স্বামীজি সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন তা-ও জানা যায় নিবেদিতার লেখা থেকে। পাশ্চাত্যে গিয়েও নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঠিকমতো সংগ্রহ করতে পারবেন কিনা—এই চিন্তা স্বামীজিকে সব সময়ই তাড়িত করত। ১৮৯৯-এর ২১ জুলাই-এর চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'He said this morning something that touched me far deeper than a long speech. 'Do you think, Morgot, that you can collect the money you want in the West!' 'I don't think Swami– I know'–I said

'I hope so'–he said, 'there were two things that I wanted to see before my death–One is done and this is the rest.'

২০ জুন কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে ৩১ জুলাই লন্ডনের টিলবুরি ডকে এসে পৌঁছল গোলকুন্ডা জাহাজ। কলকাতা থেকে লন্ডনে পৌঁছতে স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীদের লেগেছিল ৪২ দিন। টিলবুরি ডকে স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান স্বামীজির বেশ কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য এবং বন্ধুবান্ধব। এর ভিতর ছিলেন ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেল, পরবর্তীকালের সিস্টার ক্রিস্টিন এবং শ্রীমতী ফুংক। ক্রিস্টিন ডেট্রয়েট থেকে লন্ডনে এসেছিলেন স্বামীজির সঙ্গে মিলিত হতে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, লন্ডনে পৌঁছে স্বামীজি প্রথম ওঠেন উইম্বলডনের ২১ হাইস্ট্রিট ঠিকানায় নিবেদিতার বাড়িতে। কিন্তু এ তথ্য বোধহয় ঠিক নয়। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, উইম্বলডনের নোব্‌ল পরিবারের বাড়িটি ছিল ছোট। কাজেই কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে স্বামীজির থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন নিবেদিতার বোন মেরি। বাকিংহামশায়ারের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার-সূত্রে জানা যায়, লন্ডনে পৌঁছে প্রথম দিনটি স্বামীজি কাটিয়েছিলেন মধ্য লন্ডনে। এর পর নোব্‌ল পরিবারের বাসগৃহের কাছেই ৩৫ উডসাইড ঠিকানায় 'দ্য লাইমস' নামে একটি লজে স্বামীজির থাকার ব্যবস্থা

করেছিলেন মেরি। এই লজটি নোব্‌ল পরিবারের বাসগৃহ থেকে হাঁটাপথে ১৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে অবশ্য এই ঠিকানায় এই লজটি নেই। অন্য বাড়ি উঠেছে।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের এই তথ্যটিই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, নিবেদিতার চিঠিতে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। লন্ডনে পৌঁছনোর পর ৩ আগস্ট ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন, 'We arrived on Monday morning, met an unearthly hours by mother, Nim, Miss Patson, and the two American ladies Mrs. Funki and Miss Greenstidel [Sister Christine].

'The King spent Monday in Town with these friends, meaning to take rooms near these friends. But he turned up here early on Tuesday morning thinking Wimbledon best after all, and already the family have had 2 huge talks. Nim seems to please him, and he likes Rich (Richmond).

'Nim found him lovely rooms, near the station, but in green and quiteness. They cost 35/- a week–which I hope Mr. Sturdy will not think too much and I buy food for him and mean to send in the account to Mr Sturdy. While here I trust men will come to him. But meantime he says he is in perfect peace.'

নিবেদিতার চিঠিটি পড়ে জানা যাচ্ছে, শুধু ক্রিস্টিন নন, নিবেদিতার মা এবং বোনও সেদিন জাহাজঘাটায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি যদিও প্রথমদিকে ভেবেছিলেন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছাকাছিই তিনি থাকবেন, পরে অবশ্য মত পরিবর্তন করে উইম্বলডনে চলে আসেন এবং উইম্বলডনের শান্ত পরিবেশে থাকতে যে তাঁর ভালো লেগেছিল—তা-ও নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যাচ্ছে। স্বামীজির তৃতীয়বারের লন্ডন অবস্থানকালে খরচ এডওয়ার্ড স্টার্ডিই বহন করবেন এরকমই ঠিক হয়েছিল। অন্তত নিবেদিতার চিঠি পড়ে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু, স্বামীজি চাননি স্টার্ডি তাঁর এই লন্ডনবাসের খরচ বহন করুন। কারণ, ততদিনে স্টার্ডি স্বামীজির বিরোধিতা শুরু করেছেন। সে সংবাদ নিশ্চয়ই স্বামীজির কাছেও পৌঁছেছিল এবং স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন, স্টার্ডি এবারও যদি লন্ডনবাসের খরচ বহন করেন, তবে তা তাঁর পক্ষেও অস্বস্তিকর হবে। নিবেদিতা ওই চিঠিতেই লিখেছেন, ' As to the criticism of expenditure. It makes me ill. I knew there was a flaw in that crystal. But how much easier to face a situation that one understands. For Swamiji to be himself is the same as the shining of the Sun. It is enough in itself, without consequences.

'One thing I can see. He is letting things drift just now–but I can see he will NOT allow ETS (ET STURDY) to manage him this time!'

উইম্বলডনে থাকার সময় নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড নোব্‌লের সঙ্গে স্বামীজির যে যথেষ্ট হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং রিচমন্ড স্বামীজির অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন তা বোঝা যায় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত রিচমন্ডের একটি লেখায়। রিচমন্ড লিখছেন, 'That my sister (Nivedita) should have obeyed his call was nothing wonderful, for I myself saw Swamiji, and I know his power, One had only to see and to hear Swamiji, and to say to oneself, 'behold the man'! One knew he spoke truth, for he spoke with authority, and not merely as a scholar or as a priest. Swamiji brought certainly with him, he gave assurance and confidence to the inquirer. This I think was what he did for my sister, and it was the certainty which led her to obey the call fearlessly, and once having obeyed without hesitation she never had caused to regret.'

এই উইম্বলডনে থাকার সময়েই স্বামীজি রোজ তাঁর লজ থেকে হেঁটে আসতেন নোব্‌ল পরিবারের বাড়িতে। নোব্‌ল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নানারকম আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজবে কিছুটা সময় কাটাতেন তিনি। ওই সময়ের একটি মজার ঘটনার কথাও জানা যায়। রিচমন্ড একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজিকে বলেন, নিবেদিতা তাঁদের মতো একটি আইরিশ পরিবারের ওপর হিন্দু রীতি-নীতি চাপিয়ে দিচ্ছেন। এমনকী বাড়িতে গোমাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। একথা শুনে স্বামীজি হেসে বলেছিলেন, নিবেদিতা ওর হাতে আইন তুলে নিয়েছে, তাই তো? এর কদিন পরে স্বামীজি রিচমন্ডকে একটি হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে যান এবং রিচমন্ডের জন্য গোমাংসের অর্ডার দেন। রিচমন্ড অবাক হলে স্বামীজি বলেছিলেন, 'নিবেদিতা তোমার কাছ থেকে যা কেড়ে নিয়েছে, আমি তোমাকে তাই ফিরিয়ে দিলাম।'

স্বামীজি তৃতীয়বার লন্ডনে অবস্থান করাকালীনই সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ হয়। স্বামীজি উইম্বলডনের থাকার সময় ক্রিস্টিন রোজই স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সেই সময়ই নোব্‌ল পরিবারের বাসগৃহের আড্ডায় ক্রিস্টিনও মাঝেমাঝেই যোগদান করতেন। ক্রিস্টিনের জন্ম জার্মানিতে। পূর্বনাম ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেল। তিন বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে চলে আসেন আমেরিকায়। ডেট্রয়েটে বসবাস করতে থাকেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে পিতার অকাল প্রয়াণ ঘটে। মা এবং পাঁচ বোনের সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ে ক্রিস্টিনের কাঁধে। শিক্ষকতাকেই পেশা করে নেন তিনি। ১৮৯৪ সালে ডেট্রয়েটে স্বামীজির বক্তৃতা শুনে অভিভূত হন ক্রিস্টিন। স্বামীজিকেই পথ প্রদর্শক ও গুরু হিসাবে মেনে নেন। ১৮৯৫

সালে আমেরিকার থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে অবস্থানকালে স্বামীজি তাঁকে দীক্ষা দেন। ক্রিস্টিন স্বভাবে ছিলেন নিবেদিতার একদম বিপরীত। শান্ত, মৃদুভাষী ক্রিস্টিনও যে ভারতের কাজে লাগবেন তা স্বামীজি বুঝেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর এবং স্বামীজির আহ্বানে ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে ক্রিস্টিন কলকাতায় আসেন। নিবেদিতার সঙ্গে যৌথভাবে মেয়েদের স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতা রাজনৈতিক কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ক্রিস্টিনই স্কুল চালানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পরও ক্রিস্টিন এই স্কুলের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। ক্রিস্টিনের প্রতি স্বামীজির বিশেষ স্নেহ ছিল। ক্রিস্টিনকে চিঠি লেখার জন্য ফরাসি ভাষাও শিখেছিলেন স্বামীজি। জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও সুন্দর সম্পর্ক ছিল ক্রিস্টিনের। দুজনেই ক্রিস্টিনকে অতিশয় পছন্দ করতেন।

এইবার লন্ডনে অবস্থান করার সময়েই স্বামীজি তাঁর সন্ন্যাসী জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিনকে। পরিব্রাজক জীবনে হৃষিকেশ ঘোরার সময় তিনি কীভাবে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং কীরকম অলৌকিকভাবে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন সে অভিজ্ঞতার কথাও নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিনকে শুনিয়েছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতা লিখছেন (৩ আগস্ট ১৮৯৯), 'the other night with Mrs F. (Funki) and Miss G. (Greenstidel) he told me such wonderful things! He used to go in to Samadhi, not knowing that it was, when he was a little boy of 8! And I asked him about dying, he had told me that he knew what it was like– and he said–

'Twelve or fifteen years ago, in a little hut on the side of a mountain (in Hresikes) was Turiananda and Saradananda, and I. I was very ill with fever and I was sinking and sinking gradually and then, there came a moment when I was cold up to my shoulders, and then I died away–and away...and away... and then I revived gradually. I had something to do... when I came back Turiananda was reading Chandi (about the Mother, a Puran) and Saradananda was weeping.'

'And I was talking to Turiananda about it, and he said it was a miraculous cure.'

'The night was dark and stormy, and at that awful moment when it seemed that He had gone, came a sanyasin outside the door, saying in a loud voice— "Fear not brother" and he entered in and looked at Swami and said he knew a certain medicine that would cure him and where it could be got. But it was far to go, and even as Turiananda was hesitating about leaving Him (for S. was sleeping, to be ready for his turn at watching) came another monk–who volunteered to go

and bring it. He went and came and Turiananda gave the drug, and 5 minutes later death gave place to life–and He was there once more...'

স্বামীজি অবশ্য বেশিদিন লন্ডনে থাকতে পারেননি। ১৬ আগস্ট স্বামীজি তুরীয়ানন্দ, ক্রিস্টিন এবং শ্রীমতী ফুংককে নিয়ে নিউইয়র্কের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। নিবেদিতা তাঁর বোনের বিয়ে উপলক্ষে লন্ডনে থেকে যান। যদিও স্বামীজি চাইলে তিনি যে তাঁর সঙ্গে নিউইয়র্কে যেতে প্রস্তুত আছেন—তা নিবেদিতা জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল, তা ১২ আগস্ট, ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়:

'He asked me yesterday – when can you be ready for America?
-As soon as you like Swami.
-What ? Not even stay and see the sister married?
-Oh yes, I think I ought to do that – Don't you?
-Yes, Another month– isn't it?
-But, Swami, let me book the births!
-I think we ought to wait to hear again from Y (Yum/ Josephine) and Mrs. bull that we are really wanted?'

মোটামুটি ঠিক হয় বোনের বিয়ে মেটার পর এবং আরো কিছু পারিবারিক কাজ শেষ করে সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা আমেরিকা যাত্রা করবেন। ২৩ আগস্ট, ১৮৯৯-এ স্বামীজিকে একটি চিঠিতে সে কথা নিবেদিতা জানাচ্ছেনও, 'I leave Glasgow or Liverpool (whereever I get a ticket) Sept. 7th and may have to take a night train after the wedding to do it. I expect to learn my fate tomorrow– but if I carry out my plans, I shall arrive in New York about the 17th on the Mongolian of the Allan Line.'

এই সময়েই আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। স্বামীজির এই তৃতীয়বার লন্ডনে অবস্থানকালে স্টার্ডি, অ্যাশটন জনসন এবং আঁরিয়েতা মুলার—এই তিনজন স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। বরং, এঁরা স্বামীজি লন্ডন ছাড়ার পরই তাঁর সমালোচনা করতে শুরু করেন। শ্রীমতী জনসন এবং শ্রীমতী মুলার বলতে থাকেন —কোনো আধ্যাত্মিক মানুষ শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হবেন কেন? স্টার্ডি স্বামীজি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, তাঁরা বিলেতে এসে যে প্রাচুর্যের ভিতর দিন কাটিয়েছেন তা সন্ন্যাসীদের মানায় না। স্টার্ডির এইসব অভিযোগের জবাব স্বামীজি দিয়েছিলেন। স্বামীজির সেই চিঠির কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এডওয়ার্ড স্টার্ডি, অ্যাশটন জনসন এবং আঁরিয়েতা মুলারের এই ধরনের কথাবার্তা নিবেদিতাকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করে তোলে। এসব কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন নিবেদিতা। স্টার্ডির সঙ্গে তাঁর তুমুল পত্রযুদ্ধ শুরু হয়। ২৫ আগস্ট ১৮৯৯ তারিখে স্টার্ডি নিবেদিতাকে লেখেন,

'I have neither the intention nor the inclination to enter into a long paper discussion, or in words, as to Vivekananda's or any or all of the Swami's characters.

'I may merely add this, everyone must form his own ideal, and work with those who conform to it; with those who do not, association will naturally be so close. I have formed my own idea of the life of Renunciation, and although I am not able to lead it myself, I still hope to see others who profess Sanyasa who may approximate to it.

'It is only because you seem to think I shared your unreasoning enthusiasm that I wrote you. It may be quite right for you, but I alone must decide upon the atitude I take, and the opinions on which the attitude is based. I have found that appeals to loyalty are generally appeals to fanaticism, at the same time spoiling and making tyrants of those who by mere discerning methods would have acted differently. I have not set up any Gods for myself, and have none to throw down. If you have set up a God or Gods, it is quite right that you should be loyal. My loyaty is to my ideal; if shifting personalities do not conform to it, where is the loyalty ? To them, with whose methods I do not agree, or, to the ideal, which perhaps wrongly I thought we held in common?

'I have let you know that on some points there is difference between Swami and me. It now remains for him and me to settle this, not you and me.'

এর আগে ২৪ আগস্ট একটি চিঠিতে নিবেদিতা স্টার্ডিকে লিখেছিলেন, 'You will remember that in India the word 'Sanyasa' applies specially to one sort of asceticism, that is, to purity. Now I will ask you 'Have you ever found this asceticism to be untrue?' I have found that such as he is in this respect such are, in their degree, all the Gurubhais and all his monastic disciples. I know many of them very intimately, as you are aware, and most of them a little, and of all this is true.

'Another thing, in speaking of him in connection with this question of renunciation, do not forget that you are speaking of a man who might be worshipped today from one end of India to the other, and he will not, of a man who fled from fame year after year; of a man who snaps his fingers at all the rich people of his own city today to their infinite chagrin, and insists on living the life of his humblest fellow-countryman, though his knowledge an appreciation of the luxuries of Western luxury is not only greater than that of rich Hindus,

but for surpassing my own and yours, could you do these things? It is just that, this Renunciation is positive, active, overwhelming!

'If I, standing up a little with a yard measure or a foot rule declare that the great roar of the ocean beyond is nothing, since it sweeps on past the headlands, and does not invade my little domain to be measured by my little stick, I think I shall have nothing but my own folly for my pains. But I hold no belief in the matter, I do not know your grounds of criticism, and I fell to see the importance of the thing. The life of the disciples of Sri Ram Krishna in their own country has not struck me, so far as I have seen it, as it has done you. I have thought it anything but self indulgent, but after all, that is a matter of opinion; I don't see that anything depends on it.

'One thing, however, I do know, Swamiji is the one person to whom these things should be said. There is no need to ponder how to make them known. Do believe for one moment in the greatness of the man, and trust all your criticisms, all your reproaches, to him himself.'

স্টার্ডির সঙ্গে বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল নিবেদিতার। শেষ পর্যন্ত দুজনের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল। স্টার্ডির এই বিরুদ্ধাচরণ নিবেদিতাকে সত্যিই যন্ত্রণা দিয়েছিল। সেটা বুঝেছিলেন স্বামীজিও। আমেরিকা থেকে স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, 'জগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি, যদিও বা এর প্রতিকার সম্ভব হয়, তবু তা না হওয়া অবধি, ভাবী বহু যুগ পর্যন্ত এ জগতে ব্যাপারটা অন্ততঃ একটা স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখ যন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশি যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলি প্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।'

২৬ আগস্ট স্বামীজি তুরীয়ানন্দকে সঙ্গী করে নিউইউর্কের দিকে যাত্রা করলেন। নিবেদিতা থেকে গেলেন লন্ডনে। নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায়, বোন মেরির বিয়ে হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯। নিবেদিতার পরিকল্পনাটি কী ছিল তা-ও জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা ১ সেপ্টেম্বরের চিঠি থেকে জানা যায়। নিবেদিতা লিখছেন, 'Wednesday is Nim's wedding day, 2 O'clock p.m and that night at 10 to midnight I leave for Glasgow having to be on board the S.S. Mongolian nextday at noon.'

অর্থাৎ, বোনের বিয়ে মিটে যাওয়ার পর নিবেদিতা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। ওইদিন রাতেই গ্লাসগো রওয়ানা হওয়ার পরিকল্পনা

করেছিলেন। পরদিন গ্লাসগো থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশে জাহাজ ধরবেন— এরকমই ঠিক ছিল।

লিজেল রেমঁর লেখা থেকে নিবেদিতার বোনের বিয়ের দিনের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায়। রেমঁ লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন এসে পড়ল। অচেনা সব জ্ঞাতি ভাই-বোনেদের নিয়ে আয়ার্ল্যান্ড থেকে আত্মীয়-কুটুম্বরা এলেন। ফুলে ফুলে বাড়ি ছেয়ে গেছে, মে-কে যে কী সুন্দর লাগছে, মুখে তার সুখের আভা। এক কাকা সম্প্রদান করলেন। বর-কনে যখন চলে যাচ্ছে, তখন গোলাপ আর লিলির পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হল তাদের মাথার উপর। সাদা আলপাকার পোশাকে নিবেদিতা সেজেছেন নিতকনে। হুডের উপর ফুলের গুচ্ছ আর ওড়না, তার আড়ালে ঝিকমিক করছে তাঁর দুটি চোখ। অভিনয় করে যাচ্ছেন চমৎকার, মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে করমর্দন করছেন সবার সঙ্গে।'

নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায়, বোনের বিয়েতে সাজবার জন্য তাঁকে পোশাক পাঠিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। ৩ আগস্ট, ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিনকে চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The frocks you have sent are divine. What a Mother you are? But will you explain to your family that I am to apear in your costumes?' আবার ১৭ অগস্ট লিখছেন, 'Your frocks are LOVELY especially the white–which I am to wear at the wedding. The box is also lovely–you are the best of Mothers.'

তবে বিয়ে মিটতেই নিবেদিতার নিউইয়র্ক যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। রেমঁ লিখেছেন, 'কিন্তু নবদম্পতী চলে যেতে নিবেদিতা পোশাক ছেড়ে ভাঁজ করে বাক্সে তুললেন। বাক্সের ডালার উপর মিস্ ম্যাকলিয়ড (পোশাকটা তাঁরই দেওয়া) লিখে দিয়েছিলেন, 'সুন্দর করে সাজবে। তোমার লাবণ্য আর জুলুস দেখলেই না লোকে তোমার সঙ্গে আলাপ করবে, তোমার মুখে স্বামীজির কথা শুনবে।' নিবেদিতা পড়ে হেসেছেন। বন্ধুর কথা রেখেছেন, কিন্তু এবার যেতে হবে। তাঁর জীবন সেবাব্রতে দীক্ষিত।

'সেই রাত্রিতেই স্কটল্যান্ডের ট্রেন ধরলেন। ওখান থেকে জাহাজে চড়বেন।

'মায়ের বিলাপে কান দেন না, নিজের 'পরে কঠিন হয়ে মনে মনে জপতে থাকেন, 'আর কোন কাজের দায় আমার নাই, এখন শুধু বিশ্ব-মায়ের কাজের কথাই ভাবব।'

'গুরুর কাছে পাঠান ছোট্ট একটি বার্তা ঃ লড়াই-এর জন্য অধীর হয়ে উঠেছি।'

একুশ

আমেরিকায় ফ্রান্সিস লেগেটের রিজলি ম্যানরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি। ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন অতিশয় ধনী ব্যক্তি। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের ভাই। পূর্বে আমেরিকা ভ্রমণের সময়েই ফ্রান্সিস লেগেটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল স্বামীজির। ফ্রান্সিস লেগেট এবং শ্রীমতী লেগেটও স্বামীজির অনুরাগী ছিলেন। নিউ জার্সি থেকে কিংসটন হয়ে রিজলি এস্টেটে এসে পৌঁছলেন স্বামীজি। পঞ্চাশ একর জমির ওপর অনেকগুলি প্রাসাদোপম বাড়ি নিয়ে ফ্রান্সিস লেগেটের রিজলি ম্যানর গড়ে উঠেছিল। কোনো বাড়ির নাম ছিল দ্য ইন, কোনোটা ছিল কটেজ, কোনোটা লিটল কটেজ। এমনকী একটি 'ক্যাসিনো'-ও ছিল। স্বামীজি এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ সেখানে পৌঁছনোর পর স্বামী অভেদানন্দও কিছুদিন এসে কাটিয়ে গেলেন তাঁদের সঙ্গে। স্বামীজির সান্নিধ্য লাভের জন্য তখন রিজলি ম্যানরে অবস্থান করেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। কন্যা ওলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সারা বুল। ২০ সেপ্টেম্বর নিবেদিতাও গিয়ে পৌঁছলেন রিজলি ম্যানরে।

কিন্তু সমুদ্রযাত্রার সময় সাময়িকভাবে সুস্থতা বোধ করলেও স্বামীজির শরীর তখন আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। স্বামীজির শরীর যে ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ছে, তা তাঁর অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ শিষ্যরা বুঝতে পারছিলেন। ওই সময়েই এক প্রখ্যাত অস্টিওপ্যাথের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতাও অনেকদিন পরে একত্রিত হলেন। ১৮৯৮-এ স্বামীজির সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণের পর আবার এই তিন বিদেশিনী শিষ্যা একত্রিত হলেন। রিজলি ম্যানরে আসার আগে অবশ্য নিউ ইয়র্কে অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নিবেদিতার। ভারতে নিবেদিতার কাজকর্ম সম্পর্কে অভেদানন্দ এর আগেই নিউ ইয়র্কের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রচার চালিয়েছিলেন। নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির সদস্যরাও অভেদানন্দের দৌলতে নিবেদিতার কাজকর্ম সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। 'ব্রহ্মবাদিন'

পত্রিকায় ১৮৯৯ সালের জুন মাসে নিবেদিতা সম্পর্কে একটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাটি নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির সদস্যদের নিবেদিতা সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছিল। 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'The greatest interest attached to accounts of Swami Vivekananda, Swami Saradananda and the Sister Nivedita, her school work arousing much sympathy. Already a few friends are planning what money help they can give to this practical expression of a Western woman's devotion to the children of the East. It may not be amiss here for a disinterested American to say to such friends in the West as may read this letter, that during the past year the Sister Nivedita (Miss Noble of England), a young woman highly accomplished and trained, has founded and carried on a school for Hindu children, the idea being to teach the practical useful arts of the West as a help-toward better every day living in the East. Giving her life freely, the work has gone on in the face of poverty of the people and of uncertain and meagre support. This gifted and consecrated teacher and her little flock of some thirty pupils, are housed at 16 Bosepara Lane, Baghbazar, Calcutta.

'Miss Nobel became a student of Vedanta in England during Swami Vivekananda's visit there, and was made a Brahmacharini by him in India. To students of Vedanta who are profoundly grateful for the blessing India has brought to the West in her spiritual teachers, this school affords an easy opportunity for a practical expression of gratitude and love in financial support.'

'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখাটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, নিবেদিতার স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই লেখাটি প্রকাশ করা হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে, ১৮৯৯-এর জুন মাসে স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন নিবেদিতা পাশ্চাত্যে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন পরিকল্পনামাফিকই লেখাটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

নিবেদিতার দুই জীবনীকার প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, রিজলি ম্যানরের বিলাসবহুল আবাসে নিছক বিশ্রাম নেওয়া বা ছুটি কাটানো নিবেদিতার পছন্দ হচ্ছিল না। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন, রিজলি ম্যানরের যে সামাজিক অবস্থান তার সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না নিবেদিতা। তিনি এসেছেন একটি বিশেষ কাজে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। নিছক সময় না কাটিয়ে তাঁকে ওই কাজ করতে হবে। তদুপরি, তিনি ব্রহ্মচারিণী। রিজলি ম্যানরের বিলাস এবং আড়ম্বর থেকে তাঁর দূরে থাকাই উচিত বলে মনে

করতেন তিনি। যে কারণে স্বামীজিকে তিনি বললেন, তিনি রিজলি ম্যানরে না থেকে কাছেই একটি ছোট কুটিরে থাকবেন এবং সাদা পোশাক পরবেন। স্বামীজি তাতে সম্মতি দিলেন। তবে এই কুটিরে অবস্থান করলেও রোজ তিনি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এই কুটিরে অবস্থানকালেই নিবেদিতা 'কালী দ্য মাদার' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থখানি লিখতে আরম্ভ করেন। এইখানে থাকার সময়েই একদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে আসার সময় স্বামীজি তাঁকে 'The Peace' নামক একটি কবিতা লিখে উপহার দেন। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখছেন, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ তারিখে স্বামীজি ওই কবিতাটি লিখে উপহার দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। কবিতাটি এইরকম—

'Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music;
And pause in sacred art;
The silence between speaking;
Between two fits of passion—
It is the calm of heart.

It is beauty never seen,
And love that stands alone,
It is song that lives unsung
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear-drop goes,
To Spread the smiling form
It is the Goal of Life,
And peace—its only home!

রিজলি ম্যানরে থাকাকালীন স্বামীজির শরীর তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো হয়ে উঠলেও, পুরোপুরি সুস্থ তিনি হচ্ছিলেন না। যখনই শরীর একটু ভালো থাকত নানারকম কর্ম পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তিনি। স্বামীজিও চাইছিলেন, নিবেদিতা আর বেশি সময় নষ্ট না করে দ্রুত কাজে নেমে পড়ুন। নিবেদিতার লেখা থেকেই জানা যায় ৫ নভেম্বর ১৮৯৯, রবিবার সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বসে স্বামীজি বেশ কঠোর ভাষাতেই নিবেদিতাকে বললেন এভাবে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়তে। এই সময় জোসেফিন ম্যাকলিয়ড রিজলি ম্যানরে ছিলেন না ১১ নভেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে সেই ঘটনা জানাচ্ছেন নিবেদিতা। লিখছেন, 'On Sunday morning after the breakfast the volcano burst. He turned on me before everyone and asked how much longer I intended to hang on. He was quite abusive— and then he uttered a relenting ward—you know how. I said I liked to know how deeply he meant it, so there was a use in his harshness— but otherwise it was needless, for I had been only too anxious to be at work long ago, and had been kept where I was by his express instructions. I think he saw that it was so— and Olea turning to leave the room— invited me to join Alberta and herself on the journey to Chicago, They had a place too many. Swami ruled that I was to accept this invitation— then he waxed glorious. বোঝাই যাচ্ছে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সকলের সামনে নিবেদিতাকে তিরস্কার করেছিলেন স্বামীজি। কিন্তু এই তিরস্কারের পরে স্বামীজি আর্শীবাণীই দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। বলেছিলেন, বিশ্ব জয় করে আসতে। আসলে নিবেদিতা জানতেন, স্বামীজির তখন একটাই চাওয়া ছিল। যে কাজ তিনি শুরু করতে চাইছেন, সে আরব্ধ কাজ যেন তিনি তাঁর বাকি জীবদ্দশাতেই দেখে যেতে পারেন। কারণ, স্বামীজির শরীর তখন দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। জোসেফিনকে ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, '...If he had my health and strength he would conquer the world. I was a Kshatriya. Did I know that I belonged to his family? I was not a Brahmin. Austerity was the path and so on... it was tremendous— and he ended with a blessing in which the Guru was lost and it became all Father— as he told me to go out into the world and fight for him— the only thing he now wanted—before he could pass away form the world, into peace or death.'

যেদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে স্বামীজি নিবেদিতাকে তিরস্কার করেছিলেন, সেদিন বিকেলেই একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। বিকেলে স্বামীজি নিবেদিতাকে তাঁর ঘরে ডাকেন জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্য। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে গিয়ে স্বামীজি দুটো গেরুয়া সুতির কাপড় বের করেন। ওই কাপড় দুটি নিয়ে তিনি নিবেদিতার ঘরে যান। নিবেদিতার ঘরে তখন সারা বুল বসে লেখালেখি করছিলেন। নিবেদিতাকেও ওই ঘরে ডেকে পাঠান স্বামীজি। পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শ্রীমতী বুলের গায়ে গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড জড়িয়ে দেন। তাঁকে সন্ন্যাসিনী বলে সম্বোধন করেন। পরে নিবেদিতা এবং সারা বুলের মাথায় হাত রেখে স্বামীজি বলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি সেসব আজ তোমাদের দুজনকে দিয়ে দিলাম। নিজেকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি জানি না, কাল আমি কী করব। সব কাজ পণ্ড করে ফেলব কিনা। মায়ের কাছ থেকে যা (শক্তি) এসেছে, তা নারীদের হাতে থাকাই উপযুক্ত। আমি জানি না মা কে। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁকে দেখেছেন। তাঁকে ছুঁয়েছেন। আমি তোমাদের ওপর সব ভার চাপিয়ে শান্তির ভিতর চলে যেতে চাইছি।'

এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নিবেদিতা জোসেফিনকে ১১ নভেম্বরের চিঠিতে লিখছেন, 'On Sunday afternoon Swami insisted on my coming and packing with him, and as I worked he took out a couple of silk turbans to give the girls. Then two peices of cotton cloth—gerrua colour—for Mrs.Bull. He called me to my roon, where Mrs. Bull sat writing, to give these— and left the turbans on one side.

'First he shut the door—then he arranged the cloth as a skirt and chudder round her waist— then he called her a Sanyasini and putting one hand on her head and one on mine he said, 'I give you all that Ramakrishna P. gave to me. What came to us from a Woman I give to you two women. Do what you can with it. I can not trust myself. I do not know what I might do tomorrow and ruin the work. Women's hands will be the best anyway to hold what came from a Woman—from Mother. Who and what she is, I do not know, I have never seen Her, but Ramakrishna P. saw Her and touched Her—like this (touching my sleeve). She may be a great disembodied spirit for all I know. Anyway cast the load on you. I am going away to be at peace. I felt nearly mad this morning and I was thinking and thinking what I could do—when I went to my room to sleep before lunch. And then I thought of this and I was so glad. It is like a release. I have borne it all this time, and now I have given it up...'

নিবেদিতার লেখার এই অংশটি পড়লে এরকমই একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে, স্বামীজি কি তখন থেকেই নিজেকে সব কিছু থেকেই সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে ফেলতে চাইছিলেন। কেননা, রিজলি ম্যানর থেকে নিউইয়র্কে চলে আসার পর ১৮৯৯-র ১৫ নভেম্বর সারা বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'ভারতে লেখা আপনার চিঠিপত্রে পরোক্ষভাবেও আমার সম্বন্ধে যেন কোন সংবাদ না থাকে—আপনার কাছে শুধু এইটি চাই; কিন্তু পাব কিনা সে বিষয়ে আমার আশঙ্কা আছে। কিছু সময়ের জন্য অথবা চিরদিনের মতো আমি গা ঢাকা দিতে চাই। অভিশপ্ত হোক আমার প্রসিদ্ধির দিনটি।' চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, ওই সময় স্বামীজি সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে একটু অন্তরালে চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু কেন এরকম চেয়েছিলেন স্বামীজি? তা কি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণেই? ওইদিনই নিজের শারীরিক সংবাদ জানিয়ে নিবেদিতাকে লিখেছেন, '...মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। এ জাতীয় স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কখনো বা মহাসঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কখনো বা অন্ধকারে কেঁদে মরে।' স্বামীজির এই চিঠিটি পড়লে বোঝা যায়—তাঁর শরীর তখন কখনো ভালো, কখনো খারাপ যাচ্ছিল। কাজেই, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজেকে সব কিছু থেকে বিযুক্ত করতে চাইছিলেন— পুরোটা বোধহয় তা নয়। স্বামীজি কেন যে নিজেকে বিযুক্ত করতে চাইছিলেন—কী ছিল তার গূঢ় কারণ—তা কিন্তু তিনি নিজেও প্রকাশ করেননি।

রিজলি এস্টেটের একটি নিভৃত কুটিরে নিবেদিতা যখন তাঁর 'কালী দ্য মাদার' গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত তখন এক রাতে স্বামীজি তাঁর কুটিরে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। প্রায় একঘন্টা নিবেদিতার সঙ্গে কাটিয়েওছিলেন স্বামীজি। তাঁকে কালী সম্পর্কে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। ২৭ অক্টোবর, ১৮৯৯ তারিখে নিবেদিতা লিখছেন, 'Swami came in and blessed me on Sunday night, while I was still in retreat. He stayed about an hour, and told me how it was Sri Ramakrishna's firm belief that every great Incarnation either in public or in secret had been a worshiper of Mother. 'Or how could he have got the Energy?' Siva and Kali had had to be their worships. Then he talked about the Ramayana.'

রিজলি ম্যানরের এই দিনগুলি সম্পর্কে নিবেদিতা জানিয়েছেন, স্বামীজি অচেনা মানুষদের সঙ্গে এখানে খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না। বরং, নিজের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে থাকলেই তিনি সহজ বোধ করতেন। নিবেদিতা লিখেছেন, ' Mrs. Bull has a clever way of making all her guests intimate with each other, but the result is that Swami does not seem to have the whole stage as he had at Ridgely. And he shrinks from strangers in this way. Yesterday,

Mrs. Leggett, Mrs. Bull and I were together and he came with such relief, 'Ah- how lovely— there's no one here! Let's have a chat!'

৩ নভেম্বর ১৮৯৯, দুপুরে স্বামীজি রিজলি ম্যানর ত্যাগ করলেন। নিউইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। শরীর খারাপ, তবু স্বামীজি ঠিক করেছিলেন, বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আবার আমেরিকায় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেবেন। আরো একটি উদ্দেশ্য অবশ্য স্বামীজির ছিল; তা হল, মঠের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। কারণ, মঠ তখনো অর্থ সংকটে ভুগছে। স্বামীজি নিউইয়র্কের দিকে রওয়ানা হওয়ার কিছুদিন পরে, ৯ নভেম্বর নিবেদিতাও রওয়ানা দিলেন চিকাগোর দিকে। সঙ্গী সারা বুলের কন্যা ওলিয়া। চিকাগো শহরে নিবেদিতার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হাল হাউসে। জেন অ্যাডামস নামক এক সমাজকর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি চালাতেন। এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বাড়িটিতে যেমন ধনীদের জন্য বিলাসবহুল ঘর ছিল, তেমনিই সাধারণ মানুষের উপযোগী থাকার ব্যবস্থাও ছিল। ফলে, রিজলি ম্যানরের সামাজিক পরিবেশের থেকে এখানে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলেন নিবেদিতা। এখানে আরো একটি সুবিধাও নিবেদিতার হয়েছিল, বিভিন্ন দেশের মানুষরা এই বাড়িটিতে আসতেন। ফলে, এখানে তাঁদের সংস্পর্শে এসে নিজের মত প্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে। আর নিবেদিতা তা চাইছিলেনও। কারণ, নিবেদিতার উদ্দেশ্যই ছিল বক্তৃতার মাধ্যমে স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। সে কাজে তিনি খুব একটা দেরি করতে চাইছিলেন না।

চিকাগো শহরেই নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল হেল পরিবারের। চিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগ দিতে এসে স্বামীজি যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন হেল পরিবারের গৃহকর্ত্রী এলেন হেলই স্বামীজিকে আশ্রয় দেন। চিকাগো বিশ্বধর্মসম্মলনে এলেন হেলই স্বামীজিকে পৌঁছে দেন। পূর্বে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হেল পরিবারকে স্বামীজি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আমেরিকার বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে হেল দম্পতির গৃহে স্বামীজি এসে বিশ্রাম নিতেন। এলেন হেলের দুটি কন্যা মেরি এবং হ্যারিয়েটও স্বামীজির ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। হেল পরিবার নিবেদিতাকে খুবই সাদরে গ্রহণ করেছিল। মেরি হেল নিবেদিতাকে পিসি (Aunt) বলে সম্বোধন করতেন।

হেল পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হওয়ার কথা এবং মেরি হেল যে তাঁকে 'মডার্ন ইন্ডিয়া' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, তা সারা বুলকে একটি চিঠিতে (১০.৯.১৮৯৯) লিখে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। লিখেছিলেন, 'Miss Mary Hale and her married sister did come to lunch— and hung on every word we could tell them about Swami and India. Old Mr. Hale is very ill at present but when that strain is

lessened they will work with and for us heart and soul. Meanwhile Miss Mary Hale hopes to take me next week to the Friday Club to join in the debate that follows a paper on Modern India!!!'

চিকাগো শহরে নিবেদিতা তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুরু করলেন একটি প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুলে বাচ্চাদের সামনে ভারত সম্পর্কে শিক্ষামূলক বক্তব্য রেখে। তারিখটি ছিল ১৬ নভেম্বর ১৮৯৯। তার পর দিন, অর্থাৎ ১৭ তারিখে মিশনারির বোর্ডের অনুরোধে 'ভারতে নারীদের অবস্থা' বিষয়ক একটি বক্তৃতা দেন। ওইদিনই সন্ধেবেলায় মেরি হেলের সঙ্গে ফ্রাইডে ক্লাবে গিয়ে আধুনিক ভারত সক্রান্ত একটি আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন। ২০ তারিখে হাল হাউসে নিবেদিতার জন্য ভারতের ধর্মজীবন সংক্রান্ত একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। স্বামীজির সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণকালে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রসঙ্গ এই বক্তৃতায় উপস্থাপনা করেন নিবেদিতা। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে এই বক্তৃতাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

১৬ নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'I am to spend the afternoon in an elementary school, telling the children about India. One is going, now, like a man blind folded, guiding himself through a labyrinth by a silken thread. I can not tell where the usefulness of things may come in —my business is only to do them as they come— and this is the first. I mean to tell the little-ones about the Christ-child and then on to the Indian Christ-child-Dhruva-Prahlad, Gopala. And to the big ones I want to give a geography lesson, a little American patriotism for a start and then on to India— the Ganges—Agra—the Taj and the Fort.'

বোর্ড অফ মিশনারিজের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজে থেকে কোনো উদ্যোগ যে নেননি চিঠিতে তা-ও জানিয়েছেন নিবেদিতা। মেরি হেল যে তাঁকে কার্যত জোর করেই ধরে নিয়ে যান, সে রকম ইঙ্গিতই চিঠিতে আছে। নিবেদিতা লিখছেন, 'Tomorrow I go to speak, by special request, before a board of missionaries, on the condition of India women, 15 minutes only— and I hope to say important things in a loving way. I did not seek this engagement, but Miss Hale declares herself anxious to come— and of course if anyone present gains confidence in me there, it is all I can dare to wish. In the afternoon I go with Miss Mary Hale to the Friday club— in the hope of joining in the dabate. There is a paper on Modern India. Then on Monday evening, I lecture at Hull House. And that is all. Hull House subject: Religious life in India.

I think of beginning with the Pilgrims' camp at Pahalgam and ending with a touch about Dukineswara and Sri Ramakrishna.'

হাল হাউসের বক্তৃতা এবং নিবেদিতার কর্মপরিকল্পনার একটি বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যায় ২১ নভেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে। হাল হাউসে নিবেদিতার বক্তৃতা শুনতে প্রায় ৬০-৭০ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রায় দেড়ঘন্টা তাঁরা হিন্দু দর্শন বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর চালান। যদিও, নিবেদিতা নিজে বলেছেন, সেদিন তাঁর মূল বক্তৃতাটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, এবং অপ্রতুল। নিবেদিতা লিখছেন, 'Last night at Hull House I really did feel that we had had Swami's blessing— you and I. What I said was utterly scrappy and inadequate— it had nothing whatever to do with that- but 60 or 70 people stayed about $1^{1/2}$ hour to ask questions about the philosophy! And such intelligent questions too! The Hales were there and drove Miss O'Neill and myself home in a luxurious carriage, and it was lovely to have them.'

এই চিঠি থেকেই জানা যায়, চিকাগোয় নিবেদিতার পরিচিতরা ওঁকে একটি বক্তৃতা ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন। নিবেদিতাও চাইছিলেন—এরকম একটি ব্যুরোর মাধ্যমে যদি তিনি বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান, তাহলে ভালোই হয়। এইরকম ব্যুরোর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিলে স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ যে অনেক সহজ হবে, তা-ও জানতেন নিবেদিতা। এছাড়াও একটি বেদান্ত গোষ্ঠী গড়ে তোলার ভাবনাও তখন তাঁর মনে এসেছিল। এমন একটি গোষ্ঠী যাঁরা তাঁর কাজে সহায়তা করবেন। নিবেদিতার কথায়, 'কোনও সুযোগকেই প্রত্যাখ্যান করব না।' নিবেদিতা লিখছেন, 'Mrs. Adams is going to recommend me at the bureau. She agrees with me that if I could get an offer from it, it might be the best possible start, for a limited time. On her recommendation I suppose it is possible. Then there is another idea also of forming a Vedanta group who might like my work. I shall refuse nothing that opens itself.'

চিঠিতে যে শ্রীমতী অ্যাডামসের কথা উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা, তিনি ছিলেন চিকাগো হাল হাউসের পরিচালক জেন অ্যাডামস। বিভিন্ন বক্তৃতা ব্যুরোর সঙ্গে অ্যাডামসের একটি যোগাযোগও ছিল।

এরই ভিতর ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার পথে ২৩ নভেম্বর কিছুদিনের জন্য চিকাগো এসে পৌঁছলেন স্বামীজি। উঠলেন হেল পরিবারের গৃহে। ২৪ তারিখ নিবেদিতা হেল পরিবারের আবাসগৃহে গিয়ে দেখা করেন স্বামীজির সঙ্গে। শ্রীমতী সারা বুলকে ২৫ তারিখে লেখা চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়। এই সময়েই হাল হাউস আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস অ্যাসোসিয়েশনে নিবেদিতার আর-একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল।

বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতের প্রাচীন শিল্প কলা।' এই বিষয়টি সম্পর্কে নিবেদিতা তখনো বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। কাজেই স্বামীজি চিকাগো আসার পর স্বামীজির কাছ থেকে এ বিষয়ে তিনি সাহায্য নেন। নিবেদিতার এই বক্তৃতাটি শুনতে আসার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা ছিল। এবং এখানে বক্তৃতা দিয়ে নিবেদিতা পঞ্চাশ ডলার রোজগার করেন। আমেরিকায় এটিই ছিল তাঁর প্রথম রোজগার। আমেরিকায় এভাবে বক্তৃতা দিয়ে অর্থসংগ্রহের বিষয়ে যে শ্রীমতী অ্যাডামস তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন, তা স্বীকার করেছেন নিবেদিতা। নিবেদিতার লেখা থেকেই জানা যাচ্ছে, এই সময়ে অনেকেই তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, অন্য শহরে বক্তৃতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে বা এ ব্যাপারে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে তাঁরা সাহায্য করবেন। এসব দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল, বছরে তিন হাজার ডলার রোজগার করা খুব একটা অসুবিধা হবে না। ২৫ নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখে সারা বুলকে নিবেদিতা লিখছেন, 'So you see Miss Adams is doing a great deal for me. Also— I am here on a visit for a few days— and everyone lays himself out to take India all the time.

'Yesterday afternoon, at the Hale's, there were about 25 people. Anywhere but in kind America my speech would have spurned as too grossly uninteresting for words. But there, everyone without exception promised to help as much as they could, to form a guild, or to try and get me to other towns, or by giving a dollar a year— which was the amount I asked. And Mrs. Adams has a little plan for a kind of preparation on foot which I hope to hear her say more about this morning. It looked to me yesterday as if the income of 3000 dollars a year would not be difficult to raise.''

কিন্তু যাঁরা এত প্রতিশ্রুতি নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন, তাঁরা যে সবাই তঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তা কিন্তু নয়। বরং অনেকেই তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বলে কাটালেও, এক কানাকড়িও সাহায্য করেননি তাঁকে। ফলে, নিবেদিতা অনেক সময়েই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকী হতাশ হয়েও পড়েছিলেন। ১৯০০ সনের ৯ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে এই ক্ষোভ এবং হতাশা ধরা পড়েছে। নিবেদিতা লিখছেন, 'It is so like climbing in gravel! Most of people make me sit down for hours and tell them all about eveything, and then they say they are so much interested and I have given them great pleasure but they never offer to give me anything back, not even one dollar.'

অর্থাৎ নিবেদিতা প্রথম দিকে যতই সহজসাধ্য মনে করুন না ব্যাপারটিকে, তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজটি যে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না তা এই চিঠিটি পড়লেই

বোঝা যাচ্ছে। নিবেদিতার এই চিঠিটি থেকে জানা যায়, ১৯০০-র জানুয়ারি মাসটা তিনি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিলেন। স্কুলের অর্থ সংগ্রহের কাজ যে খুব সহজ হচ্ছে না এবং তার জন্য নিবেদিতা যে হতাশ হয়ে পড়ছেন—এ সংবাদ স্বামীজির কাছেও পৌঁছেছিল। ১৫ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখে লস এঞ্জেলেস থেকে স্বামীজি একটি চিঠি লেখেন নিবেদিতাকে। চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ভয় করো না— তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে-দিক দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান।'

স্বামীজি আরো লিখছেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা যেমন শেষ হবে, অমনি আমরা ইংল্যান্ডে যাবো ও সেখানে খুব চুটিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করব— কি বলো?... ধৈর্য ধরে থাকো, শক্ত ও নরম-সবই ঠিক ঘুরে আসবে। এই যে তোমার নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে, এইটুকুই আমি চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আসবে। এখন আমার স্নায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই 'মা' আমার স্নায়ুগুলোকে একটু একটু করে নীরোগ করে দিচ্ছেন, আর তোমারও ভাবুকতা শান্ত করে আনছেন।... এইবার রাশি রাশি ভাল কাজ হবে, নিশ্চিত জেনো।'

শুধু স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ নয়, নিবেদিতার একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেও স্বামীজি চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, নিবেদিতা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তুলে সংগঠন বিস্তারের কাজটাও করুন। চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল— যে রকম পারো, ওতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝ থেকে কয়েকটি ভারতীয় নারী-সমিতিকে এতে যোগ দেওয়াতে পারো, তবে আরো ভাল হয়।...'

নিবেদিতার কাজের জন্য শুধু বক্তৃতা দিয়ে নয়, অন্য উপায়েও যদি কিছু অর্থ আসে— সে ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতাকে স্বামীজি লিখছেন, 'তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুশি হলাম। ভাল বিবেচনা কর তো তুমি নিজে ওগুলি আবার নতুন করে লেখো। কোন প্রকাশককে যদি পাও, তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও; আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও। আমার নিজের দরকার নেই।'

এই চিঠিটিরও আগে ১৮৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর লস এঞ্জেলেস থেকে স্বামীজি আরো একটি চিঠি লিখেছিলেন নিবেদিতাকে। ওই চিঠিতে স্বামীজি নিবেদিতাকে একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, সর্বজনহিতে কাজ করতে গেলে, তার জন্য সবরকম

কষ্ট সহ্য করার শক্তি থাকতে হবে। অন্যকে নিজের সমস্যা নিয়ে শঙ্কিত না করে তুলতে নিবেদিতাকে নির্দেশ করেছিলেন স্বামীজি। কর্মযোগের মূল সূত্রটিই নিবেদিতাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন স্বামীজি। এই চিঠিতে স্বামীজি লিখলেন, 'যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদিগকে এমন শঙ্কিত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং ছিল ভাল। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে, তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না। তার কারণ নয় যে, জগতে পাপ নেই; তার কারণ এই যে, সে স্বেচ্ছায় স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যিনি পরিত্রাতা, তাঁকেই সানন্দে আপন পথে চলতে হবে। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, এ কাজ তাদের নয়।'

তবে, নিবেদিতা তাঁর স্কুলের অর্থসংগ্রহের কাজে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে সহায়তাও পেয়েছিলেন। অনেকেই তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে এরকম সাহায্য পেয়েছিলেন নিবেদিতা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী কোহান, শ্রীমতী কাইফ, শ্রীমতী কনগার, শ্রীমতী কিং এবং শ্রীমতী ইয়ারোস। তবে, সবথেকে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন নিবেদিতা শ্রীমতী লক নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছে থেকে, যদিও শ্রীমতী লক নানারকম প্রশ্নবানে নিবেদিতাকে জর্জরিত করে তুলেছিলেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে (১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) শ্রীমতী লকের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Last night M.H. and I dined with Isabel Mckindley, to meet Miss Josephine Locke.. She was like 20 storms in one tea cup. She talked vividly and exhaustively about woman-woman-woman-the spiritual forces of the present day -Art Art Art-Babs and Suffism... there was the mixture of the enthusiam of a fine nature, and the silly mystery of Theosophy...She struck me as eccentric—fine and absurd. No! Exaggerated! It was tiring to be assured that the American woman was the only creature on earth who could claim direct descent from Olympian Zeus at this moment, every third sentence.'

ইতিমধ্যে স্বামীজি চিকাগো থেকে লস এঞ্জেলেসে চলে এসেছিলেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল সেখানে একটি বেদান্ত সোসাইটি গঠন করবেন এবং মঠ মিশনের জন্য অর্থসংগ্রহ করবেন। কিন্তু লস এঞ্জেলেসে পৌঁছে তিনি বুঝলেন, বেদান্ত সোসাইটি গঠন করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এমনিতেই এডওয়ার্ড স্টার্ডি তাঁকে ত্যাগ করে যাওয়ায়

স্বামীজি যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর এমনও আশঙ্কা হচ্ছিল যে, তাঁর আমেরিকান শিষ্যদের ভিতরও কেউ তাঁকে ত্যাগ করে যেতে পারে। তদুপরি স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে আমেরিকায় স্বামীজির অনুরাগী এবং শিষ্যদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। যে কারণে, বেদান্ত কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ফ্রান্সিস লেগেট। অন্যদিকে, ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন তখনও খুব আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। স্বামীজি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এই কারণেই যে, আমেরিকায় যদি তাঁর শিষ্য এবং অনুরাগীদের মধ্যে বিরূপ ভাব জন্মায়, তাহলে মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে যেমন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, স্বামীজিও মঠ মিশনের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিকূলতা অনুভব করছিলেন। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা স্বামীজি নিজেই লিখেছেন। ১৮৯৯ সালের ১২ ডিসেম্বর শ্রীমতী সারা বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন, 'বর্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমায় প্রাণ দিতে হবে—হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না; এই জন্যই তো ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি তো তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না— আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি।

'অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু হায়, এখন আমি চাই যে, আমার ছেলেদের মধ্যে অন্তত: একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করুক।...

'...যা হোক এবার আমেরিকায় বন্ধুবান্ধবদের উত্যক্ত করা ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ করিনি। আমার পাথেয় বাবদ অর্থসাহায্য জো-র (জোসেফিন ম্যাকলিয়ড) কাছ থেকেই হয়তো পাব, তা ছাড়া মি: লেগেটের কাছেও আমার কিছু টাকা আছে। ভারতবর্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহের আশা এখনও আমি রাখি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যেসব বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁদের কাছে এখনও যাইনি। আশা করি, প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাজার পুরোবার জন্য পনের হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারব এবং ট্রাস্টের দলিল হয়ে গেলেই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমে যাবে। আর যদি এ অর্থ সংগ্রহ করতে নাও পারি, তবুও আমেরিকায় নিরর্থক বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরাও শ্রেয় মনে করি।...

'...কাজের শেষটা যেন বড় তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে—অবশ্য এমনি প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু ভগবানের দয়ায় একথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেবো। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান্ আমায় যদি তাঁর ছ্যাকরা গড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

চিকাগোর বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নিবেদিতা স্থির করলেন ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে তিনি চিকাগো ত্যাগ করে আমেরিকার অন্যান্য শহরগুলির দিকে যাবেন। সেখানেও বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজ করবেন। নিবেদিতা ভেবেছিলেন চিকাগো ত্যাগ করার আগে তিনি একটি কমিটি গঠন করে যাবেন, যে কমিটি তাঁর অনুপস্থিতিতেও চিকাগো শহরে তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজটি করে যেতে পারবে। কিন্তু নিবেদিতা যা-ই ভেবে থাকুন না কেন, বাস্তবটা অন্যরকম ছিল। নিবেদিতা ভেবেছিলেন, তাঁর এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে চিকাগোয় স্বামীজির অনুরাগী এবং বন্ধুরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন। সেই ভাবনা থেকেই মেরি হেলকে সেই প্রস্তাবিত কমিটির সম্পাদক হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু মেরি হেল এই প্রস্তাব যে শুধু প্রত্যাখ্যান করলেন তা-ই নয়, জানিয়ে দিলেন, তিনি বা তাঁর পরিবার নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের নাম প্রকাশ্যে জড়াতে চান না। মেরি হেলের এই আচরণে মর্মাহত হয়েছিলেন নিবেদিতা, বুঝেছিলেন বাস্তবটি অন্যরকম। আসলে, নিবেদিতার ধারণা ছিল, তিনি যা বলছেন— তা স্বামীজির কথা; তিনি যা করছেন তা স্বামীজির নির্দেশিত কাজ। কাজেই, সেই কাজে স্বামীজির অনুরাগী এবং বন্ধুরা সাহায্য করবেন। কিন্তু, স্বামীজির আমেরিকাবাসী বন্ধু এবং অনুরাগীরা এ ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁরা নিবেদিতার কাজকে স্বামীজির কাজের থেকে পৃথকভাবেই দেখেছিলেন। যে কারণে, স্বামীজির অনুরাগী হলেও, নিবেদিতার কাজের সঙ্গে প্রকাশ্যে নিজেদের জড়িত করতে তাঁদের দ্বিধা ছিল। একমাত্র জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুল—স্বামীজির এই দুই আমেরিকান অনুগামীই নিবেদিতার কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন মনে দেখা দিতে পারে। স্বামীজির আমেরিকাবাসী অনুরাগীরা কেন নিবেদিতার কাজের সঙ্গে একাত্ম হতে চাননি? সে কি শুধু একারণেই যে, তাঁরা নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে স্বামীজির কর্মকাণ্ডকে এক করে দেখতে চাইছিলেন না? শুধু এই কারণটিই বোধহয় যথেষ্ট নয়। কেননা, স্বামীজির অনুমতি ব্যাতিরেকে নিবেদিতা একাজ করছিলেন এমনটি যে নয়, তা বোঝার মতো স্বাভাবিক ক্ষমতা স্বামীজির আমেরিকাবাসী অনুরাগীদের মনে ছিল। দ্বিতীয়ত, নিবেদিতা যে স্বামীজির অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্যা—তা তাঁরা জানতেন। নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের কথা তাঁরা কেউ কেউ 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় পড়েওছিলেন। সেক্ষেত্রে, আর একটি সন্দেহও মনে জাগে। মনে রাখতে হবে, ভারতে আসার আগে নিবেদিতার সঙ্গে আইরিশ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাশিয়ান বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিনেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন নিবেদিতা। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার দাবিতে তিনি সেই সময়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্য আরো-পাঁচজন আইরিশ বিপ্লবীর মতোই নিবেদিতার

ওপরও সেই সময় ব্রিটিশ পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি ছিল— একথা মনে করলেও ভুল হবে না। নিবেদিতার এইসব কর্মকাণ্ডের কথা স্বামীজির পাশ্চাত্যের অনুরাগীদের কারও কারও জানা ছিল---এমনও অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কুনজরে পড়ার ভয়ে তাঁরা নিবেদিতার কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইছিলেন না— এমন একটি ধারণাও কিন্তু মনে আসে।

মেরি হেল তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নিবেদিতা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। এই প্রত্যাখ্যান তাঁর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। মেরি হেলের প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত, ক্ষুব্ধ নিবেদিতা ৯ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখের চিঠিতে লিখলেন, 'It seems to me that I have just received the last and worst blow of all. One of Swami's earliest friends has been in to say that she and her family would rather not be identified with my work. They wanted to help but find themselves out of sympathy.

'Yes! I know it is their right to disagree, they must be free! But oh! Do give me a little comfort, for I feel utterly discouraged. If this is the attitude of Swami's people, how can I ever expect to do anything anywhere?' কতটা ব্যথিত এবং হতাশ যে নিবেদিতা হয়ে পড়েছিলেন, এই চিঠিটিই তার প্রমাণ। আমেরিকায় নি:সঙ্গ, বান্ধবহীন নিবেদিতার মানসিক অবস্থাটি যে কী হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। নিবেদিতার চিঠিটি পাওয়ার পর লস এঞ্জেলেস থেকে ১৪ জানুয়ারি একটি উত্তর দিলেন জোসেফিন। লিখলেন—

'I have your long letter telling me that Mary Hale does not wish to act as your Secretary and of the general disapproval. If I had you here half an hour you would start again with greater courage and hope than you ever had before. I quite see the blow you have had. It was dreadful— but now that it is over it will influence your whole life and make you a success— independent of Swami. You will have Kali's blessings direct and Swami's perfect love and trust...

'You know and Swami knows that I have always felt you had a mission—your own message for this work—and you can do better work where he is not know. No one who has ever known and loved him can ever take anybody else's version of him— not even yours. As Saradananda used to say, they would not listen to Swami in the Ramakrishna days. So you must strike out alone with new people— make your own audiences —your own disciples in your own way, and two years of training in America is not too much. The women problem

is left to you and Swami should be left out— obliterated in your outward work. He is in fact the source of your life as he is of most of ours. To have known him as we know him is the greatest blessing this life could give and our knowledge of this is the strong bond between you, SS and me— but there it ends.

'The Hales adore Swami in their own way and not ours. They give him all they can but the perception that our Indian life gave us of him, they are incapable of understanding and none of his friends will ever understand that. And so you must go into a fresh new element where he may never be known...

'The blow to your affection is none the less. What I am showing you is the lesson that I have vaguely felt for some time and this but confirms it...

'When you had your message for the world you made staunch true friends— your message of Kali is your own and Swami had nothing to do with it. I am so glad you wrote. You see the people who are indifferent to Swami like Mrs H— you can touch —curious, isn't it?'

চিকাগোতে অবস্থানকালেই নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হয় মাদাম রোজা এমা কালভে-র। এমা কালভে ছিলেন সেই সময়ের একজন নামী অপেরা শিল্পী। এমা কালভে যখন খ্যাতির তুঙ্গে তখনই স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। স্বামীজির অনুরাগী হয়ে পড়েন তিনি। এমা কালভে তাঁর জীবনীতেও স্বামীজির স্মৃতিচারণা করে গিয়েছেন। স্বামীজির প্রয়াণের পর মাদাম কালভে ভারতে আসেন।

চিকাগোয় স্বামীজির অনুরাগী মেরি হেল তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার পর যখন কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা, তখন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের চিঠিখানি তাঁকে যেমন কিছুটা মানসিক শান্তি দিয়েছিল, তেমনই স্বামীজির একটি চিঠিও তাঁকে উজ্জীবিত হতে সাহায্য করেছিল। ১৯০০ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখের এই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'যে শান্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্তত আমার স্বদেশের— কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন; আর এই উৎসর্গের ভাব-অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একটা আপস করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে; একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয়, তাদের জোর করে দাবানো হয়, এবং তাদের দুর্ভোগও হয় বেশি। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।'

স্বামীজি যখন এই চিঠি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, তখন অবশ্য নিবেদিতা চিকাগোয় ছিলেন না। ১০ জানুয়ারি চিকাগো ছেড়েছিলেন নিবেদিতা। অ্যান আরবর এবং জ্যাকসন হয়ে ডেট্রয়েটে এসে পৌঁছেছিলেন। অ্যান আরবর আর জ্যাকসন—এই দুই জায়গাতেই অবশ্য নিবেদিতার বক্তৃতা খুব ভালো কাজ দিয়েছিল। মহিলারা তাঁকে অর্থ সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁদের বলেছিলেন, বছরে এক ডলার করে আগামী দশ বছর সাহায্য করতে। অ্যান আরবর এবং জ্যাকসন থেকে সাহায্য লাভের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ১৩ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখের চিঠিতে জোসেফিনকে অ্যান আরবরের অভিজ্ঞতা লিখে জানাচ্ছেন নিবেদিতা। লিখছেন—
'...Suddenly a little lady with a sparkling eyes stood before me, planting herself down firmly on two feet. 'And can we do to help you?' she said. Of course it was Kali really, just laughing at my childishness. 'Give me a dollar a year for 10 years', I said. 'Oh, I am so thankful', said some-one else. 'I never wanted to give anyone a dollar in my life so much as I do you, this afternoon.' 'Yes', said the little lady, 'I knew you must want something that we could do, for I've never noticed that great things could be done without money.' And so they say they'll form a group for me, and if Mother is really in it I suppose they will. One lady whispered to me, 'I'm going to try to be as loving as even I can,' and that evening she sent me a note, begging me to accept 5 dollars. Things of the same sort happened here yesterday— and again I feel, as I have learnt now to feel, that if Mother wishes it the group will be formed. It seems that I am not to beg unless a direct question is asked— and I love to see that a certain something happens with which I have nothing to do.'

চিকাগোয় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দুঃখ অ্যান আরবরে নিবেদিতা কিছুটা ভুলেছিলেন এই সব ঘটনায় এমন আশা করাই যায়। কিন্তু অ্যান আরবরে যতটা উৎফুল্ল হয় উঠেছিলেন নিবেদিতা, ডেট্রয়েটে এসে বুঝলেন অতটা উৎফুল্ল হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। ডেট্রয়েটে তিনি চার্চ-অনুরাগী মহিলাদের আক্রমণের মুখে পড়লেন। এই চার্চ-অনুরাগী মহিলাদের স্বামীজি 'ধর্মীয় মৌলবাদী' মনে করতেন। স্বামীজি মনে করতেন, চার্চের অঙ্গুলি হেলনে চলা এই মহিলারা ধর্মের অপব্যাখ্যা করছেন। ডেট্রয়েটে লেডিজ ক্লাবে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে নিবেদিতা এই 'ধর্মীয় মৌলবাদী'-দের আক্রমণের মুখে পড়লেন। ওই ক্লাবে নিবেদিতার বক্তৃতার পর যখন প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল, তখন এই মহিলারা তাঁকে নানাবিধ আক্রমণাত্মক প্রশ্ন শুরু করলেন। এক মহিলা নিবেদিতাকে মিশনারিদের দলে ফেলবার চেষ্টাও করলেন। নিবেদিতা তার তীব্র

প্রতিবাদ করলেন। আর-একজন নিবেদিতার বক্তব্যকে কার্যত খাটো করে বললেন, এর ভিতর নতুনত্ব কিছুই নেই। ভারতে বহুবিবাহ প্রথার কথা ওঠালেন অনেকে। নিবেদিতা ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করলেন, এটা পাশ্চাত্যের বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম প্রণালীমাত্র। নিবেদিতার এই কথার প্রত্যুত্তরে চার্চ অনুরাগী মহিলারা বিদ্রূপধ্বনি করতে শুরু করলেন। বললেন, আমেরিকার মর্মন ধর্মসম্প্রদায়ের মতোই আচরণ ভারতীয়দের। ক্ষুব্ধ নিবেদিতা বললেন, 'মর্মনদের মতো নয়। আর খ্রিস্টানদের মতো অত খারাপও নয়।' নিবেদিতার এ কথায় উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। এক মহিলা বললেন, 'ভারতে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আহার করে না। অন্তত এজন্য তো আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত।' নিবেদিতা তার প্রত্যুত্তরে বললেন, 'এটা স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্ত্রী বললেন, 'আপনার ভুল হচ্ছে। ব্যাপারটি ব্যক্তিগত নয়, সকলের।' ধৈর্য হারিয়ে নিবেদিতা বললেন, 'আমি এসব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। আমি যদি কোনো ইংরেজ দম্পত্তির উদাহরণ দিই, আমেরিকান দম্পতি কি তা মেনে নেবেন?' এইভাবে নিবেদিতাকে উত্তেজিত করে দিয়ে ওই বক্তৃতা সভায় একটা গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হল। এটা বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নিবেদিতার এই বক্তৃতা সভায় গণ্ডগোল বাধানোর পিছনে চার্চের পুরোপুরি মদত ছিল। আমেরিকান মিশনারিরা বিবেকানন্দের প্রতি যে বৈরিতা দেখিয়েছিলেন, সেই বৈরিতাই যে তাঁরা নিবেদিতার প্রতিও প্রদর্শন করেছিলেন, এই ঘটনাটিই তার প্রমাণ।

ডেট্রয়েটের এই অভিজ্ঞতার কথা নিবেদিতা লিখেছেন তাঁর চিঠিতে (১৬ জানুয়ারি, ১৯০০)। নিবেদিতা লিখছেন, 'Life brings experience. After being indulged and petted like a spoilt child at Ann Arbor I suddenly found myself yesterday afternoon in a nest of thorns, and learnt the psychological process that makes Swami fight an attack! I nearly let go and did it myself—yesterday...

'...One lady tried to drag me into attacking missionaries. I peremptorily refused. Another 'sniffed' and said, I had said nothing that she had not heard the missionaries say before. So and so and so and so and so always spoke in this strain.

'I actually rose and found myself snubbing her severely with the statement that only one living scholar had so far had the genius to see these things, and he would doubtless end by revolutionising opinion, but meantime even scholars were usually ahead of missionaries, and as Hunter and others had not had the wit to say these things I could hardly take her word for it that missionaries had done so!

'Then the President broke through hospitality to cross question me about polygamy which I represented as the only substitute for divorce. During the cross examination, I praised the chastity of Hindu men on the plane of national ideals and so on. She was a lady with a white face and thin lips— 'H'm! just like our Mormons!' She ejaculated scornfully.

'They say just those things!' I supressed the impulse to defend Mormons as Swami certainly would have done at this point, and answered 'not like Mormons I think! Rather—not quite so bad as Christians!' 'Oh no! it's Mormons! Mormons!' She replied en pleine compagni, Good breading of course silenced me.

'Then one woman insisted that I should remonstrate with husbands and wives in India for not eating together and put 'a higher way' before them. I objected that married people might be allowed to settle such things between themselves. It was no one's business but their own. 'Ah— there you're so mistaken!'- she replied— 'so the world always says but it's everyone's business really!' 'Well, it's not mine—anyway!' I ejaculated—'I refuse to be put in such a position!' and pointed out what American couples would think if I offered them English advice. After a few more remarks of this sort, the customary question about giving babies to crocodiles sounded thoroughly good-natured, and a very firm-voiced lady who was evidently my friend, and a good strong one insisted on caste being, sympathetically explained, by way of turning attention to safer topic.

'I never was in a gathering so like lunatic-asylum. Caste did not interest them at all, but looking back it seems to me that the audience bristled with 'H'm monogmy!' in front—and an angry voice saying 'Child widows!' at the back—while here there everywhere would spring up violent affirmation about the inferiority of wives, the preference of sons, the contempt for Woman-Woman-Woman. Oh how I recognised the steps that Swami had trodden before me!...

'...I could not have imagined feeling so thoroughly angry with an audience. But Mother Kali knows what she is about, and Detriot is not done with yet. I suppose it is a good thing that I did not break out and attack them, though they richly deserved it for their utter want of good breeding.'

ডেট্রয়েটে নিবেদিতার এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা। এই বক্তৃতার বছরখানেক পর, ১৯০১ সালে নিবেদিতা তাঁর 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থটি লিখতে শুরু করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের উৎসাহেই নিবেদিতা এই গ্রন্থটি রচনায় হাত দেন। ১৯০১-এর ১৯ জুলাই নরওয়ে থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিত নিবেদিতা লেখেন, 'Wow I am at work on the book, which Mr. Dutt commissioned and have just written on caste.'

১৯০৩ সালে নিবেদিতা এই গ্রন্থটি লেখা সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এই গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজ, জীবনধারা, ধর্মভাবনা, সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন নিবেদিতা। এই গ্রন্থটিতেই 'ভারতের জাতীয় জীবনে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Those who, knowing the East, read the list of seven corporal works of mercy, may well start to imagine themselves back in the Hindu home watching its labourious, pious women as they more about their daily tasks, never questioning the first necessity of feeding the hungry, harbouring the harbourless, and the like. Truly the East is eternally the mother of religions, for the reason that she has assimilated as ordinary social functions what the west holds to the only the duty of officialism or the message of the Chruch, and to those who deeply understand it may well seem that Christianity in Europe is neither more or less than the mision of the Asiatic life?

জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নিবেদিতা আবার চিকাগো ফিরে এলেন। এই সময়ে নিবেদিতা আমেরিকার বেশ কয়েকটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেন এবং ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে অবহিত হন। এই সময়ে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হয় মি. পার্কারের। পার্কার পেশায় ছিলেন শিক্ষাবিদ। তিনি ওই সময়ে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল খোলার কথা চিন্তাভাবনা করছিলেন। পার্কার চাইছিলেন এমন একটি স্কুল গড়ে তুলতে যেখানে মেয়েরা প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষয়িত্রীর পেশা বেছে নিতে পারবে। পার্কারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিবেদিতা উৎসাহিত হয়েছিলেন। বাগবাজারে তাঁর স্কুলে তিনি সন্তোষিণী নামে একটি মেয়ের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। স্বামীজির সঙ্গে পাশ্চাত্যে রওয়ানা হওয়ার সময় নিবেদিতা স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন সন্তোষিণীর শিক্ষার ভার নিতে। নিবেদিতার অনুরোধ মতো সারদানন্দ সন্তোষিণীর শিক্ষার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, সন্তোষিণীকে আমেরিকায় এনে পার্কারের স্কুলে প্রশিক্ষিত করে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে গড়ে তুলতে। পার্কারের সঙ্গে সে বিষয়ে কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু নিবেদিতার সে ইচ্ছা আর বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ, স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতে নিবেদিতা

জেনেছিলেন, সন্তোষিণীর অভিভাবকরা তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর সন্তোষিণীর পড়াশুনোয় ছেদ পড়েছে। এ সংবাদ নিবেদিতাকে ব্যথিত করেছিল সন্দেহ নেই।

ফেব্রুয়ারি মাসে নিবেদিতা কানসাস সিটি, কেমব্রিজ হয়ে বোস্টনে যান। বোস্টনে সারা বুলের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন নিবেদিতা। ওই সময়েই বিপিনচন্দ্র পালও শ্রীমতী বুলের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়েই একদিন ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার তুমুল তর্কাতর্কি হয়। এ ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার পর অবশ্য বিপিনচন্দ্র সারা বুলের বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যান।

মেরি হেল বা চিকাগোর বাসিন্দা অন্যান্য স্বামীজি অনুরাগিণীরা প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতার কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে না চাইলেও, নিবেদিতা কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী ছিলেন না। কারণ, তিনি জানতেন হাল ছেড়ে দিলে তাঁর পাশ্চাত্যে আসার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ হবে না। ফলে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে নিবেদিতা তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করলেন। সমিতির নাম হল—'দ্য রামকৃষ্ণ গিল্ড অফ হেল্প ইন আমেরিকা।' এই সমিতির সাম্মানিক প্রেসিডেন্ট হলেন শ্রীমতী লেগেট এবং সাম্মানিক সেক্রেটারি হলেন সারা বুল। সমিতির ডেট্রয়েট শাখার সেক্রেটারি হলেন সিস্টার ক্রিস্টিন। এছাড়া, অন্যান্য শহরগুলিতে নিবেদিতা তাঁর পরিচিত ঘনিষ্ঠজনদের সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করলেন। এঁরা হলেন হেনরি লয়েড এবং শ্রীমতী কুন্সগার (চিকাগো), জোসেফিন ম্যাকলিয়ড ও এমা থার্সবি (নিউইয়র্ক), এডউইন মিড এবং এডনা চেনি (বোস্টন), টমাস হিগিনসন, লিউইস জেমস এবং শ্রীমতী ব্রিগস (কেমব্রিজ)। কমিটির পক্ষ থেকে 'দ্য প্রজেক্ট অফ রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস' শীর্ষক একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করে অর্থদানের আবেদন জানানো হল। স্কুলের জন্য প্রথম দানটি করলেন শ্রীমতী লেগেট। কাজ শুরু করার জন্য তিনি এক হাজার ডলার দিলেন নিবেদিতাকে। যে আবেদনপত্রটি প্রকাশ করা হয়েছিল সেটি লিখেছিলেন নিবেদিতা স্বয়ং। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'It is after careful study and consideration of such facts as these that the project of the Ramakrishna School for Girls has been formed.

'We intend, if we succeed in aquiring means, to buy a house and a piece of land on the banks of the Ganges, near Calcutta, and there to take in some twenty widows and twenty orphan girls— the whole community to be under the guidance and authority of that SARADA DEVI, whose name has been lately introduced to the world by Professor Max Muller in his Life and Saying of Ramakrishna.

'The school course is to be founded on the kindergarten, and is to include the English and Bengali languages and literature, elementary mathematics very thoroughly taught, some elementary science very thoroughly taught and handicrafts with a special bearing on the revival of old Indian Industries. The immediate justification of the last subject would lie in enabling every pupil to earn her own living, without leaving her home, by a pursuit which should be wholly ennobling.'

নিবেদিতা আরও লিখলেন, 'Supposing our effort to be in every way successful— supposing, above all, that it aproves itself to Hindu society as in no sense denationalizing— it will probably be possible slightly to defer the day on which we ask each child to choose for herself the life of marriage or of consecrated national service. For those who choose the first, we shall hope to provide ways and means that are entirely creditable. With any who may prefer to devote their lives to unremitting toil on behalf of their country and her womenhood, we shall expect, after an extended education, and using the older women as guards and protectors, to start new Ramakrishna Schools in other centres...

'Let me say, in conclusion, that I trust I am seeking to divert no energy or gift from the near duty to the far. In these days of international commerce and finance, we are surely realizing that only World-Service is true Home-Service. Already, we seem to be answering Walt Whitman's sublime question in the affirmative:

'Are all nations communing ? Is there going to be but one heart to the Globe?'

১৯০০ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখে এই প্রচার পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। স্কুলের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে নিবেদিতার এই প্রস্তাব সম্পর্কে বহু জন বহু প্রশ্ন করেছিলেন। সব প্রশ্নেরই যথাসম্ভব উত্তর দিয়েছিলেন নিবেদিতা। সেই সব প্রশ্ন এবং উত্তরও এই প্রচার পুস্তিকার সঙ্গে সংযোজনী হিসাবে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নিবেদিতা যে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে কিছুটা হলেও সফল হয়েছেন, সে সংবাদ স্বামীজির কাছেও পৌছেছিল। সেই সংবাদে স্বামীজি যথেষ্ট খুশিও হয়েছিলেন। ১২ মার্চ, ১৯০৩, সানফ্রানসিস্কো থেকে সারা বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'নিবেদিতার অর্থ সংগ্রহের সাফল্যের সংবাদে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি। আমি তাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি এবং নিশ্চিত জানি যে, আপনি

তার দেখাশোনা করবেন। আমি এখানে আরও কয়েক সপ্তাহ আছি; তারপরেই পূর্বাঞ্চলে যাব।' এর পর ২৮ মার্চ সানফ্রানসিস্কো থেকেই নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লেখেন, 'আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে থাকি, তবে অবস্থা ফিরবেই ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার, তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।...

'আমি মিসেস লেগেটের ১০০০ ডলার দানের সংবাদ পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। সবুর কর; তাঁর ভিতর দিয়ে যা কাজ হবার, সেটাই এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জানুন আর নাই জানুন, রামকৃষ্ণের কাজে তাঁকে এক মহৎ অংশগ্রহণ করতে হবে।...

'সব বিষয় এখন আমাদের অনুকূল হতে শুরু করেছে। আমি যে অর্থ সংগ্রহ করছি, তা যথেষ্ট না হলেও উপস্থিত কাজের পক্ষে মন্দ নয়।'

নিবেদিতার পাশাপাশি স্বামীজিও যে বক্তৃতা দিয়ে অর্থসংগ্রহের কাজে কিছুটা সফল হয়েছিলেন, সেটি তাঁর আর-একটি চিঠি থেকেও জানা যায়। ১৭ মার্চ শ্রীমতী লেগেটকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, কিছু কিছু টাকাপয়সাও হচ্ছে। বেশ সন্তুষ্ট আছি।... এখানে এবং ওকল্যাণ্ডে ইতিমধ্যে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছি। ওকল্যাণ্ডের বক্তৃতাগুলিতেও ভাল টাকাই পাওয়া গেছে। স্যান ফ্রান্সিস্কোয় প্রথম সপ্তাহে কিছু পাওয়া যায়নি, এ সপ্তাহে পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহে কিছু আশা আছে। বেদান্ত সোসাইটির জন্য মিঃ লেগেট চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সত্যি, তিনি কত সহৃদয়।'

নিবেদিতা তাঁর স্কুলের অর্থ সংগ্রহের জন্য যে প্রচার পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছিলেন, তা পাঠ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত, নারীদের শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে স্বামীজি যা যা ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, তাই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। অর্থাৎ পরিষ্কার যে, স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে গুরু-নির্দেশিত পথেই চলতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। প্রচার পুস্তিকাটি পাঠ করলে এ-ও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, স্বামীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরই নিবেদিতা এই প্রচার পুস্তিকাটি রচনা করেন।

শুধু যে স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজেই নিবেদিতা এ সময়ে ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। তাঁর 'কালী দ্য মাদার' গ্রন্থটিও এই সময়ে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন তিনি। লন্ডনের সোয়ান সনেনস চেইন অ্যান্ড কোম্পানি ওই বছরই (১৯০০) বইটি প্রকাশ করেন। পকেট বইয়ের আকারে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে নিবেদিতা আরো একটি বই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন স্কুলে তিনি কৃষ্ণ,গোপাল, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন। এছাড়া স্বামীজি তাঁকে কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনি লিখে ইচ্ছামতো পারিমার্জন এবং পরিবর্ধন করে নিতে বলেছিলেন। এইসব পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে নিয়ে নিবেদিতা একটি

পুস্তক প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশক মি. ওয়াটারম্যানের সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছিল। ওয়াটারম্যান নিবেদিতাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই রকম একটি পুস্তক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য করা যেতেই পারে। কিন্তু পরে ওয়াটারম্যান পিছিয়ে যান। বইটি আর প্রকাশিত হয় না। অবশ্য পরে, ১৯০৭ সালে এই পৌরাণিক কাহিনিগুলি একত্রিত করে বইটি প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা বইটির নাম দেন Cradle Tales of Hinduism. ১৯০৬ সালের ১৬ জুলাই নিবেদিতা সারা বুলকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে এই বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। নিবেদিতা লিখছেন, 'The CradleTales of Hinduism are nearly ready. I hope to send one copy to England by the end of July and one copy to you—to try to publish independently and simultaneously in America. We have decided that if I could for this book get ₤100 down and a small royalty, say 2 cents or 1d. a copy, it would be good.'

১৯০০-র মে মাসে নিবেদিতা চিকাগো ত্যাগ করে মাসাচুসেটসের জ্যামাইকা শহরে যান। এখানে ফ্রি রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে 'প্রাচ্যের কাছে আমাদের ঋণ' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। তবে, নিবেদিতা একদিকে যেমন তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে সাফল্যের সঙ্গে এগোচ্ছিলেন, তেমনই নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীনও তাঁকে হতে হচ্ছিল। নানারকম সমালোচনা এবং আক্রমণ তাঁর দিকে ধেয়ে আসছিলই। ৩০ মে, ১৯০০ তারিখে এক চিঠিতে নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখেন, '...Some great leaders' saying that a new truth before it is accepted must meet with 1) riducule 2) argument and 3) opposition. When these 3 are present, know that you are about to win. Oh dear— come on all 3— as hard as you can— I don't mind how much, if only you are not everlasting.'

বোঝাই যায়, যতই প্রতিবন্ধকতা আসছিল, যতই আক্রমণ এবং সমালোচনা ধেয়ে আসছিল তাঁকে লক্ষ্য করে—ততই প্রতিকূলতাকে জয় করার নেশাও নিবেদিতার ওপর চেপে বসছিল।

নিবেদিতা যখন এইরকম নানা প্রতিকূলতা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন, তখন স্বামীজি কিন্তু তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ জুগিয়েছেন, বরাভয় দিয়েছেন। ১৯০০ সালের ২৬ মে সান ফ্রানসিসকো থেকে নিবেদিতাকে চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়। শ্রী ওয়া গুরু।'

জুন মাসে নিবেদিতা চলে এলেন নিউ ইয়র্কে। স্বামীজিও এই সময়ে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চিকাগো হয়ে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছোন। পূর্ব পরিকল্পনা মতো নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে স্বামীজির বেশ কিছু বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রিজলি ম্যানরে কয়েকটি দিন স্বামীজির সান্নিধ্যে কাটানোর পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এ ভাবনা নিবেদিতাকে আনন্দিত করেছিল সন্দেহ নেই। কেননা নিউ ইয়র্কে স্বামীজির বক্তৃতা শোনার জন্য নিবেদিতা যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, তা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়। লন্ডনে স্বামীজির বক্তৃতা শোনার জন্য তিনি যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন, এবারও যে তেমনই ছিলেন—তা-ও নিবেদিতা জানিয়েছেন অকপটে। লন্ডনের মতোই এখানেও স্বামীজির বক্তৃতা শোনার জন্য তিনি বাঁদিকে দ্বিতীয় সারির পিছনে বসে অপেক্ষা করতেন। ৪ জুন ১৯০০ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I went early and took the seat at the left end of the second row— always my place in London, though I never thought of it at the time.

'Then as we sat and waited for him to come in, a great trembling came over me, for I realized that this was, simple as it seemed, one of the test moments of my life.

'Since last I had done this thing, how much had come and gone! My own life— where was it? Lost— thrown away like a cast-off garment that I might kneel at the feet of this man. Would it prove a mistake; an ilusion; or was it a triumph of choice; a few minutes would tell.'

রিজলি ম্যানরের পর এই সাক্ষাৎ এবং স্বামীজির বক্তৃতা শ্রবণের পর নিবেদিতার মনোভাব কেমন হয়েছিল? ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখছেন, 'This man who stood there held my life in the hollow of his hand— and as he once in a while look my way, I read in his glance what I too felt in my own heart, complete faith and abiding comprehension of purpose— better than any feeling... Swami says, 'All accumulations are for subsequent distribution, this is what the fool forgets.'

জুন মাসের ১৭ তারিখে স্বামীজি 'ধর্ম কী' এই বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিলেন। ওই দিন সন্ধেবেলাই নিবেদিতা 'হিন্দু নারীর আদর্শ' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতাটি সম্পর্কে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'The women students, who are always most eager to hear of the everyday life and thought of their Hindu sisters especially enjoyed this talk; Sister Nivedita was pleased at the interest that was felt and answered many questions which were asked, so that most of the people went away with a clear idea of life in India than they had ever known.'

জুন মাসের ২৩ তারিখে স্বামীজি গীতা ক্লাস নেন। ২৪ তারিখ মাতৃবন্দনা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। ২৪ তারিখ সন্ধেবেলা নিবেদিতা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। ভারতের শিল্পকলা সম্পর্কিত ওই বক্তৃতায় নিবেদিতা কী বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ জানা না গেলেও, শিল্পকলা সম্পর্কিত নিবেদিতার নানা লেখা থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায়, ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে কী অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। পাশ্চাত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে ভারতীয় শিল্পকলা তার নিজস্ব ঘরানায় সমৃদ্ধ হোক, তার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করুক ভারতীয় চিত্রকলা—এটাই নিবেদিতা চাইতেন। যে কারণে অবনীন্দ্রনাথকে তিনি ভারতীয় ঘরানার ছবি আঁকতে উৎসাহিত করেছিলেন, নন্দলাল বসু প্রমুখকে অজন্তা-ইলোরা গিয়ে সেখানকার শিল্পরীতি সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'দ্য ফাংশন অফ আর্ট শেপিং ন্যাশানালিটি' শীর্ষক নিবন্ধে নিবেদিতা লিখেওছিলেন, 'do you Indian students of Indian art see nothing in any of these that you long to record? Can you not go through life seeking for the glimpses that open up the great vistas? They are seen of tener in this country than anywhere in Europe! In almost any home one might find the group from which one could paint the Nativity of Christ and the Nanda Utsab of Krishna. Have you not felt the beauty of the little earthen lamp set alight at evening beneath the Tulsi plant? Have you not breathed the peace of the Shanti-jal ceremony in the gathering dusk? Is there for you no mystic significance in the Baran dala? Believe me, without some such interpretation, some such appeal, the mere technical excellences of which you learn to prate in English schools are bone without flesh; they are worse than valueless.'

একথা আজ অস্বীকার করলে অন্যায় হবে যে, সেই পরাধীনতার সময়ে ভারতীয় চিত্রকলাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে যে ক'জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়েছিলেন—নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বাইশ

নিবেদিতা এবং স্বামীজি যখন আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত, তখন সমান্তরালভাবে আর-একটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৯০০ সালে প্যারিসে একটি বিশ্বসম্মেলনের (The exposition universelle Internationale) আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্ম-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতি সব বিষয়েই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল এই মেলায়। মানব সভ্যতা বিভিন্ন দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছে, আগামী শতকে মানব সভ্যতা কোন খাতে প্রবাহিত হবে—সেসব প্রসঙ্গে মতামত বিনিময় করতেই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনের অংশ হিসাবেই দ্বিতীয় অলিম্পিক গেমসের আয়োজনও করা হয় প্যারিসে। এই সম্মেলন উপলক্ষে যে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, সেখানেই প্রথম বিশিষ্ট ফরাসি ভাস্কর অগুস্ত রদ্যাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হন বিশ্ববাসী। এই মেলা এবং সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হন প্যারিসে। এই সম্মেলনে ধর্মীয় ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্বামীজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। স্বামীজি ওই সম্মেলনে অংশ নিতে সম্মত হন। এবং ধর্মীয় ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতাও দেন। অবশ্য ধর্মীয় ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতা দেওয়ার পাশাপাশি স্বামীজির প্যারিস যাওয়ার আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ আসার পর, স্বামীজি ভেবেছিলেন, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার পাশাপাশি প্যারিসেও বেদান্ত দর্শন প্রচারের চেষ্টা করা যাবে। ফরাসি দেশে বেদান্ত দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে এই সম্মেলনকে একটি সুযোগ হিসাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই মনোভাবের কথা কিছুটা আঁচ করা যায় ১৯০০ সালের ৭ এপ্রিল শ্রীমতী লেগেটকে লেখা একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসিদের মধ্যে কাজ করা যে উচিত, তা খুবই সত্যি। জুলাই মাসে বা তার আগেই ফ্রান্সে পৌঁছবার আশা করছি।'

লেগেট দম্পতিও প্যারিসের এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা স্বামীজিকে অনুরোধ করেছিলেন, প্যারিসে স্বামীজি যেন তাঁদের সঙ্গেই থাকেন। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্যারিসে স্বামীজি লেগেট দম্পতির অতিথি হয়েছিলেন। সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এই সম্মেলনে যাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁরাও প্যারিসের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

প্যারিসে গিয়েছিলেন নিবেদিতাও। তবে, তিনি স্বামীজির অনুরোধে বা স্বামীজির সঙ্গী হিসাবে যাননি। নিবেদিতা প্যারিসে গিয়েছিলেন একেবারে স্বতন্ত্রভাবে, বিশিষ্ট স্কটিশ জীববিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডিজের উৎসাহে এবং আগ্রহে। প্যারিসের এই সম্মেলনে বিজ্ঞান, কলা এবং শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন গেডিজ। ১৯০০-র মার্চ মাসে আমেরিকায় গেডিজের সঙ্গে নিবেদিতা এবং স্বামীজির আলাপ হয়।

নিউইয়র্কে 'ইতিহাসে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা' শীর্ষক গেডিজের একটি বক্তৃতা শুনে নিবেদিতা মুগ্ধও হন। অন্যদিকে, নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর গেডিজের মনে হয়, প্যারিসে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাজকর্মে তাঁকে যথাযথভাবে সহায়তা করার উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা সম্পর্কে গেডিজ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, 'I found no one who so rapidly and ardently seized upon the principle and delighted in every application of it as Sister Nivedita.'

ফলে, গেডিজ নিবেদিতাকে তাঁর সেক্রেটারির কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। প্রাথমিকভাবে নিবেদিতা মোটেই প্যারিসে গিয়ে এই কাজ গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। বরং, নিবেদিতা ভেবেছিলেন, স্বামীজি প্যারিসের দিকে যাত্রা করলে, তিনিও ভারতে ফিরে আসবেন এবং আবার স্কুলের কাজ শুরু করবেন। কিন্তু নিবেদিতার বন্ধুরা স্বামীজির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে কিছুদিন প্যারিসে কাটিয়ে যেতে বলেন। এছাড়া, আরো একটি কারণে কিছুটা রাজি হয়েছিলেন নিবেদিতা। তা হল, গেডিজের সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করলে কিছু পারিশ্রমিক পাওয়ার আশা ছিল। আর সেই সময়ে অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজনও ছিল নিবেদিতার। কাজেই শেষ পর্যন্ত গেডিজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিবেদিতা প্যারিসে চলে যান স্বামীজির আগেই।

প্যারিসে গেলেও নিবেদিতা গেডিজের সেক্রেটারির কাজটা বেশিদিন করতে পারেননি। কারণ, কাজটি ছিল নিতান্তই অফিস করণিকের কাজ। নিবেদিতার মতো সৃজনশীল, স্বাধীন চিন্তাধারার ব্যক্তিত্বের পক্ষে নিতান্ত করণিকের কাজ করা অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষত, যেখানে তাঁর নিজের কিছুই করার নেই। শুধুমাত্র গেডিজের বক্তব্যই তাঁকে পুনরুচ্চারণ করে যেতে হবে— এ কাজে নিবেদিতার মন বসছিল না। ১৯০০ সালের ১ জুলাই প্যারিস থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা

একটি চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছিলেনও তাঁর ভালো না লাগার কথা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I feel torn to pieces. He wants a voice that shall utter his thought as he could have done. I try them to make a mosaic in which the bright bits are his words, and I provide only grey cement of mere grammatical context,... I disappoint him so much, because I am not even a good stenographer.'

তবু কিছুদিন গেডিজের সেক্রেটারির কাজ করলেন নিবেদিতা। শেষ পর্যন্ত মন সায় না দেওয়াতে কাজটি তিনি ছেড়েই দিলেন। তার জন্য অবশ্য গেডিজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং, গেডিজ বুঝতে পেরেছিলেন, নিবেদিতার মতো ব্যক্তিত্ব এই কাজে বাঁধা পড়ে থাকতে চাইবেন না। নিবেদিতার প্রতি গেডিজের শ্রদ্ধা এরপরও অটুট ছিল। অন্যদিকে, নিবেদিতাও গেডিজের প্রতিভার প্রতি বরাবর সম্মান জানিয়ে এসেছেন। নিবেদিতা তাঁর 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থের মুখবন্ধে গেডিজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, 'I sending this book out into the world, I desire to record my thanks... to Prof. Patrick Geddes, who, by teaching me to understand a little Europe, indirectly gave me a method by which to read my Indian experiences.'

অন্যদিকে, গেডিজও পরবর্তীকালে নিবেদিতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে লিখেছেন, 'Eager to master these evolutionary methods, and to apply them to her won studies, to Indian problems therefore above all, she settled our home into an attic cell, which suited at once her love of wide and dofty outlooks and her ascetic care of material simplicity; and there she worked, for strenous weeks,... For my part, I must no less recognize how her keener vision and more sympathetic and spiritual insight carried her discernment of the rich and varied embroidery of the Indian web far beyond that simple texture of the underlying canvas, of the material conditions of life, which it was my privilege at the outset of our many conversations to help her to lay hold upon.'[Studies from an Eastern Home]

বন্ধুদের পরামর্শ এবং অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্য ছাড়াও নিবেদিতার প্যারিসে আসার আরও একটি কারণ ছিল বলে লিজেল রেমঁ লিখেছেন। রেমঁ লিখেছেন, 'নিবেদিতা প্যারিসে যেতে রাজী হলেন। আরেকটা আনন্দের কথা, প্যারিসে থাকলে জগদীশ বসুর সঙ্গে দেখা হবে। তিনি তখন ইওরোপ আসছেন। মিসেস্ বুল ইংল্যাণ্ডে আর আমেরিকায় অনেক চেষ্টা করে তাঁকে একটা বৃত্তি জোগাড় করে দিয়েছেন। ওটা অনেক দিন চলবে।'

লন্ডন এবং আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকলেও নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে যে একদিনের জন্যও বিস্মৃত হননি, বরং জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় আরো কীভাবে সাহায্য করা যায়, আরো কীভাবে এই বাঙালি বিজ্ঞানীকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করা যায়, তার জন্য যথেষ্ট উদ্গ্রীব ছিলেন নিবেদিতার চিঠিপত্রেই তার প্রমাণ মিলবে। প্যারিসের এই 'পদার্থবিদদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস'-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সংবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিবেদিতা ১৮৯৯-র ২৬ ডিসেম্বর সারা বুলকে লিখেছেন, 'Yesterday — I heard from the Boses, Dr Bose has been actually invited to Paris— but Yum (Josephine) will send on the letters to you. I sent them to her first— knowing that you would not mind the trouble of keeping them till I come!'

জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে অধ্যাপনার চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও নিবেদিতা সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে সারা বুলকে উদ্যোগী করে তুলেছিলেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র বিদেশে যাতে একটি চাকরি পান সে ব্যাপারে উদ্বেগও নিবেদিতার ওই চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'How I wish he could get a lecturership— surely that would smooth things out. Anyway I hope he will come— and never go back. The suffering that race— prestige engenders in so sensitive a nature is fatal— and the climate is not conductive to research either.'

জগদীশচন্দ্র বিদেশে থেকেই তাঁর গবেষণা কার্য চালান— প্রাথমিকভাবে এরকমই যে চেয়েছিলেন নিবেদিতা, তা এই চিঠিটি পড়েই বোঝা যায়। আমেরিকায় থাকাকালীনও যে নিবেদিতা নিয়মিত জগদীশচন্দ্রের খোঁজ খবর রাখতেন, তা আরো ভালো বোঝা যায় ১৮৯৯-র ২৬ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে। নিবেদিতা লিখছেন, Dr. Bose's discoveries are going on apace. He has been working for 5 months without even a Sunday's rest. The Scientific Congress has asked him to Paris— but he is not sure of accepting— practical difficulties being many. For my part, I want him to come, feeling sure he will not return. I think I shall enclose their letters— Swami will like to hear his — asking you to send them on to Mrs. Bull. Oh, I wish that American lecturership could be got for him!'

নিবেদিতার এই চিঠিগুলি পড়লে বোঝাই যায়, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে অবস্থান করার সময়ও বসু দম্পতি, বিশেষত, জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একটি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এবং উভয়ের মধ্যে নিয়মিত সংবাদ আদানপ্রদান হত। অনুমান করা

যায়, নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতা—দুজনেই দুজনকে নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ের ভিতরে তাঁদের ভিতর আদান-প্রদান হওয়া কোনো চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু এই সময়টুকু নয়, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যাঁর সান্নিধ্য পেয়ে এসেছিলেন নিবেদিতা, সেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একটি বা দুটি চিঠি ছাড়া অন্য কোনো চিঠির সন্ধানই পাওয়া যায় না। একথা বিশ্বাস করা কষ্টকর যে, জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার ভিতর পত্র বিনিময় হয়নি। বিশেষত, পরস্পরের প্রতি তাঁরা যখন এতটাই নৈকট্য অনুভব করতেন। জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার ভিতর আদান-প্রদান হওয়া চিঠিপত্রগুলি কি তাহলে লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেল? নাকি সে চিঠিগুলি নষ্ট হয়ে গেল কালের নিয়মে? এরকম প্রশ্ন মনে জাগা কিন্তু অমূলক হবে না।

জগদীশচন্দ্রের প্যারিসে আমন্ত্রণ পাওয়ার পিছনেও নিবেদিতার ভূমিকা ছিল---প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার মতো কেউ কেউ এরকম ধারণাও করেছেন। প্রবুদ্ধপ্রাণা লিখেছেন, 'It seems that because of Nivedita's efforts, Patric Geddes, a pioneer in the field of sociology invited Bose to contribute a paper at the Congress of Scientists at the Exposition!

প্রবুদ্ধপ্রাণার এই ধারণাকে খুব একটা অসঙ্গত বলা যাবে না। বলা যাবে না এই কারণেই যে, জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিদেশে গবেষণার সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়ে নিবেদিতা বরাবরই আগ্রহী ছিলেন। এ ব্যাপারে সারা বুলের সক্রিয় সাহায্যও তিনি চেয়েছিলেন। তদুপরি, ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র যখন ইউরোপে যান, তখন বিদ্যুৎতরঙ্গ ও বেতারতরঙ্গ বিষয়ক তাঁর গবেষণা তাঁকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত করে তোলে। কিন্তু তারপরে কলকাতায় ফিরে এসে জড় বস্তুতে সংবেদনশীলতা বিষয়ে যে গবেষণা তিনি করেছিলেন, তা পাশ্চাত্যের কাছে অজানা ছিল। নিবেদিতা পাশ্চাত্যে যাওয়ার আগে এই গবেষণার কথা জেনে গিয়েছিলেন এবং জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ থাকার ফলে এই গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রও চাইতেন তাঁর এই গবেষণার কথা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মহল জানুক। জগদীশচন্দ্রের এই ইচ্ছার কথা নিবেদিতার অজানা ছিল এমন মনে হয় না। সেক্ষত্রে নিবেদিতা চাইতেই পারেন প্যারিসের এই সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র অংশগ্রহণ করুন এবং তাঁর গবেষণার বিষয় পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরুন। জগদীশচন্দ্রের জন্য সংগঠকদের পক্ষ থেকে একটি আমন্ত্রণ জোগাড় করাও তাঁর পক্ষে সে সময়ে খুব কঠিন কিছু ছিল না। কারণ, গেডিজের সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করা এবং গেডিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে নিবেদিতার পক্ষেই বরং জগদীশচন্দ্রের জন্য আমন্ত্রণ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল।

কিছু সরকারি টালবাহানার পর সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র জুলাই মাসের প্রথম দিকে প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। আগস্ট মাসে প্যারিসে এসে পৌঁছন। জগদীশচন্দ্রের বিদেশে একটি চাকরির ব্যাপারেও যে গেডিজকে অনুরোধ করেছিলেন নিবেদিতা—তা-ও জানা যায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, জগদীশচন্দ্র লোয়েল ইন্সটিটিউটের চাকরি গ্রহণ করুন, এমনটাই তাঁর ইচ্ছা। এ-ব্যাপারে প্যাট্রিক গেডিজের সঙ্গেও তিনি কথা বলবেন বলে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা।

প্যারিসে স্বামীজি লেগেট দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। পরে শ্রীমতী বুলের অনুরোধে ব্রিটানি প্রদেশের লানিয়ঁ নামে একটি জায়গায় কয়েকদিন কাটান। বিশিষ্ট ফরাসি দার্শনিক জ্যুল বোয়ার সঙ্গে এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করেন স্বামীজি। প্যারিসে লেগেট দম্পতির বাড়িতে স্বামীজি যে সময়ে ছিলেন, এই সময়ে ওই দেশের বিশিষ্ট জনেরা প্রায় রোজই স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। নিবেদিতাও মাঝেমধ্যেই যেতেন স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। স্বামীজি প্যারিসের ওই সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও, ফরাসি সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকটাই শিক্ষা নিয়েছিলেন। ফরাসি ভাষাও শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে সিস্টার ক্রিস্টিনকে এই ফরাসি ভাষাতেই তিনি বহু চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এসবেরই পাশাপাশি স্বামীজি ক্রমশ নিজেকে সব কাজ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। সব বিষয়েই ক্রমশ নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছিলেন স্বামীজি। তাঁর শরীরও ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। তাঁর আয়ুষ্কাল যে শেষ হয়ে আসছে, সম্ভবত স্বামীজি সেবার আমেরিকায় অবস্থান করার সময়েই বুঝেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজির জীবনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৯৯-'৯০ সালে আমেরিকায় অবস্থানকালেই স্বামীজি একদিন অভেদানন্দকে বলেছিলেন, 'আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি বড়জোর আর তিন-চার বছর বাঁচব।' অভেদানন্দ একথার প্রতিবাদ করলে স্বামীজি বলেছিলেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। আমার শরীরটা যেন বড় হয়ে যাচ্ছে। এই খাঁচাটা আর আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। একদিন শরীরটা ফেটে যাবে। এই রক্তমাংসের খাঁচাটা আর বেশিদিন আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

ওই সময়ে মৃত্যুচিন্তা যে স্বামীজিকে তাড়িত করেছিল, তা তাঁর লেখা চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়। ১৯০০ সালের ৪ মার্চ নিবেদিতাকে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আমি আর কাজ করতে চাই না—এখন বিশ্রাম ও শান্তি চাই।' ২৮ মার্চ নিবেদিতাকে লিখেছেন, 'এখন আমি এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়।' ৭ এপ্রিল কোনো একজন আমেরিকান বন্ধুকে লিখছেন, 'আমার তরী ক্রমশ: সেই শান্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যেখান থেকে সে আর বিতাড়িত

হবে না। জয়, জয় মা। আর আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নাই।' ১৮ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, '...বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থানে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! —যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক (সংসারে ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!' যাই, প্রভু, যাই! হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।... দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরনো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না।'

স্বামীজির এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, নিজেকে তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে কতখানি নির্লিপ্ত করে ফেলেছিলেন। কতখানি গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে।

প্যারিসে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা বিদগ্ধ সমাজে এবং বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। এ ধারণা করা যেতেই পারে যে, জগদীশচন্দ্রের এই সাফল্য নিবেদিতাকেও যথেষ্ট আনন্দিত করেছিল। কলকাতা ছেড়ে আসার এতদিন পরে বসু দম্পতিকে আবার কাছে পেয়ে নিবেদিতা এই সময়ে তাঁদের সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করলেন। যে ঘনিষ্ঠতা কলকাতায় থাকার সময় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ছিল, সেই ঘনিষ্ঠতাই আবার গড়ে উঠল প্যারিসে। নিবেদিতা তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলুন—এটা স্বামীজির কাছে কখনোই কাম্য ছিল না। তবু বসু পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে তিনি কখনো নিবেদিতাকে বাধা দেননি। অথচ, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও, জগদীশচন্দ্রের ব্রাহ্ম ভাবধারার প্রতি বিরূপই ছিলেন স্বামীজি। এমনকী, জগদীশচন্দ্র প্যারিসে আসার প্রাক্কালেও যে স্বামীজির এই বিরক্তি একটুও কমেনি তা বোঝা যায় মেরি হেলকে লেখা একটি চিঠিতে। ১৯০০ সালের ১৭ জুন ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'তুমি যদি মনে করে থাকো যে 'হিন্দুরা' বসুদের পরিত্যাগ করেছে, তা হলে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে এ ধরনের উন্নতি তারা কোনমতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে, সেইজন্য তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন। 'অ্যাংগ্লিসাইজ্‌ড' কথাটা দ্বারা সেই সকল লোকদেরই বোঝায় যারা তাদের স্বভাব ও আচরণের দ্বারা দেখিয়ে দেয় যে, তারা আমাদের—দরিদ্র ও সেকেলে হিন্দুদের —জন্য লজ্জিত। আমি আমার জন্ম, জাতি বা জাতীয় চরিত্রের জন্য লজ্জিত নই। এ ধরনের লোককে যে হিন্দুরা পছন্দ করবে না, এতে আমি আশ্চর্য নই।' অথচ, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানী প্রতিভার প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন স্বামীজি যে, প্যারিসে

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সভায় তিনিও শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে 'ভারতের বিজয়স্তম্ভ' বলে অভিহিত করেছিলেন সবার কাছে। বসু-দম্পতির প্রতি স্বামীজির যে এরকম বিরূপ মনোভাব, তা কিন্তু নিবেদিতারও অজানা ছিল না। কারণ, কলকাতায় অবস্থানকালেই তিনি যখন বসু-দম্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিলেন, তখন স্বামীজি জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সামনেই কঠোর বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। বলতেই হবে, স্বামীজির এই মনোভাব জানা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দিতে নিবেদিতা ব্যাকুল ছিলেন এবং বসু-দম্পতি প্যারিসে অবস্থানকালে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাও করেছিলেন তিনি।

কিন্তু প্যারিসে স্বামীজির আচরণ কিছুটা দ্বন্দ্বেই ফেলেছিল নিবেদিতাকে। স্বামীজির নিরাসক্ত ভাব, সবকিছু থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা নিবেদিতাকে দিশাহারা করে তুলেছিল। স্বামীজির কাছে নিজেকে অপাংক্তেয় মনে হচ্ছিল। রেমঁ লিখেছেন, 'দেখা দুজনের কমই হয়, হলেও সেটা সুখের হয় না। তাঁদের মধ্যে যে হৃদ্যতা ছিল তা যেন আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।' রেমঁর লেখা পড়ে মনেই হয়, স্বামীজি নিবেদিতার থেকেও এই সময়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকী, নিবেদিতার অনুরোধও যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তা-ও লিখেছেন রেমঁ। রেমঁ লিখছেন, 'মিসেস্ লেগেটের বাড়িতে গান-বাজনার সান্ধ্য আসর বসে। কখনও কখনও বিবেকানন্দ ওখানে যান। এমা কাল্‌ভে সে যুগের জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁর গান শুনে স্বামীজি আনন্দ পেতেন। এর আগে আমেরিকার সব বক্তৃতা-সভাতেই এমাকে দেখেছেন।

'এক সন্ধ্যায় বললেন, 'যে ভূমিকায় তুমি সব চেয়ে আনন্দ পাও, সেই ভূমিকায় তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে, কি সে ভূমিকা বল তো?

'এমার মুখ-চোখ আগুন রাঙা হয়ে উঠে। বলেন, 'যখন কার্মেন সাজি, তখন মনে হয় ঘর-ছাড়া বাঁধন ছাড়া যাযাবর তরুণী আমি। কিছু মনে করবেন না স্বামীজি, প্রতি সন্ধ্যায় নাচ-গানের আসরে আমার অজান্তে আমি অমনি হয়ে পড়ি।'

'আমি গিয়ে শুনব', স্বামীজি বলেন।

'বাধা দিয়ে নিবেদিতা বলে ওঠেন, 'কিন্তু সে যে অসম্ভব স্বামীজি। থিয়েটারে আপনার যাওয়া চলবে না, দারুণ সমালোচনা সইতে হবে তাহলে।'

'অবাক হয়ে নিবেদিতার পানে তাকান স্বামীজি। নিরুত্তর এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় মিঃ লেগেটের সঙ্গে নাট্যমঞ্চে গেলেন স্বামীজি।'

রেমঁ লিখেছেন, আমেরিকায় নিবেদিতা কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন তা শোনার কোনো আগ্রহ স্বামীজি দেখালেন না। এমনকী প্যাট্রিক গেডিজের সঙ্গে যে

দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিল, সে সম্পর্কে নিবেদিতা স্বামীজির পরামর্শ চাইতে গেলেও, স্বামীজি খুব উৎসাহ দেখালেন না। অর্থাৎ কিছুটা নিরাসক্তি দেখিয়েই যেন নিবেদিতাকেও দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন স্বামীজি। রেমঁ লিখছেন, 'একদিন দু'জনের মধ্যে চাপা পড়া রহস্যটা শুধু ধোঁয়া ছিল, হঠাৎ তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। নিবেদিতা রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর এই তেজের জন্যই তাঁকে স্নেহ করতেন স্বামীজি। তা বলে রেয়াত করতেন না তাঁর ধৃষ্টতাকে।

'বললেন, 'তুমি যেমন জেদী তেমনি একরোখা, ঠিক আমি যেমনটি ছিলাম। তোমার চালচলনে এখনও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রয়েছে। মায়ের কাছে নিজেকে সঁপে দাও। কি ভাল আর কি মন্দ বেছে নেওয়ার অভিমান এখনও তোমার রয়েছে। সুযোগ পেলেই নির্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাক। ভেদবুদ্ধি যাতে ছাড়তে পার, নিজের অন্তরে সেই শক্তি অর্জন কর। কেমন করে তা করবে আমি জানি না। অন্তরের অন্তস্থলে ডুবে যাও। সংস্কারের সকল ছাঁচ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে; তবেই না কূল ছাপিয়ে ছুটবে আলোর নির্ঝর। তখনই তোমার সব আয়োজন পূর্ণ হবে। যে পাঁকের ছোঁয়ায় আজ তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়ে গড়বে প্রতিমা, তাতে সঞ্চার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বস্তুকে দাম দিও না। তুমি শুধু অবিরাম সৃষ্টি করে চল।'

নিবেদিতার কাছে স্বামীজির এই আচরণ অস্বাভাবিক লাগলেও, আমেরিকায় অবস্থানকালেই কিন্তু মানসিকভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন স্বামীজি। ১৭ জানুয়ারি, ১৯০০ তারিখে ওলি বুলকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, '...এখন আমার মনে হচ্ছে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করার পালা আমার ফুরিয়ে গেছে, ঐ জাতীয় কাজ করে আর আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

'এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে। আর আমার কাছে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের আহ্বানও আসছে—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। আমার মন প্রস্তুত হয়ে আছে এবং আমায় এ তপস্যা করতে হবে।... আমি এখন জো আর নিবেদিতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপদান করুক—আমার কাছে ওসব আর নাই।'

এই সময়েই প্যাট্রিক গেডিজের সঙ্গেও নিবেদিতার দূরত্ব বাড়তে থাকে। গেডিজের সেক্রেটারির কাজে তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ নিয়ে তাঁর একটু মানসিক দ্বন্দ্ব ছিলই,তার ওপরে স্বামীজির এই আচরণ। স্বামীজির এই আচরণ নিবেদিতাকে সবিশেষ ব্যথিত এবং দুঃখিত করে তুলেছিল। আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজির উপেক্ষা যেরকম উদ্বিগ্ন এবং দিশেহারা করে তুলেছিল তাঁকে,

এবারও স্বামীজির আচরণে তেমনটিই হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। মনে হতে লাগল, স্বামীজি তাঁকে উপেক্ষা করছেন, দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। এই সময়ে সারা বুলকে লেখা চিঠিতে (১৩ আগস্ট, ১৯০০) নিবেদিতার এই ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্ত, এবং একই সঙ্গে হতাশা-বিষণ্ণ মনোভাবটি ধরা পড়েছে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'We seem to be in a thorn-grown twilight—all of us— and there is NO getting out. The most futile will o'the wisps in the whole wilderness those dreams of helping others, that lend us furthur into the morass of Hope. Because in Hell how can there be joy? And if no joy, then certainly no Help. One does not desire to receive (at least in one's hypocricy one believes one does not!) but the dream of giving dies hard. Well, there is no giving then. But at least one can suffer! How futile is the expedient! It is to know that one so longs. There is something big. We are conscious of our own love even in our powerlessness and despair. We require to be concious of That which is behind all such limitation. (Probably) It is. Certainly we do not know it. Nor do I see any hope of reaching for oneself unless Swami will give it by a miracle. That is what I have come to now. A mere universe and him — and sullen tolerance of things. Will he give it? Will he give it? Alas —dear Saint Sara, but I tell you this in a whisper — he can not. For I have seen him try, before. He would have done it already if he could. He has it — and the power to give — but something depends on oneself — and that is not there — of course it is not. Has one desired so greatly as to lose anything by it? Has one sacrificed mind or comfort (I mean real comfort—apparent comfort is a different thing — but be the bed soft or be it hard, sleep is really all that matters) or affection for the desire? And what did they sacrifice? —Ramakrishna and he? What did they not sacrifice rather?

'He told me himself that the desire for realisation came upon him 'like a fever' and wherever he was he would struggle for it —sitting in one place 24 hours at a stretch without moving. When has one even desired like this?

'How easy it to say—but I don't want Salvation in any form—I prefer to help, to be a sacrifice. When there is no help— and there needs no sacrifice— one might as well try for salvation!

'Don't say anything, about this letter. I don't see why I send it all.'

সারা বুলকে লেখা এই চিঠিতে নিবেদিতা তাঁর অন্তরের দ্বন্দ্ব, দুঃখ, বেদনা এবং দীর্ঘদিন পরিশ্রমজনিত যে অবসন্নতা তাঁকে গ্রাস করেছিল তা উজাড় করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার এই চিঠি পেয়ে সারা বুলও যে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, তা বোঝাই যায়। কেননা, তিনি এই চিঠি পাওয়ার পর নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানান, ব্রিটানিতে এসে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন থেকে যাওয়ার জন্য। মানসিক দ্বন্দ্বের পাশাপশি দীর্ঘদিনের একটানা পরিশ্রমে শারীরিকভাবেও নিবেদিতা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে কারণেই সারা বুলের আমন্ত্রণ পেয়ে ব্রিটানিতে যেতে দেরি করেননি নিবেদিতা। ব্রিটানিতে সারা বুলের আতিথ্যে শারীরিকভাবে অনেকটাই চাঙ্গাও হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা। ২২ আগস্ট ১৯০০ তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'After a week of walking eating and sleeping I am like a giant refreshed with wine — but I ask myself often— why I am loitering here? Ought I not to be doing something?'

তবে ব্রিটানিতে সারা বুলের আতিথ্য গ্রহণ করলেও, স্বামীজির আচরণজনিত বেদনা নিবেদিতা ভুলতে পারেননি। বরং, ব্রিটানিতে থাকার সময়ও তা তাঁকে তাড়িত করত। ব্যথিত এবং বিষণ্ণ করে তুলত। সবসময়ই ভাবতেন, স্বামীজি তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ২৯ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I was not worthy or ready to accept the personal in Him with the loving welcome that it should have had — and I am so thankful that there is one who is. I never felt Dearest so free of all jealousy of you, all miserable sense of inefficiency by your side, as I do today, When Swami has cut me off by a well — deserved stroke — and you stand to be all in all. Be that. Someday I shall come and kiss the hem of your garment — because I shall love Him as you do — having learnt it through seperation and through you. How strange! Who would have believed a week ago that today I should stand to Him in Miss Muller's position — only cut off by His act— not my own — and yet it has happened — and is well somehow. I have now nothing to live for — but Him, and those women of the future who are to be His. And this is absolutely true today and never has been before. Is it not strange? Yet I do not feel that I can send Him a letter or a message or treat Him otherwise than as if He were literally dead. Only, no one is to know but you and S. Sara.'

স্বামীজির আচরণে এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন নিবেদিতা যে, তাঁর মনে হয়েছিল আঁরিয়েতা মুলারের মতো হয়তো তাঁর সঙ্গেও স্বামীজির একটি চিরকালীন বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এই চিঠিতে নিবেদিতার সেই মানসিক একাকীত্ব এবং যন্ত্রণাই

ফুটে উঠেছে। আরও যা ফুটে উঠেছে তা হল, স্বামীজির জন্য তাঁর তীব্র আকুলতা; স্বামীজিকে হারানোর শঙ্কা। নিবেদিতা লিখছেন, 'I wish I had not struck back at Swami in writing my last letter to him! Hours after— I knew that I could have said it all so very differently. For when I cried out hour after hour, "But why did you do it that way, Swami?' —the answer came back, 'Why did you hurt Him? The same law!" But now I do not attach undue importance to the one more than to the other. Some day all will be made right — in life or in death. It does not matter which.'

স্বামীজির আচরণে নিবেদিতার উদ্বিগ্ন হওয়ার আরো একটি কারণও ছিল। জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্বামীজি যে বিশেষ পছন্দ করেন না তা নিবেদিতা জানতেন। ব্রাহ্মদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ স্বামীজি এর আগেও তাঁকে দিয়েছিলেন। স্বামীজির আশঙ্কা ছিল, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাবেন; যে দায়িত্ব নিবেদিতার ওপর তিনি অর্পণ করেছেন, তা যথার্থভাবে পালিত হবে না। স্বামীজির এই আপত্তির কথা জানা সত্ত্বেও নিবেদিতা কিন্তু তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ করেননি। বিশেষ করে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজের ব্যাপারে তিনি সবিশেষ উৎসুক ছিলেন। এমনকী, ১৮৯৯ সালে স্বামীজির সঙ্গে পাশ্চাত্যে আসার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিবেদিতার হৃদ্যতার সম্পর্কই ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে শিলাইদহে ছুটি কাটাতে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন সেই সময়। বিলেতের দিকে রওয়ানা হওয়ার কারণে নিবেদিতার সেবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়া হয়নি। সেজন্য কবির কাছে সবিশেষ দুঃখও প্রকাশ করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০০ সালে জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসু প্যারিসে এসে পৌঁছনোর পর নিবেদিতার অনেকটা সময়ই কাটছিল বসু দম্পতির সান্নিধ্যে। নিবেদিতা মনে করেছিলেন, বসু দম্পতির সঙ্গে তাঁর এই অতি ঘনিষ্ঠতা স্বামীজি ভালোভাবে নিচ্ছেন না। এতে বিরক্ত হচ্ছেন। এবং এই কারণেই নিবেদিতাকে অবহেলা করছেন, তাঁকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। স্বামীজি যে এর অনেক আগে থেকেই ক্রমশ নিজেকে সব কিছু থেকে বিযুক্ত করেছিলেন তা নিবেদিতা বুঝতে পারেননি।

এই ধারণা থেকেই স্বামীজিকে নিবেদিতা একটি চিঠি লেখেন। নিবেদিতা স্বামীজিকে ঠিক কী লিখেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। তবে ওঁর এই চিঠি পাওয়ার পর স্বামীজি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা থেকে কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায় নিবেদিতা ঠিক কী লিখেছিলেন স্বামীজিকে। আন্দাজ করা যায়, নিবেদিতার চিঠিতে কিছু অনুযোগ ছিল। নিবেদিতা পরিষ্কার জানতে চেয়েছিলেন, স্বামীজি কী ভাবছেন তাঁর সম্পর্কে। স্বামীজি নিবেদিতার চিঠির উত্তরে লেখেন (২৫ আগস্ট, ১৯০০),

'তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমি ঈর্ষান্বিত। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখছি—আমার অন্য যে কোন দোষ থাক না কেন, জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই।

'আমি আগে কখনো তোমাকে কোন আদেশ করিনি, এখন তো কাজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই— এখন আর কি আদেশ দেবো? আমি তো কেবল এই পর্যন্ত জানি যে, যতদিন তুমি সর্বান্ত:করণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

'তুমি যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, তাদের সম্বন্ধে আমার কখনো কোন ঈর্ষা নেই। কোন কিছু মেলামেশা করার জন্য আমি কখনও আমার ভাইদের সমালোচনা করিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস— পাশ্চাত্য দেশীয় লোকদের এই একটা বিশেষত্ব আছে যে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অন্যের উপর জোর করে চালাবার চেষ্টা করে, তারা ভুলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অন্যের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয়, তোমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকবে, তুমি অন্যের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনও কখনও কোন বিশেষ প্রভাব থেকে তোমায় দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি তো স্বাধীন, তোমার পছন্দমত নিজের কাজ বেছে নাও।...'

নিজেকে যে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন, নিবেদিতাকে এই চিঠিতে তা-ও জানিয়েছিলেন স্বামীজি। লিখেছিলেন, '...এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি।

'এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।

'এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ করছি।

'কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম—তা ভুলের ভিতর দিয়েই হোক বা সাফল্যের ভিতর দিয়েই হোক—এখন আমি কাজ থেকে অবসর নিলাম। বাকি জীবন আপনভাবে কাটাব।

'আমি এখন আর কারও প্রতিনিধি নই বা কারও কাছে দায়ী নই। বন্ধুদের কাছে আমার একটা অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতাবোধ ছিল। এখন আমি বেশ করে ভেবে-চিন্তে

দেখলাম—আমি কারও কাছে কিছু ধার ধারি না। আমি তো দেখছি, প্রাণ পর্যন্ত পণ করে আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেছি, পরিবর্তে পেয়েছি (বন্ধুদের) তর্জন-গর্জন, অনিষ্ট চিন্তা ও বিরক্তিকর ঝামেলা।...'

স্বামীজির এই চিঠি পড়ে বোঝাই যায়, বেশ কিছু মানুষের ব্যবহার, বেশ কিছু ঘটনা যেমন তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল—তেমনই একটি অবসন্নতাবোধও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এ-ও বোঝা যায়, নিবেদিতাকে তিনি যা-ই লিখুন না কেন, 'নূতন বন্ধু'দের সঙ্গে নিবেদিতার মেলামেশা তাঁর পছন্দের ছিল না। তিনি চিঠিতে একথা স্বীকার না করলেও বোঝাই যায়, কিছুটা ক্ষুণ্ণ তিনি হয়েছিলেনই। এই মন:ক্ষুণ্ণতা থেকেই হয়তো লিখেছিলেন, 'তুমি তো স্বাধীন, তোমার পছন্দমত নিজের কাজ বেছে নাও।'

স্বামীজির এই চিঠি কিন্তু নিবেদিতাকে সংশয়মুক্ত করতে বা তাঁর মানসিক অস্থিরতা দূর করতে পারেনি। বরং, এই চিঠিটি নিবেদিতাকে আরও সংশয়দীর্ণ করে তুলেছিল। নিবেদিতা ভেবেছিলেন, তাঁর চিঠির প্রত্যুত্তরে স্বামীজি তাঁকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলবেন। তাঁকে নির্দিষ্ট কিছু আদেশ দেবেন। আর তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন, স্বামীজি তাঁকে দূরে সরিয়ে দেননি। চিঠিটি পেয়ে নিবেদিতার আশাভঙ্গই হয়েছিল। কারণ, এই চিঠিটিও এক ধরনের নির্লিপ্ততাই বহন করে এনেছিল। স্বামীজি নিবেদিতাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, কোনো সুনির্দিষ্ট আদেশও দেননি। পরন্তু তিনি নিবেদিতাকে 'পছন্দমত নিজের কাজ' বেছে নিতে বলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই নিবেদিতার মনে হয়েছিল, স্বামীজি আর তাঁর মাঝখানে একটা পাঁচিল উঠে গিয়েছে।

নিবেদিতার এই মানসিক অস্থিরতা বুঝেছিলেন সারা বুল। সারা বুলের মনে হয়েছিল, স্বামীজিকে যদি ব্রিটানিতে আমন্ত্রণ জানানো যায়, স্বামীজি যদি এসে কয়েকদিন ব্রিটানিতে থাকেন, তাহলে গুরু-শিষ্যের ভিতর দূরত্ব কিছুটা কমে আসবে। বিবেকানন্দ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রিটানিতে এসেছিলেন। কিন্তু ব্রিটানিতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের শীতলতা দূর হয়েছিল কি? 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা যা লিখেছেন তা পড়লে অবশ্য মনে হয়, ব্রিটানিতে গুরু-শিষ্যা আবার পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, '১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আমি ব্রিটানিতে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন আমি একাকী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছিলাম, উদ্দেশ্য, ভরতীয় কার্যের জন্য সহায়তা লাভ ও অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা। কতদিন আমাকে সেখানে থাকিতে হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না। কোন কার্যপ্রণালীও নির্দিষ্ট ছিল না। সম্ভবত: স্বামীজির মনে এই চিন্তার উদয় হইয়া থাকিবে যে, পুরনো সম্পর্কগুলি বহু সময় বিদেশে নূতন সম্পর্ক স্থাপনের প্রবল অন্তরায় হয়। বহু লোককে তিনি কথা দিয়া কার্যের সময় পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়াছেন। মনে হইত, অন্য যে কেহ ঐরূপ করিতে পারে, এজন্য

তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। যেভাবেই হউক, তাঁহার শিষ্যের পক্ষে ঐ সময়টি ছিল সঙ্কটকাল, এবং উহা তিনি অবহিত ছিলেন। ব্রিটানিতে অবস্থানের শেষ দিন সন্ধ্যার পর লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারপ্রান্তে আমি সহসা স্বামীজির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তখন রাত্রির আহার সমাপ্ত হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্বামীজি আমাকে উদ্যানে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। আমি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, তিনি জনৈক বন্ধুর সহিত নির্দিষ্ট কুটিরে যাইবার পথে আমাকে আশীর্বাদ জানাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন।

'আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে; শোনা যায়, তারা এত গোঁড়া যে, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে বলে, "যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তোমার মৃত্যু হোক, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন তবে বেঁচে থাক।" শিশুকে তারা যা বলে থাকে, আজ রাত্রে আমিও তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু কথাটাকে উল্টে দিয়ে—যাও কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।"

'তথাপি পরদিন সকালে, সূর্যোদয়ের একটু পরেই তিনি পুনরায় আসিলেন আমাকে বিদায় দিতে। ইউরোপের ভূখণ্ডে তাঁহার সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। আর একবার কৃষকের পণ্যবাহী শকট হইতে এই শেষ দিনটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই, স্বামীজি আমাদের ল্যানিয়ঁর কুটিরের বাহিরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছেন এবং ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে, আলোকে সমুজ্জ্বল আকাশ। প্রাচ্যদেশের অধিবাসীগণের নিকট ইহা কেবল অভিনন্দন নহে, আশীর্বাদও।'

এই ব্রিটানিতেই স্বামীজি একখানি কবিতা লিখে নিবেদিতাকে উপহার দিয়েছিলেন। কবিতাটির নাম 'A Benediction'। কবিতাটি এইরকম ঃ

'The mother's heart, the hero's will
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan Alters, flaming, free;
All these by yours and many more
No ancient soul could dream before
Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one.'

তবে, ব্রিটানিতে স্বামীজির সান্নিধ্য যে তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল, তাঁর অশান্ত হৃদয়কে যে অনেকটা শান্ত করেছিল, এবং তাঁর বাকি জীবনেও এক

মধুর স্মৃতি হয়ে ছিল ব্রিটানির দিনগুলি, তা নিবেদিতার পরবর্তী লেখা থেকেই বোঝা যায়। স্বামীজির মৃত্যুর চার বছর পর, ১৯০৬ এর ১২ জানুয়ারি, স্বামীজির জন্মদিবসে সারা বুলকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'You remember that Swamiji made me free to see things a little ahead, and plan, saying, that sweet last evening in Brittany, "that also is Mother.' If I were to die, I think I would so like you to take the Bairn (Jagadish Chandra Bose) to Brittany, and show him the garden in which Swamiji gave me that great final blessing— His apostolic charge to me.' যে বাগানে একদিন স্বামীজি তাঁকে চরম এবং পরম আশীর্বাদটুকু করে গিয়েছিলেন, তিনি না থাকলেও সেই বাগানটিই একবার জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়ে আনার অনুরোধ শ্রীমতী বুলের কাছে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। তাঁর এই ইচ্ছার ভিতরই কোথায় যেন বিবেকানন্দ এবং জগদীশচন্দ্র দুজনেই একাকার হয়ে গিয়েছেন।

একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনেই দেখা দিতে পারে যে, বিবেকানন্দ এবং জগদীশচন্দ্র—এই দুই ব্যক্তিত্বের ভিতর কার বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় ১৮৯৫-র শেষভাগে। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় ১৮৯৮-এ। কেউ কেউ অবশ্য বলেন ১৮৯৯-র গোড়ায় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়।

সে অর্থে নিবেদিতা বিবেকানন্দের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন ছ বছরের কিছু বেশি। আর জগদীশচন্দ্রের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বারো-তেরো বছর। একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, জগদীশচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ এই দুই ব্যক্তিত্বের প্রতিই নিবেদিতার ছিল অশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। দুই বিরোধী মতের এই দুই ব্যক্তিত্বের কাউকেই নিজের জীবন থেকে হারাতে চাননি নিবেদিতা। মনে রাখতে হবে, নিবেদিতা বিবেকানন্দকে প্রথম দেখেছিলেন এক ভারতীয় ধর্মপ্রচারক হিসাবে। বিবেকানন্দের ধর্মীয় দর্শনের পাশাপাশি তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তা নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম থেকেই বিবেকানন্দকে নিবেদিতা বসিয়েছিলেন ভক্তিমিশ্রিত আচার্যের আসনে— যে আচার্যের প্রতি তাঁর অধিকারবোধ ছিল প্রবল। বিবেকানন্দ তাঁকে দূরে সরিয়ে দিলে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। অভিমানী হয়েছেন। বিবেকানন্দকে হারিয়ে ফেলার শঙ্কাও তাঁর মনে এসেছে। আবার বিবেকানন্দের সব নির্দেশ বিনা প্রশ্নে তিনি মেনেও নেননি। বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্ক করেছেন। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। একথাও ঠিক যে, বিবেকানন্দের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি জগদীশচন্দ্র এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গিয়েছেন। আবার পাশাপাশি এ কারণে বিবেকানন্দকে কখনো দুঃখ দিতেও তিনি চাননি। বিবেকানন্দের

কাছেই নির্দেশ চেয়েছেন— এই সব সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কী করবেন? বিবেকানন্দ স্পষ্টত কখনোই তাঁকে এইসব সম্পর্ক ভেঙে আসতে বলেননি।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কটি কিন্তু প্রথম থেকেই সংবেদনশীল বন্ধুর ছিল। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। পাশাপাশি, সেই সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের চূড়ান্ত অসহযোগিতা সত্ত্বেও যে কষ্টের ভিতর জগদীশচন্দ্র নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন তা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে যে বৈষম্য সেই সময়ে হয়েছিল—তা নিবেদিতাকে ব্যথিতও করেছিল। জগদীশচন্দ্রের এই একক লড়াইটিই প্রথমাবধি তাঁর প্রতি নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল। এই বঞ্চিত অসহায় বাঙালি বিজ্ঞানীর পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়ানো উচিত—এটিই নিবেদিতা বলেছিলেন। এমনকী, এ কথা তিনি স্বামীজিকেও বলেছিলেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুলকেও বহুবার বিভিন্ন চিঠিপত্রে একথা লিখেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার এই বক্তব্য স্বামীজিও কিন্তু প্রকারান্তরে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই বিদেশে জগদীশচন্দ্রকে গবেষণার সুযোগ করে দিতে এত তৎপর ছিলেন নিবেদিতা। একথা ঠিক, নিবেদিতার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগ জগদীশচন্দ্র পছন্দ করতেন না। তার জন্য তিনি প্রকাশ্যেই নিবেদিতাকে কটূ কথা বলতেন। তৎসত্ত্বেও নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে এই মতবিরোধকে আমল দেননি। জগদীশচন্দ্রের এই মনোভাবে তিনি কষ্ট পেলেও দূরে সরে আসার কথা কখনো ভাবেননি। একথাও সত্য যে, তাঁর পুস্তক লেখার বিষয়ে নিবেদিতার সহায়তার কথা জগদীশচন্দ্র কখনো স্বীকার করেননি। এ কাজ নিশ্চয়ই অন্যায়। আবার একথাও ঠিক যে, শেষ পর্যন্ত তিনিই নিবেদিতার শুভানুধ্যায়ী পরম সুহৃদের ভূমিকাটি পালন করে গিয়েছেন। এমনকী জীবনের শেষ কয়েকটি দিন নিবেদিতা কাটিয়েছিলেন বসু দম্পতির সঙ্গে, দার্জিলিংয়ে, রায়ভিলায়। নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে নিজের উইলে জগদীশচন্দ্র একলক্ষ টাকা রেখে যান। জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরেও নিবেদিতার নিরুচ্চার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাতিষ্ঠানিক চিহ্ন (লোগো) বজ্র। বুদ্ধগয়া বেড়াতে গিয়ে এই বজ্র চিহ্নটিই নিবেদিতা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কল্পিত ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নিবেদিতার একটি রিলিফের মূর্তি আছে। আর বসানো হয়েছিল একটি শেফালি গাছ। তারা চারা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে অজন্তায় বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন নিবেদিতা স্বয়ং। আর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ফোয়ারার নীচে প্রোথিত করা হয়েছিল নিবেদিতার চিতাভস্ম। অর্থাৎ, জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবন থেকে নিবেদিতাকে মুছে ফেলেননি কখনো। নিবেদিতার মৃত্যুর পরও জগদীশচন্দ্র অনেকদিন বেঁচেছিলেন। অনেক পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। নিবেদিতার মৃত্যুর পর

জগদীশচন্দ্র যে মানসিকভাবে বিষণ্ন, নিঃসঙ্গ এক মানুষের মতোই বেঁচে ছিলেন— ১৯১৩-র ২১ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা সিস্টার ক্রিস্টিনের একটি চিঠি থেকেও তা জানা যায়।

বিবেকানন্দ এবং জগদীশচন্দ্র দুজনের সঙ্গেই শুধু নিবেদিতার নয়, নিবেদিতার পরিবারেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বামীজি যখন তৃতীয়বার লন্ডনে যান, তখন উইম্বলডনে নিবেদিতার পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। নিবেদিতার পরিবার স্বামীজিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তবে, স্বামীজি খুব বেশিদিন ওই পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেননি। তুলনায়, জগদীশচন্দ্র অনেক বেশিদিন ওই পরিবারের সান্নিধ্যে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ তিনি হতে পেরেছিলেন। ১৯০০ সালে প্যারিস হয়ে লন্ডনে যাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র উইম্বলডনে নিবেদিতার পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন থেকেই নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড এবং বোন মেরির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, যা পরে জগদীশচন্দ্রকে নোব্‌ল পরিবারের পারিবারিক বন্ধু করে তোলে। নোব্‌ল পরিবার যে জগদীশচন্দ্রকে আপন করে নিয়েছিলেন তা বোঝা যায় নিবেদিতার একটি চিঠি থেকেও। ১৯০১-এর ২২ মার্চ উইম্বলডন থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'It is so sweet that everything in this house is being taken up as it were and dedicated to India, in the fact that the Boses are using it. I can not tell you either how thankful I am for Rich's (Richmond) share in their companionship. I do not believe that he ever before saw a nature so ideal as Mrs. Bose's. How much this means! I do hope anyway that my Brother also will some day be Swami's Child.'

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নোবল্‌ পরিবারের যোগাযোগ ছিল নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও। নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার বোন মেরি উইলসনের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ রাখতেন। নিবেদিতার চিতাভস্ম বিলেতে নোব্‌ল পরিবারের কাছে পাঠিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রই— এরকমই অনুমান করা যায়। এই ঘনিষ্ঠতা কতটা ছিল? নিবেদিতার বোন মেরি উইলসনের পৌত্র ক্রিস ওরপেন এই সংক্রান্ত একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, ১৯০০ সালে নিবেদিতার বোন মেরির একটি কন্যাসন্তান (ক্রিসের মা) জন্মান। সেই কন্যাসন্তানের নাম রাখা হয় মার্গারেট বোস উইলসন। নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের স্মৃতিকে ওই নামের মধ্য দিয়েই ধরে রাখতে চেয়েছিল নোব্‌ল পরিবার।

ক্রিস আরো জানিয়েছেন, মেরি উইলসনের স্বামী আর্নেস্ট উইলসন পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আর্নেস্ট উইলসনের অন্তত হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আর্নেস্ট উইলসনের সংগ্রহে একটি আঁকা ছবি রয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে তিনি

টেবিলে বসে কাজ করছেন। তাঁর পিছনে, দেওয়ালে রয়েছে তিনটি ফ্রেমের ভিতর দুটিতে দুই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন এবং মার্কনির ছবি। তৃতীয় ফ্রেমটি ফাঁকা। সেটিতে রয়েছে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ক্রিস মনে করেন, ওই ফাঁকা ফ্রেমটি জগদীশচন্দ্রের কথা মনে করেই আঁকা হয়েছিল।

নিবেদিতা-বিবেকানন্দ এবং জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের কোনো চটজলদি বাখ্যা বোধকরি দেওয়া সম্ভব নয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-নির্ভরতা-বিশ্বাস সব মিলিয়ে এ এক অন্যতর ভালোবাসার সম্পর্ক। কোনো চেনা ব্যাখ্যায় তাকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া মূর্খামি। বরং, সে ব্যাখ্যার চেষ্টা হলে এই সম্পর্ককেই অবমাননা করা হবে, যা কখনই কাম্য নয়। তবে, এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর ঘনিষ্ঠতম সুহৃদের স্থানটি অধিকার করলেও, শেষ দিন পর্যন্ত বিবেকানন্দই ছিলেন কিন্তু নিবেদিতার জীবনের ধ্রুবতারা। জীবনটুকু তাঁকেই সমর্পণ করেছিলেন নিবেদিতা। সে সত্য নিবেদিতার জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করলেই উদ্ভাসিত হয়।

তেইশ

নিবেদিতা ব্রিটানি থেকে লন্ডনের দিকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে স্বামীজি ফিরে এলেন প্যারিসে। প্যারিসে বিশিষ্ট দার্শনিক এবং লেখক জ্যুল বোয়ার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি। কিছুদিন প্যারিসে অবস্থান করার পর ১৯০০ সালের ২৪ অক্টোবর ইয়োরোপের অন্যান্য জায়গা পরিভ্রমণের উদ্দেশে প্যারিস ত্যাগ করলেন তিনি। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হলেন জ্যুল বোয়া, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, এমা কালভে এবং শ্রী ও শ্রীমতী লেয়জেঁ। ভিয়েনা, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, রোমানিয়া, কনস্তান্তিনোপল, বুলগেরিয়া এবং এথেন্স ঘুরে স্বামীজি এবং তাঁর সঙ্গীরা পৌঁছলেন মিশরে। সেখান থেকে স্বামীজি একাই ভারতের দিকে রওয়ানা হলেন। ৯ ডিসেম্বর স্বামীজি ভারতে এসে পৌঁছোন। ১৯ ডিসেম্বর একটি চিঠিতে স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখছেন, 'মহাদেশসমূহের আর একটি প্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমায় প্রশ্ন করছে : 'কেমন আছ'? এতে তুমি অবাক হচ্ছ না কি? বস্তুত: আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গম।

'আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কনস্তান্তিনোপল, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত কায়রো—সবই পেছনে ফেলে এসেছি, আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচছে; শুধু ক্বচিৎ দু-একখানা মালবাহী নৌকোর দাঁড়ের শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে।'

নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০০, তিনি ফিরে আসেন লন্ডনে। এই প্রসঙ্গে লিজেল রেমঁর লেখায় একটু ভুল তথ্য দেওয়া আছে। রেমঁ লিখেছেন অক্টোবরের শেষে নিবেদিতা লন্ডনে ফেরেন। নিবেদিতার সঙ্গে লন্ডনে আসেন জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুও। রেমঁ লিখছেন, '...একখানা ক্যাবে মালপত্রসুদ্ধ তিনজন ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছেন। জানলার গায়ে মুখখানা চেপে নিবেদিতা দেখতে

চেষ্টা করেন কোথায় চলেছেন। কিন্তু ঘন কুয়াশার বিচ্ছিন্ন ছায়ায় চারিদিক আবছা। বসুরা শ্রান্ত, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল তাঁদের। নিবেদিতা শীতে কাঁপছেন।...'

লন্ডনে আসার পর বসু দম্পতির আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি পরস্পরের আরও কাছে আসেন। জগদীশচন্দ্রের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করেই এই বন্ধন আরো দৃঢ় হয়। লন্ডনে আসার পর জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ জগদীশচন্দ্রের শুশ্রূষার জন্য নিবেদিতা লন্ডনে পৌঁছেও সাময়িকভাবে তাঁর অন্যান্য কাজ কিছুদিন মুলতুবি রাখেন। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জগদীশচন্দ্রের একটি অস্ত্রোপচার হয়। অস্ত্রোপচারের পর বিশ্রামের জন্য অসুস্থ জগদীশচন্দ্রকে উইম্বলডনে তাঁর মায়ের বাড়িতে নিয়ে আসেন নিবেদিতা। এই সময় সারা বুলও জগদীশচন্দ্রের শুশ্রূষার জন্য তাঁদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন। অসুস্থ জগদীশচন্দ্রকে এই সময়ে শুধু যে অক্লান্তভাবে সেবাযত্ন করেছেন নিবেদিতা তা-ই নয়, তঁকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখবার জন্যও নিবেদিতার চেষ্টা কিছু কম ছিল না। নানাবিষয়ে আলোচনা করে, নানাভাবে আমোদপ্রমোদের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রকে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতে চাইতেন নিবেদিতা। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'সন্ধ্যায় নিবেদিতা বসুকে একেবারে সুমেরু হতে নিয়ে আসেন কুমেরুতে। গোয়েন্দা-কাহিনী চেঁচিয়ে পড়ে শোনান। তাঁদের আর একটা বড় আমোদ হল ফি-রবিবার সারের বীচ-বনের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালানো। সেবারের বসন্ত ঋতু কাটল এমনি করে।' সেবছর তাঁর জন্মদিনটাও সারের ওই বিচ-বনে বসুদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০০-এর ১৯ নভেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা, 'We have spent a few days in the Surrey pine woods—in a perfect heaven. There I had my birthday—mother and Boses being with us.'

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখায় ওই সময়ের ছবি পাওয়া যায় নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড নোব্‌লের স্মৃতিচারণে। রিচমন্ড বলেছেন, 'ডা. বসু হুইস্ট তাস খেলতে ভালবাসতেন। মার্গারেট খেলতে চেষ্টা করত, কিন্তু এ ধরনের আমোদে সে নির্লিপ্তভাবে যোগ দিত, সেটাই তার স্বভাব ছিল। আসল মজা ছিল তার খেলার ধরনে---যা নিয়ে আমরা আমোদ করতুম।

'আমোদ-প্রমোদের কথায় আমার মনে পড়ছে তার বাইসাইকেল চড়ার চেষ্টার ব্যাপারটি। এক সময়ে রাস্তার অন্যদিকে একজন ঝালাইওয়ালা কাজ করছিল। সাইকেল-অধিষ্ঠিত মার্গারেট তাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণবস্তু মনে করল—এবং ধাক্কা মারার কাজটি নিবারণ করতে পারল না কিছুতে। দৃশ্যটা আমি কখনোই ভুলব না—

আমার ভগিনীদেবী গতিশীল সাইকেলে আসীনা, তাকে প্রাণপণে সংযত করতে চেষ্টা করছেন, যেমন অশ্বরজ্জু আকর্ষণ করে থাকে লোকে, প্রশস্ত পথকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে ছুটছেন, কণ্ঠে উচ্চনিনাদ: 'মি: ঝালাইওয়ালা, সাবধান! সাবধান!' আজ পর্যন্ত স্যার জগদীশ বসু হাসিতে বেসামাল হয়ে পড়েন সেই ঘটনাটি স্মরণ করলেই।'

এই সাইকেল চালানোর ঘটনাটির উল্লেখ পাই নিবেদিতার চিঠিতেও। ১৯০১-এর ৪ এপ্রিল জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখছেন, 'We are all bicycling morning and evening, as our holiday exercise, and are enjoying it much. Even Saint Sara has begun to learn, with Rich as tutor.'

এই চিঠিতেই ওই সময়ে, বসু দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতা দিনযাপনের একটি টুকরো ছবিও পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখছেন, 'We are taking all our meal in the kitchen— as Dr. Bose has made the dining-room into his holiday-laboratory. I wish you could see it. You don't know how grand it looks with the instruments about.'

শুধু যে আমোদ-প্রমোদ বা অন্যান্য বিষয়ে আলোচনাতেই জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতা সীমাবদ্ধ ছিলেন তা নয়, অনেক ব্যক্তিগত বিষয়েও এই সময়ে দুজনের ভিতর আলোচনা হত। ব্যক্তিগত বিষয়ে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার সহায়তাও চাইতেন। জগদীশচন্দ্র এই সময়েই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর তরুণ ভাগ্নে অরবিন্দমোহন বসুকে (আনন্দমোহন বসুর পুত্র) নিবেদিতার কাছে বছরখানেক শিক্ষাব্রতী হিসাবে রাখতে। এই প্রস্তাব নিবেদিতার পছন্দ হয়। তিনি তাতে সম্মতও হন। ৪ এপ্রিলের ওই চিঠিতেই একথাও জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Dr, Bose wants me to have his little nephew, Mr. A. M. Bose's tiny son, for a year or so, but he seems to think that Sarala Devi may object. I scarcely think she will, but I have wirtten to ask. I want to have him with me continually, except when he is at Bengali lessons everyday. And we want him to grow up such a patriot and such a man of science in one, as the world has never seen.'

জগদীশচন্দ্রের এই অসুস্থতার সময়েই আর একটি কাজও করেন নিবেদিতা। তিনি জানতেন জগদীশচন্দ্র বিবেকানন্দের ধর্মমতের সমর্থক নন, তবু জগদীশচন্দ্রের কাছেই ব্রাহ্ম ধর্মের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা শুনতে চান নিবেদিতা। বলা ভালো, এ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রকে কিছুটা চাপই দেন তিনি। এবং জগদীশচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা শোনা যে তাঁকে অনুভূতির অন্য একটি মাত্রা এনে দিয়েছিল, তা-ও স্বীকার করেছেন নিবেদিতা। তাঁর এই অনুভূতির কথা তিনি জানিয়েছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে। ১৯০১-এর ৪ জানুয়ারি জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I am trying to get

the whole of Brahmo feeling and tradition honestly. And it seems a right and necssary side to get. There has been a tremendous resolution on his side to overcome—for he felt that honour could never permit my hearing his views from him. But at last I think I am getting it all. And I am throwing myself into it completely, as I think S.R.K. (Sree Ramakrishna) would wish me to do, and trying, if that might be, to reach GOD that way. You will remember that we (or at last I) did to love even Shiva and Kali at first. Even S.R. K. can not have loved all religions equally. So I may say without any disloyalty to the effort I am making that at present it is dreadfully like the Puritanism of my childhood. But I feel strongly that the more this is the fact, the more must I try to do it. And sometimes I am quite clear and sure that the call and the effort come straight from S.R.K. Himself. And at other times I think of Swami and shudder — for I do not think he could understand or approve — and to be disapproved of by him is still the uttermost depth to me. Moreover, I seem to be casting away all that I have lived for—all that it has been Freedom to possess — so far. But how mean even to think in such a way! As if it were so dreadful to see one's own miserable little self in the wrong! No wonder one is so shy of seeing it hungry or cold or ridiculed.'

চিঠিটি পড়ে বোঝাই যায়, জগদীশচন্দ্রের ব্যাখ্যা যেমন নিবেদিতাকে মুগ্ধ করছে, ভাবাচ্ছে—তেমনই পাশাপাশি স্বামীজি একে কীভাবে নেবেন তা ভেবেও দোলাচলে ভুগছেন তিনি। অর্থাৎ এক সংশয় এবং দ্বন্দ্বে যে নিবেদিতা পড়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু নিবেদিতার ভিতরের এই দ্বন্দ্ব এবার বেশিদিন চলেনি। যতই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় হয়ে উঠুক না কেন, যতই জগদীশচন্দ্রের কাছে শোনা ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা তাঁকে মুগ্ধ করুক না কেন—শেষ পর্যন্ত কিন্তু স্বামীজির প্রভাবই, অন্তত ধর্মীয় দর্শনের দিকে, তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। বা বলা ভালো, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত স্বামীজিই তাঁর অবলম্বন হয়েছেন। এই একটি ক্ষেত্রে, স্বামীজির উপরে তিনি কাউকেই স্থান দেননি। জগদীশচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে যখন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা চিঠি লেখেন, তার কিছুদিন পরেই টানব্রিজ ওয়েলসের একটি গির্জায় তাঁর বক্তৃতা ছিল। ওই বক্তৃতা দিয়ে আসার পর ১১ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখে জোসেফিনকে আর একটি চিঠি লেখেন নিবেদিতা। সেই চিঠিতে তিনি লিখছেড়, 'Last Sunday I lectured twice at Thenbridge Wells, and meet Sara grand there. It was an extraordinary thing that came to me there.

I told you that I was trying to lay hold of Brahmoism. Well, S. Sara says I am not doing that at all, but at any rate, on Sunday night it was religious service at which I had to speak, and I found myself taking the highest part of everything Swami has ever given us. Then I understood in a flash that my notion about Brahmoism had been a kind of call to me to do this, which I should have never done, perhaps, without that invitation from another's need. so I am able to realise that I really may have been using images to thawrt and blind my vision of the One. And that untill I have achieved that vision, I may not go back to the Image. I cannot tell you the peace of this discovery. And it is not a wonderful proof of the truth of Adwaita that Swami is so tremendous that every path means faithfulness to him?'

বোঝাই যায়, শেষ পর্যন্ত নিবেদিতার এটাই মনে হয়েছিল যে, স্বামীজি এতদিন ধরে এইটেই তাঁকে দিয়ে এসেছেন। তবে, এই আলোচনার সময়ে জগদীশচন্দ্র যে একবারের জন্যও যেসব বিষয়ে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ আছে, সে সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি—তা-ও নিবেদিতা জানিয়েছেন। ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'He would not discuss with me the points on which Swami and he differed because it would be dishonourable.' ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে আলোচনার সময়ে জগদীশচন্দ্র স্বামীজি-প্রসঙ্গ না আনলেও, মাঝেমধ্যেই স্বামীজির প্রসঙ্গ যে উঠত সে স্বীকারোক্তিও নিবেদিতার লেখাতেই পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে স্বামীজির আত্মীয়তা নিয়ে নিবেদিতার কথার সূত্র ধরে এরকম স্বামীজির প্রসঙ্গ এসেছিল। ১৯০০ সালের ১৫ নভেম্বর একটি চিঠিতে জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I see a great deal of Mr. R.C. Dutt, and he tells me that he has never meet the King. Dr. Bose is greatly amused at what he considers Mr. Dutt's willingness to become a favourite. For I argued with him that if he was related to Toru Dutt, he must be also to Swami, and he did not deny the soft impeachment. Some other triffle of a similar sort happened, and Dr. Bose pounced on him for his cleverness in sweeping everyone who would be a credit to him into his family. "Why" he said "Swamiji is almost your half brother!" Dr. Bose thinks that arguments of that nature must be quite irresistible passports to my heart!'

আবার স্বামীজির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জগদীশচন্দ্র কখনো কখনো নিবেদিতাকে উপহাসও করতেন। ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'Dr. Bose was teasing me (being tired and cross one day and having a natural tendency so be tormenting!) about Swami and Mr. Mohini. And I said (I did not

quite know who was the 2nd person whom he meant — but Mrs. Bose knew) "there is no equality between the two men— that they should be compared." Mrs. Bose intervened quitely at this end and said "Nivedita is quite right. The comparison is absurd."

জগদীশচন্দ্রের সান্নিধ্যে এই দিনগুলিতে স্বামীজি লন্ডনে উপস্থিত না থাকলেও, নিবেদিতার ভাবনায় কিন্তু সব সময়েই স্বামীজি ছিলেন। স্বামীজির সান্নিধ্য লাভ এবং স্বামীজির ছায়ায় সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপনের ইচ্ছাও তিনি ঘোষণা করতেন। যে চিঠিতে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে তিনি এত কথা লিখেছেন, সেই চিঠিতেই স্বামীজির সান্নিধ্য কতটা কামনা করেন তিনি তা-ও জানিয়েছেন। লিখেছেন, 'Tell Swami I have only one wish in the world and that is to live a nun's life perfectly. But everyday the golden apple of my desire seems to slip further out of my hands. Will he bless me and give it me?' অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত স্বামীজির কাছেই নিজেকে সমর্পণ করার আকুতি তিনি প্রকাশ করেছেন। স্বামীজির প্রতি তাঁর এই আনুগত্য যে কতখানি, তা আরও পরিষ্কার হয় তাঁর Hints on National Education In India-র অংশবিশেষ পড়লে। নিবেদিতা সেখানে লিখছেন, 'To see the thing as it appears to the mind of the Master, is the one necessity. To serve him, acting as his hands and feet, as it were, in order that one's mind and heart may be made one with his; to serve him silently, broodingly, with the constant attempt to assimilate his thought, this is the method.'

এই সময়ে নিবেদিতা কিন্তু ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ইংল্যান্ডে তিনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন। বরং, ভারতে ফিরে গিয়ে দ্রুত স্কুল শুরু করাটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল তাঁর। ১৯০১-এর ৪ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Have I any business to go on in England? Is it a real call to stay here?— or only a fancied call? As far as wishes go — my whole souls is in India. I am more and more convinced that there is nothing to be down outside. And what I am doing here seems the mearest fancy-work.'

নিবেদিতা যে সত্যিই ভারতে ফিরে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন, এবং ঠিক করেছিলেন সে বছর মে মাস নাগাদ কলকাতা ফিরে আসবেন তা ওই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন, 'Dr. and Mrs. Bose talk much of my going round India to the various people they know—as Mrs. Bose says "like the sacrificial horse" —before I settle down in Calcutta. And I suppose if they really mean this that it might be a good thing to do.

'If this is so I think I am going to strike for March, and if they do not, I may get to calcutta either by May (which would bring me just in time for the heat, and seems foolish) or October.'

জগদীশচন্দ্র একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে পুরোদমে নেমে পড়লেন। লন্ডনের বিশিষ্ট, শিক্ষিত সমাজে নিবেদিতা অপরিচিত ছিলেন না। ভারতে আসার আগেই লন্ডনের শিক্ষিত সমাজে নিবেদিতার একটা আলাদা স্থান ছিল। লন্ডনের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা কিছু কম ছিল না। তবে, ভারতে আসার আগে নিবেদিতা বিভিন্ন সভায় বা সমাবেশে যে বক্তৃতা দিতেন, এবারের বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি ছিল তার থেকে পৃথক। বক্তৃতার উদ্দেশ্যও ছিল আলাদা। এবার নিবেদিতার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্যই ছিল স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া। নিবেদিতা লন্ডনে টনব্রিজ ওয়েলস, হাইয়ার থট সেন্টার এবং সিসেম ক্লাবেই মূলত বক্তৃতা দিতেন। লন্ডনের 'ডেইলি নিউজ'-এ নিবেদিতার বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হত। 'দ্য হিন্দু' কাগজের লন্ডনস্থিত সংবাদদাতা লিখেছিলেন,

'There has arisen a champion for India from an unexpected quarter, as was the way with champions of old. Not from a far country, however, nor from a strange people, nor from masculine ranks, has this new champion come. She is a lady, belonging to the Ruling Power in India, a lady of exceptional ability, who has given up a promising career in England to devote herself to the service of the women in India. Miss Margaret Noble is her name, and though she has been only eighteen months in India, she has learned more of real Indian life during that time than have others who have passed as many years there. ...She has been admitted a member of the Order of Ramakrishna and, as 'Sister Nivedita' is now in England addressing audiences in various places on the subject of Indian life and philosophy. She is a striking figure to English people, garbed in a gown of white flannel, graceful in cut but of extreme simplicity; the beads round her nck suggest a rosary...her eloquence striking, she speaks without notes, animated simply by an intense sympathy for the people of India and the desire to break down some of the false ideas which have been associated with Indian ladies by English people.'

নিবেদিতার এবারের বক্তৃতার বিষয়গুলি কিন্তু নিছক ধর্মভিত্তিক ছিল না। বরং, ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় নারী এবং শিক্ষা পদ্ধতি তাঁর বক্তৃতার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিল। নারীজাতির আদর্শ, ভারতের সমস্যা, ভারতীয় নারী, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি, ভারতে ইংল্যান্ডের ব্যর্থতা, রামকৃষ্ণ সংঘ, ভারতের সামাজিক জীবন—

এইসব বিষয়ের ওপরেই তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর এইসব বক্তৃতা লন্ডনের শিক্ষিত সমাজের প্রশংসাও লাভ করেছিল। এই সময়েই তাঁর একটি সভায় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল। নিবেদিতা ভারতে শিক্ষাদানের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন তাকে স্যার রিচার্ড প্রশংসা করেন ও সমর্থন জানান। বক্তৃতার সূত্রেই ১৯০১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা স্কটল্যান্ডের এডিনবরার উদ্দেশে রওয়ানা হন। পরদিন, অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি এডিনবরা লেডিজ ভিক্টোরিয়ান ক্লাবে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতীয় নারীর আদর্শ। ১৯০১-এর এপ্রিলে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় নিবেদিতার এই বক্তৃতা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, 'Miss Noble depicted the life of the Hindu woman under an aspect entirely new to many of her listeners, and difficult to reconcile with what they had heard on the same subject from other sources. The animated discussion which followed the lecture had to be cut short owing to lack of time.'

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ এবং ২৫ তারিখেও এডিনবরায় নিবেদিতা দুটি ভাষণ দেন। ওই দুটি ভাষণের বিষয়বস্তুও ছিল ভারত কেন্দ্রিক। কিন্তু স্কটল্যান্ডে তাঁকে মিশনারিদের রোষের মুখে পড়তে হয়। মিশনারিরা সেই সময়ে ভারত সম্পর্কে যে ভুল চিত্র তুলে ধরত ব্রিটিশ সমাজের কাছে, নিবেদিতা তার প্রবল বিরোধিতা করেন নিজের বক্তৃতায়। এতেই মিশনারিরা প্রবল রুষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ওপর। ওই সময়েই নিবেদিতার একটি সভায় ভারত প্রত্যাগত এক ব্যক্তিকে মিশনারিরা বক্তব্য রাখতে প্ররোচিত করে। কিন্তু মিশনারিদের হতবাক করে ভারত প্রত্যাগত ওই ব্যক্তিটি নিবেদিতাকেই সমর্থন করেন।

এডিনবরায় মিশনারিদের আক্রমণের মুখে পড়ার ঘটনাটি নিবেদিতা জানিয়েছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকেও। ১৯০১-এর ৭ মার্চ তারিখে নিবেদিতা জেসেফিনকে লিখেছিলেন, 'We had a tremendous challange from missionaries in Edinburg, and if you are ever well enough to read anything again you will enjoy reading the report S. Sara had made of that. They gave a terrible account of India and her ways, and I had only time to fling defiance at one of them and leave. Then of course they had things their own way—till they asked a young Indian Xtn man to speak, and he got up and said I had been right — and that he did not, since reaching Europe, care to call himself a Xtn !!! Did you ever hear anything so splendid and manly? He was a Madrasi. Now the club is trying to restrain me from right of reply. They must be much afraid.

I suppose they do not want the material used in India, as 'Missionary-statements.' However, some diliberate grappling with missionary opinion I shall do before I stir, in one form or another. Do read Mark Twain's article 'To the Person Sitting in Darkness' in the North American Review for this month. It is grand.'

ইংল্যান্ডে নিবেদিতার এবারের এই বক্তৃতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন, শিক্ষা বোতলে ভরিয়া ওষুধ গেলানর মত নিয়মিত মাত্রা হিসাবে দেওয়া যায় না। হিন্দু রমণীদের পক্ষে শিক্ষার প্রধান উপকরণ তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রভাব। কোন জাতির শিক্ষার প্রণালী নির্দেশ করিতে গেলে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহার অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ জীবনের পর্যালোচনা আবশ্যক। তিনি বলেন, আমি যে কেবল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলির প্রতি অনুরক্ত তাহা নয়, আমি উহার ভালমন্দ সকল অংশের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন। অতএব হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোন সমালোচনা আমার অভিপ্রায় নয়। সমুদয় লইয়া হিন্দু সর্ব্বোচ্চ সভ্য জাতি; আর জগতের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজেই সুন্দর শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগী অবস্থা বর্তমান।... পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্যজীবনের ন্যায় সুন্দর বস্তু বোধহয় আর কিছুই নাই। ভারতীয় রমণীর আদর্শ প্রেম নহে, ত্যাগ। এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমি হিন্দু রমণীকে পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দিতে চাই।'

ইংল্যান্ডে তাঁর বক্তৃতা কর্মসূচি শুরু করার আগে নিবেদিতা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস নিয়েছিলেন। এ প্রয়াসটির সঙ্গে যদিও ভারতে বিদ্যাচর্চার একটি যোগসূত্র ছিল, তবুও এই প্রয়াসটি নিবেদিতা নিয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার পথকে মসৃণ করতে। বিদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র যে তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীদের প্রবল অসূয়া এবং বিরোধিতার মুখে পড়বেন—এটি নিবেদিতা বুঝতে পারছিলেন। নিবেদিতা এ-ও বুঝতে পারছিলেন যে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার পথ যদি কণ্টকমুক্ত করতে হয়, তাহলে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে তাঁকে কাজ করে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে, যেখানে দেশীয় মানুষের হাতেই পরিচালনভার ন্যস্ত থাকবে। ১৯০০-র শেষ দিকে জামশেদজি টাটা লন্ডনে উপস্থিত হতে নিবেদিতা ভেবেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার জন্য উপযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান বোধহয় টাটার সহযোগিতায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। জামশেদজি টাটা সেই সময়ে ভারতীয়দের জন্য, ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার প্রচেষ্টায় ছিলেন। সেই কাজেই তিনি লন্ডনে এসেছিলেন। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান চালু হলে যে জগদীশচন্দ্র সেখানে নির্বিঘ্নে বিজ্ঞান সাধনা করতে পারবেন—তা বুঝেছিলেন নিবেদিতা। সে কারণেই তিনি টাটার এই পরিকল্পনা সফল করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

ওই সময়ে ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন স্যার জর্জ বার্ডউড। জামশেদজি টাটা লন্ডনে তাঁর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন। সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সারা বুল। সারা বুল তাঁর বাড়িতে এক দ্বিপ্রাহরিক ভোজে জর্জ বার্ডউড এবং জামশেদজি টাটাকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রিত হন নিবেদিতাও। এই সুযোগকেই নিবেদিতা কাজে লাগাতে চাইছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, ভারতীয়দের হাতে ভারতের উচ্চশিক্ষাকে তুলে দিতে বার্ডউডের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব রাজি হয়নি। এই ব্যর্থ বৈঠকের কথা নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুকে ৫ নভেম্বর, ১৯০০ তারিখে এক দীর্ঘ চিঠিতে জানিয়েছিলেন। চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Forgive me for writing you all this. I wanted to record of the conversation.' ওই দ্বিপ্রাহরিক বৈঠকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে তুলে ধরেছিলেন। সেই বিবরণ অনুসরণ করে রেমঁ বার্ডউড এবং নিবেদিতার কথোপকথন তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়।

রেমঁ লিখছেন, 'জগদীশচন্দ্র বসু ভারতে ফিরে যাওয়ার পর যে পরিস্থিতি তাঁর জন্য তৈরী হয়ে আছে, নিবেদিতা তা আগেভাগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কৌশলে জানতে চাইলেন যে সরকারীভাবে যখন শিক্ষাব্রতীদের নিয়োগ চলবে ভবিষ্যতে, তখন আবেদনকারীর বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতার হিসাবই শুধু নেওয়া হবে এমন কোন আশা আছে কিনা।

'স্যার জর্জ বললেন, 'সে অসম্ভব। একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে কাগজে-কাগজে ঘোষণা করা হবে। তারই ফলাফল অনুসারে আড়াল থেকে নিয়োগপত্রের তালিকা তৈরী হবে, ভারত সচিবের ইচ্ছা এই।'

'আপনার মনে হয় না এরকম হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে?'

'তা থাকতে পারে বটে, তা থাকতে পারে। ...তবে আমি কিন্তু মনে করি না যে এমন সম্ভাবনা বাস্তবিকই আছে। ভারতবাসীরা কখনও আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলবে না। শাক-সব্জী খায়, গো-বেচারী ওরা।'

'আমি ভাবছি ভারতের বিপদের কথা, আমাদের কথা নয়...'

'ও: আমি কিন্তু তা ভাবিনি। তাই তো, কথাটা ভাববার মতো বটে।'

'মি: টাটা তাঁর নিজের কথা পাড়বার সুযোগ পেতে না পেতেই কফি পরিবেশন শুরু হয়ে গেল।

'নিবেদিতা বেপরোয়া হয়ে আক্রমণ চালালেন, 'মি: টাটা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করছেন। তাতে অধ্যাপকের পদে বিশেষ গুণী হিন্দুদের যাতে নিয়োগ করা হয় সে ব্যবস্থা পাকা করবার জন্য কি ধরনের বিধান চালু করবার প্রস্তাব করবেন, স্যার জর্জ?'

'অতর্কিত আক্রমণ। মি: টাটার সুচতুর পরিকল্পনা ছিল, সমানসংখ্যক পার্সী মুসলমান হিন্দু ও খৃষ্টান অধ্যাপকদের নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালনা-সংসদ গঠিত হবে।

'স্যার জর্জ নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কিছু প্রস্তাব করব না। এ ধরনের কিছু করা হলে বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াতেই কুড়ুল মারা হবে। সমস্ত পৃথিবীর স্বার্থ এতে জড়িত, শুধু ভারতের তো নয়।'

'এ একটা দুমুখো মতবাদের সংঘাত। তাই কোনো আলোচনা চালানো সম্ভব হল না।

'মি: টাটা, আপনি টাইম্‌সে আমায় খোলা চিঠি লিখবেন। আমি সরকারীভাবে উত্তর দেব। এটুকু বলতে পারি যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব চিত্তাকর্ষক—এই বলে স্যার জর্জ চালাকের মত নিজেকে আলগোছ করে নিলেন।

'নিবেদিতা এরই মধ্যে এ-সংঘাতের কোন পর্বে নিজে কি করবেন মনে-মনে তা ঠিক করে রাখছিলেন, হাতের কাছে সুযোগ মেলবার ওয়াস্তা শুধু।

'স্যার জর্জ যা করতে চাইলেন না, তা আমি করব। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের লক্ষ লোকের চেষ্টায় যে-ভারতের জন্ম হবে তার সঙ্গে ইংলন্ডের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'

জগদীশচন্দ্রকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I hope it may be my part now to bring the voices of others who are stronger into Mr. Tata's Councils...' জগদীশচন্দ্রকে লেখা এই চিঠিটি নিবেদিতা শেষ করছেন এভাবে, 'I must add that at the end Sir G. B. sent off fireworks about the future Univesity of Bombay taking the place of the old Alexandria in the world's history—Alexandria — with it's murdered Hypatra— the beautiful martyr-Saint (if Science could be said to have it saints) of Science.

'And the Hypatra was born in Egypt—I said.

'Yes.' 'And her father was born in Egypt...'

Then we rose to go.'

জামশেদজি টাটার এই প্রয়াসকে সফল করে তুলতে এর পর নিবেদিতা একটি আবেদনপত্র লিখে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন জনের কাছে পাঠান। কিন্তু খুব একটা সাড়া তাতে তিনি পাননি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করাই যায়। ফ্রান্স ছাড়ার আগে জগদীশচন্দ্র সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্যারিসে সোসাইতে দ্য ফিজিক এবং সোসাইতে দ্য জুলজিতে দুটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা দুটি যথেষ্ট

প্রশংসা লাভ করে। 'দ্য ইলেকট্রিশিয়ান' পত্রিকায় বক্তৃতা দুটির প্রশংসা করে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি লন্ডনে আসেন। এখানে ব্রাডফোর্ড ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে অনুরূপ একটি বক্তৃতা দেন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক লজ। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার পর অধ্যাপক লজ নিজে উঠে গিয়ে তাঁকে এবং অবলা বসুকে অভিনন্দন জানান। রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০-র চিঠি থেকে জানা যায়, এই বক্তৃতার পরদিন অধ্যাপক উইলিয়াম ফ্লেচার ব্যারেট জগদীশচন্দ্রকে জানান, অধ্যাপক লজ প্রমুখের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনে হয়েছে জগদীশচন্দ্র ভারতে বৃথা সময় নষ্ট করছেন এবং সেখানে তাঁর কাজও বিঘ্নিত হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র কি ইংল্যান্ডে এসে তাঁর কাজ করতে পারেন না? জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদনও জানিয়েছিলেন ব্যারেট। মনে রাখতে হবে, নিবেদিতা জামশেদজি টাটার সঙ্গে বৈঠক করার অনেক আগেই জগদীশচন্দ্র বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার প্রস্তাব পেয়েছিলেন। ভারতে থাকতেই নিবেদিতা ইউরোপে জগদীশচন্দ্রের কর্মসংস্থানের নানা চেষ্টা করেছিলেন। পরে, তিনি এবং সারা বুল আমেরিকাতেও জগদীশচন্দ্রের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার কাজ চালান। অর্থাৎ, জগদীশচন্দ্র যে বিদেশে কাজ করার সুযোগ পাননি—এ যুক্তি একেবারেই খাটবে না। বরং, তাঁর কাছে সে সুযোগ এসেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তিনি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ না দিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততার পরেই যে তিনি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ২ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠিতে। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, 'আজ প্রায় দু মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে।...আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই আমার জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যেসব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহ্য করিব।'

৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র আর একখানি পত্রে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংশ্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাহি না, কারণ তাহা হইলে আমার কার্য্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না। দ্বিতীয়ত: অন্যান্য ছাত্রদিগের অনুসন্ধান কার্য্যে তাহা হইলে সুবিধা হইবে না।'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর বন্ধুর দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেননি। ১৯০১-এর ২১ মে জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না।' কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর এই ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটির কথাও রক্ষা করেননি। দেশে ফিরে এলে বাধা পড়বে জেনেও দেশে ফেরার বিষয়েই মনস্থির করে ফেলেছিলেন। এবং অবশেষে ১৯০২-এর অক্টোবরে দেশে ফিরে আসেন।

কিন্তু যে-নিবেদিতা চেয়েছিলেন বিদেশে নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানসাধনা করুন, তিনিও জগদীশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি কেন? রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় প্রবল স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকেই জগদীশচন্দ্র দেশে ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনুমান করাই যায়, তাঁর দেশে ফেরার সিদ্ধান্তের সমর্থনে এই একই যুক্তি তিনি নিবেদিতাকেও দেখিয়েছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন আন্তরিকভাবে একজন জাতীয়তাবাদী। এক্ষেত্রে এমন ধারণা সহজেই করা যায় যে, জগদীশচন্দ্রের এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানাতেই নিবেদিতা বিদেশে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে আর জোরজবরদস্তি করেননি। দ্বিতীয়ত, আরো একটি কারণও ছিল। নিবেদিতাও তখন ভারতে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

কিন্তু যে জাতীয়তাবাদী যুক্তি জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন, বাস্তবে ততটা জাতীয়তাবাদী তিনি ছিলেন কিনা, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে জগদীশচন্দ্র সযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের সক্রিয় বিরোধিতা করলেও, জগদীশচন্দ্র নীরবই থেকেছেন। বলতে গেলে, ১৯০২ সালে ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্র কখনোই দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখেননি। হয়তো, বিজ্ঞান সাধনার স্বার্থেই এ ছিল তাঁর কৌশলী পদক্ষেপ। কেননা, এরপর থেকেই ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বিজ্ঞান সাধনার জন্য তিনি অপরিমিত সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা কেন্দ্রীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ সাহায্য বোধকরি ভারতবর্ষে আর কখনো পায়নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্তই আপন লোকবিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেননি।' ফলে, এরকম সংশয় হতেই পারে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের চাকরি না নেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে অন্য কোনো গূঢ় কারণ রয়ে গিয়েছিল।

১৯০১ সালের এই সময়টিতে নিবেদিতা শুধু স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ নয়, লেখালেখির কাজেও ভীষণভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়েই তাঁর 'কালী দ্য মাদার' বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি আগ্রহী পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃতও হয়। ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত নিবেদিতাকে প্রস্তাব দেন ভারত সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা এবং মূল্যায়ন তা পুস্তক আকারে লিখে ফেলার জন্য। রমেশচন্দ্র নিবেদিতার লেখনি শক্তি অনুধাবন করেই বলেছিলেন, বই লিখেই নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। বলতে গেলে রমেশচন্দ্রের উৎসাহেই নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' লিখতে শুরু করেন এই সময়ে। এই বইটি লিখতে প্যাট্রিক গেডিজও যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন নিবেদিতাকে। বইয়ের মুখবন্ধে রমেশচন্দ্র এবং গেডিজ— দুজনের প্রতিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০১-এর ১৯ জুলাই তিনি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন 'Now I am at work on the book which Mr. Dutt commisioned. I have written so far on the Hindu Woman as Wife, and on Caste.'

এই বইটি লেখা নিবেদিতা শেষ করেন ১৯০৩-এর অক্টোবরে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটি প্রভূত প্রশংসিত হয়। যেসব পত্র-পত্রিকায় বইটি প্রশংসিত হয় সেগুলির ভিতর ছিল 'আউটলুক', 'দ্য চার্চ টাইমস', 'দ্য ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস', 'দ্য ডেইলি গ্রাফিক', 'কুইন', 'দ্য ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর', 'দ্য ইয়র্কশায়ার পোস্ট', 'পল মল গেজেট', 'সেন্ট জেমস গেজেট', 'দ্য ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট', 'দ্য সান', 'দ্য সানডে মেল' ইত্যাদি। ১৯০৪ সালের ১৭ জুন 'শেফিল্ড ডেইলি টেলিগ্রাফ' লেখে, 'Sister Nivedita (Miss Margaret E. Noble) went to India some years ago and was engaged in educational work among the Hindus. She lived, not in the European Quarter of Calcutta, but in the middle of the Hindu Quarter. We mention this fact by way of preface, simply because it gives her book an authoritative status which few books written by Europeans about India can possess.'

১৯০৪-এর আগস্ট মাসে লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'কুইন' লেখে, 'It is possible that the Western women who read about their Hindu sisters will have to read just their ideas after reading Miss Noble's book. It would be well if those who gather their impressions of our Indian Empire solely from missionaries of preconceived ideas and little sympathy, or from the abstruse works of scholars, or the chatter of Anglo-Indians, were to revice the impressions they gathered from their sources by the light of this poetically written and scholarly book.' নিবেদিতার এই গ্রন্থটি সেই সময়ে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় বিদগ্ধ সমাজে যথেষ্ট

আলোচিত হয়েছিল। পাশাপাশি, নিবেদিতার এই গ্রন্থটি সেই সময়ে মিশনারিদের অতীব ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। ভারত সম্পর্কে মিশনারিরা পাশ্চাত্যে যে ধারণা সেই সময়ে প্রচার করে বেড়াতেন, তার মূলেই কুঠারাঘাত করেছিল এই গ্রন্থটি। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই নিবেদিতাকেও তখন মিশনারিদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল। এর আগে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়ে একইরকম আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল স্বামীজিকেও। নিবেদিতার বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করে তুলতে সেই সময়ে অ্যানি উইলসন কারমাইকেল নাম্নী এক মিশনারি মহিলা 'থিংস অ্যাজ দে আর' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ওই পুস্তিকায় নিবেদিতার এই বইটিকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। মিশনারিদের এই আক্রমণ সম্পর্কে ১৯০৫-এর ৪ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'We are beginning to have counterblasts from the Missionaries now—to the Book. Sometimes they are very funny—and always they express more than the poor authors suspect. It is for India to understand my book— and make the world admit that it is not half the truth.'

'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থটি যখন নিবেদিতা শেষ করেন, তখন স্বামীজি প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে স্বামীজির প্রভাবই যে তাঁর ওপর কাজ করেছিল—তা-ও স্বীকার করেছেন নিবেদিতা। ১৯০৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জোসেফিনকে লিখেছেন তিনি, 'You will realise dear Yum, as no one else can, that it is not my book at all, but Swamiji's, and that my one hope about it is that I may have said the things that He would have liked said. As to whether this is so or no, you shall be the judge, when you are well enough to read it.' স্বামীজির প্রভাব যে কতখানি কাজ করেছিল এই বইটি রচনার ক্ষেত্রে, তা বোঝা যায় নিবেদিতার আর একটি চিঠিতে। ১৯০৪-এর ২৬ জুলাই, জোসেফিনকে তিনি লিখছেন—'If, when you do dip into it, you recognise Swamiji at all, dear Yum, you will give me great happiness. I have worked for others as a hand or a tool, but He alone demanded the whole of my heart and head and being, and left it to me to use them for Him. Both kinds of service, all kinds of service, are great and good, but this alone is all-absorbing—because this alone implies perfect faith.' এই গ্রন্থটি নিবেদিতা তাঁর আচার্য বিবেকানন্দকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

যে ভারত পাশ্চাত্যের কাছে তখনো অজানা ছিল, যে ভারত সম্পর্কে তখনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল পাশ্চাত্য সমাজে—সেই ভারতীয় সমাজকেই যথাযথভাবে নিবেদিতা তুলে ধরেছিলেন 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে। ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা, ভারতীয় সমাজচিত্র, ভারতীয় সনাতন ধর্মবোধ, ভারতীয় পুরাণ—তাঁর ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিবেদিতা চিত্রিত করেছিলেন। নিবেদিতার লেখায় এমন একটি সংবেদনশীল মনের খোঁজ পেয়েছিল পাশ্চাত্য সমাজ, যা সহজেই ভারতের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করেছিল।

লন্ডনে নিবেদিতার হাজার কর্মব্যস্ততার পাশাপাশি জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প অনুবাদের কাজেও হাত লাগান নিবেদিতা। এই প্রসঙ্গটি অবশ্য আগেও একবার উল্লেখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে স্বদেশে তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য খ্যাতিমান হলেও, পাশ্চাত্যে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না। জগদীশচন্দ্র চেয়েছিলেন রবীন্দ্র-গল্পগুলি অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যে পরিচিত করে তুলতে। জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখতে গিয়ে প্যাট্রিক গেডিজ লিখেছেন, 'Tagore, though occupying the foremost literary position in India, was not at that time known in Europe and Bose felt keenly that the west had not the opportunity of realising his friend's greatness.'

জগদীশচন্দ্র যে তাঁর গল্পগুলির অনুবাদ করতে চান এবং পাশ্চত্যে প্রকাশ করতে চান সেই পরিকল্পনা ২ নভেম্বর ১৯০০ তারিখে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি জানিয়েছিলেন। এই গল্পগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র দুজনের কথা ভেবেছিলেন। নিবেদিতা এবং শ্রীমতী নাইট। দুজনেই তখন ইয়োরোপীয়ান সমাজে যথেষ্ট পরিচিত লেখিকা এবং দুজনেরই প্রাচ্য জীবনযাত্রা সম্পর্কে উৎসাহ ছিল। তবে, শ্রীমতী নাইট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই কথা জগদীশচন্দ্রকে পত্র মারফৎ জানিয়েছিলেনও। লিখেছিলেন, 'কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনা নৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।'

নিবেদিতা তাঁর হাজার কর্মব্যস্ততার ভিতরেও রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন মূলত জগদীশচন্দ্রের অনুরোধ— সে বোঝাই যায়। 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং 'দেনাপাওনা'—এই তিনটি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছিল অনুবাদের জন্য— তা-ও আগেই উল্লেখিত হয়েছে। গল্পগুলি অনুবাদ হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র তা পড়তে দিয়েছিলেন সারা বুল এবং পিটার ক্রপটকিনকে। প্যাট্রিক গেডিজ জানিয়েছেন, 'Prince Kroptkin —a good critic in letters as well as science— declared it to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen.' 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্রপটকিন। আর সারা বুল যে 'ছুটি'-র অনুবাদ পড়ে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন তা জগদীশচন্দ্র নিজেই জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। লিখেছিলেন, 'এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান্ মহিলা—সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে, 'ছুটি' শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।'

নিবেদিতার অনুবাদ যে খুবই সুখপাঠ্য হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছিলেন। ১৯১১-র ২০ ফেব্রুয়ারি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,'ডাক্তার বসু বলিতেছিলেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প ইংরেজিতে তর্জমা করিয়াছেন—তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই।' এই 'তাঁহার' বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কাকে বুঝিয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্র না নিবেদিতা—তা অবশ্য পরিষ্কার নয়।

তবে, রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যের সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে পরিচিত করার যে উদ্যোগ জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতা নিয়েছিলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। প্যাট্রিক গেডিজের লেখা থেকে জানা যায়, পিটার ক্রপটকিন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের অনুবাদ পাঠ করে উচ্ছ্বসিত হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র সেটি 'হারপারস' ম্যাগাজিনে প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওই পত্রিকা সেটি ছাপায়নি। গেডিজ লিখেছেন, পত্রিকাটির মনে হয়েছিল পাশ্চাত্য সমাজ এখনও প্রাচ্যের জীবনযাত্রা নিয়ে এতটা আগ্রহী নয়। তবে, তাৎক্ষণিক কোনো ফল না দিলেও ভবিষ্যতে এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল। ১৯১৬ সালে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ম্যাকমিলান রবীন্দ্র-গল্পের প্রথম যে ইংরাজি সংকলন প্রকাশ করে, তাতে নিবেদিতার অনুবাদ করা 'কাবুলিওয়ালা' স্থান পেয়েছিল।

এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদের ক্ষেত্রে নিবেদিতাকে যথার্থ স্বীকৃতি দিতে জগদীশচন্দ্রের কুণ্ঠা লক্ষ করা গেছে। এই গল্প-অনুবাদ সংক্রান্ত যতগুলি পত্র জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তার কোনোটাতেই নিবেদিতার নামোল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেননি। এমনকী ১৯০০ সালের ২৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র জানাচ্ছেন, শ্রীমতী নাইটকে তিনি এই গল্পগুলির অনুবাদের দায়িত্ব দেননি। কিন্তু কাকে দিয়েছেন, তা-ও পরিষ্কার করে বলেননি। নিবেদিতাকে স্বীকৃতি দিতে কেন কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। অবশ্য অনেকের ক্ষেত্রেই আড়াল থেকে নিবেদিতা তাঁদের কাজে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনকে এভাবেই সাহায্য করেছিলেন তিনি। স্বয়ং জগদীশচন্দ্রকেও অন্তরাল থেকে সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদের ক্ষেত্রে নিবেদিতাই যদি অন্তরালে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন— তবে স্বতন্ত্র কথা। তা না হলে বলতে হবে, বন্ধু হিসাবে জগদীশচন্দ্র যথার্থ আচরণ কিন্তু করেননি নিবেদিতার প্রতি। তবে, জগদীশচন্দ্র না-দিলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু পরে নিবেদিতার এই অনুবাদ কর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেই স্বীকৃতির প্রমাণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবির চিঠি। সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নিবেদিতার অনুবাদ 'বিশেষ উপাদেয়' হয়েছে।

শুধু যে রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদ বা নিজের গ্রন্থ রচনার কাজেই নিবেদিতা ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। আর-একটি কাজও নিবেদিতা এই সময়ে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন; তা হল জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং'য়ের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন এবং সংশোধন করার গুরুদায়িত্ব। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'জগদীশচন্দ্রকে নিবেদিতা বলেছিলেন—'আমি তো আছি। আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মত তোমার কাজ করবে। মনে কর এ লেখা তোমারই।' এ প্রতিশ্রুতি কিন্তু নিবেদিতা কখনোই ভুলে যাননি। বরং দেশে এবং বিদেশে— সর্বত্রই জগদীশচন্দ্রের কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করে গিয়েছেন নিবেদিতা। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, '১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডে অবস্থানকাল হইতে নিবেদিতা জগদীশ বসুর গবেষণার কার্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৭-এর মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বসুর তিনখানি বিখ্যাত পুস্তক 'Living and Non-living', 'Plant Response,' Comparative Electro-physiology', পরবর্তী পুস্তক 'Irritability of Plants'এবং অন্যান্য বহু প্রবন্ধ, যাহা পরে ধারাবাহিকরূপে রয়্যাল সোসাইটি পরিচালিত 'Philosophical Transactions' পত্রিকায় বাহির হয়—সমস্তই নিবেদিতা কর্তৃক সম্পাদিত বলিলে অযথার্থ বলা হয় না। ভাষার উপর নিবেদিতার অসাধারণ দখল থাকায় ঐ সকল পুস্তক প্রণয়নে তাহা যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছিল।'

বিভিন্ন সময়ে জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র যে নিবেদিতার প্রতি ঋণ স্বীকার করতে এক প্রকার অনীহাই দেখিয়েছিলেন, তারও উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

শুধু যে জগদীশচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনের কাজই নিবেদিতা করতেন তা-ও নয়। জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করাবার জন্য এই ভারতীয় বিজ্ঞানী সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সময়ে লেখালেখিও করেন নিবেদিতা। যে কোনো উপায়ে জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করাই যেন তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংল্যান্ডের 'রিভিউ অফ রিভিউজ' পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়ম স্টেডকে ১৯০১ সালের গোড়ায় 'এ ক্যারেক্টার স্কেচ অফ ডঃ বোস' শীর্ষক একটি লেখা দিয়ে তা প্রকাশের অনুরোধও জানান। কিন্তু লেখাটি প্রকাশ করতে স্টেড অস্বীকার করেন। ১৯ জুলাই, ১৯০১ তারিখের চিঠিতে জোসেফিনকে লিখছেন নিবেদিতা, 'I wrote the character sketch and it proved a colossal task. And now Mr. Stead refuses it on the ground that it is too much India and too little Bose. However I am rewriting, in the hope of final acceptance.' এখন, অনেকে ভাবতেই পারেন যে, জগদীশচন্দ্রের এই কাজের সঙ্গে নিবেদিতার এতখানি জড়িত হয়ে পড়ার কারণ কী ছিল? এ-প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি চিঠি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০২ সালের ১ অক্টোবর জোসেফিনকে লিখছেন নিবেদিতা, 'You see my little Bairn is divine, but where the country is concerned—I am the Guru—and with S.S's influence paramount this is forgotten for awhile. Even your viking knows better than the nonsense that my sweet child talks of late — and S.S repeats it all so solemnly as if each word were to be my law. It is curious that we seem to be divided now... How strange! How strange! only never think my heart is changed to him because my view of life is larger and truer today. The real thing is there just as it always was. But that is an impersonal thing, not limited by names. Mind, all that has been was necessary in order to save life and Bairn, and perhaps too in order to exhaust my Karma. Only, it was like S.R.K's [Sri Ramakrishna] worship of Christ or Mahomet or Woman. Having once done it, He left it. So, having realised this, I am not to limit myself by it, I am to pass on— I am a nun— not anything else.' চিঠিটি পড়ে এমনই একটি প্রত্যয় হয় যে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় সহায়তাকে তিনি এক অর্থে তাঁর 'কর্ম' হিসাবেই মনে করতেন। 'বাঁধা' পড়ে যাওয়ার জন্য তিনি কিছু করেননি। বরং একজন সন্ন্যাসিনী হিসাবে নিজেকে সব বন্ধন করে মুক্ত করে এগিয়ে চলার ভাবনাই তাঁর অন্তরে ছিল।

এই লন্ডনবাসের সময় বন্ধু জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে এবং আগ্রহেই নিবেদিতা নিজের কাজের বাইরেও বহুবিধ কাজে যেমন মনোনিবেশ করেছিলেন, তেমনই জগদীশচন্দ্রও কি কখনো নিবেদিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি? এই প্রসঙ্গে ১৯০১-এর মে মাসে লন্ডনের রয়াল ইন্সস্টিটিউশনে দেওয়া জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত বক্তৃতাখানির কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। রয়াল ইন্সটিটিউশনে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দেন ১০ মে ১৯০১। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ঃ 'The Response of Inorganic Matter to Mechanical and Electrical Stimulus.' এই বক্তৃতাটি জগদীশচন্দ্র শেষ করেন এইভাবে, 'আলোকতরঙ্গে ভাসমান ধূলিকণা, এই পৃথিবীতে জীবনের উচ্ছ্বাস ও মহাশূন্যে অসংখ্য ভাস্বর সূর্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য কখন আমার কাছে ধরা পড়ল জানি না। আমার পূর্বপুরুষগণ ত্রিশ শতাব্দী আগে ভাগীরথীর তীরে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন প্রথম আমি তার আংশিক মর্ম উপলব্ধি করলাম। এই বিশ্বের নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে যাঁরা ঐক্য দেখতে পান, চিরন্তন সত্য তাঁদের কাছেই ধরা পড়ে।'

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, লন্ডনে জগদীশচন্দ্রের লেখা এবং বক্তৃতাসমূহের খসড়া নিবেদিতা সংশোধন এবং পরিমার্জন করতেন। ফলে, এটুকু ধরে নেওয়াই যায় যে, এই বক্তৃতার খসড়াটিও নিবেদিতা সংশোধন এবং পরিমার্জন

করেছিলেন। বক্তৃতার এই শেষ অংশটি যে স্বয়ং জগদীশচন্দ্রেরও মনে ধরেছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠি। রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'আমার বক্তৃতার শেষ অংশ তোমাকে পাঠাইতেছি। Sri William Crookes বলিলেন যে, Royal Instn. হইতে যখন আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে তখন যেন আমি শেষের দুই পংক্তি quotation দিতে ভুলিয়া না যাই।' লন্ডনে জগদীশচন্দ্রের অসুস্থতার সময় ধর্ম এবং দর্শন নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর নানাবিধ আলোচনা হয়েছিল। তারপর সুস্থ হয়ে উঠে রয়াল ইন্সটিটিউশনে বক্তৃতার শেষভাগে জগদীশচন্দ্রের এই কথাগুলির ভিতর নিবেদিতার প্রতিধ্বনি কিন্তু অনেকটাই পাওয়া যায়। নিবেদিতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন এমন তথ্য হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু ঘটনা পরম্পরা এটুকু অনুমান করতে সাহায্য করে যে, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ওপর বিবেকানন্দ-অনুরাগিণী নিবেদিতার কিছুটা প্রভাব তো পড়েছিলই। যে কারণে রয়াল ইন্সটিটিউশনের ওই বক্তৃতায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত দার্শনিক জগদীশচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতাটি বিস্তৃতভাবে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার শেষ ভাগটি লিখেছিলেন এইভাবে, 'It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things — the note that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it— it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the bank of the Ganges thirty century ago.

'They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else...'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পাওয়ার পর তার উপর ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথ 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি বাংলা ১৩০৮ সনের আষাঢ় মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মাঝে মাঝেই নিবেদিতার পাঠানো মূল ইংরেজি চিঠির অংশবিশেষ তিনি তুলেও দেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিবেদিতাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে কবিও যেন কুণ্ঠা বোধ করেছেন সেদিন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, রয়াল ইন্সটিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সভায় উপস্থিত 'জনৈকা ইংরেজ মহিলা'র পাঠনো বিবরণ তিনি তুলে দিচ্ছেন। এই ইংরেজ মহিলা যে নিবেদিতা—তা উল্লেখ করার প্রয়োজনই বোধ করেননি কবি। এই তাচ্ছিল্য নিবেদিতার কিন্তু প্রাপ্য ছিল না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠবে। জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং পরিমার্জন করা, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির সুখপাঠ্য অনুবাদ করা বা জগদীশচন্দ্রের রয়াল ইন্সটিটিউশনের বক্তৃতা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা— প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিবেদিতা করলেও তাঁকে অস্বীকার করা বা প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে অনীহা দেখিয়েছিলেন কেন জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ? সে কি এই কারণেই যে, কবি ও বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন নিবেদিতাকে স্বীকৃতি দিলে তাঁদের কৃতিত্ব জনসমক্ষে কিছুটা খাটো হলেও হতে পারে? প্রকৃত কারণটি কী— তা জানার উপায় নেই ঠিকই; তবে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায়, ভারতের এই দুই মহান প্রতিভা নিবেদিতার প্রতি সেদিন অন্যায়ই করেছিলেন।

১৯০১-এ যখন স্কটল্যান্ডে নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে যান, তখন প্যাট্রিক গেডিজ তাঁকে আর একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্কটল্যান্ডে গেডিজের সঙ্গে যখন সেই সময়ে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয়, নিবেদিতাকে তিনি ডাণ্ডি নামক একটি জায়গায় আসার আমন্ত্রণ জানান। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ডাণ্ডিতে থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করেন নিবেদিতাকে। গ্লাসগো এগজিবিশনে ভারতীয় বিভাগে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণও নিবেদিতাকে জানান গেডিজ। মিশনারিদের নানাবিধ আক্রমণের জবাব দিতে নিবেদিতা এই সময়ে একটি পাল্টা পুস্তিকা রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। গেডিজ তার ভূমিকা লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলেন নিবেদিতাকে। গেডিজের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি নিবেদিতা। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে গেডিজের এই প্রস্তাব অনেকটাই কার্যকরী হবে।

নিবেদিতা যদিও এই সময়ে ভারতে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, তবু নানাবিধ কাজের জন্য তা সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে। স্কটল্যান্ড থেকে বক্তৃতা দিয়ে লন্ডনে ফিরে এসে স্বামী সারদানন্দের পাঠানো চিঠিতে নিবেদিতা সারদা মায়ের অসুস্থতার খবরও জানতে পারেন। এতে তিনি আরো ব্যাকুল হয়ে পড়েন ভারতে আসার জন্য। ১৯০১-এর ৪ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখেন, 'I wish I were back in India. I am just longing to get there, though I know of course that I cannot begin to do all the wrtiting we want before that. Plague must be raging in Calcutta. I can not bear to be away. ...How lovely it is in India! I am so glad that you feel India 'Sweeter' as you say 'than ever.'

জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এই সময়ে জাপানের দিকে যাত্রা করেছেন। জাপান হয়ে ভারতে যাবেন তিনি। নিবেদিতা ভারত ফেরা মনস্থ করেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাত্রার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। বরং বারবার তাঁকে যাত্রার তারিখ পিছিয়ে দিতে

হয়েছে। কারণ, লন্ডনে যেসব নানাবিধ কাজের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেসব কাজ সম্পূর্ণ না করে নিবেদিতা ফিরে যেতে চাইছিলেন না ভারতে। তার চেয়েও বড় কারণ, জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির কাজ চলছিল তখন। নিবেদিতা কখনোই চাইছিলেন না জগদীশচন্দ্রের এই কাজটি অর্ধসমাপ্ত রেখে ফিরে যেতে। তাই বারবার তিনি যাত্রার তারিখ পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। নিবেদিতার এভাবে লন্ডনে থেকে যাওয়া যে স্বামীজির শিষ্য এবং অনুরাগী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি করেনি এমন নয়। এমনকী স্বামীজির অনুরাগিণী, নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী জোসেফিন ম্যাকলিয়ড পর্যন্ত এই সময়ে নিবেদিতার বিরুদ্ধে 'স্বামীজির প্রতি আনুগত্যহীনতা'র অভিযোগ তোলেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'কিন্তু প্রতি ডাকেই আরও জরুরী কাজের তাগাদা আসে। মিস্ ম্যাকলিয়ড এখন জাপানে। নিবেদিতাকে আনুগত্যভঙ্গের অভিযোগ করে তিনি শাসাতে থাকেন।

'নিজেকে নিবেদিতা প্রশ্ন করেন। ফিরে যাচ্ছেন এই সংবাদ দিয়ে সারদা দেবীকে চিঠি লেখেন, কিন্তু যাওয়ার দিন ঠিক করে উঠতে পারেন না।'

তাঁর এভাবে লন্ডনে থেকে যাওয়া নিয়ে যে স্বামীজির অনুরাগীদের ভিতর ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে কিছু সংশয়ও যে দেখা দিচ্ছে তাঁদের মনে, তা নিবেদিতা জানতেন। আর, জানতেন বলেই, লিজেল রেমঁর কথায়, নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখেছিলেন, 'যদি মনে কর আমার সবই ভুল, সবই সর্বনেশে, অশেষ কৃতজ্ঞতায় তোমার পা ছুঁয়ে আমার পথে আমি চলে যাব। আমার পাওয়া স্বপ্নকে আমায় রূপ দিতেই হবে।' তাঁর আচার্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যে যে এতটুকু চিড় ধরেনি, তা বোঝাতে ১৯০১-এর ৩ অক্টোবর আর একটি চিঠিতে নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখছেন, 'Do you think I do not know that the great message of my sweet Father is unique? That I could never forget, but beyond that I do not understand. For all this last year I have been going through experiences that lie far outside his course for me. I have held so hard to Sri Ramakrishna the while that if at any point I have been wrong, I can only count it His fault, not mine. And yet it may well be that the place it is all to take in my future life is to be that of warning or even sorrow. I can not tell. It is not necessary to understand. It is only necessary to be faithful, and I have done my best.'

এই সময়েই নিবেদিতা এটুকু অনুভব করেন যে, তাঁকে কেন্দ্র করে যে সংশয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে স্বামীজির ঘনিষ্ঠ মহলে, তা দূর করতে পারেন একমাত্র স্বামীজিই। নিবেদিতা জানতেন, লন্ডনের কাজগুলি শেষ করে তারপরেই দেশে ফেরার জন্য স্বামীজি যদি তাঁকে সম্মতি দেন, তাহলে সংশয় যেমন কাটবে, তেমনই তিনি

নিজেও দ্বিধাগ্রস্ততা থেকে মুক্ত হতে পারবেন। এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যখন দ্বিধাগ্রস্ততায় ভুগেছেন, তখনই স্বামীজির শরণ নিয়েছেন। অতীতেও স্বামীজির অনুমতি এবং সম্মতিই তাঁকে যাবতীয় দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ, অতীতের মতো এবারও স্বামীজিকে একেবারে অস্বীকার করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে কিন্তু পারেননি নিবেদিতা। ইতিমধ্যে লন্ডনে তাঁর রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। রমেশচন্দ্রকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন নিবেদিতা। রমেশচন্দ্রও নিবেদিতার প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। রমেশচন্দ্র ছিলেন সম্পর্কে স্বামীজির আত্মীয়। রমেশচন্দ্রকে স্বামীজিও শ্রদ্ধা করতেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল, রমেশচন্দ্র যদি স্বামীজিকে বোঝান আরো কিছুদিন নিবেদিতার লন্ডনে থেকে যাওয়া উচিত—তাহলে হয়তো স্বামীজি সম্মতি দেবেন। রমেশচন্দ্রকে তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। রমেশচন্দ্রও চাইছিলেন না, নিবেদিতা তখনই ভারতে ফিরে যান। নিবেদিতা যে জগদীশচন্দ্রের বইয়ের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন এবং সম্পাদনার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন—তা রমেশচন্দ্র জানতেন। রমেশচন্দ্র এ-ও বুঝেছিলেন যে, নিবেদিতা ভারতে ফিরে গেলে জগদীশচন্দ্রের বইয়ের কাজটি সমাপ্ত হবে না। রমেশচন্দ্রও চাইছিলেন, জগদীশচন্দ্রের বইয়ের কাজটিও নিবেদিতাই করে দিয়ে যান। তদুপরি, রমেশচন্দ্রের উৎসাহে এবং আতিশয্যেই নিবেদিতা তখন 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' লেখার তোড়জোড় করছেন; সেই কাজটিও যাতে নিবেদিতা সুষ্ঠুভাবে শুরু করতে পারেন—তা-ও চাইছিলেন রমেশচন্দ্র। ভারতে যাওয়ার আগে নিবেদিতা যেন 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থটির কাজ সম্পন্ন করে যান তা-ই চেয়েছিলেন রমেশচন্দ্র। ১৯০১-এর ১৫ মার্চ নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখেছেন, 'Mr. R.C.Dutt insists that I write my book before I leave England and he thinks there is money in it for the school.' রমেশচন্দ্র নিবেদিতার এই অনুরোধে রাজি হয়েছিলেন। ২৯ মার্চ, ১৯০১ তারিখে নিবেদিতা লিখেছেন জোসেফিনকে, 'I have been glad that Mr R.C.Dutt should write to Swami.'

রমেশচন্দ্র কথা রেখেছিলেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'রমেশ দত্ত ভাবতেন নিবেদিতার ইউরোপে থাকা-না-থাকা নির্ভর করছে স্বামীজির 'পরে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল তাঁর। সেই সূত্রে তাঁকে লেখেন, ভারতের মঙ্গলের জন্যই নিবেদিতার ভারতে ফিরে যাওয়া আপনার স্থগিত রাখা উচিত।' রমেশচন্দ্রের কাছ থেকে এই অনুরোধ আসার পর স্বামীজির প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, তা অবশ্য জানা যায় না। তবে, স্বামীজি যে সম্মতি দিয়েছিলেন, এটুকু অনুমান করাই যায়। কেননা, এরপর নিবেদিতা তাঁর কাজগুলি শেষ করে তারপরই কলকাতা ফিরেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য। ১৯০০-র নভেম্বরে প্যারিস থেকে দেশে ফিরে আসার পর ১৯০১-এর নভেম্বর পর্যন্ত স্বামীজি নিবেদিতাকে মোটে তিনটি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু সেসব চিঠির কোনোটাতেই নিবেদিতাকে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেননি স্বামীজি। এমনকী, এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেননি। অবশ্য অন্য আর কোনো চিঠি এই সময়ের ভিতর স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। কেননা, এই তিনটি চিঠিরই হদিস পাওয়া যায়। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, স্বামীজি এই সময়ের ভিতর আর কোনো চিঠি নিবেদিতাকে লেখেননি, তাহলে বলতেই হয়, নিবেদিতার দেশে ফিরে আসার প্রসঙ্গটি সম্পর্কে স্বামীজি উদাসীনই থাকতে চেয়েছেন। ইয়োরোপ পরিভ্রমণ শেষ করে আসার পর ১৯০০-র ১৯ ডিসেম্বর নিবেদিতাকে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'মহাদেশ সমূহের আর এক প্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমায় প্রশ্ন করছে ঃ 'কেমন আছ?' এতে তুমি অবাক হচ্ছ না কি? বস্তুত আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গম।

'আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কনস্তান্তিনোপোল, চাকচিক্যময়, ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত কায়রো— সবই পিছনে ফেলে এসেছি, আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কী শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যলোকে নাচছে : শুধু ক্বচিৎ দু-একখানা মালবাহী নৌকার দাঁড়ের শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে।

'এখানে এখন শীতকাল চলছে; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ উষ্ণ ও উজ্জ্বল। এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতেরই মতো। সর্বত্র সবুজ ও সোনালী রঙের ছড়াছড়ি, আর কচি ঘাসফুল যেন মখমলের মতো! আর বাতাস, শীতল, পরিষ্কার ও আরামপ্রদ।'

১৯০১ -এর ৭ সেপ্টেম্বর নিবেদিতাকে তিনি লিখছেন, '...মঠের জমিতে যে বর্ষার জল দাঁড়ায়, তার নিষ্কাশনের জন্য একটি গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এইমাত্র ফিরলাম। কোন কোন জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংসহংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতেই আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার (হরিণী)-টি মঠ থেকে পাঠিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের দিন কয়েক বেশ উদ্বিগ্নে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় একসপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন হাস্যরসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলছিলেন, 'মশায়, এই কলিযুগে যখন জল-বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।'. ১৯০১-এর ৮ অক্টোবর তিনি নিবেদিতাকে লিখেছেন, '...জীবনের স্রোতে উঠছি, পড়ছি। আজ যেন কতকটা অবতরণের পথে...।'

প্রশ্ন উঠতেই পারে, নিবেদিতার লন্ডনে থেকে যাওয়া নিয়ে যখন স্বামীজির ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ এবং সংশয় দেখা দিচ্ছে, তখন স্বামীজি এত নির্লিপ্ত থাকছেন কেন? কেন এ বিষয়ে স্বামীজি কিছু বলছেন না নিবেদিতাকে? এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। প্রথমত, নিবেদিতার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় স্বামীজি কখনোই হস্তক্ষেপ করতে চাননি। সে-কথা স্বামীজি বেশ কয়েকবারই জানিয়েওছিলেন নিবেদিতাকে। এমনকী, প্যারিসে অবস্থানকালে নিবেদিতার যখন সংশয় হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে স্বামীজি তাঁর প্রতি মন:ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তখনো স্বামীজি নিবেদিতাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে তিনি পছন্দ করেন না। এক্ষেত্রেও হয়তো সেই কারণেই নিবেদিতার ভারতে ফিরে আসার বিষয়ে নিজের কোনো সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে চাননি স্বামীজি। দ্বিতীয়ত, শেষবার আমেরিকা ভ্রমণকালেই স্বামীজি ক্রমে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। পারিপার্শ্বিক সবকিছু সম্পর্কে নির্লিপ্ত, উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। সেই কারণেই এ প্রসঙ্গেও নির্লিপ্তই ছিলেন স্বামীজি। তৃতীয়ত, নিবেদিতা তাঁর ব্রাহ্ম-বন্ধুদের 'অতি ঘনিষ্ঠ' হয়ে উঠুন এটা কখনোই চাননি স্বামীজি। সেক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতার এত ঘনিষ্ঠতা, এবং তাঁদের জন্যই দীর্ঘসময় লন্ডনে থেকে যাওয়া মন:ক্ষুণ্ণ করে তুলতেই পারে স্বামীজিকে। হয়তো, সেই কারণেই অভিমানাহত স্বামীজি এই প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে একটি কথাও বলেননি। নিবেদিতার প্রতি অভিমান থেকেই হয়তো স্বামীজি নির্লিপ্ত হয়েছিলেন। এই তিনটি সম্ভাবনার কোনোটিকেই কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন হতেই পারে যে, স্বামীজির নির্লিপ্তির নেপথ্যে এই তিনটি সম্ভাবনাই একত্রে কাজ করেছিল। এখানে আরো একটি বিষয়ও উল্লেখ্য যে, এই সময়ের ভিতর স্বামীজিকে নিবেদিতা কোনো চিঠি লিখেছিলেন এমন সন্ধান পাওয়া যায় না।

মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে চারিদিকে দৌড়ে বেড়ানোর ফলে ১৯০১-এর মাঝামাঝি সময়ে নিবেদিতার শরীরও কিছুটা খারাপ হয়ে পড়ে। নিবেদিতাও চাইছিলেন সব কাজ থেকে বিদায় নিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন। সেই সুযোগও তাঁর সামনে এসে গেল। ১৯০১-এর ১৭ মে নরওয়ের বার্গেন শহরে ওলি বুলের একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সারা বুলের সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। সারা বুল নিবেদিতাকে প্রস্তাব দিলেন, বার্গেন শহরের কাছে লাইসোঁতে তাঁর যে অবসরকালীন আবাস আছে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে। নিবেদিতা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

লাইসোঁ জায়গাটি ছিল সমুদ্রতীরবর্তী একটি শান্ত ছোট এলাকা। জায়গাটি নিবেদিতার যথেষ্টই পছন্দ হয়েছিল। ২১ মে নিবেদিতা লাইসোঁতে এসে পৌঁছন।

এই জায়গাটি নিবেদিতার বেশ পছন্দই হয়েছিল। লাইসোঁর নির্জন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে কাশ্মীরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'It is a green gem set in blue sea, and carved with roads and rocks and pines and filled wtih delicious odours of the forest. It is more like Achhabal than anything else.'

এই লাইসোঁ নামের নির্জন শান্ত জায়গাটিতে নিবেদিতা তিনমাস ছিলেন। এই সময়ে মাঝেমাঝেই বার্গেন শহর থেকে সারা বুলও এখানে এসে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে যেতেন। এছাড়াও, শ্রীমতী বুলের অতিথি হয়ে যাঁরা নরওয়ে আসতেন, তাঁরাও কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যেতেন। নিবেদিতা এখানে থাকতে থাকতেই জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুও কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন। শ্রীমতী সেভিয়ার কিছু ব্যক্তিগত কাজে লন্ডনে এসেছিলেন। তিনিও কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন এখানে। রমেশচন্দ্র দত্তও নিবেদিতা থাকাকালীন এখানে এসেছিলেন। ওই সময়ই 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ'-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদ নিবেদিতা লেখেন এবং রমেশচন্দ্রকে পড়ে শোনান। রমেশচন্দ্রও এখানে বসেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থনীতির ইতিহাস' লেখা শুরু করেন। মিশনারিদের কুৎসার জবাব দিয়ে 'Lambs Among Wolves' নামে যে পুস্তিকাটি নিবেদিতা রচনা করেছিলেন, তা-ও এই সময়েই প্রকাশিত হয়। আর, বলতে গেলে, এই সময় থেকেই নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনও শুরু হয়।

চব্বিশ

লাইসোঁতে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করলেন নিবেদিতা। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'এই বনবাস পর্বটা নিবেদিতার সতর্ক আত্ম-বিশ্লেষণের কাল। তাঁর চিঠিগুলো থেকে বোঝা যায় এই সময়ের ভাবনা ও সঙ্কল্পের প্রভাবে তাঁর গোটা জীবনের ধারাটাই বদলে গেছে। সত্যি বলতে, বহু তপস্যায় অর্জিত স্বাতন্ত্র্যের আনন্দে এই সময়েই তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ালেন। পরস্পর স্বতোবিরুদ্ধ নানা শক্তি যেন এতদিন তাঁকে বাধ্য করেছিল অবাঞ্ছনীয় নানা কাজে। কিন্তু নিজের কাছে তাঁর লক্ষ্য বরাবরই সুস্পষ্ট। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। এই নির্জন অবসরে তিনি তিনটি ভাবনাকে রূপ দিলেন— 'কেবল কাজ করে যেতে চাই, কেবল কাজ—আর স্বপ্ন দেখতে চাই না। শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত কিছুতেই ভারতে ফিরে যাব না স্থির করেছি। গোপালের মা যে কুঁড়েটিতে থাকতেন নামমাত্র ভাড়ায়, সেইটি নেব। কঠোর দারিদ্র্যের ভয় ঘুচে দেহ-মনের শুদ্ধি ঘটবে তাতে।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'এই দীর্ঘ অবকাশে নিবেদিতা একান্তভাবে আত্মবিশ্লেষণ করেন। তাঁহার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এই নির্জন স্থানে বসিয়া তাহা তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইলেন। উত্তরকালে যে নিবেদিতাকে সকলে চিনিয়াছিল, তাহার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল এই সময় ইংলণ্ড এবং নরওয়েতে অবস্থানকালে।

'যে নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে লিখিয়াছিলেন 'ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন আমার চিরদিনের স্বপ্ন,' সে নিবেদিতা তিনি ছিলেন না।

'প্রথম ভারত গমনের সময় প্রকৃতপক্ষে ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। চিন্তারও প্রয়োজন ছিল না। আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের উপায় তিনি স্বামীজির বেদান্তবাদের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সেবাকেই তাঁহার জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করার মূলে ছিল স্বামীজির প্রতি অকপট শ্রদ্ধা। ভারতে অবস্থানকালে

ইংলণ্ড ও ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও ব্যবধান তিনি বেদনার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেন। তথাপি আশা ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন এই ব্যবধান দূর করিয়া ভারতকে তাহার স্বজীবন-যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে। পরে বুঝিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব।'

১৯০১-এর ১৯ জুলাই লাইসোঁ থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখলেন, 'Oh! India ! India! who shall undo this awful doing of my nation to you? Who shall atone for one of the million bitter insults showered daily on the bravest and keenest nerved and best of all your sons?

'How silly I think it now to do anything in England for India I can not tell you ! What utter waste of time! Do you think ravening wolves can be made gentle as babes? Can be made polite and sweet as little girls? That is what work in England for India means. Work is needed there, must be done there, I know. But do you know what that work is? People must come to England, people like Swami—like Dr. Bose—like Mr. Dutt- and must show in England What India is and can be. They must make friends and disciples and lovers by the millions. And so in 20 years from now, when the blow is struck (I know hat that will be), there will suddenly be a body of men and women in England, who never thought of themselves in that light before, to rise up and say "Handes off! This people shall be free!'

রেঁম লিখছেন, 'মিসেস বুলকে নরওয়ে থেকে লিখলেন, 'স্বাধীনতার একটা কন্দর আছে আমার কাছে। এমন অনেক কিছুকে জীবনে মেনে নিয়েছি যা স্বামীজি বোধহয় কখনও অঙ্গীকার করতে দিতেন না। কিন্তু তাঁরই জন্য সেসবকে মনে ঠাঁই দিয়েছি। আমার বিশ্বাস 'সব ভাল যার শেষ ভাল।' স্বামীজিও আগের মতই আমাকে তাঁর সন্তান বলেই গ্রহণ করবেন।... আমার সম্পর্ক এখন কাজের সঙ্গে, আমি এখন ওদেশের মেয়েদের সম্পত্তি। আজ আমি ভাবনায় যতটা হিন্দু এতটা আর আগে কখনও ছিলাম না। কিন্তু সেইসঙ্গে ওদেশের রাষ্ট্রচেতনার প্রয়োজনটাও অত্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে! এই হল আমার মনের কথা—নিজের কাছে আমায় খাঁটি থাকতেই হবে। নবজাগ্রত ভারত আর ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করবার আছে, এ-বিশ্বাস আমার জন্মেছে। সেই 'কিছু' করবার অধিকার কেমন করে পাব, সেটা ঠিক করবার ভার মায়ের, আমার নয়।'

অর্থাৎ, এই সময় থেকেই ভারতের পরাধীনতা নিবেদিতাকে বিচলিত করে তুলল। স্বাধীন ভারতের জন্য সংগ্রামের একটি স্বপ্ন ধীরে ধীরে তাঁর মনে দানা বাঁধতে শুরু করল। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণও এই সময় থেকেই শুরু করলেন নিবেদিতা।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতা কীভাবে অংশীদার হয়ে উঠলেন, তা বিশদে আলোচনা করার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগটি কেমন ছিল। একথা ঠিক যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন না; তবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর বিবেকানন্দের একটি প্রভাব বরাবরই ছিল। শুধু প্রভাব নয়, স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিবেকানন্দ যে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন, এবং সে সংগ্রামের প্রতি তাঁর যে সমর্থনও ছিল— তা-ও সমসাময়িক বিপ্লবীদের সাক্ষ্যেই প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় সে সময়ের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকার লেখাতেও। বাল গঙ্গাধর তিলকের গোষ্ঠীর পত্রিকা 'মারাঠা' বিবেকানন্দ সম্পর্কে ১৯১২-র ১৪ জানুয়ারি লেখে, 'Swami Vivekananda is the real father of India nationalism. He wanted to develop a modern India... He wanted the Indian to become 'an occcidental of occidentals in his spirit of equality, freedom, work and energy, and at the same time a Hindu to the very back-bone in religious culture and instincts... Every Indian is proud of this father of modern India.'

স্বামীজির মৃত্যুর পর, ১৯০৩-এর জুলাই মাসে 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'To us, however, Vivekananda was always more than a mere Vedantic preacher. He was a patriot and a patriot of right type. He loved his country with a devotion which, if he were to live in violent times, would have merked him out as a Wallace or a Bruce, a Hampden or a Cromwell, or a Mazzim...'

১৯১২-র ২০ জানুয়ারি 'মাইসোর টাইমস' লিখেছিল, 'His heart bled at the degradation of his country and countrymen and how he put himself to physical torture to show up his aliveness to the miseries of his coutrymen is current history... Renouncing his whole life at the alter of service for the country, Swami Vivekananda stands out as valiant patriot... To what extent one great soul can be saviour and exalter of one's country is more than illustrated to him.'

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের ভিতর অন্যতম, তৎকালে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আনন্দ চার্লু বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন, বিবেকানন্দের পূজা করার অর্থ বীরের অর্চনা করা। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা বিভিন্ন নিবন্ধে বিবেকানন্দের উল্লেখ করে বলে যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাপুরুষ বিবেকানন্দ। তাঁকে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী হিসাবেই 'বন্দেমাতরম্' চিহ্নিত করে। এমনকী, রবীন্দ্রনাথ, যিনি স্বামীজির ধর্মভাবনাকে

সমর্থন জানাতে পারেননি, এবং স্বামীজি যাঁর প্রতি বিরূপই ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথও ১৯২৮ সালের ৯ এপ্রিল সরসীলাল সরকারকে লিখেছিলেন, 'আধুনিককালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।' গান্ধীর চরকা কাটার বাড়াবাড়িতে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দকেই জাতীয় জীবনের নায়ক হিসাবে দেখেছিলেন।

এইসব লেখাগুলি থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যায়, বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চরিত্রটি কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বরং, তাঁকে নিছক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসাবে না দেখে, একজন দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদীর চেহারাতেই দেখতে পছন্দ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ ব্যক্তিত্বরা। বিশেষত, সে সময়ে বাংলা এবং বাংলার বাইরে থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগুলি বিবেকানন্দকেই জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাপুরুষ বলে মনে করত।

কিন্তু জীবৎকালে বিবেকানন্দের কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি? এ প্রসঙ্গে সেই সময়ে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেমন, হেমচন্দ্র ঘোষ। ১৯৭৮ সালে রামকৃষ্ণ মিনশনের ব্রহ্মচারী শঙ্কর বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের একটি সাক্ষাৎকার নেন। হেমচন্দ্র ওই সাক্ষাৎকারে বলেন বিবেকানন্দের মৃত্যুর একবছর পূর্বে, ১৯০১ সালে তিনি বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। তখন বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা—Political freedom, তাই সর্বপ্রথম ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বুলি কপচিয়ে নয়, গায়ের জোরে, সংঘবদ্ধ সংঘটিত আক্রমণের সাহায্যে, Organized collective action under one leadership. তারা (ইংরেজরা) দস্যু, তস্কর, পরস্বাপহারী, তারা intruders, exploiters, তারা blood suckers — আমাদের মায়ের বুকে বসে রক্ত খাচ্ছে। এই রাক্ষসদের আমাদের ধ্বংস করতে হবে। What right the Britishers have to rule our country? They

shall have go back to England. It is our brithplace. To drive these intruders and plunderers away from our country, therefore, is your only religion.এই তোমাদের একমাত্র ধর্ম— the only programme to be executed... যে ভাবে হোক, যে-কোনো প্রকারে হোক তাকে বিন্যাস করতে হবে।'

এই সাক্ষাৎকারেই জানা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ আরও বলেছিলেন, 'মানুযের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে দূর করে দে। ...গোলামির শিকল ছিঁড়ে ফেল। ছিনিয়ে নে দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কি কেউ এমনি দেয় রে, তা অর্জন করতে হয়। যা ভারত হারিয়েছে তা তোদের পৌরুযের বলে, মানুষের শক্তিতে আবার পুনরুদ্ধার কর। পশুও চায় না বন্দী হয়ে থাকতে। গরুকে বেঁধে রাখলে গরুও দড়ি ছিঁড়তে চায়, ছিঁড়তে চেষ্টা করে। আর তোরা কি করছিস! তোরা ওঠ, তোর জাগ। তোরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠ। আর হাতে কৃপাণ ধর, ধর বন্দুক। চলুক গুলি-গোলা! ভীমা রণরঙ্গিনী মহাকালীর সন্তান আমরা। ভয় কাকে? কিসের ভয়?'

স্বামীজির ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'মৃত্যুর একবছর পূর্বে তাঁর দুজন বিদেশী অনুরাগী (তন্মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর শিষ্যা) কলকাতায় কয়েকজন নাগরিকের সহায়তায় একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। এই দলটিই পরে বাংলায় বিপ্লববাদী আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজি তাঁর শিষ্যাকে এই দলে যোগদান করতে বারণ করেছিলেন। ভগ্নী ক্রিস্টিন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি সেই শিষ্যাকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করলেন? উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, 'নিবেদিতা ভারতের পরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে কী জানে? আমার জীবনে আমি তার চেয়ে অনেক বেশী রাজনীতি করেছি। বিদেশি শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি করতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই জন্যই আমি বন্দুক-নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।'

হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বিবেকানন্দ যে যোগাযোগ করেছিলেন তা স্বীকার করেছেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডও। জোসেফিন ম্যাকলিয়ড লিজেল রেমঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্বামীজি বিদেশ থেকে অস্ত্র আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে রেমঁ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের এই কথাটি জানিয়েছিলেন। তা লিপিবদ্ধও করেছেন শঙ্করীবাবু। তবে, স্বামীজির সে পরিকল্পনা সফল হয়নি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকেই জানা যায়, স্বামীজি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'স্বামীজি নিজেই একথা বেলুড় মঠে ইতিহাস লেখক পণ্ডিত

সখারাম দেউস্করের সঙ্গে আলোচনাকালে একবার বলেছিলেন। পণ্ডিত দেউস্কর বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেউস্করের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, 'সমস্ত দেশটা বারুদ কারখানায় পরিণত হয়েছে। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই একে প্রজ্বলিত করে দিতে পারে, আমার জীবদ্দশাতেই বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে যাবো।' বিপ্লবের প্রকৃতি কী হবে এবং ভারতীয়রা বৈদেশিক সাহায্য চাইবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'না, ভারতবাসীরা চতুর্থবার এই ভুল আর করবে না। আমি কয়েকজন নৃপতির কথা জানি যাঁরা এই বিপ্লবকে সফল করতে পারেন।' পরে এই আলোচনার কথা দেউস্কর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিশিষ্ট বিপ্লবীদের কাছে প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দের এই কথাগুলি শুনলে বোঝাই যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষেই তাঁর মত ছিল। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি যে তিনি পছন্দ করেন না, তা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন স্বামীজি। স্বামীজির আর-এক ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা থেকে জানা যায় স্বামীজি গুরুভ্রাতা সারদানন্দকে বলেছিলেন, 'ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের independent বলে declare করুক, হেঁকে বলুক, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম,' আর সমস্ত স্বাধীন Government কে নিজেদের declaration পত্র পাঠিয়ে দিক, তখন একটা হৈ চৈ উঠবে।'

মহেন্দ্রনাথের লেখায় আরো জানতে পারি, বিবেকানন্দ বলছেন, 'বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে। বিধি মতে কাজ করে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।... পড়ুক গুলি আমার বুকে, আমেরিকা, ইউরোপ একবার কীরকম কেঁপে উঠবে। তখন বুঝবে বিবেকানন্দ কি জিনিস! আমেরিকায় এমন স্থান নেই যেখানে বিশ-ত্রিশ হাজার লোক নিতান্তই আমার অনুগত নয়। আমার রক্ত পড়লে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে যাবে। কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগীদের মতন বসে বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?'

বিবেকানন্দের এই কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থীদের প্রভাবিত এবং উজ্জীবিত করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, কংগ্রেসি বা অন্যান্য নরমপন্থীদের তুলনায় চরমপন্থীরা বিবেকানন্দকে গ্রহণ করেছিলেন বেশি। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন সংগ্রামের প্রেরণাদাতা, প্রাণপুরুষ। বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ব্রহ্মচারী শঙ্করকে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, —'আমাদের দেশের অতীত বিপ্লবী সংগ্রামের উপর বিবেকানন্দের প্রভূত পরিমাণে

প্রভাব ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় আমিই দেখেছি—আমরা যখন ছোট ছিলাম এবং বিপ্লবী আন্দোলন এবং গোপন বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে আসি, তখন বিপ্লবী সাহিত্য বলে বিশেষ কিছু ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, রমেশ দত্তের Victorian Age, সখারাম গণেশ দেউস্করের বই এবং বিবেকানন্দের লেখা বই সমূহই আমাদের ভালো করে পড়তে বলা হত। এই কয়খানি বই বিভিন্ন বিপ্লব আন্দোলনে অনুপ্রেরণা পাওয়ার মতো। আর বিশেষ কোনো সাহিত্য অথবা বই ছিল বলে তো মনে হচ্ছে না।'

গণেশ ঘোষ লিখেছেন, 'মাস্টারদা সূর্য সেন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃবর্গের সঙ্গে দীর্ঘকাল অতি ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁদের কাছে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য বহুসংখ্যক নেতৃবর্গের কাছে আমি স্বামীজির কথা অনেক শুনেছি। প্রত্যেকেই স্বামীজির কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করেছেন। ...আমার সতীর্থ অনন্ত সিংহের বেলাতেও ঠিক তাই। প্রথম-প্রথম তাকেও বিবেকানন্দের সাহিত্য, বিশেষত স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতা সেইযুগে অবশ্যই অনেকবারই পড়তে হয়েছে।...

'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো একজন ব্যক্তির অবদানের কথা বলতে গেলে একথা বললে বোধহয় ভুল হয় না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনাকালে বিবেকানন্দের বাণীই বাংলাদেশের তরুণদের সবচাইতে বেশি মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল।'

বাংলাদেশের চরমপন্থী বিপ্লবীদের উপর বিবেকানন্দের কী গভীর প্রভাব ছিল তা জানা যায় সূর্য সেনের সহকর্মী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কথা থেকে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসি হওয়ার কিছুদিন আগে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মনে হচ্ছে একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজীর মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম। আমার ওটা খুব ভালো লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওঁকে তোমার খুব ভালো লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে, ওঁর কী পরিচয় তোমার জানা আছে? কী জবাব দেব তা ভেবে পাইনে। ওঁকে কতখানি-ই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা বলেছে Cyclonic Hindu— আমার মতে, He is moral and spiritual force of India. আজকালকার দিনে তো কথা কাটাকাটির অন্ত নেই। কারণ, blind belief জিনিসটা পছন্দ করে না কেউ। কিন্তু বিবেকানন্দের বেলায় কোনো যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওঁর প্রত্যেকটি কথা শুধু ওঁর কথা বলেই বিনাবিচারে মেনে নেওয়া চলে, ওঁর আদর্শের উপর একান্তচিত্তে নির্ভর করে চলে! শুধু সেন্টিমেন্টের দিক থেকে আমার এ ধারণা জন্মেনি, ওঁকে চিনবার যেটুকু

চেষ্টা করেছি তার তরফ থেকেই আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এতবড় আদর্শ আর কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালবেসেছে কি?'

আর সূর্য সেনের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে গেছেন আর এক বিপ্লবী অনন্ত সিংহ। অনন্ত সিংহ লিখেছেন, 'মাস্টারদা... বিনয়ের সঙ্গে অথচ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে চারজন বিপ্লবী বন্ধুকে বললেন, আমরা চট্টলার বুকে বসে মাত্র এই পাঁচজনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের পরিকল্পনা করছি। ...বর্তমানে মূলত আনন্দমঠের আদর্শে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের চলা উচিত এবং মা-কালী পূজা, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের বাণী ও গীতাপাঠ কর্তব্য হওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'সবাই আলোচনার পরে মাস্টারদার এই সমস্ত প্রস্তাবগুলো মেনে নিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, গভীর রাত্রে পাহাড়ে ঘেরা নিভৃত স্থানে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মায়ের পূজার বেদীর সামনে বুকের রক্ত দিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন। তাঁরা মায়ের পূজাও করেছিলেন, অঙ্গীকারবদ্ধও হয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের নিজের ঘরে মা-কালীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও একখানা গীতা রাখাটা নিয়মে পরিণত হল।' অনন্ত সিংহের এই লেখাটি পড়ে আরো পরিষ্কার বোঝা যায়, সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে বিবেকানন্দের কতখানি আবেগঘন আবেদন এবং শ্রদ্ধার স্থান ছিল।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন, 'বিবেকানন্দের প্রতি আকর্ষণের ফলে বিপ্লবীরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। মিশনের সঙ্গে অনেক বিপ্লবীর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। অনেক বিপ্লবী পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন, এ দৃষ্টান্তও কম নয়।... আমার সতীর্থ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (পূর্বাশ্রমে সুধীরকুমার রায়চৌধুরী) পূর্ব জীবনে বিপ্লবী ছিলেন। তাঁকে আমার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ১৯১৭ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। বৎসরাধিককাল অন্তরীণ এবং বন্দিজীবন যাপন করার পর মুক্তি পেয়েই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন।'

বিবেকানন্দের প্রভাব যে বাংলা এবং বাংলার বাইরের বিপ্লবীদের ওপরও ছড়িয়ে পড়েছিল, তা স্বীকার করেছিলেন সেই সময় ব্রিটিশ পুলিশের কর্তা চার্লস টেগার্টও। বিবেকানন্দের প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই টেগার্ট রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। ওই রিপোর্টেই স্বামীজির বেশ কিছু রচনাকে 'আপত্তিকর' হিসাবে চিহ্নিত করেন টেগার্ট। এবং রিপোর্টে বলেন, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত। রিপোর্টে আর-একটি অভিযোগও আনেন টেগার্ট। তা হল, স্বামীজি মায়াবতীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকবার জন্য। এরও

আগে, ১৮৯৬ সালে স্বামীজি যখন ইংল্যান্ডে যান, তখন লন্ডনের পুলিশ তাঁর সম্পর্কে একটি গোপন রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্টে বলা হয়, বিবেকানন্দ নাম্নী ব্যক্তিটির উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি, ভারী চেহারা, ডানদিকের কপালে কাটা দাগ। সন্ন্যাসী হলেও রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহী।

আরো বিস্তারিত আলোচনা না করলেও, এরপর বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও স্বাধীনতা আন্দোলনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বামীজি পালন করে গেছেন। তবে স্বামীজি শুধুমাত্র চরমপন্থীদেরই আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করেছিলেন— তা-ও নয়। স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো অহিংস মন্ত্রের উপাসকও স্বামীজির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতেই সে কথা লিখেও গিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে গান্ধী কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক হয়েছিলেন গান্ধী। এতটাই উৎসুক হয়েছিলেন যে, কলকাতা থেকে হেঁটে বেলুড়েও গিয়েছিলেন স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীর দুর্ভাগ্য, স্বামীজি সেই সময়ে বেলুড়ে ছিলেন না; ফলে, স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। এর পর আর মাত্র যে ক'মাস স্বামীজি জীবিত ছিলেন—সেই সময়ের মধ্যে এই দুই ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সাক্ষাতের কোনো সুযোগ আসেনি। গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'Having seen enough of the Brahmo Samaj, it was impossible to be satisfied without seeing Swami Vivekanand. So with great enthusiasm I went to Belur Math, mostly, or may be all the way, on foot. I loved the sequestered site of the Math. I was disappointed and sorry to be told that the Swami was at his Calcutta house, lying ill, and could not be seen.'

গান্ধীর লেখার এই অংশটুকু পড়লে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, স্বামীজির বক্তব্য এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে গান্ধী এর আগে থেকেই ভালোরকম অবহিত ছিলেন। এবং স্বামীজি তাঁকে এতটাই আকৃষ্ট করেছিলেন যে, কলকাতা থেকে হেঁটে বেলুড় যাওয়ার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজটুকু করতে একটুও বাধেনি গান্ধীর।

এ প্রসঙ্গেই বলা দরকার, স্বামীজির সঙ্গে দেখা না হলেও, গান্ধী সেবার কলকাতায় এসে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে, নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় গান্ধীর মনে হয়েছিল তাঁদের দুজনের ভিতর মানসিক যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে না। সেকথা গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে জানিয়েওছিলেন গান্ধী। অর্থাৎ, প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতার সঙ্গে একটি দূরত্ব অনুভব করেছিলেন গান্ধী। তাঁর মনে

হয়েছিল নিবেদিতা প্রাচুর্যের ভিতর বাস করছেন। তাছাড়া, নিবেদিতা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণারও তিনি বশবর্তী হয়েছিলেন। তবে, পরে, তাঁর স্বভাবসুলভ বিনম্রতা দিয়ে গান্ধী এই ভুল সংশোধনও করেছিলেন। গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'I then ascertained the place of residence of Sister Nivedita, and met her in a Chowringhee mansion. I was taken aback by the splendour that surrounded her, and even in our conversation there was not much meeting ground. I spoke to Gokhale about this, and he said he did not wonder that there could be no point of contact between me and a volatile person like her.

'I met her again at Mr. Pestonji Padshah's place. I happened to come in just as she was talking to his Old Mother, and so I became an interpreter between the two. In spite of my failure to find any agreement with her, I could not but notice and admire her overflowing love for Hinduism. I came to know of her books later.'

নিবেদিতা সম্পর্কে গান্ধীর মন্তব্য, 'I was taken aback by the splendour that surrounded her' নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল পরে। আসলে গান্ধী নিবেদিতা সম্পর্কে একটি আলটপকা মন্তব্যই করে বসেছিলেন। তিনি বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দেখেননি। বর নিবেদিতাকে দেখেছিলেন কলকাতার আমেরিকান কনসালের বাড়িতে। সেই সময়ে সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য নিবেদিতা ওই বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। গান্ধী ভেবে নিয়েছিলেন, এই প্রাচুর্য্যের ভিতরই বোধহয় নিবেদিতা বাস করেন। গান্ধীর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে 'দ্য মডার্ন রিভিউ' লিখেছিল, 'The mention of 'the splendour that surrounded her' without any other details conveys a wrong idea of Sister Nivedita's mode of living. The fact is, at that time when Mr.Gandhi saw her, she was the guest of Mrs Ole Bull and Miss Josephine Macleod at the American Consulate, and, as such, was not responsible for the 'splendour.' Her ascetic and very simple style of living in a tumbledown house in Bossepara Lane, Baghbazar, is well known to all her friends and acquaintances.'

শুধু এইটুকুই নয়, 'দ্য মডার্ন রিভিউ' গান্ধীর বক্তব্যের আরো সমালোচনা করে লিখেছিল, 'We do no know whether Mr. Gokhale spoke to Mr. Gandhi in English and actually used the word 'volatile' to describe her: for what has appeared in Young India is translated from the Gujrati Navajivon. But whoever may be responsible for the use of the word 'volatile' has wronged her memory. Sister Nivedita had her defects,

as in fact even the greatest of mankind had and have, but volatile she was not in any sense of that word. As English is not our vernacular, we have consulted two dictionaries on our table to find out its exact meaning as applied to human beings. The pocket Oxford Dictionary defines it to mean 'of gay temperament, mercurial'. In Webeter's new International Dictionary the explanation given is, 'light-hearted; airy; lively; hence; changeable; fickle' Sister Nivedia was a very serious-minded person, noted for her constancy and steadfast devotion to the cause of Hinduism and India.

'The reference to 'her overflowing love for Hinduism' is quite just and accurate.'

'মডার্ন রিভিউ'-এ এই সমালোচনা বেরোনোর পর গান্ধী বুঝতে পারেন কী ভুল তিনি করে ফেলেছেন। ভুল বুঝতে পারার পর গান্ধী অকপটে নিজের সেই ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন এবং তা সংশোধনও করেছেন। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২৭ সালের ৩০ জুন সংখ্যায় গান্ধী লেখেন, 'I gladly reproduce this correction. For I never knew the fact, till I saw the note in The Modern Review that I had met the deceased not at her own place but at a guest's. The reader has to recongnize my painful limitations. My reading is so poor that I have not read much, though I should like of have, the lives even of those who have contributed to the making of modern India. My only consolation is that the poverty of my reading is not due to any laziness on my part, but a life of ceaseless action and full of tempest from early youth left on time for much reading. Whether on the whole I have lost or gained thereby is to me a debatable question. But if it is a gain, it has been achieved in spite of myself. I can therefore claim no credit for it. And if in the story that I am writing from week to week, I deal with men and women, I do so only in so far as such reference is necessary for showing the working of my mind, so far as I can, in my search for Truth. I am therefor leaving our innumerabe instances in life, which would be certainly otherwise interesting, as also references to several men and women. And it will be unjust to those whom I am obliged to refer in the story and to me, if the reader concludes that the estimate that I may give about persons is my final statement or true in fact. Such references should be regarded merely as the impression left upon my mind at the time to which they may relate. I introduced Sister Nivedita, Swami Vivekananda, Maharshi Devendranath and others in

the story simply to illustrate my desperate search, and to illustrate the point, that even then my political work in South Aftica was an integral part of that search, which was never once subordinated to the political work. It has therefore given me pleasure to reproduce the paragraph in The Modern Review at the very first opportunity after reading it.'

তাঁর আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদে 'volatile' শব্দটি ব্যবহার প্রসঙ্গে গান্ধীজি লিখেছেন, 'As to the use of the word 'volatile', though the transslation is not mine I cannot dissociate myself from its use, because as a rule I revise these translations, and I remember having discussed the adjectve with Mahadev Desai, We both have doubts about the use of the adjective being correct.The choice lay between volatile, violent and fanatical. The last two were considerd to be too strong. Mahadev had chosen volatile and I passed it. But neither he nor I had the dictionary meaning in view.

'What word Gokhale used I can not recall. The word used in the original writing is tej. I have a full recollection of the conversation between Sister Nivedita and myself. But I do not propose to describe it. No fault in the translation or the original can possibly damage the memory of one who loved Hinduism and India so well. It will ever be cherished with greatfulness.'

গান্ধীর এই লেখাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক এবং গান্ধীর ক্রটিস্বীকার সব কিছুই ঘটেছে কিন্তু নিবেদিতার প্রয়াণের অনেক পরেই। এবং গান্ধী ক্রটিস্বীকার করে যে লিখেছিলেন, সেটি পড়ে এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিবেদিতা সম্পর্কে কোনো অপ্রিয় মন্তব্য করতে যাননি। যা হয়েছিল, তা নিতান্তই অজ্ঞতাবশত।

আবার ফিরে আসা যাক নিবেদিতার প্রসঙ্গে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিবেদিতার আগ্রহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'বস্তুত: তাঁহার এবার ইংলণ্ডে অবস্থান অতিপ্রিয় স্বদেশে ইতিপূর্বে যে দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া দেখা দিয়াছিল। পুরাতন সম্পর্ক তাঁহাকে নবপরিচিত ভারতবর্ষের কথা ভুলাইতে পারে নাই। তাঁহার সকল কাজকর্ম, চলাফেরার মধ্যে সর্বদা একটি লক্ষ্য থাকিত—তাহা ভারতের সেবা। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত পূর্বপরিচিত অধিকাংশের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন, তাঁহার যাত্রাপথে ইঁহাদের সহিত কোথাও মিল নাই। যে পথ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে, সে পথের সঙ্গী এই মার্জিত, সুসভ্য, প্রভুত্বপরায়ণ ব্রিটিশ নরনারী নহে; তাঁহার যাত্রাপথের সঙ্গী ভারতের অগণিত জনগণ, তাহারা

অনশনক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত, অশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য জাতির নিকট বর্বররূপে পরিগণিত, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চক্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী, কারণ তাঁহারা এমন এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা উন্নত।

'স্বামীজির প্রতি তাঁহার আস্থা পূর্ব্ববৎ অটুট ছিল; কিন্তু ভারত এবং তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁহার মধ্যে স্বামীজি-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল।' অর্থাৎ, মুক্তিপ্রাণা বোঝাতে চেয়েছেন—রাজনীতি সম্পর্কে ক্রমশ আগ্রহী হয়ে ওঠা এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে নিবেদিতা যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিলেন বা নিয়েছিলেন—তা ছিল একান্তই তাঁর। এক্ষেত্রে স্বামীজির কোনো ভূমিকা ছিল না। উপরন্তু, নিবেদিতার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানেও স্বামীজির আপত্তি ছিল। ১৯০২-এর গোড়ায় ইয়োরোপ থেকে কলকাতা ফিরে আসার পর কাকুজো ওকাকুরা প্রমুখের সহচর্যে যখন চরমপন্থী রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন নিবেদিতা —তখন স্বামীজি তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে স্বামীজির আপত্তি ছিল মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, তিনি কখনই চাননি তিনি নিজে বা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কোনো সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারী প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ুন। কেননা, স্বামীজি জানতেন জড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যাঘাত নেমে আসতে পারে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর। সেক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যে কারণে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহমর্মিতা থাকলেও, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সচেতনভাবে তিনি নিজেকে বরাবরই দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ওকাকুরা প্রমুখের সঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ায় স্বামীজির আপত্তির আরো একটি কারণও ছিল। স্বামীজি মনে করতেন, জাতি হিসাবে ভারতীয়রা তখনো কোনোরকম বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়। এইরকম অপ্রস্তুত একটি জাতিকে নিছক আবেগবশত প্ররোচিত করলে তার ফল বিপজ্জনক হতে পারে। এই ভাবনারই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সিস্টার ক্রিস্টিনকে বলা স্বামীজির সেই কথায়, 'দেশের কাছ থেকে আমি সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।'

অনেকে এরকম মনে করে থাকেন, যেহেতু ভারতে আসার আগে আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, সে কারণে ভারতে আগমনের পর থেকেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। এ ধারণাটি কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন, তখন প্রাচ্যের ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে তার যেমন অজ্ঞতা ছিল, তেমনই ভারতীয় রাজনীতি, ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের আচরণ—এসব সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞই ছিলেন। বরং, সেই সময়ে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়,

তিনি ভারত এবং ইংলণ্ডের ভিতর একটি সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে ইচ্ছুক ছিলেন। অর্থাৎ, তখন ভারত এবং ইংলণ্ড—দুই দেশের প্রতিই দ্বৈত আনুগত্য দেখা যায় নিবেদিতার। নিবেদিতার ওই সময়ের চিঠিপত্রে কোথাও ব্রিটিশ-বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। বরং, নিবেদিতার লেখা 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' পড়লে জানা যায়, স্বামীজি নিজেও নিবেদিতার অন্ধ ব্রিটিশ পতাকাপ্রীতির নিন্দা করেছিলেন।

নিবেদিতা ভারতে থাকাকালীনই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ করেন ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আচরণ। ভারতে থাকতে থাকতেই তিনি বুঝেছেন পরাধীন ভারতে ভারতীয়দের কোনো অধিকার নেই। কাশ্মীরে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্তৃক জঘন্য উপায়ে স্বামীজিকে জমি পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা বা জগদীশচন্দ্রকে অন্যায়ভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনের বঞ্চনা, জামশেদজি টাটাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে অনুমতি না দেওয়া এই সবই নিবেদিতাকে ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই ঘটনাগুলিই ক্রমে নিবেদিতাকে ব্রিটিশ বিদ্বেষী করেছিল। আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িত থাকার সুবাদে এবং পিটার ক্রপটকিনের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার ফলে অচিরেই নিবেদিতা জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে। প্রাথমিকভাবে বেছে নিয়েছিলেন চরমপন্থী রাজনীতির পথটিই। আর এই কাজে নিবেদিতা স্বামীজির বাণীকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। 'বন্দেমাতরম' বা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী পত্রিকার আবির্ভাবেরও আগে নিবেদিতা স্বামীজির দেশাত্মবোধ ভাবনাকে প্রচার করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাপুরুষ হিসাবে স্বামীজিকে প্রথম তুলে ধরতে চেয়েছিলেন নিবেদিতাই। নিবেদিতার প্রত্যক্ষ রাজনীতির অংশ গ্রহণের বিষয়ে, স্বামীজির যতই আপত্তি থাকুক না কেন, স্বামীজির প্রয়াণের পরেও তাঁর বাণীকেই রাজনীতিতে চলার পথের পাথেয় করে এগিয়ে গিয়েছিলেন নিবেদিতা।

লাইসোঁতে তিনমাস কাটিয়ে সেপ্টেম্বরে নিবেদিতা লন্ডনে ফিরে এলেন। ততদিন তাঁর চিন্তা-ভাবনায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। পরাধীন ভারতের যন্ত্রণাটি কোথায়, ভারতীয়রা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে কতখানি বঞ্চিত তা বুঝতে পারছেন নিবেদিতা। এবং যতই বুঝছেন, ততই তাঁর অন্তরে ব্রিটিশ বিদ্বেষ জেগে উঠছে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এই সময়ে তিনি লন্ডনে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে কথা বললেন। দেখলেন, অধিকাংশই, বিশেষত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা, ভারতকে স্বাধীনতাদানের বিপক্ষে। তৎকালীন ব্রিটেনে জন ল্যান্ডের মতো দু-একজন উদারনৈতিক নেতা অবশ্য নিবেদিতার মতকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ভালোভাবে বুঝতে তাঁকে সাহায্য করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে নিয়মিত

আলোচনায় নিবেদিতা জানতে পারেন ভারতের রাজনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থাটি। কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র অবহিত করেন তাঁকে। এই সময়ে কংগ্রেসে যোগদান করার ইচ্ছাও তাঁর মনে উদিত হয়েছিল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত একদিন জন-পঁচিশ ভারতীয় ছাত্রকে লইয়া আসিলে নিবেদিতা তাহাদের নিকট জ্বলন্ত ভাষায় 'ভারতের নবজাগরণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইহারা যে তাঁহার একান্ত আপনজন, ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যধর! কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের দাসসুলভ মনোভাব তাঁহার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করিল। নিজেদের দেশ সম্বন্ধে ইহাদের এতটুকু মর্যাদা বোধ নাই। নিবেদিতা নিজেকেই ধিক্কার দেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সংবাদ আসিত, তাহাতে পরাধীন দেশের অসহায়তা ও গ্লানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। যেমন জামশেদজী টাটার বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অনুদার মনোভাব। মিসেস বেশান্ত কাশীতে তাঁহার কলেজ স্থাপনের অনুমতি না পাইয়া অবশেষে ভারতীয় স্টেট সেক্রেটারী লর্ড জর্জ হ্যামিলটনের নিকট সরাসরি আবেদন করিয়াছেন। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তাঁহার আইরিশ চিত্তে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল, এবং উহার ফলে চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল।'

১৮৯৫ সালে স্বামীজি লন্ডনে যাওয়ার আগেই রাশিয়ান দার্শনিক এবং চরমপন্থী বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নিবেদিতার। বলতে গেলে, ক্রপটকিনের রাজনৈতিক শিষ্যত্বই নিবেদিতা তখন গ্রহণ করেছিলেন। ক্রপটকিনের পরামর্শেই নিবেদিতা সেই সময়ে আইরিশ বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং সক্রিয়ভাবে তাদের সহযোগিতা করতে শুরু করেন। এবারও লন্ডনে ফিরে এসে তিনি পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ক্রপটকিনও তাঁর কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের খারাপ দিকগুলি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। নিবেদিতার ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মনোভাব গড়ে ওঠাতে ক্রপটকিনেরও অনেকখানি অবদান ছিল। তদুপরি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার বিষয়েও ক্রপটকিন তঁকে উৎসাহ জোগান। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়—নিবেদিতার রাজনৈতিক গুরু হিসাবে যদি কাউকে দেখতে হয়, তিনি এই রাশিয়ান দার্শনিক পিটার ক্রপটকিন। ক্রপটকিনই একদা তাঁকে আইরিশ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আবার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার পিছনেও এই ক্রপটকিনেরই অনুপ্রেরণা ছিল।

১৯০০ সালে পিটার ক্রপটকিনের 'দ্য মিউচুয়াল এইড' গ্রন্থটি পাঠ করেন নিবেদিতা। এই গ্রন্থে ক্রপটকিনের বক্তব্য তাঁকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। ১৯০০ সালের ১৮ আগস্ট এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'A feeling of feline

possessiveness is growing up in my mind towards Kroptkin's book. He knows more than any other man of what India needs. What I specially dwell upon is the utter needlessness of Governments. That is what we want to learn. We want to learn it and work it into the blood and nerves of the people so that no political machinery would ever have a chance of imposing of a single peasant. It matters little therefore who is on India's throne—Edward VII of England, or the Tsar of all the Russias—her real hope lies in the education of her people. As to the way in which such education is obtained, K. (Kroptkin) himself tells us of the long years of propaganda, of writing, printing, lecturing — only bearing fruit at unexpected moments here and there. This is great —and the book is a great book.

'I have said a good deal about the hopelessness of the Mutiny because there was no 'continuous policy' looming beyond. But the village system supplies machinery of self-government enough, and the grim conviction of the people that all other is unnecessary is the only 'policy' that could possibly prove permanently continuous. So I see now what we have to work for. Neither England, Russia or any other. But determination towards Anarchy, And as India is already the most civilised country in the world, I see clearly that she is at this moment the only country where a gigantic race is employed as a body in working this out. It will be there that the world's problems will be solved. No war, no bloodshed. We shall one day peacefully wait upon the Viceroy and inform him, smiling, that his services are no longer requird. Till then, I think I am glad of every soverign destroyed — if I do nothing for this cause before I die. Have this letter copied and given to anyone who would care for my last will and testament.'

নিবেদিতার চিঠিটি পড়ে এটাই মনে হয় যে, আমেরিকায় অবস্থানকালীন সময়ে পিটার ক্রপটিনের এই বইটি পাঠ করার পরই ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। পরে তা-ই আরো গভীরতা লাভ করে লাইসোঁতে থাকার সময়ে। এবং ভারত সম্পর্কে ক্রপটকিনের বিশ্লেষণ এতটাই অভিভূত করেছিল নিবেদিতাকে যে, লন্ডনে ফিরে এসে আবার ক্রপটকিনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

ব্রিটিশ জাতি সম্পর্কে যেটুকু মোহ ছিল, সে মোহও লাইসোঁতে থাকাকালীনই নিবেদিতার কেটে যায়। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ভারতে ফিরে আসবেন মনস্থির করেছিলেন, কিন্তু নানা কাজে জড়িয়ে পড়ায় তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে

উঠছিল না। কিন্তু এবার স্থির করলেন, সব কাজ ফেলে রেখে ভারতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন। ব্রিটিশদের সম্পর্কে তিনি যে কতটা মোহমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই সময়ে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পড়লেও তা বোঝা যায়। ১৯০১-এর ১১ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'It is nice to hear that my country people have their social virtues. I think if one is within the ring, there is no one like them in the world. But I pray never to forget for one moment what it is to be outside that ring! To know that all our talk of Freedom— Freedom for all the people of the Earth — Freedom for every man of every people of the Earth for this was how I SAW the national ideal— to know that all this meant only British comfort, success and gold, has been such a feast of ashes to me as leaves me with no power of rebound at all. I am permanently embittered and disillusioned, I much fear. Yet there are a few honest men here all the same. But has any Ninkiveh ever been entirely without its Jonahs? I don't think the honesty of a few can be counted specially to England's credit, since it belongs to all Humanity.'

৭ মার্চ ১৯০১ জোসেফিনকে লিখছেন, ...'I quite agree that Swami is at the vitals and all other movements merely attacking symptoms— yet of course many different kinds of work are needed. Blessed india! How infinitely much I owe her. Have I anything worth having that I do not directly or indirectly owe to Her?'

১৫ মার্চ লিখছেন, '...What we have dreamt and talked of, was but child's play compared with what lies actually before.

'I feel as if I alone, of all who ever lived, am beginning to see the thing as it really is. Certainly no one has seen it but Swami, and I know that his vision does not obviate mine, but makes it the more necessary.'একটি বিষয় উল্লেখ্য। এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যাচ্ছে, নিবেদিতা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন। সে সঙ্গে এ-ও বোঝা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও তাঁর অভীষ্ট কাজের পক্ষে স্বামীজির বাণীকেই তিনি হাতিয়ার করতে চাইছেন। বারবার একথাই বলতে চেয়েছেন—স্বামীজিও প্রকৃত চিত্রটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ, স্বামীজির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে যে তিনি কিছু করছেন না বা করতে চাইছেন না, বরং যা করতে চাইছেন, সে যে স্বামীজি নির্দেশিত পথেই—তা-ই যেন বারবার বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের। ১৯০১-এর ১৯ জুন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন নিবেদিতা,

সেই চিঠিতে আরও পরিষ্কার হয়েছে তাঁর সেই সময়ের ভাবনা-চিন্তা। নিবেদিতা লিখেছেন, ' I must tell you with the utmost intensity that I have no interest in anything done by the Government for India. To my mind, what a people do not do for themselves is ill-done, no matter how brilliant it seems. I keep on more and more seeing that what I once saw true for an individual is true for communities. ...I am doing nothing for India. I am learning and galvanizing, I am trying to see how the plant grows. When I have really, understood that, I shall know that there is nothing to be done, except defence, I fancy.

'India was absorbed in study; a gang of robbers came upon her and destroyed her land, the mood is borken. Can the robbers teach her anything? No, she has to trun them out, and go back to where she was before. Something like that, I fancy, is the true programme for India. And so I have nothing to do with Xtians or Government agencies as long as the government is foreign. That which is Indian for India, I touch the feet of , however stupid and futile. Anything else will do a little good and much harm, and I have nothing to do with it. Yes, my way will do some harm, too, but it will be vital to the people themselves. Good and evil of their own, not any other's, and for such harm I care nothing. They need it...

'People must come to England, people like Swami, like Dr.Bose, like Mr. Dutt, and must show in England what India is and can be. They must make friends and disciples and loves by the millions. And so in 20 years from now, when the blow is struck (I know that will be), there will suddenly be a body of men and women in England, who never thought of themselves in that light before, to rise up and say 'Hands off. This people shall be free!" But this is the redeeming of England—it is not work done for India.

'Oh! in India now, we want, what do we not want? We want the very dust of the earth to carry our message for us. We want the slow-growing formative forces put well to work. Do not think I can be forgetful of the planning of trees, the training of children, the farming of land. But we want also the ringing cry, the passion of the multitude, the longing for death. And we can not do without these. When I think of our needs, I am in despair, but when I remember that the time is ripe, and that MOTHER works, not we, I take courage again.

'All we have to do is to float with the tide, anywhere, anywhere it may take us—to speak the whole word that comes to us—to strike the blow on the instant of heat. Dare we hope that we shall not fail?

'May task is to see and to make others see. The rest does itself. The vision is the great crisis. Now do you see what I feel and why? To me now a missionary is a snake to be crushed with my heel. The better he is doing, the worse he is...The English official is a fool, playing amidst smoking ruins and crying on the highway that he builds well. The native Christian is a traitor in his own land. For these and of all other bought men, paid spies, mercenaries, india has no use and no time. Very different work they must be at, who would save her, or show her, rather, how to save herself. The Congress is foolish, it is true, an mischievous in some ways, but it is ten thousand time better than Mr. Tata's scheme, for instance, or the Sorabji business.

'Swami is the only person I know of who goes to the root of the matter—national man-making—I don't know if Swami formulates all this other. I don't think he does.

'But don't mistake me. India, once conscious that she has to save herself, may employ a foreigner, a christian, anyone she likes, here and there. That is a very different matter. At present they gag her and feed her with morphine laden soothing syrup which they call education.'

কতখানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষী নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন, এই চিঠিটি তার প্রমাণ। নিবেদিতার চিন্তায় যে তখন শুধুই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা এই চিঠিটিতেই তা ধরা পড়েছে। অবশ্য, সেই সঙ্গে নিবেদিতা জোসেফিনকে মনে করিয়ে দিতেও ভোলেননি—যে কাজের দায়িত্ব, অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা, তাঁকে স্বামীজি দিয়েছেন, সেই কাজে তিনি অবহেলা করবেন না। কিন্তু, এই মুহূর্তের রাজনৈতিক চাহিদাটিও যে কী তা-ও যে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, সে কথাও জানিয়েছেন জোসেফিনকে। ১৯০১ সালের ১০ জুন নিবেদিতা লিখছেন, 'You must not think from all this that I cherish any idea of going out to be with Brahmos when I get back. Not at all. I belong to my work— to the women— and to the girls—even as you have said. And I belong to Hinduism more than I ever did. But I see the political need so clearly too! That is all I mean — and to that I must be true. I believe now that I have something to do for grown-up India

and for Indian men. How I shall be allowed to do that something, is Mother's business, not mine.'

নিবেদিতা তাঁর চিঠিগুলিতে একটি বিষয় বারংবার উল্লেখ করেছেন— ভারতের প্রকৃত চিত্রটি একমাত্র স্বামীজিই জানেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রকৃতচিত্র বলতে ভারতবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অবিচারের কথাই নিবেদিতা বোঝাতে চাইতেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের এই দুর্দশা যে স্বামীজি সত্যিই অনুভব করতেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তিনিও যে ক্ষুব্ধ ছিলেন তা বিভিন্ন সময়ে স্বামীজির বক্তব্যেও ধরা পড়েছিল। স্বামীজি তাঁর আমেরিকান শিষ্য মেরি হেলকে একটি পত্রে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার দিকটি বিশদে তুলে ধরেছিলেন। মেরি হেলকে স্বামীজি লিখেছিলেন, '...রক্তশোষণই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না। ...আধুনিক ভাবাপন্ন, অর্ধশিক্ষিত ও জাতীয় ভাব-বর্জিত কয়েক শ লোক— এই হল ইংরেজ শাসিত বর্তমান ভারতের সেরা রূপ। আর কিছু নেই। ...ইংরেজের বিজয় প্রচেষ্টার কালে শতাধিক বর্ষব্যাপী অরাজকতা, ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে ইংরেজের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, এবং ততোধিক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, যা হল ইংরেজ রাজত্বের অনিবার্য ফল (করদ রাজ্যগুলিতে কোনদিন দুর্ভিক্ষের বালাই নেই), এবং যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটছে—এই সব অন্তরায় সত্ত্বেও লোকসংখ্যার বেশ বৃদ্ধি হয়েছে। ...এই তো অবস্থা। এমনকি শিক্ষার প্রসারও আর হতে দেওয়া হবে না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আগেই বন্ধ করা হয়েছে (বলা বাহুল্য, নিরস্ত্রীকরণ বহু পূর্বেই হয়ে গেছে)। যে সামান্য স্বায়ত্ত-শাসন কয়েক বৎসরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেইটুকুও দ্রুত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাকিয়ে আছি আরও কী হয় দেখার জন্য। গুটিকতক নির্দোষ সমালোচনাত্মক কথার ফল— লোকের সঙ্গে সঙ্গে যাবজ্জীবন নির্বাসন, কারও বা বিনা বিচারে কারাদণ্ড; তা ছাড়া কেউ জানে না, কখন তার মাথাটা কাটা যাবে।

'ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। ইংরেজ সৈনিকদের হাতে আমাদের পুরুষেরা প্রাণ হারাচ্ছে, মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে। তাদেরই আবার আমাদের ঘাড় ভেঙ্গে বৃত্তি ও পাথেয় দিয়ে ঘরে পাঠানো হয়। এক ভয়ঙ্কর হতাশার মধ্যে আমরা বাস করছি।...

'শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য পূর্ব পূর্ব সরকাররা যে সব জমি-জারাত দিয়েছিল সে সব গ্রাস হয়ে গেছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষা-বাবদে রাশিয়ার চেয়েও কম করচ করে— আর সে শিক্ষাও কেমন!

'মৌলিকত্বের এতটুকু প্রকাশ দেখলেই তাকে গলা টিপে মারা হয়। মেরি, সত্যই যদি ঈশ্বর থাকেন, তো তিনি ছাড়া আমাদের কোনও আশা দেখি না।

'...আমরা এক নূতন ভারতবর্ষের সূচনা করেছি, এক অভ্যুদয়ের— এবং কী ফলাফল হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। — সমাজ ও আমাদের মধ্যে নয়—ওরা তো গেছেই। এ সংগ্রাম আরও কঠোর, গভীরতর ও আরও ভীষণ।'

কিন্তু, একথা লিখলেও স্বামীজির মনে তখনো সন্দেহ ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতীয় জনগণ সত্যিই মানসিকভাবে প্রস্তুত আছে কিনা। স্বামীজির রচনাতেই রয়েছে, 'হে ভারত, এই পরাণুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সহায়ে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?' এই সংশয় থেকেই স্বামীজি সিস্টার ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন, দেশের মানুষের কাছ থেকে তিনি সাড়া পাননি। জোসেফিনকে লেখা নিবেদিতার চিঠি পড়লে মনে হয়, স্বামীজির এই সংশয়ের কথা নিবেদিতাও জানতেন। জানতেন বলেই নিবেদিতার এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর রাজনীতিতে আগ্রহ প্রকাশ করা বা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া স্বামীজি অনুমোদন করবেন না। ১৯০১-এর ১৯ জুন-এ চিঠিতে তাই তিনি জোসেফিনকে লিখেছেন, 'I am likely to be asked to speak at the Congress— and am only hoping that Swami will do so too— as I intend to accept. And so on.

'To my great horror, freedom has meant something to me, for my life has come to include many elements that Swami would probably not have put there. They are all for him however, I trust in the end— and he will not hold me less his child than before.'

ভারতে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে মনস্থির করে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০১ নরওয়ে থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন নিবেদিতা। ১৪ সেপ্টেম্বর গ্লাসগোতে তিনি বক্তৃতা দিলেন। অক্টোবর মাসে বোথানি নামে একটি জায়গায় ছোট একটি মঠে এক সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন। এক সপ্তাহ এই মঠের জীবন খুবই ভালো লেগেছিল নিবেদিতার। এই মঠ থেকে লেখা একটি চিঠিতে (৩ অক্টোবর ১৯০১) জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা, 'This is an Anglican, not a Roman, Sisterhood, so everything is in English instead of Latin, and there is a certain reserve and self restraint from great emotion, which is most beautiful to me. And yet the whole life is like a great office of prayer, so that the very stones of the walls seem full of the beautiful influence of peace and the thought of God.'

কিন্তু তিনি যে ভারতে ফিরে যেতে ব্যাকুল সে কথাও নিবেদিতার এই চিঠিতে পরিষ্কার ধরা পড়েছে। নিবেদিতা লিখেছেন, '...I want to get to Swami and the Holy Mother myself. All my wishes are summed up in that one longing. So meanwhile, as I can not settle but must wait to be shown, I do my best to write and write, and thus accomplish the immediate duty.'

কিন্তু ভারতে আসার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে মনস্থির করে ফেললেও ফিরে আসার দিনক্ষণ তখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি নিবেদিতা। কারণ, তখনও তাঁর হাতে রয়েছে জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থটি সম্পাদনা এবং পরিমার্জনার কাজ। লন্ডনে ফিরে এসে দ্রুত তিনি ওই কাজে হাত দিলেন। তাঁর তখন একটিই লক্ষ্য —হাতের কাজগুলি দ্রুত শেষ করে ভারতে ফিরে যাওয়া। নভেম্বর মাসটা জগদীশচন্দ্রের পুস্তকের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা করে এবং প্যাট্রিক গেডিজের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময়টা কাটল নিবেদিতার। অবশেষে ঠিক হল, ১৯০২-এর জানুয়ারির প্রথমেই তিনি ভারতের দিকে রওয়ানা দেবেন।

নিবেদিতার এই ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্তে জগদীশচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা নিবেদিতাকে পেয়ে বসেছে। ভারতের ডাকে সাড়া দিতেই হবে তাঁকে। কিন্তু বসু তাতে ভয়ানক বিরক্ত। 'আমার সাফল্যের চেয়ে ভারতই তোমার বড় হল।' তারপর থেকে নিবেদিতাকে আর চিঠিপত্র দিতেন না।'

জগদীশচন্দ্রের এই অভিমান বা ক্ষোভ খুব যুক্তিযুক্ত ছিল তা নয়। নিবেদিতা কিন্তু ভারতে আসার বিষয়ে মনস্থির করেও দিনক্ষণ সব পিছিয়ে দিয়েছিলেন একটিই কারণে। তা হল— জগদীশচন্দ্রের পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কাজটি সম্পূর্ণ করে যাওয়া। সেই কাজ সম্পূর্ণ করেই তিনি ভারতে ফিরে আসার দিনক্ষণ ঠিক করেছিলেন। তবু জগদীশচন্দ্রের অভিমান হয়তো একারণেই হয়েছিল যে, তিনি ভেবেছিলেন নিবেদিতা লন্ডনে আরো বেশ কিছুদিন কাজকর্মের বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করবেন। যদি এরকম ভেবেই থাকেন জগদীশচন্দ্র, তাহলে বলতেই হয়— সেটি তিনি শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থেই ভেবেছিলেন। নিবেদিতার স্বাধীন সত্ত্বাকে তিনি ধর্তব্যের ভিতর আনেননি।

কিন্তু তখন জগদীশচন্দ্রে বন্ধুত্বের দাবি ছাপিয়ে ভারতের আহ্বান নিবেদিতার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। আর ভারতের আহ্বান যতই বড় হচ্ছে—স্বামীজির কাছে এসে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করার ইচ্ছাই প্রবল হয়ে উঠছে। তুচ্ছ হয়ে পড়ছে আর সবকিছু। তখন আর এক মুহূর্তও ইংল্যান্ডের মাটিতে সময় নষ্ট করতে রাজি

নন নিবেদিতা। তাঁকে তখন ভারতে ফিরতেই হবে। নিজেকে নিবেদন করতে হবে গুরু বিবেকানন্দের পায়ে। শুরু করতে হবে কর্মযজ্ঞ।

৩১ ডিসেম্বর ১৯০১ নিবেদিতা মম্বাসা জাহাজে তাঁর জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন। ৯ জানুয়ারি, ১৯০২ প্যারিস থেকে ওই জাহাজেই উঠলেন নিবেদিতা। গন্তব্য কলকাতা।

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'বন্ধুদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে নিবেদিতা রওনা হলেন। জাহজে একা থাকবেন এই তাঁর ইচ্ছা। চেয়েছিলেন ভারতে গিয়ে একলাই দেখা করবেন সারদা দেবী আর তাঁর গুরুর সঙ্গে।

এইমাত্র খবর পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ভয়নাক অসুস্থ।'

পঁচিশ

ভারতের পথে জাহাজে নিবেদিতার সঙ্গী হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সারা বুল। ১৯০২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা মাদ্রাজে পৌঁছলেন। পরদিনই, অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা এবং রমেশচন্দ্রকে মাদ্রাজের মহাজন সভা প্রেক্ষাগৃহে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হল। রমেশচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে বললেন, ভারতের সেবায় যাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, সেই নিবেদিতাকে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর তিনি সবিশেষ আনন্দিত। নিবেদিতা তাঁর ভাষণে বললেন, 'Just it has been realised already that in religion you have a great deal to give, and nothing to learn from the West, so also in social natters it will be well to understand that what changes are necessry you are fully competent to make for yourselves, and no outsider has the right to advise or interfere. Changes no doubt there will be. Change is probably, inseperable from the process of life. But these changes must be orignal, self-determined, self wrought. What! does the civilisation of three thousand years mean nothing that the young nations of the West should be in a position to lead the peoples of the East?'

নিবেদিতা বললেন, 'They tell us that India wants civilising, that Indian life is barbarous. Nay, we answer, it is simple, but this simplicity resembles the religious thought of India in being itself not only a special from of civilisation of a very high order, but is also providing the solution of the abstract and universal problem of all civilisations ...before Europe was born, India had grasped the essential fact that the end of civilisation lies in the making of men- not weatlth, not power, not organisation.'

তাঁর এই বক্তৃতায় নিবেদিতা স্বামীজি, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং জগদীশচন্দ্রের নামোল্লেখ করেন। নিবেদিতা বলেন, 'It has been my unspeakable privilege to know some of the greatest men that modern India has produced. Of one well known to you, it is not my place to speak, since a daughter can not be permitted to offer praise before the world to her own father. Her whole life is in that case, her best offering. Or of him, again, whom you see before you, it would be impertinent to talk in his presence. We must leave in silence that admiration and reverence that his work and his character can not fail to inspire. Let us speak then, of a faithful son of motherland, who is working in distance and isolation for his cause, and who ought to be remembered daily in the love and prayers of all country people–I allude to Professor Jagadish Chandra Bose.'

নিবেদিতা রমেচন্দ্র এবং জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে অনেকখানি অংশ জুড়ে সপ্রশংস বক্তব্য রাখেন। ১৯০২ সালের ৮ ফ্রেব্রুয়ারি কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় নিবেদিতার এই ভাষণটি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়।

নিবেদিতা, সারা বুল এবং রমেশচন্দ্র যখন মাদ্রাজে এসে পৌঁছোন, তখন স্বামীজি বারাণসীতে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেই সময়ে বেশ অসুস্থ। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যই বারাণসীতে গিয়েছিলেন তিনি। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংবাদ পাঠ করে এবং বিভিন্ন জনের সূত্রে স্বামীজি মাদ্রাজে নিবেদিতার এই বক্তৃতার কথা জেনেছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ তারিখে বারাণসী থেকে সারা বুলকে লিখেছেন স্বামীজি, 'মাতা ও কন্যাকে ভারতে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। জো-র সৌজন্যে মাদ্রাজের একখানা সংবাদপত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি ; নিবেদিতা মাদ্রজে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে, তা নিবেদিতা ও মাদ্রাজ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। তার ভাষণ যথার্থই সুন্দর হয়েছিল।'

তবে, ভারতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিবেদিতা তাঁর স্কুলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে পূর্ণোদ্যমে লেগে পড়ুন—তা-ও স্বামীজি চেয়েছিলেন। এমনকী নিবেদিতার স্কুলের বাড়িটি কেমন হবে সে সম্বন্ধেও তিনি ভেবেছিলেন। সারা বুলকে ১০ ফেব্রুয়ারির চিঠিতেই স্বামীজি লিখেছেন, 'সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে—আশা করি, আপনি এখন ভালভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এবং নিবেদিতাও বিশ্রাম নিচ্ছে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরি পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়।

প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরি করতেন। সেই শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরি করে দিতে পারতাম! তবে এখনও যে কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও। ব্রহ্মানন্দ তার ব্যবস্থাদি করবেন; আপনাদের কাজ শুধু কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণ।'

১৯০২ -এর ১২ ফেব্রুয়ারি স্বামী ব্রহ্মান্দকে লিখেছেন, 'নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে যা আমার বলবার ছিল, তাকে লিখেছি। বলবার এই যে, তার যা ভাল বিচার হয় করবে।' স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজির এই চিঠিটি পড়লে এরকমই বোধ হয় যে, নিবেদিতার স্কুলের ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ স্বামীজি চাননি। বরং, স্কুলটি নিবেদিতা নিজের মতো করে চালান সেইটিই চেয়েছিলেন স্বামীজি। ১২ ফেব্রুয়ারিই তিনি নিবেদিতাকে লিখলেন, 'সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর— এই আমার প্রার্থনা...

'যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমন ভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্টভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।' অর্থাৎ, সর্বতোভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি অনুপ্রাণিত করলেন নিবেদিতাকে।

মাদ্রাজে ওই ভাষণটি দেওয়ার পর পরই নিবেদিতার ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়ল। নিবেদিতার ওই বক্তৃতায় যে তীব্র জাতীয়তাবাদের আঁচ ছিল তা ব্রিটিশ প্রশাসনের নজর এড়ায়নি। ব্রিটিশ প্রশাসন বুঝতে পেরেছিল— নিবেদিতার এইসব জাতীয়তাবাদী কথাবার্তা স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। ব্রিটিশ প্রশাসন এই আশঙ্কাই করেছিল যে— নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতে আসার আগে নিবেদিতার অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের অজানা ছিল—এমন ভাবা ভুল হবে। আইরিশ বিপ্লবী এবং পিটার ক্রপটকিনের মতো রাশিয়ান বিপ্লবীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল—এমনও মনে হয় না। কাজেই মাদ্রাজে যখন নিবেদিতা এই বক্তৃতাটি দিলেন, তখন আবার নতুন করে তাঁর ওপর ব্রিটিশ প্রশাসনের নজরদারি শুরু হল। ফলে, নিবেদিতার চিঠিপত্র খুলে পড়ার এবং তাঁর ওপর নজর রাখার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হল। কলকাতায় ফিরে আসার পর ৩ মার্চ, ১৯০২ তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'It is so uncomfortable to feel that I can not express myself at all affectionately or freely because I have received a warning that the police have taken authority

to open my letters, and I do not care to write to you for their eyes. The very possibility put a restraint.

'It has suddenly grown hot, and I am afraid our party may break up.'

নিবেদিতার এই চিঠিতে পেনসিলে নোট হিসাবে লেখা রয়েছে 'Leftist Party In Congress.' চিঠির এই নোটটি পড়ে এরকমই মনে হয়, নিবেদিতা সেই সময়ে কংগ্রেসের ভিতর অবস্থানকারী চরমপন্থী অংশটিকেই বুঝিয়েছিলেন। এবং এই অংশটির সঙ্গে যে নিবেদিতার একটি যোগাযোগ তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল—তা আন্দাজও করা যায়।

১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় ফিরে কিছুদিন নিবেদিতা অবস্থান করেছিলেন কলকাতাস্থ মর্কিন কনসালের বাড়িতে। এখানেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেখা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে; সে কথা পূর্বেই অলোচিত হয়েছে। কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর কিছুদিন পর অবশ্য নিবেদিতা এসে ওঠেন বাগবাজারে, ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। এই বাড়িতে রমেশচন্দ্র দত্ত নিয়মিত যাতায়াত করতেন। রমেশচন্দ্র এই সময় নিয়মিত বাংলাও পড়াতেন নিবেদিতাকে। পাশাপাশি, এই সময় থেকেই নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়ি জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গন্তব্য হয়ে দাঁড়াল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, আবদুর রহমানের মতো ব্যক্তিরা এই সময়ে প্রায়ই নিবেদিতার বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ভারতের রাজনীতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনাও করতেন নিবেদিতা। ফলে, ব্রিটিশ পুলিশের সন্দেহের তালিকায় নিবেদিতার নাম উঠতেও খুব দেরি হয়নি।

কলকাতায় ফিরে আসার পরই নিবেদিতা স্কুল চালু করার বিষয়টিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। নিবেদিতা স্থির করেছিলেন, সরস্বতী পূজার দিন আবার স্কুল চালু করবেন। স্কুল চালু করার কাজে নিবেদিতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ। স্কুল চালু করার উদ্দেশ্য নিয়ে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করলেন নিবেদিতা। তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে পুজোর আয়োজন করা হল। নিবেদিতা তাঁর পুরনো প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুজোয় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন। সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিবেশী মহিলারা ভিড় করে এলেন নিবেদিতার বাড়িতে। বেশ সমারোহের সঙ্গেই সরস্বতী পুজো সম্পন্ন হল নিবেদিতার বাড়িতে। নিবেদিতার এই সরস্বতী পুজোর সংবাদ স্বামীজির কাছেও পৌঁছেছিল। বারাণসী থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজি লিখলেন, 'নিবেদিতার ৺ সরস্বতী পূজার ধুমধাম শুনে বড়োই খুশি হলাম।

নিবেদিতা শীঘ্রই স্কুল খোলে খুলুক। ...পাঠ, পুজো, পড়াশোনা সকলের যাতে হয়, সে-চেষ্টা করবে।'

কলকাতায় ফিরে আসার পর ফেব্রুয়ারি মাসেই সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে নিবেদিতার। এই পরিচয় ভারতীয় চারুকলার প্রচার এবং প্রসারের কাজে ভবিষ্যতে অত্যন্ত সহায়ক এবং কার্যকরী হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি হ্যাভেলের অপরিসীম আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। নিবেদিতা চাইতেন, ভারতীয় চিত্রকলা পাশ্চাত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে আপন ঐতিহ্য অনুসারে স্বকীয় হয়ে উঠুক। তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতীয় চিত্রকলাকে পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত করে আপন বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হ্যাভেল তাঁকে সাহায্য করবেন। নিবেদিতার এই ভাবনার পিছনে আরো একটি কারণ ছিল। নিবেদিতা এ-ও মনে করতেন—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে ভারতকে নিজ ঐতিহ্যের অনুসারী করে তুলতে না পারলে জাতীয়তাবোধও জাগ্রত করা যাবে না। হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা ভারতীয় চিত্রকলাকে পাশ্চাত্যপ্রভাব মুক্ত হয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

হ্যাভেলের সঙ্গে এই পরিচয় পর্বের পর পরই নিবেদিতা ১৯০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিটিতে লিখেছেন, 'She (Miss Hay) took me to see the head of the Art School here–which was a success. They beg to come and look at the bottle (which when cleaned of Gauges mud, proved a divine shimmer of silver and light blue!) and take the next Tuesday. The FEEL with extraordinary rightness about Indian Art. Schools are doing nothing but harm– Government utterly blind etc. etc. But they say 'I can teach a man to draw and pain, but I can not make him an artist, or a genius!' And my spirit laughed behind its mask of features and said, 'Fools! but I CAN.' How is it that they do not see? Love of Country–love if Follows–Pride of birth–Hope for the Future – dauntless passion for INDIA– and there will be such a tide of Art, of Science, of Religion, of Energy, as no man can keep back. Instead of dolts-heroes—instead of copyist—original genuises. All these one could create–all these must be created. will it be done? Everything else is only training—only opurtunity. The whole world can be laid under tribute—Europe—Japan—science—Arts—Mechenics—Heasting— Literature—but only if this divine passion first exists. The people as yet are like men in dreams

and even the shifter of burdens binds them faster in a tie. They are not awake–they do not know to what end their dormant powers may be directed.'

১৯০২ সালে নিবেদিতা ভারতে এসে পৌঁছোনোর অনেক আগেই, ১৯০১-এর ডিসেম্বরে জাপান হয়ে কলকাতা এসে পৌঁছোন জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। জোসেফিনের সঙ্গে জাপান থেকে আসেন ওকাকুরা কাকুজো। ওকাকুরা ছিলেন বিশিষ্ট জাপানি শিল্পশাস্ত্রী এবং জাপানের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৮৬ সালে, জাপান সরকার তরুণ ওকাকুরাকে ইম্পিরিয়াল আর্ট কমিশনের সদস্য হিসাবে ইউরোপ এবং আমেরিকা সফরে পাঠায়। পাশ্চাত্য সফর করে আসার পর জাপান সরকার ১৮৮৭ সালে ওকাকুরাকে টোকিও নিউ আর্টস্কুলের ডাইরেক্টর পদে নিয়োগ করে। জাপান সরকার ওকাকুরার ওপর চাপ দিতে থাকে যে, ওই আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য ধারায় চিত্রকলা শিক্ষা দিতে হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত ওকাকুরা মেনে নিতে পারেননি। ওকাকুরার জাতীয়তাবোধ এতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। ওই আর্টস্কুলের ডিরেক্টরের পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। ওই সময়ে জাপানের উনচল্লিশজন বিশিষ্ট চিত্রকর ওকাকুরাকে সমর্থন জনিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ওকাকুরা টোকিওতে আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের পত্তন করেন। ওকাকুরার এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবই নিবেদিতাকে আকর্ষণ করেছিল। এই চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছিল ওকাকুরার 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট' গ্রন্থে। ওকাকুরার এই গ্রন্থে অবশ্য নিবেদিতার প্রভূত অবদান রয়েছে। ওই গ্রন্থে ওকাকুরা লিখেছিলেন, 'Asia is one. The Himalayas divide, only to accentuate, two mighty civilizations, the Chinese with its communism of Confucius, and the Indian with its individualism of the Vedas. But not even the snowy barriers can interrupt for one moment that broad expanse of love for the Ultimate and Universal, which is the common thought—inheritance of every Asiatic-race, enabling them to porduce all the great religions of the world, and distinguishing them from those maritime peoples of the Mediterranean and the Baltic, who love to dwell on the Particular, and to search out the means, not the end, of life.'

ওই গ্রন্থে ওকাকুরা আরো লিখেছিলেন, 'The task of Asia today, then, becomes that of protecting and restoring Asiatic modes. But to do this she must herself first recognise and develop consciousness of these modes....

'It was some small degree of this self-recognition that re-made Japan, and enabled her to weather the storm, under which so much

of the Oriental world went down. And it must be a renewal of the same self-consciousness that shall build up Asia again into her ancient stead-fastness and strength.'

জোসেফিন ম্যাকলিয়ড জাপানে গিয়েছিলেন ১৯০১-এর মে মাসে। নিছক একজন পর্যটক হিসাবে জোসেফিন জাপানে যাননি। জাপানের সংস্কৃতি এবং দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতেই ওদেশে গিয়েছিলেন জোসেফিন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কেও জাপানের কাছ থেকে কিছু জানার আগ্রহ ছিল তাঁর। ১৯০১-এর মে থেকে নভেম্বর—ছ মাস জোসেফিন জাপানে কাটিয়েছিলেন। এই সময়ে টোকিওর আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে জাপানি চিত্রকলার ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তৃতা তিনি শুনতে যেতেন। এই বক্তৃতা সভাতেই ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ওকাকুরার বক্তব্য জোসেফিনকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁরা দুজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও হয়ে ওঠেন। জোসেফিন ওকাকুরাকে স্বামীজি এবং স্বামীজির দর্শন সম্পর্কে অবহিত করেন। জোসেফিনের কাছ থেকে শুনে ওকাকুরাও স্বামীজি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ওকাকুরা এবং জোসেফিন ঠিক করেন, জাপানে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখার জন্য স্বামীজিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেইমতো ওকাকুরা স্বামীজিকে আমন্ত্রণও জানান। কিন্তু স্বামীজি জাপান যেতে পারেননি। ১৯০১-এর ১৪ জুন স্বামীজি জোসেফিনকে চিঠিতে লিখেছেন, 'জাপান বিশেষতঃ জাপানী শিল্প তুমি উপভোগ করছ, এতে আমি খুব আনন্দিত। জাপানের কাছ থেকে আমাদের যে অনেক কিছু শিখতে হবে, এ কথা তুমি ঠিকই বলেছ। জাপান আমাদের যে সাহায্য করবে, তার মধ্যে থাকবে সহানুভূতি ও মর্যাদা, আর অন্যদিকে পশ্চিমের সাহায্য সহানুভূতিশূন্য ও গঠনবিরোধী। ভারত ও জাপানের মধ্যে একটি যোগসূত্র-স্থাপন সত্যই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।...

'এখন প্রিয় জো, যদি আমাকে জাপানে যেতে হয়, তবে এবার কাজটা চালাবার জন্যে সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া লি হুয়াং চাং-এর (Le Hung Chang) নিকট মিঃ ম্যাক্সিমের অঙ্গীকৃত পত্রখানাও আমার অবশ্যই পাওয়া চাই। বাকি 'মা' জানেন। এখনও কিছু স্থির নেই।...

'এইমাত্র মি: ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০ টাকার একটি চেক এবং আমন্ত্রণ এল। এ খুবই লোভনীয়, কিন্তু তথাপি 'মা'-ই জানেন।'

ওকাকুরার এই আমন্ত্রণ পাঠানোর পিছনে যে জোসেফিনের অবদান রয়েছে, তা স্বামীজি জানতেন। ১৮ জুন ১৯০১ তারিখে জোসেফিনকে স্বামীজি লিখলেন, 'তোমার চিঠির সঙ্গে মিঃ ওকাকুরার টাকার রসিদ পাঠালাম। তোমার সবরকম চাতুরীর জন্যই আমি প্রস্তুত।

'যা হোক, আমি যাবার জন্য সত্যিই চেষ্টা করছি। কিন্তু জানই তো—যেতে এক মাস, ফিরতে এক মাস, আর থাকতে হবে দিন কয়েক। তা হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; তবে আমার দুর্বল স্বাস্থ্য এবং কিছু আইন ঘটিত ব্যাপার প্রভৃতির জন্যই একটু দেরি হতে পারে।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্বামীজির জাপান যাওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়েছিল বলে জাপান যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বামীজি। তিনি জাপান আসতে পারবেন না জানার পর জোসেফিন ঠিক করেন ওকাকুরা এবং আরো কয়েকজন জাপানি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে যাবেন। এবং তাঁদের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় করাবেন। ১৯০১-এর ৩০ অক্টোবর এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সারা বুলকে জোসেফিন লেখেন, 'Since Swamiji did not come to Japan, Mr. Okakura is thinking of going to India for two months but as the meeting of the committee for the Restoration of the Old Temples— of which he is the head, may not take place till early december—if I go the 30th November as I had planned, he may not be able to accompany me. So I would rather postpone sailing a week or ten days, and have the pleasure and protection of his and Mr Hori's company during the three weeks' sea voyage.

'Mr. Hori is a young neophyte, who is going to the Math— a fine earnest Japanese, who has led a Brahmachari's life for 7 years.'

ওকাকুরা এবং জাপানি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে জোসেফিন কলকাতা আসছেন—এ সংবাদে স্বামীজিও যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৯০১-এর ৮ নভেম্বর স্বামীজি লিখেছেন জোসেফিনকে, 'যা হোক, তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ জেনে বেশ আনন্দিত হলাম। আমার ক্ষমতায় যতটা কুলায়, আমি তাঁদের খাতির-যত্ন করব। খুব সম্ভব আমি তখন মাদ্রাজে থাকব। আমি ভাবছি যে, আগামী সপ্তাহে কলকাতা ছাড়ব এবং ক্রমশ দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাব।

'তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখা সম্ভব হবে কিনা, জানি না। আমি ম্লেচ্ছদের খাবার খেয়েছি বলে আমাকেই ঢুকতে দেবে কিনা জানিনা। লর্ড কার্জনকে ভেতরে যেতে দেয়নি।

'যা হোক, আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা আমি তোমার বন্ধুদের জন্য করতে সর্বদা প্রস্তুত!'

১৯০২-এর ৬ জানুয়ারি জোসেফিন, ওকাকুরা এবং হোরি সান (যাঁর কথা সারা বুলকে লিখেছিলেন জোসেফিন) কলকাতা এসে পৌঁছোলেন। বেলুড় মঠে ওকাকুরাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন স্বামীজি। ওকাকুরাও মুগ্ধ হলেন স্বামীজিকে দেখে। প্রাচ্যের

ধর্ম এবং দর্শন, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের ওপর স্বামীজির কতখানি দখল তা ওকাকুরা এই বেলুড়ে থাকাকালীন সময়ে বুঝেছিলেন। স্বামীজির এই পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দ আমাদের, প্রাচ্যের। তোমাদের, পাশ্চাত্যের নন।'

নিবেদিতা যে সময়ে কলকাতা এসে পৌঁছোন, সে সময়ে অবশ্য জোসেফিন এবং ওকাকুরা কলকাতায় ছিলেন না। দুজনেই তখন বেরিয়েছিলেন ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যগুলি দর্শন করতে। বারাণসী থেকে স্বামীজিও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন বুদ্ধগয়া ভ্রমণে। সারা বুল এবং নিবেদিতা কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর পর বারাণসী থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ তারিখের চিঠিতে স্বামীজি শ্রীমতী বুলকে লিখেছেন, 'ছোটখাটো একটু ভ্রমণে মি: ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে। বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবক—তার পিতার সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব ছিল—গতকাল এই শহরে এসেছে। শিল্প সম্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ; লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করছে। মি: ওকাকুরা চলে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাঁকে শিল্পময় ভারত (অর্থাৎ যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার সে-ই উপযুক্ত লোক এবং শিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরার নির্দেশে সে নিশ্চয়ই বিশেষ উপকৃত হবে। ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও খোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী। তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেরূপ আর একটি তৈরি করাতে। কি করা যায় ভেবে ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি আসে, সে সেটা করে দিতে রাজি তো হয়েছেই, আবার বলেছে, ওকাকুরার পছন্দ ওই জিনিসটির চেয়ে বহুগুণ ভাল খোদিত কারুকার্য বিশিষ্ট কয়েকশো টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে।

'সেই অপূর্ব পুরাতন শৈলীতে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন রীতিতে আঁকতে পারে এরূপ একটি মাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি মটরদানার ওপর শিকারের একটি সম্পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন—খুঁটিনাটি বর্ণনা সহ একেবারে নিখুঁত কাজ। পর্যটন শেষ করে ওকাকুরা আশা করি আবার এই শহরে ফিরে আসবেন, তখন এই ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি কিছু কিছু দেখে যাবেন।

'মি: ওকাকুরার সঙ্গে নিরঞ্জন গিয়েছে। তিনি জাপানী বলে কোনো মন্দিরে তাঁর প্রবেশ করা নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্যান্য উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন।

'তাঁরা তাঁকে শিবের প্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে দিয়েছে। মিসেস এনি বেস্যান্ট একবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেচারি যদিও খালি পায়ে শাড়ি পরে পুরোহিতের সামনে দীনহীনভাবে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন, তথাপি তাঁকে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আমাদের বড় বড় মন্দিরগুলির কোনটাতেই বৌদ্ধদের অহিন্দু বলে মনে করা হয় না।'

এই চিঠিটি পড়ে স্পষ্টতই এটা বোঝা যায় যে, ওকাকুরাকে কলাবিশারদ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে স্বামীজির দ্বিধা ছিল না। বরং শিল্পকলা সম্পর্কে ওকাকুরার পাণ্ডিত্যের ওপর তাঁর আস্থা ছিল। সে কারণেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'শিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরার নির্দেশে সে নিশ্চয়ই বিশেষ উপকৃত হবে।' স্বামীজির এই চিঠিটি পড়ে আরো যেটা জানা যায় তা হল, ওকাকুরা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মন্দির দর্শন করেছিলেন। এবং পূজা করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে ওকাকুরার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সুসম্পর্কও স্থাপন হয়েছিল স্বামীজির। ওকাকুরাকে তিনি 'খুড়ো' সম্বোধন করতেন। পরে, এই ওকাকুরার কার্যকলাপে স্বামীজি বিরক্ত হন।

ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে জেনেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের চিঠি থেকে। ওকাকুরার পাণ্ডিত্য, প্রাচ্য দর্শন সম্পর্কে ওকাকুরার জ্ঞান, ভারতের প্রতি ওকাকুরার শ্রদ্ধা—এ সবই জোসেফিন নিবেদিতাকে জানিয়েছিলেন। ফলে, ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধার ভাব নিবেদিতার মনে জন্ম নিয়েছিল। জোসেফিন এবং ওকাকুরা যখন অজন্তা ভ্রমণ করছেন, সেই সময়ে কলকাতায় ফিরে নিবেদিতা জোসেফিনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ১৯০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জোসেফিনকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'I am so happy that Mr. Okakura has all of you and that you are all seeing Buddhist India under his wing! It must be divine to live for these days in the past–so living to him–and therefore made so essential to you.

'I long to see him–I care nothing for his knowledge–or his prestige–or anything. I want to sound his will–to measure the depth of his soul–to hear from him at what point a people's thirst for Life should cease. I think, I trust, I shall have an answer that so far I have failed to get from the successful.'

বোঝাই যায়, ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হতে নিবেদিতাও যথেষ্টই আগ্রহী ছিলেন। অপরদিকে, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের মাধ্যমে ওকাকুরাও যে নিবেদিতার সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছিলেন— তা-ও সহজেই অনুমান করা যায়। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে জোসেফিন এবং ওকাকুরা কলকাতা ফিরে আসেন। ওই সময়ে ওকাকুরার

সম্মানার্থে কলকাতার মার্কিন কনসালের বড়িতে একটি পার্টির আয়োজন করা হয়। এই পার্টিতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় নিবেদিতার। ওকাকুরা ভারত ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসার পরই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে পরিচয় ক্রমশ রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। রাজনৈতিকভাবে ওকাকুরা এবং নিবেদিতা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধগয়া এবং বারাণসী ঘুরে স্বামীজিও ইতিমধ্যেই বেলুড়ে ফিরে এসেছিলেন। তবে তাঁর শরীর আরো অনেক ভেঙে পড়েছিল। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'স্বামীজি বেলুড়ে ফিরে এলেন। পুরাতন কর্মসঙ্গীরা তাঁর মুখ দেখে বুঝলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। বিবেকানন্দকে তাঁরা ঘিরে রইলেন আকুল হয়ে। এর আগে এতটা যেন কাছে আসতেন না কেউ। দিন-রাত সবাই চোখে চোখে রাখেন তাঁকে।

'কিন্তু ঘরে বসেই অদম্য উৎসাহে মঠের দৈনন্দিন জীবন আর প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন স্বামীজি। দিনে একবার খাওয়া, রাত্রে সামান্য জলযোগ আর বিকালে একটুও বিশ্রাম না নিয়ে ক্লাস করা এই হুকুম জারি হল সবার 'পরে। মঠে দিনচর্যা কঠোরতর হয়ে উঠল। কোনও বিধান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলে তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে হয়। সাধুদের গাঢ় ধ্যান-তন্ময়তার শিক্ষা দিতে নিজে স্বামীজি রাত তিনটার আগেই উঠে ধ্যানে বসেন। তিনি আসন ছেড়ে না ওঠা পর্যন্ত কেউ ওঠে না। মঠে স্বামীজির পোষা কয়েকটি জীব আছে—একটি হরিণ, একটি সারস, একটি ছাগল, আর একটি কুকুর। গঙ্গার পাড়ে যখনই বেড়াতে যান, তাদের খাওয়ার তদবির করেন।'

১৯০২-এর ১১ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি ছিল। তার আগে, স্বামীজি বেলুড়ে ফেরার পর নিবেদিতা একদিন গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। সেই সময়ে কথায় কথায় স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেন, তিনি চলে যাচ্ছেন। নিবেদিতা জানতেন, স্বামীজির জাপান যাওয়ার কথা চলছে। নিবেদিতা ভেবেছিলেন, সেই কথাই বলছেন তিনি। ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি আর চার মাসের ভিতর স্বামীজি সত্যিই সকলকে ছেড়ে চলে যাবেন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবের কয়েকদিন পর, ২৯ মার্চ, বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন স্বামীজি। ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নিবেদিতাকে। নিবেদিতা যখন পুরস্কার বিতরণ করছিলেন, তখন স্বামীজি তাঁর দোতলার ঘরের জানলা থেকে তা দেখছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বামীজি নীচে নামতে পারেননি। স্বামীজির কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। হঠাৎই স্বামীজি জোসেফিনকে বলেন, 'আমি কখনও চল্লিশে পৌঁছব না।' এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, তা সেদিন জোসেফিন ম্যাকলিয়ড অনুমান করতে পারেননি। জোসেফিনের সঙ্গে স্বামীজির ওটিই

ছিল শেষ সাক্ষাৎকার। এর কিছুদিন পরেই জোসেফিন মায়াবতী যান। মায়াবতী থেকে ফিরে এপ্রিল মাসে আমেরিকা ফিরে যান জোসেফিন।

১৯০২ সালের ২১ মার্চ নিবেদিতা বক্তৃতা দেন ক্লাসিক থিয়েটারে। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দু মন ও আধুনিক বিজ্ঞান'। ২৮ মার্চ 'দ্য ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা নিবেদিতার বক্তব্যের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে। ইউরোপে জগদীশচন্দ্র বসুর সাফল্যের কথা নিবেদিতা ওই বক্তৃতায় বিশদভাবে তুলে ধরেন। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা লিখেছিল, 'In referring to the recent work of Dr. Bose in Europe, the lecturer pointed out the relation which his present theory of stress and strain holds to his previous accomplishment on the subject of electric waves. The wounderfully practical nature of his scientific work was shown in the fact that he had constructed by far the most perfect detector of wireless signals yet produced. The manipulative dexterity here displayed must have served him well in such later experiments as that in which he proved the continuity of mechanical and light stimulus by balancing the effect of a sunray on one wire by a twist of the hand on another.

'ইন্ডিয়ান মিরর' আরো লিখেছিল, 'In the lecturer's opinion, the Hindu race had an aptitude of strongest kind of scientific work. The brilliant imagination, the dogged persistence, and the manipulative dexterity which so distinguished this worker, might be proved to a race characteristic, not an individual inheritance.'

এপ্রিল মাসের গোড়াতেই স্বামীজির আমন্ত্রণে ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেল (সিস্টার ক্রিস্টিন) ভারতে এসে পৌছলেন। আমেরিকায় স্বামীজির সংস্পর্শে আসার সময় থেকেই ক্রিস্টিন চাইতেন ভারতে এসে স্বামীজির কাজে আত্মনিয়োগ করতে। স্বামীজিও বুঝেছিলেন, নিবেদিতার মতোই ক্রিস্টিনও এদেশে তাঁর কাজে বিশেষ সহায়ক হতে পারবেন। নিবেদিতার স্কুল চালু হওয়ার পরিকল্পনা পাকাপাকি হওয়ার পরই স্বামীজি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, স্ত্রী শিক্ষার কাজে ক্রিস্টিনও কলকাতায় এসে নিবেদিতাকে সাহায্য করুন। ক্রিস্টিন ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত, সদাহাস্যময়ী। নিবেদিতার একবারে বিপরীত চরিত্র। স্বামীজি বুঝেছিলেন, নিবেদিতার কাজে সাহায্যের জন্য একজন ধীরস্থির অথচ আত্মনিবেদিত মহিলাই দরকার। যে কারণেই একাজে ক্রিস্টিনকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। ক্রিস্টিনের সঙ্গে নিবেদিতারও লন্ডনে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ক্রিস্টিন কলকাতায় এসে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বাড়িতেই উঠলেন। স্বামীজিরও এরকমই পরিকল্পনা ছিল। স্বামীজি চেয়েছিলেন নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন একত্রে থেকে কাজ করুন।

ক্রিস্টিনের প্রতি স্বামীজির বরাবরই পূর্ণ আস্থা ছিল। তার প্রমাণ রয়েছে স্বামীজির চিঠিতে। ১৯০১-এর ৬ জুলাই ক্রিস্টিনকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি ক্ষুদ্র; অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে আমার সর্বদা আস্থা আছে। অন্য সকল বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই।

'জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। একথা নিশ্চয় জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোন বাধাবিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না।'

ক্রিস্টিনের সঙ্গে যদিও তাঁর চরিত্রগত পার্থক্য ছিল, তবু ক্রিস্টিন নিবেদিতার পছন্দের পাত্রী ছিলেন। ১৯০২ সালের ৫ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে ক্রিস্টিন সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I wish I could tell you about Christine. She is just as staunch as a Mcleod, She is gentle and clinging and not so dominant as you– but she is loyal and sympathetic and generous. Perfect in sweetness and perfect in trustworthiness and so large in her views! She cuts herself off from hosts of things–but she never condemns anything or anyone, and she is so quiet!'এর আগে ১৯ এপ্রিল একটি চিঠিতে ক্রিস্টিন সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Christine is beyond words–soothing, gracious, lovely. ...Her character is radiantly beautiful.' ক্রিস্টিন সম্পর্কে নিবেদিতার এই উচ্চ ধারণাই দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে নিবেদিতা রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লে এবং নিবেদিতার প্রয়াণের পর ক্রিস্টিন নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিতার অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার অবর্তমানে তাঁর স্কুলটিকে দক্ষভাবে পরিচালনা করেছিলেন ক্রিস্টিন। নিবেদিতার মতোই ক্রিস্টিনও উত্তর কলকাতার হিন্দু পরিবারে গিয়ে স্ত্রীশিক্ষার কার্যকারিতা বোঝাতেন এবং সেইসব পরিবারের মহিলাদের নিয়ে আসতেন শিক্ষাদানের জন্য। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সিস্টার ক্রিস্টিনের অবদানও অবহেলা করার মতো নয়।

সিস্টার ক্রিস্টিনের এই অবদানকে স্বয়ং নিবেদিতাই স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। সিস্টার ক্রিস্টিন সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন,'Yet, strong as was all this backing, there was always the doubt whether anyone would come! Ganges water was provided, in metal goblets, in case of thirst. Fresh rugs and cushions were placed on the yellow matting as individual seats. The rose tinted walls had been newly colour-washed. Men, it goes without saying, would be banished outside a circle of fifty yards. Everything had been done, in short, that could be thought of, to suggest purity and propriety. Still would the carriage return empty? We trembled

at the thought of this mortification. If only six should appear, we were determined to put a good face on the matter; if ten or twelve, we should feel ourselves triumphant. The importance of my sister's efforts made itself duly appreciated, however, when sixty or seventy ladies came to us that first day, and showed extreme reluctance to admit that afternoon need ever end.

'Old women came, accompanied by their daughter-in law. Mothers brought their married daughters, who happened to be at home on a visit. Widows of twenty five and thrity were glad to come alone. And wedded wives were only too apt to be there, accompanied by a baby and a couple of children! Sister Christine's place and sucess were assured.'

নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন দুজনেরই মৃত্যুর পর ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এই লেখাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ক্রিস্টিন তাঁর ছাত্রীদের কোন আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাও এই লেখায় জানিয়েছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'The prayer of this American teacher is that her students may be—not bad copies of the American woman, but still nobler examples of that Indian womanhood towards which their mothers strove, with a greatness and beauty that those mothers themselves any recognise and enjoy, And as I contemplate this effort, I think that wisom is shown as much in what it does not, as in what it does attempt, and for my own part I regard my American sister, striving to solve the educational problem of a foreign people as standing in the ranks so the great Educators of the world.'

ইতিপূর্বে ১৯০২-এর গোড়ায় কলকাতায় ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবেদিতা কলকাতার জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলেন। এবং ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠার আগ্রহ প্রদর্শন করতে থাকেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাজনৈতিকভাবে নিবেদিতাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিলেন পিটার ক্রপটকিন। পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে অবশ্য স্বামীজিরও ইয়োরোপে অবস্থানকালে ১৯০০ সালে আলাপ হয়েছিল। স্বামীজির ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে জানা যায়, স্বামীজির সঙ্গে ক্রপটকিনের একবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল। দুজনে একান্তে আলোচনাও হয়েছিল। তবে কী আলোচনা হয়েছিল, তা জানা যায় না। স্বামীজির সঙ্গে যখন ক্রপটকিনের পরিচয় হয় তখন রাশিয়ায় প্লেখানভের গোষ্ঠী অত্যন্ত সক্রিয় এবং ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনও তখন প্লেখানভের সঙ্গেই ছিলেন। স্বামীজির বেশ কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যা ক্রপটকিনের বিশেষ

অনুরাগী ছিলেন এ কথা ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। এই শিষ্য-শিষ্যাদের ভিতর অবশ্যই নিবেদিতা ছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ক্রপটকিনের একটি পারিবারিক ঘনিষ্ঠতাও ক্রমে তৈরি হয়েছিল। তাঁদের কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল সেটা বোঝা যায় ১৯০১ সালের ১৫ মে বোন মেরি উইলসনকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে। শ্রীমতী ক্রপটকিনের কাছে এক ফরাসি পরিচারক চেয়ে যে দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিবেদিতা, তা সেই চিঠি থেকেই জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Mdme. Kroptkin promises to enquire about a French servant here. How difficult it is! I am so anxious that you should have help!'

ক্রপটকিন যে নিবেদিতার চিন্তা-ভাবনাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিলেন, তা বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে নিবেদিতার চিঠিতে ক্রপটকিনের উল্লেখে। ১৯০৬-এর ২৩ এপ্রিল শ্রীমতী লেগেটকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I feel as if Kroptkin has a larger sense of humanity, and were more reliable in his dictates. Less engrossed in the methods, his attention is absorbed in the pattern to be carved. Swamiji would have loved Kroptkin, I think' নিবেদিতা এই চিঠিটি লিখেছিলেন স্বামীজির প্রয়াণের প্রায় একবছর পর। এই চিঠিটি পড়ে মনে হয় নিবেদিতার এই বিশ্বাস ছিল যে, ক্রপটকিনের মানবতাবোধকে স্বামীজি নিশ্চয়ই সম্মান জানাতেন। এমনকী, বাঙালি এক বিপ্লবী যুবককে ক্রপটকিনের কাছে শিক্ষা নেওয়ার জন্য পাঠানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৫-এর ৩ আগস্ট সারা বুলকে তিনি লিখেছিলেন, 'I have said to him (G. N. Mukherjee) about trying to return by Europe and study under Geddes, Kroptkin and Hyndman falls to the ground.' ক্রপটকিনের প্রতি নিবেদিতার রাজনৈতিক আস্থার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায়। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার জেলে যাবার আগে ভগিনী নিবেদিতা আমাকে প্রিন্স ক্রপটকিনের 'কেরিয়ার অব এ রেভলিউশনিস্ট ইন রাশিয়া অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ প্রিজন' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। জেলে যাবার আগেই তিনি আমাকে ক্রপটকিনের বইগুলি পড়তে অনুরোধ করেছিলেন।' অর্থাৎ বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই ক্রপটকিনের রাজনৈতিক ভাবনা যেভাবে নিবেদিতাকে আচ্ছন্ন করেছিল, মাঝে কয়েকটি বছর বাদ দিলে, তা আবারও নিবেদিতাকে প্রবলভাবেই প্রভাবিত করে। এবং ক্রপটকিনের এই রাজনৈতিক প্রভাব আমৃত্যুই নিবেদিতার উপর ছিল। কাজেই, অনায়াসে ক্রপটকিনকে নিবেদিতার রাজনৈতিক গুরু বলা যেতেই পারে। ১৯০০ সালে আমেরিকা এবং ইউরোপ সফরের সময় নিবেদিতা যখন ক্রমশ ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছেন—তখন ক্রপটকিনের প্রভাবই তাঁকে আরও উদ্দীপিত করেছিল ভারতে ফিরে এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক

হতে। এবং নিবেদিতাও ভারতে ফিরে এসে বিলম্ব করেননি এখানকার জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে। ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করে তোলার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, চিন্তাভাবনা করতে।

১৯০২ সালে নিবেদিতা কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর আগেই নরমপন্থী এবং চরমপন্থী—দুই গোষ্ঠীরই কিন্তু অস্তিত্ব ছিল বাংলার রাজনীতিতে। কংগ্রেস যেমন ছিল, তেমনই প্রমথনাথ মিত্র একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনও তার আগে থেকেই চালিয়ে আসছিলেন। অনেকে এই ভুল করেন যে, নিবেদিতা এবং ওকাকুরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই চরমপন্থী কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটে বাংলার রাজনীতিতে। এক্ষত্রে ওকাকুরা এবং নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষকেও অনেকেই এই কার্যকলাপের উদ্‌গাতা মনে করেন। বাস্তব কিন্তু তা নয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্বে কয়েকবার তিনি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্বে চারিবার তাঁহার এই উদ্যম ব্যর্থ হয়।' বোঝাই যায়, ১৯০২ সালে নিবেদিতা কলকাতা এসে পৌঁছোনোর পূর্বেই বিপ্লবী সংগঠন তৈরির জমি প্রস্তুত হচ্ছিল। এক্ষেত্রে বলা যায়, ওকাকুরার সান্নিধ্যে নিবেদিতা সে কাজ ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন।

ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় ১৯০২-এর এপ্রিল মাসে। ততদিনে ওকাকুরা বুদ্ধগয়া সহ ভারতের বেশ কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে এসেছেন। ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে নিবেদিতাও তাঁর সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। উৎসাহী হয়েছেন। তিনি যে ওকাকুরার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী তা ১৯০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন। ওকাকুরা যে শুধুমাত্র জাপানের রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ, শিল্পশাস্ত্রী নন–তাঁর যে বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে তা নিবেদিতা জানতেন না— এমন ভাবা ভুল হবে। এমন অনুমান করাই যায় যে, ওকাকুরার রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড সম্পূর্ণই অবগত ছিলেন, এবং তা তিনি নিবেদিতাকে জানিয়েওছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হতে আগ্রহী নিবেদিতাকে ওকাকুরার সেই পরিচয় যে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল, তাও অনুমান করাই যায়; যে কারণে, ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা।

ওকাকুরার সঙ্গে কলকাতায় জাতীয়তাবাদী মহলের যোগাযোগ এবং পরিচয় ঘটিয়ে দেন নিবেদিতাই। কীভাবে সেই পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়। সুরেন্দ্রনাথ নিবেদিতার স্নেহের পাত্র ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে 'জাতীয়তাবাদী' বলেই মনে করতেন নিবেদিতা। ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে ইংরাজিতে যে লেখাটি সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ

বসু-কৃত তার বাংলা অনুবাদটি এখানে তুলে দেওয়া হল— 'তাঁর প্রথম দর্শনের ছাপ আমার মনে এখনো জ্বলজ্বল করছে। গৃহস্বামিনীর পাশে উপবিষ্ট মাঝারি উচ্চতার বলিষ্ঠ একটি মানুষ, কালো সিল্কের কিমোনোয় আবৃত দেহ, তার উপরে পারিবারিক প্রতীক চিহ্ন পাঁচ পাপড়ির সাদাসিধে একটি ফুল কাজ করা বা ছাপা। তাঁর হাতে ছিল বাঁশ ও কাগজের তৈরী পাখা, তাতে রক্তপিঙ্গল রঙের পল্লবগুচ্ছের অলঙ্করণ। জাপানী কাপড়ের মোজায় পা ঢাকা, পরেছিলেন ঘাসের চটি। মুখ দেখলে জাপানীর চেয়ে চীনা মনে হয়; চোখের পাতা ভারী, যৎসামান্য গোঁফ, কিন্তু গায়ের রঙ লালচে, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে আসীন, গাম্ভীর্যে সমাহিত, মিশরীয় সিগারেটের ধূমপান করে যাচ্ছিলেন ক্রমান্বয়ে।

'ওকাকুরা নীরবে বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে প্রবলভাবে কথা বলে যাচ্ছিলেন নিবেদিতা—আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় তাঁকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনাই ছিল নিবেদিতার সুপষ্ট অভিপ্রায়। নিবেদিতা যতই তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর দেশের সম্বন্ধে (যে-দেশ তখন সকলের চোখের উপরে উঠে আসছিল) বা তাঁর বই সম্বন্ধে (যার পাণ্ডুলিপির মধ্যে সানন্দে প্রবেশ করার সুযোগ নিবেদিতা পেয়েছিলেন) প্রশংসাপূর্ণভাবে উল্লেখ করে যাচ্ছিলেন, ততই তিনি তাঁর (ওকাকুরার) কাছ থেকে স্বীকৃতিসূচক আভূমি নতমস্তকের অভিবাদন লাভ করছিলেন, কিন্তু কোনো কথা নয়।

'কিছু পরে ওকাকুরা উঠে গেলেন। আমিও অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ধরে নিয়ে বিদায় নিতে অগ্রসর হলাম। তখন নিবেদিতা রহস্যময়ভাবে আমার কাছে এসে আমাকে পাশের ঘরে যেতে বললেন। নির্দেশিত দরজা দিয়ে আমি ছোট কাচ লাগানো বারান্দায় হাজির হলাম, সেখানে কেবল একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার, যার একটিতে বসে আছেন ওকাকুরা, তখনো ধূমপান করছেন এবং পূর্বের মতোই অটল গাম্ভীর্যে পূর্ণ। আমি যদিও তাঁর থেকে অল্পবয়স্ক এবং বয়সের তুলনায় অপরিণত, তবুও তিনি নত হয়ে সমমর্যাদায় অভিবাদন জানালেন, পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। এবং খুব সুন্দরভাবে হাতের তালু মেলে ধরলেন, তাতে আমার জন্য একটা সিগারেট। তখন আমি আবিষ্কার করলাম তাঁর কিমোনোর ঢোলা হাতার একটিতে রয়েছে পুরো একটিন সিগারেট।

'ওকাকুরা থেমে-থেমে ইংরেজি বলতেন, ঠিক কথাটি যেন খুঁজে পাচ্ছেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তিনি সর্বদাই পেতেন। 'আপনার দেশের জন্য আপনি কী করতে চান বলুন?'–হঠাৎ প্রশ্ন গোড়াতেই। আমি হতভম্ব। তখন বুঝতে পারিনি, তবে পরে সন্দেহ করেছি যে, নিবেদিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ভূমিকা নিয়ে ওকাকুরাকে বলেছেন আমাদের জাগিয়ে তুলতে। সে-ধরনের কথার পক্ষে আমি তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত, আমতা আমতা করে এই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে, (অন্তত: তাই করেছি বলে মনে করেছিলাম) দেশের উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা করার ব্যাপারে আমাদের

বাধা কতখানি। যখন আমি আমার অসন্তোষজনক বক্তব্য এই বলে শেষ করেছিলাম—বর্তমানে অবস্থা যে রকম তাতে নিজের কাজটুকু সমাধা করে সমষ্টিগত ফলাফল কালের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই — তখন নিজেকে কী-যে দ্বিধা দুর্বল লেগেছিল তা এখনো মনে পড়ে।

'আমার কথা নিঃশব্দে শোনার পর ওকাকুরা বললেন, এদেশে তরুণদের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব তাঁকে ব্যথিত করেছে। বুঝতে পারা গেল, আমার থেকেই তিনি প্রথম এই কথা শোনেননি। তারপর আমাকে তাতিয়ে তোলার জন্য তিনি নিজে কোন্ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন তার বর্ণনা আরম্ভ করলেন। তাঁর অতি বাল্যকালের একটি ঘটনা যখন শোনাচ্ছিলেন তখনই প্রথম তঁর মুখে হাসির ঝলক দেখলাম; শৈশবে একদা পাশের ঘরে বাগ্‌বিতণ্ডার শব্দ শুনে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, তাঁর কাকার মুন্ডহীন ধড় উপবিষ্ট, আর গলা থেকে ফিনকি দিয়ে উঠছে রক্তের ফোয়ারা। এইভাবে ওকাকুরার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সমাপ্তি, এবং আমার সামনে তাঁর দারুণ গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকারও ইতি।'

সুরেন্দ্রনাথের এই লেখার ভিতর দিয়েই কিন্তু ওকাকুরার চরমপন্থী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওকাকুরার এই মানসিকতা সম্পর্কে যে নিবেদিতা সম্যক অবহিত ছিলেন এবং অবহিত থেকেই জাতীয়তাবাদী মহলের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন—এ অনুমান অতি সহজেই করা যায়। এতে এটিই প্রমাণ হয় যে, বাংলার জাতীয়তাবাদী মহলকে চরমপন্থার পথে আকৃষ্ট করাই তখন নিবেদিতার মূল লক্ষ্য ছিল।

শুধু জাতীয়তাবাদী মহল নয়, সেই সময়ে বাংলা সংস্কৃতি জগতের পুরোধা ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্টদের সঙ্গেও ওকাকুরার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। এ প্রসঙ্গে ১৯০২ সালের ১৬ এপ্রিল অবলা বসুকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে–অধ্যাপক মহাশয়কে (জগদীশচন্দ্র বসু) তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য উৎসুক আছেন।' পরবর্তীকালে নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

চরমপন্থার প্রতি নিবেদিতার একটি সহজাত আকর্ষণ বরাবরই ছিল। এমনকী, ওকাকুরার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও চরমপন্থা সম্পর্কে নিবেদিতার আগ্রহ কমে গিয়েছিল—এমন প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায় না। বরং, পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষ যোগাযোগই গড়ে উঠেছিল নিবেদিতার। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয়ের পরে ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য চরমপন্থা অবলম্বন করার উৎসাহ তাঁর আরো দ্বিগুণ হয়েছিল।

১৯০২-এর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর এই ক'মাস নিবেদিতা ওকাকুরার মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন। এই সময়ে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিগুলিতে দেখা যায়, নিবেদিতা ওকাকুরাকে নানা ছদ্মনামে সম্বোধন করেছেন। যেমন —Japanese Poet, Nigu, Chieftain, Subject, The other, Your child, Banner chief, Ghenghis, Your Japanese friend. কেন এরকম ছদ্মনামে ওকাকুরার কথা বোঝাতেন নিবেদিতা তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। হয়তো, ওকাকুরার কিছু কার্যকলাপ তিনি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। এই সময়েই ওকাকুরাকে 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট' বইটি রচনা করতেও নিবেদিতা সাহায্য করেছিলেন। ওকাকুরা ইংরেজি লেখায় খুব দক্ষ ছিলেন না। 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট' বইটির পাণ্ডুলিপি মূলত সংশোধন এবং সংযোজনের কাজটি করে দেন নিবেদিতাই। আর এই সংশোধন এবং সংযোজনের কাজ করার সময়ে নিবেদিতা তাঁর কিছু ভাবনাও এই গ্রন্থে সংযোজিত করেছিলেন। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট'-কে নিবেদিতা-ওকাকুরার যৌথ কাজ বলতেই হয়। নিবেদিতাও তাই-ই মনে করতেন। বইটির একটি দীর্ঘ এবং মনোজ্ঞ ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন তিনি।

১৯০২-এর মে মাসে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, ওকাকুরা দু-একজন সঙ্গীসহ মায়াবতীর দিকে রওয়ানা হন। নিবেদিতা, ওকাকুরা এবং ক্রিস্টিনের মায়াবতী যাত্রার আয়োজনের সংবাদ মেলে নিবেদিতারই চিঠিতে। ১৯০২ সালের ১৯ এপ্রিল নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'I think we may come to Mayavati together on May 1st, 2nd or 3rd.' ওই চিঠিতেই আরো দুটি রহস্যময় বিষয়ও নজরে আসে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Your telegram about Rhinoceros has reached us last night, and I have answered this morning that he will probably in Gaya on April 27, and I here. This is doubtful, however, for he may have returned here by that time, to await Nepalese pass-ports.' অনুমান করা যায় নিবেদিতার চিঠিতে 'রাইনোসেরাস' বলে কথিত ব্যক্তিটি ওকাকুরা ব্যতীত কেউ নন। কেননা, ওকাকুরার প্রসঙ্গ এলেই নিবেদিতা এইরকম ছদ্মনামের ব্যবহার করতেন। যদি তাই হয়, তাহলে বোঝাই যায় কোনো বিশেষ কারণে ওকাকুরা তখন নেপাল যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এর পরই নিবেদিতা লিখেছেন, 'However thanks to dear Mr. Mohini to whom I went secretly, telling him I had a commission to execute for you. The bank have cashed my cheque for 3000 rupees, which I have applied to your purpose. This will I trust relieve you of all anxiety. Sadananda is going to travel, and the saint pays costs, I felt that this was really necessary.'

চিঠিটি পড়ে বোঝাই যায় কোনো বিশেষ কারণে ৩০০০ টাকা জোগাড় করার কথা বলা হয়েছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতো গবেষকরা মনে করেছেন, নিবেদিতা এবং ওকাকুরার মায়াবতী ভ্রমণের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যও ছিল।

তবে, নেপাল যাওয়ার একটি পরিকল্পনা যে হয়েছিল এবং তা যে হয়েছিল স্বামীজির অগোচরে, তা বোঝা যায় ২১ এপ্রিল নিবেদিতার চিঠি থেকে। ২১ এপ্রিলের চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, 'রাইনোসর' শুধু নয়, সদানন্দের নেপাল যাওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। নেপালের পাসপোর্টের জন্য সদানন্দও অপেক্ষা করছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Meanwhile, Sadananda has gone to B.G. (Bodh Gaya) and is supposed to be going to Nepal, but the passports are not here yet, and all may turn up again here once more. Of this, Swamiji does not know.'

স্বামীজির অজ্ঞাতসারে নেপালে যাওয়ার পরিকল্পনা কেন হয়েছিল, কী উদ্দেশ্য ছিল তার পিছনে—তা কিন্তু অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। তবে, অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না—এই সব কিছুর পিছনেই নিবেদিতার একটি পরিকল্পনা ছিল। আর সে পরিকল্পনায় ওকাকুরাও জড়িত ছিলেন না, এমন কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে না। আর একটি কথাও বলা আবশ্যক যে, নিবেদিতা যে পরিকল্পনাই করে থাকুন না কেন— তা পুরোটাই জানতেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ড। শুধু জানতেনই না, এইসব কাজে নিবেদিতা যে তাঁর থেকে সাহায্যও পেতেন, নিবেদিতার চিঠিই তাঁর প্রমাণ। প্রত্যক্ষ না হলেও, পরোক্ষভাবে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড জড়িত ছিলেন এই সব কর্মকাণ্ডে।

১১ মে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, ওকাকুরা মায়াবতীতে গিয়ে পৌঁছোন। স্বামী স্বরূপানন্দ তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। তাঁর ও শ্রীমতী সেভিয়ারের আতিথ্যে মায়াবতীতে ছিলেন নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গীরা। ওকাকুরা কয়েকদিন মায়াবতীতে অতিবাহিত করে ফিরে আসেন। নিবেদিতা ২০ জুন মায়াবতী থেকে রওয়ানা দেন। ২৬ জুন কলকাতায় ফিরে আসেন। ক্রিস্টিন আরো কিছুদিনের জন্য মায়াবতীতে থেকে যান।

ওকাকুরার সঙ্গে মিলিতভাবে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ার বিষয়ে স্বামীজির যথেষ্ট আপত্তি ছিল। এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'অধ্যাপক ওকাকুরা 'আইডিয়াল অব দ্য ইস্ট' নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা পাণ্ডুলিপিটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ওকাকুরা বলিয়াছিলেন, এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টি এক। এই অধ্যাপকটি একটি আজগুবি গল্প প্রচার করিলেন—এশিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য সংগঠিত হইয়াছে, ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়। এইজন্য ভারতকে স্বাধীন

করিয়া এই সংঘের মধ্যে আনিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য কলিকাতার জনকতক নামজাদা লোক লইয়া একটি ভাসা-ভাসা মণ্ডলী গঠিত হয়। ইহার মধ্যে যতদূর অবগত আছি, হেমচন্দ্র মল্লিক (সুবোধচন্দ্র মল্লিকের খুল্লতাত), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে যাইয়া তাঁহার আন্দোলনকে বিপদগ্রস্ত করিবেন।'

স্বামীজি নিজে যদিও ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের পক্ষে ছিলেন, সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থনও করতেন, এমনকী হাইরাম ম্যাক্সিমের কাছ থেকে বন্দুক আমদানির পরিকল্পনাও করেছিলেন (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে), তথাপি ওকাকুরার সঙ্গে একত্রে নিবেদিতার বিপ্লব প্রচেষ্টাকে স্বামীজি মেনে নেননি। স্বামীজি মনে করতেন, দেশের মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার জন্য তখনো তৈরি হয়নি। যে কারণে সিস্টার ক্রিস্টিনকে স্বামীজি বলেছিলেন, 'বিদেশী শাসন উৎখাতের জন্য আমি ভারতের দেশীয় রাজন্যগণের জোট ঘটাবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই উদ্দেশ্যে আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ঘুরেছি, সেই কারণে আমি কামান নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশ থেকে কোনো সাড়া আমি পাইনি। দেশ মরে গেছে।' স্বামীজি ক্রিস্টিনকে আরও বলেছিলেন, 'নিবেদিতা ভারতের অবস্থা ও তার রাজনীতির কথা কী বোঝে? আমি তার থেকে অনেক বেশি রাজনীতি করেছি।' স্বামীজির আশঙ্কা ছিল, দেশের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা না করে ঝোঁকের বশে চরমপন্থার পথে পা বাড়ালে নিবেদিতা বিপ্লবকে সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবাহিত করে ফেলবেন। তদুপরি, স্বামীজি কখনোই চাইতেন না ভারতের কোনো বিপ্লবী আন্দোলন বিদেশের সাহায্যপুষ্ট হয়ে উঠুক। সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে স্বামীজির সাক্ষাৎকারটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। দেউস্কর স্বামীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিপ্লবী আন্দোলনে ভারতের বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা? উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, 'না, ভারতবাসীরা চতুর্থবার ঐ ভুল করবে না।' ওকাকুরার মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা স্বামীজি উড়িয়ে দিতে পারেননি। যে কারণে, ওকাকুরার সঙ্গে মিলিতভাবে কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টার বিরোধী ছিলেন স্বামীজি। তদুপরি, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ভবিষ্যৎ চিন্তা তো স্বামীজির ছিলই। স্ত্রী শিক্ষার যে দায়িত্ব নিবেদিতার ওপর অর্পণ করেছিলেন তিনি, সেই দায়িত্ব পালনে নিবেদিতা ব্যর্থ হবেন—এরকম একটি আশঙ্কাও হয়তো স্বামীজির মনে দেখা দিয়েছিল।

এছাড়াও, আর-একটি ব্যক্তিগত কারণ ছিল —তাও অনুমান করা যায়। ওকাকুরা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অসংযমী এবং অতিরিক্ত নেশায় আসক্ত। কলকাতায় এসে

প্রাথমিকভাবে বেলুড় মঠে আশ্রয় নিলেও ওকাকুরা মঠ-জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। স্বামীজি ওকাকুরাকে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদানের আহ্বানও জানিয়েছিলেন। ওকাকুরা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'জীবনকে উপভোগ করা এখনও আমার বাকি রয়েছে।' ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজি বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন একথা ঠিক; কিন্তু ওকাকুরার অসংযমী জীবনযাপন তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিরক্তই করেছিল মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯০২ সালের ১৪ জুন সারা বুলকে লেখা স্বামীজির একটি চিঠি লক্ষণীয়। স্বামীজি লিখেছেন, 'আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এমন সব জাতের হাতে গিয়ে পড়েছে, যাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় তারা সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার করে তুলেছে। সুতরাং যতদিন না জাপানীদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালবাসা ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়ে উঠছে, ততদিন তাদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উদ্ভব কেমন করে সম্ভব হবে, তা আমি বলতে পারি না। আপনি যেমন বুঝতে পেরেছেন যে, সতীত্বই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনি আমার দৃষ্টিও এ বিষয়ে খুলে গেছে যে, আমরণ সাধু চরিত্র জনাকয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হলে জনসাধারণের একটি বৃহত্তম অংশকেও এই সুমহান পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক।'

এই কথাগুলির লক্ষ্য যে ওকাকুরা—তা না বলে দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। অথচ ওকাকুরার সঙ্গে জাপানি যে যুবক এসেছিলেন, হোরি, তিনি কিন্তু স্বামীজির যথেষ্ট স্নেহধন্য হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি স্বামীজির মনোভাবও ছিল সুপ্রসন্ন। শ্রীমতী বুলকে লেখা ওই চিঠিতেই হোরি সম্পর্কে স্বামীজি বলেছেন, '(জাপানী) যুবক হোরির এখানে জ্বর হয়েছিল; সে দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে উঠে কিছুদিনের জন্য ওকাকুরার সঙ্গে গেছে। তার ধর্মভাব দেখে সবাই তাকে ভালবাসে। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তার ধরণাগুলি খুব উচ্চ এবং তার অভিলাষ এই যে, জাপানে সে খাঁটি ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সন্ন্যাসী-সংঘ স্থাপন করবে।' অর্থাৎ, বোঝাই যায়, ব্যক্তিগতভাবে ওকাকুরার ওপরই বিরক্ত হয়েছিলেন স্বামীজি।

ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর একত্রে রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়ে স্বামীজির আপত্তি আছে জেনেও, সেই সময়ে সেই পথ নিবেদিতা একবারের জন্যও পরিহার করেননি। বরং, তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে নিবেদিতা এই সময় অনেক যুক্তি সাজিয়েছেন। ২১ এপ্রিল ১৯০২ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, ' I could only say that I was prepared to take all the inspiration that a new individual could give me, whatever his race or habits, but I was not going, any more than my Guru, to treat this as anything but an individual matter. I trusted him, as Swami himself had trusted me. And whatever I might do, I should look for this understanding in Swami.' স্বামীজি

নিবেদিতাকে যেমন বিশ্বাস করতেন সেরকমই বিশ্বাস নিবেদিতাও করেন ওকাকুরাকে— এই কথা বলে নিজেই যেন নিজেকে তিনি সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন। স্বামীজি এসব ক্ষেত্রে যা করেন, তিনি যে তার বেশি কিছু করছেন না—এ কথা বলেও নিজের কার্যকলাপের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করার প্রয়াসও দেখা যায় নিবেদিতার এই চিঠিতেই। এর ঠিক আগের দিন ২০ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা জানাচ্ছেন, তাঁর এবং ওকাকুরার লক্ষ্য এক। লিখছেন, ' I am alone, and yet not alone, for another's heart and brain and eyes have been at my service for 6 weeks. And my vision is not my own now, it includes that also.'

৫ মে জোসেফিনকে যে চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছেন, সেটি পড়লে বোঝা যায়, তিনি তখন ওকাকুরার প্রভাবে কতটা আচ্ছন্ন ছিলেন। ওকাকুরা স্বামীজিকে কিছু জানাতে বারণ করেছেন, এবং নিবেদিতা মনে করেছেন, ওকাকুরার কথাই ঠিক। ওকাকুরার পরামর্শে স্বামীজির অজান্তেও কাজ করতে তখন রাজি ছিলেন নিবেদিতা। তিনি লিখেছেন, 'He says, 'leave Swami alone–it will be alright— say nothing.' I think he must be right... Don't feel worried at anything Swami may write. His ups and downs are the tides of receding illness on the shore of nerves.' কোন বিষয়টি ওকাকুরা সেই সময়ে স্বামীজিকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন, তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে, ওকাকুরার সঙ্গে একত্রে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে স্বামীজির আপত্তির কথা জেনে নিবেদিতা ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। তা বোঝা যায় তাঁর আর একটি চিঠিতে। ১৯০২-এর ২৫ মে মায়াবতী থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে এই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'I do not need to say that it is for His (Vivekananda) own sake, because I love Him and desire to serve Him truly, that I face calmly such a plan. If only He were out of India! I do not believe that His power of service is by any means ended, but I am very much inclined to believe that His presence in this country is the reverse of service, and unless some great crisis were past, must continue to be so. I am not sorry that it is impossible for me to give the reins to my feeling on the subject— for I believe that the service He would long ag have asked form me at this point would be simply to life the colours for Him, in the thick of the fight, keeping personal emotion at arm's length, lest it dims the eye or cause the hand to shake.'

৪ জুলাই স্বামীজি প্রয়াত হন। তারপরেও বেশ কয়েকমাস ওকাকুরা সম্পর্কে মোহগ্রস্ত ছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজির প্রয়াণের পর লেখা চিঠিগুলিই তার প্রমাণ। স্বামীজির প্রয়াণের কিছুদিন পরে, ৭ জুলাই নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখেছেন,

'Please live a little while, and make your child believe and understand that your dear FRIEND (Okakura) is REALLY part of the whole thing, whatever Swamiji may or may not have said, and that the Freedom is really the Work... This man (Okakura) that you have given us is noble through and through!' ওকাকুরা সম্পর্কে কতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন তখন নিবেদিতা, এই চিঠিটিই তার প্রমাণ। এর পরপরই ১৬ জুলাই যে চিঠিটি তিনি লিখেছেন জোসেফিনকে, সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে দূরত্বের প্রসঙ্গটি এসেছে। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, রামকৃষ্ণ মঠ ও ওকাকুরা —এই দুইয়ের ভিতর ওকাকুরার মতটিই তিনি সঠিক বলে গ্রহণ করছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Yes, You are right about Nigu (Okakura), and he is right, I feel sure— though the divergence between his methods and the monks' is so complete that I am quite cut off from the Math. I feel that in this, I am carrying out the mission Swami really gave me, though Swami himself thought differently, under the tortures of the physical existence. Do you understand me? I feel sure you do and will. I feel sure too that your last words hold good in your mind always–'United you stand, divided you fall.' Many a times those words have sounded in my ears, warning me not to let go N. [Nigu]. He feels that this excessive caution and rationality has been the bane always. They feel that we go to the utter ruin. I cannot say more.'২৮ জুলাই নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায় ওকাকুরা এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো একটি 'বিশেষ উদ্দেশ্যে' একমাসের জন্য সফরে বেরচ্ছেন। এই সফরটি যে কোনো গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছিল, তা-ও অনুমান করা যায় সহজেই। কারণ, নিবেদিতা লিখেছেন, এই ধরনের সফরে খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকতেই পারে। ওকাকুরাকে খুন হয়ে যেতে দিলে চলবে না। নিবেদিতা লিখেছেন, 'On Saturday they leave for a month's travel, and my heart always sinks a little, for you know such a journey is not without its evil chances for him. I am glad to have him tomorrow, in order to send him off with full prayers. I always say that if only he goes safely home this time, I do not mind next— but for the present he is a guest, and not free to be killed! You see, you brought him, and for our sakes. If he comes again, as he declares he will, it will be of his won accord, knowing what is before him. He loves Suren. What a wonderful nature he has, for loving those whom he teaches! No wonder he has strong men for his disciples!'

ওকাকুরার সেই গোপন সফরের জন্য যে টাকা দরকার হয়েছিল এবং সে টাকা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের কাছ থেকে নিবেদিতাই যে জোগাড় করে দিয়েছিলেন, তা জানা যায় ২১ আগস্টের চিঠি থেকে। নিবেদিতা তাতে লিখেছেন, 'Even if you never saw that money again, it wd. have been well spent. Anything that makes his work here possible is well spent. At present he is in Poona. I think you know his Calcutta address, so I will not repeat it here.'

ওকাকুরার কাজের জন্য যে কোনো পরিমাণ অর্থব্যয়ই যে সৎ উদ্দেশ্যে সেকথাও চিঠিতে বোঝাতে চেয়েছেন নিবেদিতা। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এই সফর শেষ করে ওকাকুরা এবং সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা ফিরে আসেন। যে উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা সফরে যান না কেন সে উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল, তা নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যায়। নিবেদিতা এমনও আশা করেছিলেন ওকাকুরা এবং সুরেন্দ্রনাথের এই সফর ভবিষ্যতের চলার পথ সহজ করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলির ভিতর সমন্বয় সাধন করতে এবং বিপ্লবী মন্ত্রে সমাজের একটি অংশকে উদ্বুদ্ধ করতেই কি ওকাকুরা-সুরেন্দ্রনাথ সফরে বেরিয়েছিলেন? ৪ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন, 'Nigu is indeed a great genius. He and Suren have seen India and returned. What have they not done? Everything. We can see our way now.'

১০ সেপ্টেম্বর ওকাকুরা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিবেদিতা আরো লিখেছেন জোসেফিনকে, 'Nigu and S. [Suren] came back as I told you having done all, and more. You know that passionate longing to serve even the least. So you do not need to be told how he had been used. He returned ten days ago. ...And now shall I try to tell you how he is worshiped, by all who really know him? Amongst the boys of Ballygunge there is a myth afloat that he is Khalki, of whom so many things are said. And this morning, I caught dear Sadananda making a pranam to him! Dear Yum, I felt how glad you would be and you need none to tell how worthy he is.'

১৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে ওকাকুরা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা লিখেছেন, 'I wrote you a long letter about Nigu last week. I fear he is working as hard as ever. It is that burning self sacrifice in little things as well as big. So unconscious of itself, that one workships so. No indeed, I do not need help in order to see the greatness of the man you brought.'

অবশ্য এর কিছুদিন পরে, অক্টোবর মাসে ওকাকুরা ভারত ত্যাগ করে জাপানে ফিরে যান। ১১ অক্টোবর নিবেদিতা যে চিঠি লিখেছিলেন জোসেফিনকে, সেই চিঠিতে ওকাকুরার ভারত ত্যাগের সংবাদ পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Your dear child [Okakura] has gone. A telegram sent at 20 to 3 on Monday last says that he wd. sail at day break on Tuesday. By now he may perhaps be at Rangoon. With him went one Hindu. Others may follow. No monks.'

ওকাকুরা সম্পর্কে নিবেদিতার এই মোহ অবশ্য বেশিদিন ছিল না। বলতে গেলে, ওকাকুরা ভারত ত্যাগের পরই ধীরে ধীরে নিবেদিতার মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওকাকুরা সম্পর্কে নিবেদিতা বিরূপ ধারণা পোষণ করতেই শুরু করেন। নিবেদিতার যে ওকাকুরা-মোহ কেটে যাবে তা অবশ্য স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'আগে তোমার ব্রাহ্মদের সম্পর্কে মোহ ছিল, এখন এই মোহ [ওকাকুরা সম্পর্কে], আগেরগুলি যেমন কেটে গেছে, এই মোহও তোমার একদিন কেটে যাবে।' স্বামীজির এই কথাগুলি নিবেদিতার চিঠিতেই জানা যায়। স্বামীজির মৃত্যুর কয়েকমাস পরে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে (২১.১২.১৯০২) নিবেদিতা লিখেছেন, 'That last Sunday He exclaimd 'Well, Margot, I see. This is the period of your such and such conviction! You have had your Brahmo conviction, and your Tagore conviction and now you have these convictions. And they will pass, as others did? And somehow the words ring very sweet in my ears now.' মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে স্বামীজি যখন এই কথাগুলি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, তখন নিবেদিতা সম্পূর্ণই ওকাকুরা-মোহে আচ্ছন্ন। অনুমান করাই যায়, স্বামীজির এই কথা নিবেদিতার তখন বিশেষ পছন্দ হয়নি। কিন্তু স্বামীজির এই কথা, অন্তত ওকাকুরা-নিবেদিতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে, খুব দ্রুতই ফলে গিয়েছিল। এবং স্বামীজির প্রয়াণের পর এই চিঠিটি যখন নিবেদিতা লিখেছেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে, তখন স্বামীজি যে কতখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা অনুভব করেছেন তিনি।

নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার সম্পর্কে ফাটল কেন ধরেছিল—কোন ঘটনায় তাঁদের ফাটল ধরেছিল, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য অবশ্য পাওয়া যায় না। নিবেদিতার চিঠি থেকে দুজনের সম্পর্কের দূরত্বের বিষয়টা জানা যায়। কী কারণে এই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে তৎকালীন ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে কিছু অনুমান করা যায়। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে বিবেকানন্দের আকস্মিক প্রয়াণ নিবেদিতার মনে এক গভীর আঘাত এবং শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজির জীবিতাবস্থায় ওকাকুরার সান্নিধ্য যদিও তাঁকে স্বামীজির থেকে দূরেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু

প্রয়াণের পর স্বামীজি নিবেদিতার মনকে আরো গভীরভাবে অধিকার করেছিলেন। আর তখনই তিনি ক্রমে ক্রমে অনুভব করতে থাকেন, স্বামীজির ভাবনাকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। ১৯০২ সালের ২১ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে যে চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছিলেন, তা থেকেই অনুমান করা যায় পুনরায় স্বামীজি তখন তাঁর মনকে কী গভীরভাবে অধিকার করে ফেলেছেন।

এছাড়াও, আরো কিছু কারণ ওকাকুরা-নিবেদিতা বিচ্ছেদের পিছনে কাজ করছিল বলে মনে হয়। ওকাকুরা ভারত-ত্যাগের পর তাঁর সাক্ষাৎ প্রভাব থেকে নিবেদিতা কিছুটা মুক্ত হয়েছিলেন। এবং সেই সময়েই ওকাকুরার কার্যাবলী পর্যালোচনা করে তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলি নিবেদিতার নজরে আসে। তিনি বুঝতে পারেন, যে পথের সন্ধান ওকাকুরা তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, সে পথটি নিতান্তই ভ্রান্ত। সে পথে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসবে না। এমনকী, ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ যে গোষ্ঠী তখন বাংলায় তৎপর ছিল, যার অন্যতম বালীগঞ্জের ঠাকুর পরিবার গোষ্ঠী, তদের সম্পর্কেও মোহমুক্তি ঘটেছিল নিবেদিতার। ২১ ডিসেম্বরের ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'To tell you the truth, I am disillusioned about the whole Ballyguange connection. Sarola is now installed as Vicegerent of the Mother. She writes to me and calls on Dr. Bose, to organise us, in her army. Her paper is said to the doing great service, preaching Kali-worship and the rest. Meanwhile I find not one soul amongst them to risk his own valuable neck. And more this takee—talkee proceeds at a screen, the more quiet do I find myself becoming. I fear Nigus time has been wasted.'

এই বালিগঞ্জ গোষ্ঠী সম্পর্কে কতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা, তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'At the same time do nothing that could again renew for me any possible link with Ballygunje. That connection is hopeless– hopeless and useless.'

স্বামীজির প্রয়াণের পর ওকাকুরার অনুগামী এই গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে নিবেদিতার এই তিক্ত ধারণার বিষয়টি আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তৃতীয় যে কারণটি ওকাকুরা নিবেদিতার বিচ্ছেদের নেপথ্যে আছে বলে অনুমান করা যায় তা হল—ওকাকুরার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিবেদিতা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, ওকাকুরা ভারতে এসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বললেও, নিজ দেশে তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। নিবেদিতা কিন্তু ভারতে আসার অনেক আগেই আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত

ছিলেন। তদুপরি, তখন জাপান বিশ্বশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। জাপানের আগ্রাসী চেহারাটিও তখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। নিজের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জাপান ব্রিটিশ-ভারতের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করবে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে, এরকম একটি সম্ভাবনা কিন্তু তখন ছিলই। এইরকম একটি প্রেক্ষাপটে নিবেদিতা ওকাকুরার প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য বা সংবাদ হয়তো পেয়েছিলেন, যা তাঁকে তাঁর জাপানি বন্ধু সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। জাপান সম্পর্কে কতটা যে বিতৃষ্ণ ছিলেন নিবেদিতা, পরবর্তীকালে তাঁর লেখাগুলিতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাপানের কোরিয়া আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে নিবেদিতা ১৯১০ সালে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লিখেছিলেন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ওই পর্বেরও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু জ্য এব্রঁ এবং লিজেল রেমঁকে দেওয়া 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর র‍্যাটক্লিফের সাক্ষাৎকারের যে অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন, তাতেও দেখতে পাচ্ছি—র‍্যাটক্লিফ বলেছেন, শেষ পর্যন্ত ওকাকুরাকে জাপানি এজেন্ট বলেই মনে করেছিলেন নিবেদিতা। ওই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ এইরকম, 'In 1902 ...She [Nivedita] was just getting over [sic] great admirer for him [Okakura]. She thought the real leadership of Asia would lie wih Japs.

'In '04–'05, I can't remember her speaking of the Russo-Jap war.

'She flinted with the idea of Jap assistance to Indian nationalism. She thought Okakura was Jap agent.

'There were many [Japs], very active, studying, administration, agriculture,... etc... she felt it was political espionage.

'The Japs in Korea outraged N. and turned the mind of every Indian against Japs.'

ওকাকুরার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে এতটাই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা যে, পরবর্তীকালে তাঁর মনে হয় ওকাকুরাকে 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট' বইটি লিখতে সাহায্য করে তিনি ভুলই করেছিলেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল, ওকাকুরার এই গ্রন্থটি রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এশীয় দেশগুলিতে জাপানের প্রভাব বিস্তার করা। যে 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট'-কে একসময় নিবেদিতা তাঁর আর ওকাকুরার যৌথ কাজ বলে মনে করেছিলেন, সেই গ্রন্থটি সম্পর্কে ১৯০৮ সালে নিবেদিতা লেখেন, 'বইটির আসল তাৎপর্য কী তা যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে কখনই আমি সহায়তা করতে যেতাম না।' ওকাকুরাকে তিনি যে আর কখনো ভারতে চান না সে কথাও নিবেদিতা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে। ১৯০৪ সালের ১৭ মার্চের চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I heard through the boys that Mr. Okakura left Japan

for America on Feb 9 th. I think I may say to you how very glad I shall be if he does not return via India. What his visit meant unconsciously was very great–and the ends that he subserved were all important—but the conscious aims were not perhaps so well directed, and I could never take the same position again, after finding how Sarola had carried things out. This could only lead to pain— so I should like to avoid the necessity of defining the matter either by wards or acts.'

বোঝাই যাচ্ছে, আর কোনোমতেই ওকাকুরার কোনোরকম কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখতে চাননি নিবেদিতা।

ওকাকুরার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পিছনে একটি ব্যক্তিগত কারণও কাজ করেছিল বলে মনে হয়। ওকাকুরার অসংযমী চরিত্র এবং মহিলাদের প্রতি দুর্বলতা, স্বামীজির মতো নিবেদিতাকেও বিরক্ত করে তুলেছিল মনে হয়। এই ধরনের চরিত্রের পুরুষ নিবেদিতার একেবারেই পছন্দের ছিল না। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিজেল রেমঁর সংগ্রহে থাকা স্বামী অশোকানন্দের যে চিঠির উল্লেখ করেছেন, তাতে জানা যায় ওকাকুরা নিবেদিতাকেও প্রেম নিবেদন করে বসেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি স্বামী অশোকানন্দ এম. হারবার্টকে লিখেছেন, 'I really have very little worthwhile information about her [Nivedita]. On the point you have specially enquired about, I know very little. I have heard that Okakura proposed to her and she rejected him, and my impression is that the man was really attracted her. More than that I do not know.'

ওকাকুরা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত এই তিক্ততা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল? এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নিবেদিতা চাননি লন্ডনে এসে ওকাকুরা নিবেদিতার পরিবারের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫ তারিখে নিবেদিতা লিখেছেন জোসেফিনকে, 'I am sure you will understand that I could not bear mother or Rich or Beatrice to meet any of our Japanese acquaintances, should they be in England. I simply could not bear it... for them, or for anyone else who belonged to me. I am sure you will see to this.'

ওকাকুরার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু বাংলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে নিবেদিতার নিবিড় সংযোগ ছিল। তফাৎ একটা হয়েছিল। নিছক সন্ত্রাস বা পরিকল্পনাহীন কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিবেদিতার আর আগ্রহ ছিল না। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নিবেদিতার সেই রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।

ছাব্বিশ

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বেশ কিছুদিন বেনারসে থাকার পর ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজি বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের খুব একটা উন্নতি ঘটল না। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'সন্ন্যাসীরা জানতেন সব শেষ হয়ে আসছে। তবু প্রতিদিন তাঁদের নতুন করে আশা জাগে। আটত্রিশ বছরের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে স্বামীজি যুঝে চলেছেন। মাসের পর মাস তাঁর ভাবগতিক দেখছেন সাধুরা। কখনও বহুমূত্র আর হাঁপানিতে কাবু হয়ে পড়েন। কখনও এমন উদগ্র কর্মব্যস্ততায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে অতি উৎসাহী কর্মীরাও ঘাবড়ে যায়। আবার শিশুর মতো সরলচিত্তে ডাক্তারদের বিধি-ব্যবস্থাও মেনে নেন। যেমন প্রশান্ত মনে মালা জপেন, তেমন প্রশান্তিতেই রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁর কাছে মৃত্যু তো কেবল 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি', তেমনি করে ভাঙা শরীরটা ছেড়ে যাওয়া।' এই সময়েই, ২১ এপ্রিল তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে স্বামীজি লিখেছেন, 'লোকে বলে, আমি বেশ আছি; কিন্তু প্রথমত বড় দুর্বল, আর জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু হয়েছে যে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে অনেকটা উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের ফোলা প্রভৃতি একেবারে গেছে।'

১৫ মে ১৯০২ আবার জোসেফিনকে লিখেছেন, 'আমি অনেকটা ভালই আছি; অবশ্য যতটা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় কিছুই নয়। নিরিবিলি থাকার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে—আমি চিরকালের মতো অবসর নেবো, আর কোনো কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করব।' ১৪ জুন সারা বুলকে লিখছেন, 'অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল।' স্বামীজির সব চিঠিতেই একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, নিজের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে উনি কখনোই বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেননি এবং এ-নিয়ে বেশি আলোচনাও করতে চাননি। শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাঁর। হাঁপানি,

ডিসপেপসিয়া, অ্যালবুমিন ইউরিয়া, ডায়াবেটিস, একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, হৃদরোগ প্রভৃতি শারীরিক সমস্যায় তখন ভুগছিলেন স্বামীজি। এরই সঙ্গে নিদ্রাহীনতা এবং উদরীতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। দীর্ঘসময় পরিব্রাজক জীবন এবং পশ্চিমে বেদান্তের প্রচারে গিয়ে যে শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল স্বামীজিকে—তার ফলেই একটি-একটি করে এই সমস্ত রোগ বাসা বেঁধেছিল তাঁর শরীরে। বলতে গেলে পাশ্চাত্যে থাকার সময়েই তাঁর শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। ১৮৯৮ সাল নাগাদই স্বামীজি যথেষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮৯৯-র ২৬ জানুয়ারি ক্রিস্টিনকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'ডায়াবেটিস উধাও, কিন্তু পরিবর্তে যা এসেছে, তাকে কোনও কোনও ডাক্তার অ্যাজমা, আবার কেউ কেউ ডিসপেপসিয়া বলেন। দুশ্চিন্তা ঘটাবার মতো অসুখ, দিনের পর দিন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।' এর আগে ১৮৯৮-র নভেম্বর মাসে খেতড়ির মহারাজাকে স্বামীজি লিখছেন, 'বায়ু পরিবর্তনে আমার আর কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না—গত চৌদ্দ বৎসর ধরে আমি একনাগাড়ে কোথাও তিনমাস থেকেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হয়, যদি কোনক্রমে বেশ কয়েক মাস কোন এক স্থানে থাকতে পারি, তবেই আমার পক্ষে ভালো হবে। তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। যা হোক, আমি বুঝতে পারছি, এ জীবনে আমার কাজ শেষ হয়েছে, ভাল ও মন্দ, বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার জীবন-তরী বয়ে গিয়েছে।'

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ১৮৯৮-র ডিসেম্বরে কিছুদিনের জন্য দেওঘর গিয়েছিলেন স্বামীজি। ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে দেওঘর থেকে সারা বুলকে লিখেছেন, 'আমি যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব না, তা আপনি আগেই জেনেছেন। আপনার সঙ্গে যাবার মতো শারীরিক শক্তি আমি সংগ্রহ করতে পারছি না।' দেওঘরে গিয়ে স্বামীজির স্বাস্থ্যের যে বিশেষ উন্নতি হয়নি, তা-ও জানা যায় তাঁর পরবর্তী একটি চিঠিতে। ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ তারিখে জোসেফিনকে স্বামীজি লিখেছেন, 'বৈদ্যনাথে বায়ু পরিবর্তনে কোন ফল হয়নি। সেখানে আট দিন আট রাত্রি শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে ওঠবার লড়াই শুরু করেছি।' ১৮৯৯-র এপ্রিল মাসে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন, 'দু বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বছরের আয়ু হরণ করেছে।'

১৮৯৭ সালে স্বামীজির লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, অনিদ্রা রোগে তিনি তখনই কষ্ট পেতে শুরু করেছিলেন। ১৮৯৭ -র ২৯ মে আলমোড়া থেকে শশী ডাক্তারকে ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'তোমার পত্র এবং দু-বোতল ঔষধ যথাসময়ে পেয়েছি। কাল সন্ধ্যা হতে তোমার ঔষধ পরীক্ষা করে দেখছি। আশা করি

একটি ঔষধ অপেক্ষা দুটির মিশ্রণে বেশি ফল পাওয়া যাবে... জীবনে কখনও শোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমুতে পারি না; অন্তত: দু-ঘন্টা এপাশ-ওপাশ করতে হয়। কেবলমাত্র মাদ্রাজ থেকে দার্জ্জিলিং পর্যন্ত (দার্জ্জিলিং-এর প্রথম মাস পর্যন্ত) বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত। সেই সুলভ নিদ্রার ভাব এখন একেবারে চলে গেছে। আর আমার সেই পুরানো এ-পাশ ও-পাশ করার ধাত এবং রাত্রির আহারের পর গরম বোধ করার ভাব আবার ফিরে এসেছে।'

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, বরানগর মঠে থাকার সময়ই স্বামীজির উদরাময় রোগের শুরু। অসম্ভব দারিদ্র এবং অনাচার সেই সময় স্বামীজিকে অসুস্থ করে ফেলেছিল। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তাঁহার মাংস খাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু পরে সাধু হইয়া মুষ্টিভিক্ষার অন্ন বা অনিশ্চিত অন্ন আহারে শরীর একেবারে কৃশ হইয়া যায় ও উদরাময় রোগ রইয়া পড়ে।' স্বামীজি সেই সময়ে এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, বলরাম বসু তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে বার্লি-সাগু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকেও জানা যায়, লন্ডনে থাকার সময় স্বামীজির একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্বামীজি তাঁহার ঠেসান-দেওয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন বা ধ্যান করিতেছিলেন। ফক্স ও বর্তমান লেখক অপরদিকের দেওয়ালের নিকট পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। স্বামীজি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার মুখে বড় কষ্টের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ পরে তিনি নি:শ্বাস ফেলিয়া ফক্সকে বলিলেন, 'দেখ ফক্স। আমার প্রায় heart fail (সন্ন্যাস রোগ) করেছিল। আমার বাবা এই রোগে মারা গিয়েছেন। বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল— এইটা আমার বংশের রোগ।'

শেষ বার যখন পাশ্চাত্যে যান স্বামীজি, তখনও যে তাঁর আর-একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, সে সংবাদ পাওয়া যায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের চিঠিতে। ২৯ নভেম্বর, ১৯০০ তরিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড সারা বুলকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, 'স্বামীজির খবর ভালো নয়। তাঁর আর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল—এখন ভারতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে উদ্গ্রীব হয়েছেন (Swamiji was not very well— had another heart attack — and was radiant about going to India —bless him)। তবে, এই বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য অবশ্য জানা যায় না।

তাঁর প্রিয় শিষ্য যে বড় স্বল্পায়ু, তা রামকৃষ্ণ পরমহংস কিন্তু অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন। স্বামীজির শরীর পরীক্ষা করে রামকষ্ণদেব একদা বলেছিলেন,

'তোর শরীরের সকল স্থানই সুলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাইবার কালে নি:শ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নি:শ্বাস পড়িলে অল্পায়ু হয়।'

তবে, স্বামীজি কিন্তু তাঁর এই শারীরিক কষ্টকে শান্ত চিত্তেই গ্রহণ করেছিলেন। মনে করেছেন, এরও প্রয়োজন তাঁর ছিল। সিস্টার ক্রিস্টিনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'কর্ম চিরকালই অশুভকে নিয়ে আসে। আমি স্বাস্থ্য হারিয়ে অশুভের মূল্য দিয়েছি। এতে আমি খুশি, মনের উন্নতিই এতে হয়েছে— আমার জীবনে একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে, তা আগে কখনও ছিল না।'

নিবেদিতা, ওকাকুরা এবং ক্রিস্টিন মায়াবতী রওয়ানা হওয়ার আগেই রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামীজি বেনারস থেকে বেলুড়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি যথেষ্টই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর কষ্ট হবে মনে করে মঠের সন্ন্যাসীরা সেই সময়ে স্বামীজির সঙ্গে সবাইকে দেখা করতেও দিচ্ছিলেন না। সেই সময়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মঠ প্রাঙ্গণে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল স্বামীজির আগ্রহে। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল, সেদিন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সবার মাঝে যাবেন। কিন্তু সকালে দু-একজন অতিথির সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর এতটাই ক্লান্ত বোধ করতে থাকেন যে, ঘর থেকে আর বেরোতে পারেননি। স্বামীজির প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সেদিন সারাদিন স্বামীজির কাছে ছিলেন। স্বামীজির শরীরের এই অবস্থা দেখে তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেছিলেন, 'কী ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতর ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি, তাহলেই জান্‌ব, দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।' নিবেদিতাও সেদিন কয়েকজন বিদেশিনী ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজিকে দেখতে এসেছিলেন। স্বামীজির কষ্ট হবে মনে করে, সেদিন তিনিও বেশিক্ষণ স্বামীজির ঘরে থাকেননি।

স্বামীজির শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে নিবেদিতাও যথেষ্টই উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৮৯৯ সালে কার্যত তাঁর এবং আরো কয়েকজন বিদেশি অনুগামীর ইচ্ছাতেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বামীজিকে আমেরিকা এবং ইয়োরোপ নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিদেশ যাত্রার সময়ও যে স্বামীজির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন নিবেদিতা, তার প্রমাণও পাওয়া যায় তাঁর চিঠিতে। ১৮৯৯ সালের ১৩ জুলাই জাহাজে স্বামীজির সঙ্গে বিদেশযাত্রার সময় জোসেফিন ম্যাক্লিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, ' I am going up to the king. I TRUST he is better to day. I begin to think that your doctor may cure him.' কতটা চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন নিবেদিতা তা বোঝা যায় ১৮৯৯-র ২১ জুলাইয়ের চিঠিতেও। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'Swami is a little restless and unwell today. ...oh dear, how I

love and worship him! I wish he'd ask me to cut my heart out and give it to him.' স্বামীজির শরীর সম্পর্কে এই চিন্তা এবং উদ্বেগ থেকেই নিবেদিতা এক জ্যোতিষীকে দিয়ে স্বামীজির একটি কুষ্ঠী আগেই করিয়েছিলেন।

মায়াবতী থেকে নিবেদিতা কলকাতা ফিরলেন ২৬ জুন। ২৮ জুন সকালে হঠাৎ করেই স্বামীজি বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বাগবাজারে সম্প্রতি একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। ২৮ জুন নিবেদিতা সে বাড়ি থেকে বেরচ্ছেন, দেখেন দুজন সাধুকে নিয়ে স্বামীজি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। 'গুরু মহারাজ কী জয়' বলে নিবেদিতা তাঁর ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজি একলাই বাড়িতে ঢোকেন। খিলানের থাম, ঘরের মেঝে, মাটির দেওয়াল আর উঠানের ডুমুর গাছ—সব কিছু হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখেন। তারপর যান দোতলায়। মেঝেতে একখানি মৃগচর্ম পাতা ছিল, বসে পড়েন তাতেই। এই অজিনাসনটিতে বসে নিজে ধ্যান করতেন। মাত্র ক'দিন হল নিবেদিতাকে দিয়েছেন।

'শেষকালে বললেন, 'বাড়িটা ভাল লাগল, তোমার কাজের উপযুক্তই হয়েছে। শিশুর মাঝে যে ভগবান আছেন, তাঁর অর্চনা করতে ভুলো না কখনও। ক্ষুদ্র কীটের মাঝেও যে ব্রহ্মবস্তু লুকিয়ে আছেন।'

'ছাত্রীদের জন্য নিবেদিতা মাটির খেলনা যোগাড় করে রেখেছিলেন, কথা বলতে বলতে সেইগুলো নিয়ে খেলা করেন স্বামীজি। একটা ম্যাজিক লণ্ঠন, অণুবীক্ষণ আর ক্যামেরাও আছে দেখতে পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

'কাল সকালে বেলুড়ে এসো। আমার ইচ্ছা তোমার কাজের ছকটা মঠের সাধুদের বুঝিয়ে দেবে।'

'এতটা নিবেদিতা কখনও আশা করেননি। স্বামীজি চলে যাচ্ছেন, এমন সময় নিবেদিতা সসঙ্কোচে থেমে-থেমে বলেন, 'স্বামীজি, বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হবে যেদিন, আপনি এসে আশীর্বাদ করে যাবেন?'

'গুরু হেসে এমন একটা ভাব করলেন যার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না। আগে নিবেদিতা তাঁকে যেমন স্নিগ্ধসুরে কথা বলতে শুনেছেন, সেই সুরে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সবসময় তোমায় আশীর্বাদ করছি যে।'

৭ আগস্ট, ১৯০২—স্বামীজির প্রয়াণের পর একটি চিঠিতে ওই দিনটির কথা স্মরণ করে নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'Saturday morning. I was going to the Math, but a note came early, to say He was coming to Town. He came at 9. Went over the whole house — explained everything– examined everything. Sat down on His own rug here — played with some Lucknow figures I had brought.

Expressed DELIGHT with the microscope and magic lantern and camera and told me to bring Him the microscope next day–asks me what I planned. I said University Settlement Work rather than school. He said 'right'. As He went— I said 'Swami, you must come back, and bless the work.' and He said 'I am always blessing you!' As the door closed, I said to Bet 'all the old sweetness Bet!'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়ে জানা যায়—মায়াবতী থেকে ফিরে আসার পর ওইদিন বেলুড় যাওয়া মনস্থ করেছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু, ওইদিন সকালেই খবর আসে স্বামীজি স্বয়ং কলকাতা আসছেন। ফলে, নিবেদিতা বেলুড় যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং স্বামীজি নিজেই নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে আসেন। স্বামীজির জীবনের এই শেষ সময়টি সম্পর্কে নিবেদিতা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে স্বামীজি একবার তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করেন, এমনকি তিনি কবিরাজী চিকিৎসা শুরু করেন, তাহার জন্য এপ্রিল, মে ও জুন এই তিনমাস ধরিয়া তিনি একবিন্দু ঠান্ডা জল পান করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে শরীরের কতদূর উপকার হইয়াছিল বলা যায় না; তবে ঐ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বল অব্যাহত আছে দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন।

'জুন মাস শেষ হইলে কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, অন্তিমকাল নিকটবর্তী। দেহত্যাগের পূর্বে বুধবার তিনি নিকটস্থ একজনকে বলেন, 'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।' এই নিকটস্থ একজন নিবেদিতা স্বয়ং।

স্বামীজির ঘনিষ্ঠজনদের বিবরণ থেকে জানা যায়, দেহত্যাগের এক সপ্তাহ আগে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে একটি পঞ্জিকা এনে দিতে বলেন। শুদ্ধানন্দ পঞ্জিকা নিয়ে এলে স্বামীজি সেটি নিজের ঘরে রেখে দেন। এবং মাঝেমধ্যেই পঞ্জিকাটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতেন —যেন বিশেষ কোনো দিনক্ষণ বাছছেন। স্বামীজির প্রয়াণের পর তাঁর গুরুভ্রাতারা বুঝতে পারেন—পঞ্জিকাটি কেন প্রয়োজন হয়েছিল স্বামীজির। জীবনের শেষক্ষণটিতেও হয়তো স্বামীজি তাঁর আচার্য রামকৃষ্ণ পরমহংসকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবও দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে এক শিষ্যকে পঞ্জিকা পাঠ করে শোনাতে বলেছিলেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে আসার পর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'আর পড়ার দরকার নেই।' স্বামীজির গুরুভ্রাতারা হয়তো আঁচ করতেই পারেননি, স্বামীজিও তাঁর গুরুর মতোই জীবনের শেষ ক্ষণটিকে নিজেই বেছে নিতে চলেছেন।

স্বামীজির আদেশমতো ২৯ জুন নিবেদিতা মঠে গেলেন। ওইদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। সেদিনটা ছিল একাদশী। স্বামীজি সেদিন উপবাস করেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, নিবেদিতাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে খাওয়াবেন। নিবেদিতাকে স্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন। খাবারের ভিতর ছিল কাঁঠালের বিচিসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, ভাত এবং বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা দুধ। খাবার পর নিবেদিতাকে হাত ধোওয়ার জন্য জল নিজেই ঢেলে দিলেন এবং তোয়ালে দিয়ে তাঁর হাত মুছিয়ে দিলেন। নিবেদিতা প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'স্বামীজি, এসব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।'

উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, 'খৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন,' নিবেদিতা প্রত্যুত্তরে বলতে চেয়েছিলেন, 'সে তো শেষ সময়ে।' নিবেদিতা তখনো জানতেন না, স্বামীজির সঙ্গে ওটিই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ।

'দ্য মাস্টার অ্যজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, 'ঐ সপ্তাহের বুধবারে—সেদিন একাদশী—স্বামীজি সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত শিষ্যকে প্রাতঃকালীন আহার্য স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। আহারের মধ্যে ছিল কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদা ভাত এবং বরফ দিয়া ঠান্ডা করা দুধ। প্রত্যেকটি জিনিস পরিবেশন করিবার সময় সেগুলি সম্বন্ধে স্বামীজি হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। সর্বশেষে আহারান্তে তিনি নিজেই শিষ্যের হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন।

'স্বভাবতই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'স্বামীজি, এ-সব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।'

'কিন্তু তাঁহার উত্তর ছিল অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্যপূর্ণ—'ঈশা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' শিষ্যের মুখে উত্তর আসিতেছিল, 'কিন্তু সে তো শেষ সময়ে।' কথাগুলি যেন কিরূপ বাধিয়া গিয়া অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। ভালই হইয়াছিল। কারণ, এখানেও শেষ সময় আসিয়া গিয়াছিল।'

১৯০২-এর ৭ অক্টোবর চিঠিতে ওই দিনটির কথা জোসেফিনকে বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা, 'Sunday. Went early. Reached Math 8 or 8-30. Stayed till 5. We talked things out a good deal— esp. about Nigu. He said He 'loved that boy! Such greatness and goodness He had never seen.' That was the blessing. In the afternoon, He grew very cross, being tired, and I cried bitterly. Then He gave me a beautiful blessing—holding my head and blessing me twice–in that caressing way. I only asked Him to tell me when He doubted and disap-

proved—not to make up His mind apart from me. Oh I am sure He will!

'That day, I think I must have told you, He said a great tapasya was coming over Him. Had I not been there—at near noon he wd. still have been in the chapel. He felt that Death was drawing near and at these words, the gecko cried. Don't you remember? 'That's true.' But still I never dreamt of less than 3 or 4 years. He was wildly interested in experiments, on the making of bread.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি থেকে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। নিবেদিতা নিজেই জানিয়েছেন, ওইদিন ওকাকুরাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বামীজির আলোচনা হয়েছিল। ওই আলোচনার সময়েই যে স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন, এই ওকাকুরা-মোহও একদিন কেটে যাবে—তাও নিবেদিতা পরবর্তী সময়ে (২১ ডিসেম্বর ১৯০২) একটি চিঠিতে জোসেফিনকে জানিয়েছিলেন। সেই চিঠিটির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে। দুটি চিঠিকে পাশাপাশি রাখলে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না—ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রসঙ্গটি সেদিন আলোচনায় এসেছিল। এবং স্বামীজি তাঁর ক্ষোভ নিবেদিতার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। নিবেদিতা অবশ্য এই চিঠিতে লিখেছেন, 'He said He 'loved that boy! Such greatness and goodness He had never seen.' মনে হয়, নিবেদিতা এই চিঠিতে ইচ্ছা করেই সেদিন ওকাকুরাকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে স্বামীজির মতান্তর এবং মনান্তরের কথাটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, এই চিঠিটি যখন তিনি লিখেছিলেন, তখনো ওকাকুরা-মোহ তাঁর কাটেনি। ওকাকুরা-মোহ কেটে যাওয়ার পর ১৯০২-এর ডিসেম্বরে যে চিঠিটি তিনি জোসেফিনকে লিখেছিলেন, সেখানে ওকাকুরা প্রসঙ্গে স্বামীজির বিরক্তির কথাটি তুলে দিয়েছিলেন।

সেই শেষ সাক্ষাৎকারে, আচার্যের সঙ্গে মনান্তর যে তাঁকে ব্যথিত করেছিল, তুমুল বিতণ্ডাও হয়েছিল দুজনের মধ্যে, তা আরো বোঝা যায় নিবেদিতার এই চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'He grew very cross, being tired, and I cried bitterly.' বোঝাই যায় স্বামীজি ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কিছু বলেছিলেন যা নিবেদিতাকে কষ্ট দিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও নিবেদিতার প্রতি স্বামীজির যে আলাদা স্নেহ এবং ভালোবাসা ছিল, তা বোঝা যায় — কারণ, ওই শেষ সাক্ষাৎকারে বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রিয় শিষ্যার মাথায় হাত রেখে দুবার আশীর্বাদ করেছিলেন। ওই চিঠিতেই নিবেদিতা জানাচ্ছেন, তাঁর মনে হয়েছিল স্বামীজি আরো তিন-চার বছর সবার মাঝখানে থাকবেন। স্বামীজি যে অকস্মাৎ চলে যাবেন তা নিবেদিতা ওইদিন ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি।

ওই দিনটি সম্পর্কে ১৯০২-এর ২৮ আগস্ট নেল এবং এরিক হ্যামন্ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'On Wednesday I went again, and stayed from 9 till noon. Oh! He was so sweet. And I think now that he knew I would never see him again. Such blessings! Such sweetness! I can not tell you. If I had only known! As it was, well as he looked, I was so full of the idea of the care he required that I introduced no topic lest it might agitate him, and I dreaded overstaying, lest I should make him tired. If I had only known how precious every moment would have been, but oh-how unbearable!'

২৯ তারিখে স্বামীজির সঙ্গে মঠে দেখা করে আসার পর কদিন আর নিবেদিতার বেলুড় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কেননা, লন্ডন থেকে নিবেদিতার সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন তাঁর যে ব্যক্তিগত পরিচারিকা, শ্রীমতী বেট, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শুশ্রূষাতেই নিবেদিতার পরপর কয়েকটি দিন কেটেছিল।

প্রয়াণের ঠিক আগের দিন স্বামীজি নিজের হাতে তৈরি একটি রুটি বেলুড় থেকে এক সন্ন্যাসীর হাত দিয়ে কলকাতায় নিবেদিতার কাছে পাঠালেন। সেই রুটিটি খুব যত্ন করে নিবেদিতা খেয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে, 'Thursday, Swami Sa. brought me a whole baking of brown bread that He sent me— and I ate every crumb of it, finishing it on Friday evening.'

স্বামীজিকে যাঁরা শেষ দিনটিতে বেলুড় মঠে দেখেছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়—৪ জুলাই খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বামীজি সকলের সঙ্গে ধ্যান করতে না বসে পুরনো দিনের নানারকম গল্পগাছা শুরু করেছিলেন। পরদিন ছিল শনিবার এবং অমাবস্যা। সেজন্য পরদিন মঠে কালীপুজো করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। পরদিন কীভাবে পুজোর আয়োজন করা হবে সে বিষয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা, তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মঠে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীজি স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বোধানন্দকে তখনই পুজোর ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। এরপরে চা পান করে মঠের ঠাকুর ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন।

স্বামীজি কখনোই এভাবে ঠাকুরঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ করে পুজো বা উপাসনা করতে বসতেন না। সেদিন স্বামীজিকে ওভাবে সব দরজা-জানলা বন্ধ করে উপাসনা করতে বসতে দেখে মঠের সকলে অবাকই হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস দেখাননি। তিন ঘণ্টা এভাবে কাটল। তারপর ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এলেন স্বামীজি। তাঁকে যেন আনন্দিত এবং উৎফুল্ল

লাগছিল। গান গাইতে গাইতে মঠের প্রাঙ্গণে পায়চারি শুরু করলেন। অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। পরে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, পায়চারি করতে করতে স্বামীজি আপন মনে বলছিলেন, 'যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহলে সে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কী করেছে? কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।'

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে স্বামীজি মঠে সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করতেন না। তাঁর আলাদা খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন স্বামীজি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ার পর সেদিন তিনি মঠের একতলায় সকলের সঙ্গে একত্রে খেতে বসলেন। খেতে বসে যথেষ্ট হাসিঠাট্টা করলেন। এ-ও বললেন যে, অন্যান্য দিনের চেয়ে এদিন তাঁর শরীর বেশ ভালো আছে। সেদিন বিকেলে নিবেদিতাকেও তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি আগের থেকে ভালো রয়েছেন।

খেয়ে ওঠার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই স্বামীজি ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত ক্লাস নিতে বসলেন। প্রতিদিন ক্লাস শুরু হত আড়াইটে তিনটে নাগাদ। সেদিন দুপুর পৌনে একটাতেই স্বামীজি ক্লাস নিতে বসলেন। তিনঘণ্টা এই ক্লাস চলল। নানারকম হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে, ছোট ছোট গল্প বলে স্বামীজি ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত ক্লাস নিলেন।

বিকেলে স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মঠের বাইরে হাঁটতে বেরোলেন স্বামীজি। হাঁটতে হাঁটতে বেলুড় বাজার অবধি চলে গিয়েছিলেন দুজনে। সেদিন দুজনে নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে বেদ বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বেদপাঠে কী উপকার হবে?' স্বামীজি উত্তর দিয়েছিলেন, 'অন্তত কুসংস্কারগুলি দূর হবে।'

বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মঠে ফিরে এলেন স্বামীজি। আমগাছের নীচে একটি বেঞ্চে বসলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের বললেন, 'অনেকদিন পরে আজকে আমার শরীরটা বেশ ভালো লাগছে।' এখানে বসেই বেশ কিছুক্ষণ স্বামী প্রেমানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন। ইয়োরোপের সভ্যতা এবং ঔপনিবেশিকতা নিয়ে আলোচনা করলেন। রামকৃষ্ণানন্দের পিতার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ স্বামীজি একটু চা খেতে চাইলেন। সাতটার সময় মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজল। সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা স্বামীজিকে প্রণাম করে একে একে মন্দিরে গেলেন। স্বামীজি দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে উঠে গেলেন। স্বামীজির সেই সময়ের সচিব স্বামী বোধানন্দ সেদিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'সেই সময়, জুলাই মাসে, বেলুড়ে ভীষণ মশার উৎপাত। ম্যালেরিয়ারও প্রকোপ যথেষ্ট। মশারি না টাঙিয়ে শোয়া যায় না।

স্বামীজি ঘরে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসীর মশারি ছিঁড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বললেন, এদের জন্য নতুন মশারি কেনার ব্যবস্থা কর। ওটিই স্বামীজির শেষ আদেশ।'

স্বামীজি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সব সময় তাঁর সঙ্গে থেকে দেখাশোনা করতেন ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র। নিজের ঘরে ঢুকে স্বামীজি ব্রজেন্দ্রকে বললেন, 'আজ বেশ হালকা লাগছে শরীরটা। আমাকে আমার জপমালাটা দাও। একটু ধ্যানে বসব।' ব্রজেন্দ্র জপমালা এনে দিলে গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন স্বামীজি। ধ্যানে বসার আগে ব্রজেন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন, পাশের ঘরে গিয়ে জপধ্যান করতে। দরকার পড়লে তিনি ডাকবেন।

রাত আটটা নাগাদ স্বামীজি ব্রজেন্দ্রকে ডেকে বললেন, ঘরের সব জানালা খুলে দিতে আর তাঁকে হাওয়া করতে। ভীষণ গরম লাগছে তাঁর। এই বলে মাটিতে শুয়ে পড়লেন স্বামীজি। ব্রজেন্দ্র তাঁর মাথার কাছে বসে হাওয়া করতে লাগলেন। জপমালাটি তখনো স্বামীজির হাতেই। কিছুক্ষণ পর ব্রজেন্দ্রকে বললেন, 'আর হাওয়া করতে হবে না। বরং আমার পা-টা একটু মালিশ করে দাও।' এরপরই স্বামীজি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এভাবেই একঘণ্টা কেটে গেল। হঠাৎই তিনি ঘুমের ভিতর শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। তারপর দুবার গভীর শ্বাস ফেললেন। তাঁর ডান হাতটি একটু কেঁপে উঠল। মাথাটি বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ল। শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

হতবাক ব্রজেন্দ্র দৌড়ে নীচে গিয়ে স্বামী অদ্বৈতানন্দকে খবর দিলেন। অদ্বৈতানন্দ তড়িঘড়ি স্বামীজির ঘরে এসেই তাঁর নাড়ির স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বামীজির হৃৎস্পন্দন বা নাড়ি স্পন্দন ছিল না। অদ্বৈতানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ডেকে পাঠালেন স্বামী বোধানন্দকে। বোধানন্দ তখন স্বামীজির রাতের খাবার প্রস্তুত করছিলেন। অদ্বৈতানন্দের ডাক শুনে তিনি দৌড়ে এসে স্বামীজির অবস্থা দেখলেন। স্বামীজির বুকে কান রেখে হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করলেন। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে কেঁদে উঠলেন বোধানন্দ। অদ্বৈতানন্দ আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে স্বামী নির্ভয়ানন্দকে পাঠালেন বরানগরে, যথাশীঘ্র সম্ভব ডা: মহেন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে আসতে। ইতিমধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা, স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দ স্বামীজির মাথার কাছে বসে রামকৃষ্ণের নাম শুরু করলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ সেদিন সকালেই কলকাতা গিয়েছিলেন। স্বামীজিকে একটু সুস্থ দেখে মঠের কিছু কাজকর্মের জন্যই তাঁরা কলকাতা গিয়েছিলেন। সেদিন রাতটা কলকাতা থাকবেন, এরকমই পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। ওই রাতেই নির্ভয়ানন্দ এবং আর-একজন সন্ন্যাসী গঙ্গা পেরিয়ে চললেন বরানগরে ডাক্তার ডাকতে আর কলকাতায় সারদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দকে খবর দিতে। সারদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ খবর পাওয়ার পর আর

এক মুহূর্তেও দেরি করলেন না। এসে পৌঁছলেন বেলুড়ে। তার আগেই রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ডা: মহেন্দ্র মজুমদার বেলুড়ে পৌঁছে গেছেন। স্বামীজিকে পরীক্ষা করেছেন। এবং জানিয়ে দিয়েছেন—রাত নটা নাগাদ স্বামীজি সব বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন।

প্রয়াণের সময় স্বামীজির বয়স হয়েছিল উনচল্লিশ বছর, পাঁচ মাস, চব্বিশ দিন। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে স্বামীজি বলেছিলেন, তিনি চল্লিশে পৌঁছবেন না। তাঁর সেই কথাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত।

সেদিনের সেই দুঃসংবাদ জানিয়ে নেল এবং এরিক হ্যামন্ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'On Friday, he sent word to Calcutta that he had never felt better. He was in the chapel till noon. Then he gave sanskrit lesson to the boys for three hours and talked to many people with SUCH sweetness all the afternoon. At half-past four, his message reached Calcutta, he drank a cup of hot milk and water and set out on a two miles walk-coming home, he sent everyone away, that he might meditate alone— the evening meditation at sunset. And strange to say— quite contrary to our usual custom, he sat through that meditaion facing North-West. After an hour or so, he turned round and lay down, calling a boy to massage and fan him. Then he slept quietly.

'Suddenly there was trmbling— a crying as if in sleep, a heavy breath, then a long pause— another breath, and that was all. Our beloved Master was gone form us for ever. Life's even-song was over. Earth's silence and Freedom's dawn was come.'

৪ তারিখ রাতে নিবেদিতা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস দ্বিতীয়বারের জন্য দেহত্যাগ করেছেন। ৫ তারিখ খুব সকালেই মঠ থেকে এক পত্রবাহক এসে হাজির হলেন নিবেদিতার বাড়িতে। সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের লেখা সংক্ষিপ্ত একটি পত্র— স্বামীজি আর নেই। পত্রটি হাতে পেয়ে তড়িদাহতের মতো নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'চোখের সামনে অক্ষরগুলো নাচতে থাকে। কাল রাত্রে দুর্জয়প্রাণ ধূর্জটি কি এই মরণের আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন? বাড়ির ভিতর একটা গুমরানো কান্না শুনে নিবেদিতা পিছন ফিরে তাকান। চাকরটা ব্যাপার বুঝতে পেরে কাঁদছে।'

পত্রবাহকের সঙ্গে নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ রওয়ানা দিলেন বেলুড়ের দিকে। কলকাতা শহরেও ততক্ষণে স্বামীজির মৃত্যু সংবাদ রটে গেছে। এই মর্মান্তিক সংবাদটি এতটাই আকস্মিক ছিল যে, কলকাতাবাসীও প্রথমে খবরটি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। পরে সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে সবাই যখন নিশ্চিত হল, তখন মানুষের ঢল নামল বেলুড়ের পথে। বেলুড়ে পৌঁছেই নিবেদিতা সোজা চলে গেলেন স্বামীজির

ঘরে। ঘরের জানালার পাল্লাগুলি বন্ধ ছিল। ঘরের ভিতর কিছুটা অন্ধকার। মেঝেতে মাদুরের ওপর স্বামীজি শায়িত। পরনে স্বামীজির গেরুয়া বস্ত্র। যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন। পাথরের মূর্তির মতো নিবেদিতা এসে বসলেন স্বামীজির মাথার কাছটিতে। আচার্যের মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলের ওপর। আস্তে আস্তে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'শোকের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। নিবেদিতার সব দুঃখ যেন ফুরিয়ে গেছে। কেবল মনে পড়তে থাকে, স্বামীজি অমরনাথে তাঁকে কি বলেছিলেন, 'রত্নেশ্বর বর দিয়েছেন আমায়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হলে আমার মৃত্যু হবে না। ইচ্ছামৃত্যুর বর।'

'যথার্থ সন্ন্যাসীর মত চলে গেলেন, ভাঙা শরীরটা হেলায় ত্যাগ করলেন। আর কিছু তো দিতে বাকী রাখেননি।'

দুপুর দুটো অবধি ওইভাবে স্বামীজির মাথাটি কোলের ওপর নিয়ে প্রস্তরবৎ বসে রইলেন নিবেদিতা। চোখে একফোঁটা জল নেই। এই শোক তাঁকেও যেন পাথর করে দিয়েছে। দুপুর দুটো নাগাদ স্বামীজির গুরুভাই এবং সন্ন্যাসীরা এসে স্বামীজির দেহ ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। নতুন গৈরিক বস্ত্র এবং ফুলের মালায় সাজিয়ে দেওয়া হল স্বামীজিকে। তারপর আরতি করলেন সন্ন্যাসীরা। এইসব ক্রিয়াকর্ম শেষ হওয়ার পর তাঁর দেহ নিয়ে আসা হল মঠেরই ভিতর গঙ্গার তীরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। জীবিত থাকতে স্বামীজিই এই স্থানটি চিহ্নিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখানেই যেন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। সকলের সঙ্গে নিবেদিতাও সেখানে এলেন। স্বামীজির শয্যার ওপর একটি গেরুয়া কাপড় দেওয়া হয়েছিল। তা দেখে নিবেদিতার মনে পড়ল, স্বামীজির সঙ্গে শেষবার যখন তাঁর দেখা হয়, ওই কাপড়টিই তিনি স্বামীজিকে পরে থাকতে দেখেছিলেন। নিবেদিতা ভাবলেন, ওই কাপড়ের একটি টুকরো তিনি যদি নিয়ে যেতে পারতেন। পাঠাতে পারতেন জোসেফিনকে। জোসেফিন আর সারা বুলের কথাও বারবার মনে পড়ছিল নিবেদিতার। ওঁরা দেশে ফিরে গেছেন। ফিরে যাওয়ার আগে ওঁরাও ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেননি, স্বামীজির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করে ফিরে যাচ্ছেন। নিবেদিতার মনের বাসনা জেনে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন, ওই কাপড়টি তিনি নিবেদিতার জন্য নিয়ে আসতে পারেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল কাজটা শোভন হবে না। তাই তিনি রাজি হননি।

একসময় স্বামীজির দেহ চিতায় শোওয়ানো হল। ক্রিয়াকর্ম-শেষে সন্ন্যাসীরা চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। একটু দূরে একটি গাছের নীচে একা বসেছিলেন নিবেদিতা। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। হঠাৎ নিবেদিতার মনে হল, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে স্পর্শ করল। ফিরে দেখেন, জ্বলন্ত চিতা থেকে উড়ে এসে সেই গেরুয়া বস্ত্রের একটি খণ্ড তাঁর পায়ের কাছে পড়েছে। পরম মমতায় নিবেদিতা সেই

বস্ত্রখণ্ডটি তুলে নিলেন। চিরবিদায়ের আগে তাঁর গুরু তাঁকে শেষ উপহারটি দিয়ে গিয়েছেন।

নিবেদিতার ডায়েরিতে ৪ জুলাই শুধু মাত্র দুটি শব্দ লেখা— 'Swami died.' যে শূন্যতা নিবেদিতার জীবনে সৃষ্টি হয়েছিল এ যেন তারই প্রতীক। কোনো শব্দ এ শূন্যতার ব্যাখ্যা করতে পারে না। জীবনে সৃষ্টি হওয়া শূন্যতার মতোই ডয়েরির বাকি পাতাটুকু সাদা।

স্বামীজির প্রয়াণের পরে নিবেদিতার মনে হয়েছিল, স্বামীজি জানতেন তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি সমাগত। এবং নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যে আর দেখা হবে না, তা-ও জানতেন। স্বামীজির প্রয়াণের পর ৭ আগস্ট জোসেফিনকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I think He certainly knew—not the minute, the hour, the day. But I think on Wednesday morning He knew that I wd. never see Him again. Remember His 'JESUS washed the feet of His disciples!'— and a pained sorry smile He gave me without a single word, when I told Him it wd. be 8 or 10 days before I cd. have the house neat enough for Him and the godfather [Romesh ch. dutt] to meet.' নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়ে জানা যাচ্ছে, শেষ সাক্ষাৎকারের সময় নিবেদিতা স্বামীজিকে বলেছিলেন, ৮-১০ দিনের ভিতরই তিনি বাড়ি (বোসপাড়া লেন) পরিষ্কার করে ফেলবেন, যাতে সেখানে স্বামীজি এবং রমেশচন্দ্র পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। নিবেদিতার একথায় স্বামীজি বিষণ্ণভাবে হেসেছিলেন।

স্বামীজি মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিন বছর ধরে জ্ঞাতি এবং শরিকদের সঙ্গে চলা তাঁর পরিবারের মামলাটি মিটিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল স্বামীজি সবকিছু যথাস্থানে ঠিকঠাক করে রেখেই গিয়েছিলেন। ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'He left everything in order. On Sunday He told me that the lawsuit with the family that had been hanging over Him for 3 years, was compromised by them voluntarily in His favour—and He was satisfied a last! It was the same with everything. Here I am, on my feet. He blessed the house and the work— and me. Everything. No loose ends of Karma. No karma at all. Three wishes— Japan, wh. he expressed the very day He went —'I want to do something for Japan.' A night's worship of the Mother-wh. was carried out by the men last Saturday. And Mr, Dutt— wh. will surely bring them together somewhere in Universe.' নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়ে বোঝা যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার একটি বিশেষ ইচ্ছা স্বামীজি নিশ্চয়ই প্রকাশ করেছিলেন। যে কারণে, নিবেদিতা স্বামীজি এবং রমেশচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর বাগবাজারের

বাড়ি পরিষ্কার করার কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামীজির তিনটি শেষ ইচ্ছার কথা বলতে গিয়েও তিনি রমেশচন্দ্রের প্রসঙ্গটি এনেছেন।

বিবেকানন্দের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা আক্ষরিক অর্থেই শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। ওই পাষাণ মূর্তির চোখে কেউ জল দেখেনি। কিন্তু কখনো কি নিবেদিতার দু চোখ ছাপিয়ে জল নামেনি? নেমেছিল। স্বামীজির মৃত্যুর পর এক চিঠিতে নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখেছিলেন 'তোমার কান্না কাল আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছি আমি তাঁর সঙ্গেই আছি —আর তুমিও আছ।' ১৮ জুলাই , ১৯০২-এর এই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Your sorrowful cry came yesterday, and all night long in my dreams I was with Him— and you. This time we knew that He was going, and it all seemed so simple, but when He had left us we sobbed— oh so bitterly. Yes, I am His child. But I am yours too. And I feel that at this time specially I belong to you alone, with some little right to console an cearess. Say that a child can be a comforter to a beloved mother!'

স্বামীজির মৃত্যু সংবাদে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড যে কতখানি শোকে কাতর হয়েছেন তা অনুমান করেছিলেন নিবেদিতা। এই মৃত্যুশোককে এই দুই বিদেশি মহিলা যে সবার নিভৃতে পরস্পরের ভিতর ভাগ করে নিয়েছিলেন, একে অপরকে সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছিলেন—এই চিঠিই তা বলে দিচ্ছে। এই চিঠিটি যেদিন জোসেফিনকে লিখেছিলেন নিবেদিতা, সেদিনই বিকেলে তিনি স্বামীজির সিমলা স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছিলেন। দেখা করেছিলেন স্বামীজির মা এবং বোনের সঙ্গে। স্বামীজির মা এবং বোন বলেছিলেন, নিবেদিতাকে দেখলে তাঁদের স্বামীজির কথাই মনে আসে। স্বামীজির মৃত্যুর পর তাঁর অসহায় মা এবং ভাইদের দেখে নিবেদিতা বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'His brother Mohim came this afternoon, and took me to see the mother [of Swamiji]. The sister came in. They said 'His name' came to them whenever they saw me. The brother is dreadfully broken and poor-looking. It nearly broken my heart. He is throwing up his service in Cashmere in order to be with his mother here, but what chance has he? What chance?

'And he wants to send younger brother to America or Japan. 'Anywhere out of Bengal—he exclamis— and I imagine I know why— and agree. But how shall it be done?

'Oh yum, you can not dream what a struggle life is becoming to everything Indian! 'Our country is the graveyard of her own children,

and the Paradise of every bully who chooses to outrage her!' —says this brothers, almost in His manner.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি থেকে স্বামীজির পরিবারের অবস্থাও বেশ খানিকটা আঁচ করা যায়। স্বামীজির মৃত্যুর পর তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী যে পুত্রশোকে যথেষ্ট কাতর হয়ে পড়েছিলেন এই চিঠিতে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। পুত্রশোকে এতটাই কাতর ছিলেন তিনি যে, স্বামীজির পরের ভাইকে (মহেন্দ্রনাথ) কাশ্মীর থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছিল, মা-কে সামলানোর জন্য। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে এখানে যে কোনো চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবেন তার কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না, পাশাপাশি স্বামীজির ছোটভাইকে বাংলার বাইরে যে কোনো জায়গায় পাঠানোর চিন্তা ভাবনাও চলছিল। বিশেষ করে, আমেরিকায় বা জাপানে। কারণ, মহেন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'ভারত তার নিজের সন্তানদের জন্যই শ্মশানভূমি'। কিন্তু কীভাবে ছোটভাইকে বিদেশে পাঠানো সম্ভব তার কোনো সদুত্তর ছিল না। অর্থাৎ এককথায়, স্বামীজির পরিবার তখন দিশাহারা এবং বিপর্যস্ত।

তবে, প্রয়াণের পর স্বামীজির প্রভাব যেন আরো বেশি আচ্ছন্ন করেছিল নিবেদিতাকে। ২৮ আগস্ট, ১৯০২ তারিখে নেল এবং এরিক হ্যামন্ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Pray that I may have strength and faithfulness and knowledge, to do this and ask no other blessing for me. I want no other. He is NOT dead— dear Nell. He is with us always. I can not even grieve. I only want to work.'

ঐ বছরই ৪ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'Everyday the passes shows me more plainly that I have indeed undertaken my father's own work. Pray that I be true to it.'

১৯০২ সালের ৭ জুলাই সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখেছেন, 'Let us all be one soul. Do you gather the strength so, for us all. I want every moment to be the realization of his will regardless of Mukti, regardless of Karma, regardless of anything, to carry our his will, flawless, entire, as he would have loved to carry it, had he been here. I came to India for that— 4 years ago— that he might feel free to die. Only that— and the moment is here.'

এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, আচার্যের সঙ্গে যতই মতান্তর হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সেই বিবেকানন্দের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন নিবেদিতা। প্রয়াত স্বামীজির প্রভাব যেন আরো বেশি আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকে। সেই প্রভাব থেকে কখনোই তিনি মুক্ত হতে পারেননি। বরং, বাকি জীবনটুকু যে কাজই করেছেন সেই

কাজকে স্বামীজি-নির্দেশিত কাজ বলেই মনে করেছেন। মনে করেছেন, তাঁর আচার্যের নির্দেশই তিনি পালন করছেন।

স্বামীজির জীবিতাবস্থাতেই নিবেদিতা রামকৃষ্ণ সংঘের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই বিষয়ে স্বামীজির আপত্তি ছিল তা জানা সত্ত্বেও নিবেদিতা নিজেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। রাখতে চাননি। নিবেদিতা কিন্তু স্বামীজির অন্য শিষ্যদের মতো অন্ধ অনুগামী হননি কখনো। স্বামীজি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুমোদন করবেন না জানা সত্ত্বেও, তা থেকে পিছিয়ে আসার চিন্তা কখনো তাঁর মাথায় আসেনি। নিজের স্বাতন্ত্র্য অন্তত এক্ষেত্রে তিনি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা যে স্বাধীনচেতা এবং প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তা স্বামীজিও জানতেন। স্বামীজি সম্ভবত এ-ও বুঝতে পারতেন যে, মিশনের সবরকম কঠোর অনুশাসনের ভিতর নিবেদিতাকে বেঁধে ফেলা সম্ভব হবে না। যে কারণে, ঠাকুর পরিবার, ব্রাহ্মদের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা বা ওকাকুরার সহযাত্রী হিসাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ—সব নিয়ে ব্যক্তিগত আপত্তি থাকলেও, কোনো নিষেধাজ্ঞা নিবেদিতার ওপর কখনোই চাপিয়ে দেননি স্বামীজি।

স্বামীজির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের দিনটিতেও অবধারিতভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ এসেছিল। কারণ, ১৯০২-এর গোড়ায় কলকাতা ফিরে আসার পর, বিশেষ করে ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হবার পর, নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ সাক্ষাৎকারের দিন নিবেদিতা স্বামীজিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আচার্য এবং শিষ্যার ভিতর এ-নিয়ে মতান্তর এবং মনান্তর হয়েছিল— সে প্রমাণও নিবেদিতার চিঠিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতই মতান্তর হোক, নিবেদিতা নিজের মত ছেড়ে নড়েননি। স্বামীজির প্রয়াণের পর ২৪ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন—

'...that last Sunday He said it was folly to have homes for widows and orphans in India—doing more harm than good. Missionaries did it—but they bought them and frightened them. Behind them were money and the sword.

'Yes', I said eagerly, 'don't you see? That's exactly why I say that the other question must be answered first! Then, all questions of Education!' 'Well well Morgot' He said, 'perhaps you are right. Only I feel that I am drawing near to death— I can not bend my mind to these worldly things now!'

নানারকম মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতা স্বামীজিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি কখনো। বরং, স্বামীজির সাহচর্য এবং পরামর্শ তাঁর কাছে খুবই কাঙ্ক্ষিত

ছিল। যে কারণেই, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথাও স্বামীজিকে পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে জড়িত কেউ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারবেন না—সংঘের গঠনতন্ত্রে এমনই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার পর তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সংঘের সঙ্গে নিবেদিতাকে কখনো সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেননি। অবশ্য আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে স্বামীজি এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিতেন, তা পরিষ্কার নয়।

নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ সংঘের ভিতর সংশয়টি দেখা দিল স্বামীজির প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই। স্বামীজির মতো প্রবল ব্যক্তিত্ববান নেতৃত্বের অভাব তো তখন মঠে পরিস্ফুট হচ্ছিলই, তার উপর স্বামীজির অবর্তমানে মঠ কর্তৃপক্ষও চাইছিলেন না নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনোভাবে মঠের নামটি জড়িয়ে যাক এবং মঠ ব্রিটিশ শাসকদের সন্দেহের তালিকায় পড়ুক। যদিও পরবর্তীকালে মঠ ব্রিটিশ শাসকদের সন্দেহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। বরং, রামকৃষ্ণ মিশনকে ব্রিটিশ শাসকরা যে সন্দেহের চোখেই দেখেছে—নানাবিধ সরকারি নথিপত্রেই তার প্রমাণ রয়েছে। তবে, সে প্রসঙ্গ অবশ্য ভিন্ন।

মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা এ-ও বুঝতে পারেননি যে, নিবেদিতার এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বামীজি কী পদক্ষেপ করতেন। তা বোঝা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। স্বামীজির প্রয়াণের পর তাঁরা চেয়েছিলেন, নিবেদিতা সংঘ-নির্দেশিত কাজকর্মই করুন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে আনুন। স্বামীজির মতো ব্যক্তিত্ব এবং সাহস তাঁর পরবর্তী সংঘের পরিচালকদের ছিল না। কাজেই তাঁরা কোনো ঝুঁকি নিতেও অরাজি ছিলেন। মঠ কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে অনুরোধ করলেন— তিনি কোন পথ বেছে নেবেন, তা স্থির করতে।

৮ জুলাই নিবেদিতা মঠে গেলেন। সঙ্গে ওকাকুরা। কিন্তু সঙ্গে ওকাকুরা থাকায় সেদিন এই বিষয়ে মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এ-নিয়ে নিবেদিতার আলোচনাই হল না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে ফের ১০ জুলাই মঠে এলেন নিবেদিতা। স্বামীজির এই দুই গুরুভ্রাতার সঙ্গে সেদিন দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল নিবেদিতার। ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দ দুজনেই নিবেদিতাকে জানালেন, মঠের সঙ্গে থাকলে কোনোরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে যে কোনো একটি পথ তাঁকে বেছে নিতে হবে। নিবেদিতা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কাজ করে যাওয়া এই মুহূর্তে তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তিনি সেই লক্ষ্য থেকে সরে আসতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত সেদিনই জানালেন না নিবেদিতা। বরং ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দের সঙ্গে

নিবেদিতার আলোচনায় স্থির হল এতদিন তিনি মঠ ও মিশনের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তার কিছুটা নিজের কাজের জন্য রেখে বাকি অর্থ সারদাদেবীর গৃহনির্মাণের জন্য দেবেন। এর কিছুদিন পরই ব্রহ্মানন্দ চিঠি লিখে নিবেদিতার কাছে জানতে চাইলেন—কী সিদ্ধান্ত নিবেদিতা নিতে চান।

দৃঢ়চেতা নিবেদিতা তাঁর আচার্যকে শেষ সাক্ষাৎকারের দিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজের স্থির করা লক্ষ্য থেকে সরবেন না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আপাতত তাঁর কাছে কাম্য। ব্রহ্মানন্দের চিঠি পাওয়ার পর নিবেদিতার মনে হল, লক্ষ্যে অটল থাকার জন্য তাঁকে একটি পথ বেছে নিতেই হবে। তা হল রাজনীতির পথ। ত্যাগ করতে হবে রামকৃষ্ণ সংঘকে। ১৮ জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক চিঠিতে রামকৃষ্ণ সংঘ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানিয়েওছিলেন নিবেদিতা। তিনি লিখলেন,

Dear Swami Brahmananda,

Will you accept on behalf of the Order and myself my acknowledgement of your letter received this evening. Painful as the occassion, I can but acquiesce in any measures that are necessary to my complete personal freedom.

I trust, however, that you and other members of the order will not fail to lay my love and reverence daily at the foot of the ashes of Sri Ramakrishna and my own beloved Guru.

I shall write to the Indian papers and acquaint them as quietly as possible with my changed position.

Yours in all gratitude and good faith,

Nivedita of Ramakrishna.

'নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ অর্ডার'—এভাবেই নিবেদিতা এতদিন নিজের পরিচয় দিতেন। কিন্তু এই চিঠিতে নিবেদিতা লিখলেন 'নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ।' তারপর থেকে নিবেদিতা নিজের পরিচয় দিতেন 'নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। সরকারিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ হল বটে, কিন্তু তিনি যে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগামিনী তা নিবেদিতা তাঁর পরিচয়ের ভিতর দিয়েই জানিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর আচার্য যে প্রতিষ্ঠানটিকে সন্তানস্নেহে গড়ে তুলেছেন, যে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং প্রসার ঘটানোই তাঁর আচার্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যে প্রতিষ্ঠানের অর্থসংগ্রহের জন্য অকল্পনীয় পরিশ্রম করে অকালে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন—সেই প্রতিষ্ঠান তাঁর জন্য কোনোরকম অস্বস্তি বা বিপদে পড়ুক তা নিবেদিতা কখনোই চাননি। নিবেদিতা উপলব্ধি

করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে মঠ-মিশনের সংস্পর্শ থাকলে, মিশনকে অদূর ভবিষ্যতে নানাবিধ অশান্তিতে পড়তে হতে পারে। সেক্ষেত্রে মিশনের কাজ ব্যাহতও হতে পারে। মিশনের কাজে কোনোরকম অন্তরায় সৃষ্টি হোক, তা নিবেদিতার কখনোই কাম্য ছিল না। সে কারণে, নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। তবে, সরকারিভাবে মঠ-মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ হলেও স্বামীজির গুরুভ্রাতা বা মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। বরং, আমৃত্যু একটি হার্দিক সম্পর্কই ছিল তাঁদের সঙ্গে। বেলুড় মঠে যাতায়াতও ছিল নিবেদিতার; যদিও স্বামীজির মৃত্যুর পর তা কমে গিয়েছিল।

সরকারিভাবে নিবেদিতার সঙ্গে মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কিছুদিন পরেই, ১৯০২-এর আগস্ট মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ বাগবাজারে নিবেদিতার বাসভবনে এসে তাঁর চিকিৎসা, ওষুধপত্র এবং পথ্যের ব্যবস্থা করেন। নিবেদিতা নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু পুষ্টির জন্য নিবেদিতার জন্য তাঁরা আমিষ খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিবেদিতা উপলব্ধি করলেন বাহ্যত মঠ-মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, স্বামীজির গুরুভ্রাতারা তাঁকে ত্যাগ করেননি। বরং বিপদে তিনি তাঁদের সহায়তা পাবেন—সে আশ্বাস নিবেদিতা পেলেন। বলতে গেলে, পরবর্তীকালেও নিবেদিতা কিন্তু স্বামীজির গুরুভ্রাতাদের এই সাহায্য এবং সমর্থন পেয়ে এসেছেন। এমনকী নিবেদিতার স্কুলটি চালাতেও স্বামীজির গুরুভ্রাতারা সাহায্য করেছেন। নিবেদিতার প্রয়াণের পর, এই স্কুলটির দায়িত্বও রামকৃষ্ণ মিশনই কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে এমনটিই মনে হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সরকারিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল নিবেদিতার রাজনৈতিক কৌশল; এটা তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল না। আর এই রাজনৈতিক কৌশলটি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ অবহিত ছিলেন।

নিবেদিতা সরকারিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পরদিনই শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার' পত্রিকা-য় সেই সংবাদটি পরিবেশিত হল। কিন্তু স্বামীজির জীবদ্দশাতেও শিশিরকুমারের 'অমৃতবাজার' যেমন স্বামীজি এবং বেলুড় মঠের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় পিছপা ছিল না, নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগের সংবাদটি প্রকাশ করেও তারা কুৎসা রটানোর চেষ্টা করেছিল। 'অমৃতবাজার' ইঙ্গিত করেছিল যে, নিবেদিতা রামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান হতে চেয়েছিলেন। তাতেই 'অমৃতবাজার' ক্ষান্ত হল না। আরো লিখল, স্বামীজিরও সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। 'অমৃতবাজার'-এর এই সংবাদে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতা। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ২৮ জুলাই 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি চিঠি লিখলেন নিবেদিতা। তিনি লিখলেন, 'It is with the deepest pain that I hear of allusions to myself as having become—by the death of my great master, the Swami

Vivekananda —leader of the order of Ramakrishna. I must ask you, therefore, to be good enough to give the widest currency at your disposal to the following statement:

1. The order of Ramakrishna has its Head Quarter at Bellur Math, Howrah and is under the absolute leadership and authorithy of the Swami Brahmananda and the Swami Saradananda, two of the most saintly men whom one could ever meet.

2. The order has received from its two great founders and Gurus a definite deposit of religious thought and realisation which it will be its task henceforth to preserve and develop.

3. My own position towards this religious treasure is that of the humblest learner, merely a Brahmacharini, or novice, not a Sanyasini or fully professed religious; without any pretentions to Sanskrit learning, and set free by the great kindness of my superiors to pursue mẏ social, literary and educational work and studies, entirely outside their direction and supervision. Indeed, since the death of my Guru, I am not likely to be much in contact with any of my fellow-disciples who are not women.

4. To my own mind, no mistake could be more deplorable than that which assumes that the Hindu people require European leaders for their religious life. The very contrary is the case.

I trust that this lettef may reach the eyes of many correspondents who will take it as a personal acknowledgement and reply.

I am etc.
Nivedita of Ramakrishna–V
July 28.'

শুরু হল নিবেদিতার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। স্বামীজি নেই, তবু ভারতকেই নিবেদিতা নিজের দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করাই তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর এই কাজটিকেও স্বামীজি নির্দেশিত কাজ বলেই মনে করেছেন নিবেদিতা। ২৪ জুলাই ১৯০২, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখলেন, ' We talk of 'Woman making'. But the great stream of the oriental woman's life flows on— who am I that I should seek in anyway to change it? Suppose even that I could add my impress to 10 to 12 girls— would it be so much gain? It is not rather by taking the national consciousness of the women like that of the men, and getting it towards

greater problems and responsibilities, that one can help? Then, when they have surveyed the great scheme, have they not already become open to new views of life and necessity ? Will they not achieve these for themslves? Oh Yum I don't know! This may all be my own sophistry. I can not tell. Only I think my task is to awake a nation, not to influence a few women.'

এর অনেক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতার এক অসামান্য মূল্যায়ন করেছিলেন। তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন নির্মলকুমারী মহলানবিশ, তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে। নির্মলকুমারীর লেখা থেকে জানা যায়, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '...যখনি কোনো মেয়ে বড়ো কিছু একটা আইডিয়া বা আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করে, তখনি খুঁজে দেখলে দেখা যাবে তার পিছনে কোনো 'ব্যক্তি' রয়েছে, যার প্রতি ভালোবাসা তাকে এই পথে টেনে বের করেছে। সে ভালোবাসাকে আমি ছোটো করছিনে। বস্তুত ভালোবাসা যখন বড়ো, কেবল তখনি সে আসক্তিমুক্ত। তখনি সে নিজেকে এমনি করে দান করতে পারে, স্বার্থপরের মতো প্রিয়জনকে নিজের কাছে বেঁধে রাখবার চেষ্টা না করে তার আদর্শের কাছে, তার কাজে, নিজেকে উৎসর্গ করে। আমার বিশ্বাস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, সিস্টার নিবেদিতা সকলেরই এই এক ইতিহাস।'

বিবেকানন্দের টানে নিবেদিতা ঘর ছেড়ে ভারতে এসেছিলেন। বিবেকানন্দের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে সব আসক্তি মুক্ত করেছিল। জীবনের দ্বিতীয় পর্বেও, রাজনীতির বন্ধুর পথে চলার সময়েও, বিবেকানন্দই ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা।

তথ্যসূত্র

১। নিবেদিতা : লিজেল রেমঁ (অনুবাদ : নারায়ণী দেবী)
২। ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
৩। Long Journey Home : Barbara Foxe
৪। Letters of Sister Nivedita : Edited by Sankari Prasad Basu
৫। স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি : ভগিনী নিবেদিতা
৬। Sister Nivedita : Pravrajika Atmaprana
৭। The Complete Works of Sister Nivedita
৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম কথিত
১০। পত্রাবলী : স্বামী বিবেকানন্দ
১১। Reminiscences of Swami Vivekananda : His Eastern and Western Admirers
১২। The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose : Patrick Geddes
১৩। জগদীশচন্দ্র পত্রাবলী
১৪। নিবেদিতা লোকমাতা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৫। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৬। রবীন্দ্র রচনাবলী
১৭। চিঠিপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮। রবিজীবনী : প্রশান্তকুমার পাল
১৯। The Life of Josephine Macleod : Pravrajika Prabudhdhaprana
২০। বাইশে শ্রাবণ : নির্মলকুমারী মহলানবীশ
২১। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ : রাণী চন্দ
২২। পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩। জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী চৌধুরানী
২৪। বিবেকানন্দ চরিত : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
২৫। The Compassionate Mother : Brahmachari Akshaychaitanya
২৬। The Story of My Experience With Truth : M.K. Gandhi
২৭। লন্ডনে বিবেকানন্দ : মহেন্দ্রনাথ দত্ত
এছাড়া আরো বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।